নীহার
রঞ্জন
গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.04.16 08:21:36 +06'00'

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

www.boiRboi.blogspot.com

তৃতীয় খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

KIRITI OMNIBUS Vol. III
Collection of Detective Stories & Novels
by Niharranjan Gupta
Published by Amar Sahitya Prakashan
7, Tamer Lane, Cal. 9
Price Rs 10/

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮০

প্রকাশক ঃ
এন. চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রণ ঃ
এস. এন. শাস্ত্রী
বি. বি. প্রেস
১১০।বি অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট ঃ
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ টাকা

সূচীপত্র

(ভূমিকা)	লীলা মজুমদার	✓০
বিষকুম্ভ	...	১
মৃত্যুবাণ	...	১৪৯
রাত্রি যখন গভীর হয়	...	৩৪৫
অলোকলতা	...	৪০৭

For More E-Books, Visit,
www.boiRboi.blogspot.com

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে নীহাররঞ্জন গুপ্তের চারটি উপন্যাস সম্বলিত হয়েছে। যথা ঃ—বিষকুম্ভ (১৯৫৬), মৃত্যুবাণ (১৯৫১-৫২), রাত্রি যখন গভীর হয় (১৯৪৮), অলোকলতা (১৯৫২)।

নীহাররঞ্জনের বিশেষ প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা ভাল। এক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ বা ক্ল্যাসিকেল সাহিত্য আছে যা সাধারণতঃ কেবলমাত্র সাহিত্যরসিকরাই প্রাণভরে উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু শতকরা পঁচাশিজন যে ধরনের বই পড়ে আনন্দ পান, তাকে কদাচিৎ উচ্চাঙ্গ সাহিত্য বলা চলে। সব দেশেই এ কথা খাটে। শেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তার সঙ্গে অ্যাগাথা খৃস্টির জনপ্রিয়তার তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। অবশ্য নীহাররঞ্জন গুপ্ত শুধু গোয়েন্দা কাহিনীই রচনা করেন নি, তাঁর লেখা অনেকগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থও আছে। বর্তমান গ্রন্থে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

এ-সব বইয়ের প্রধান উপজীব্যই হল রহস্য ও রোমাঞ্চ এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হল নানান দুর্ভাবনা ও সাংসারিক দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত সাধারণ মানুষদের নিত্যনৈমিত্তিকের গ্লানি থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিদান করা। এই সব সাধারণ মানুষদের বেশির ভাগেরই শিক্ষা ও চিন্তা সীমায়িত ও মামুলী ধরনের। জীবিকানির্বাহের সমস্যাই এঁদের সব চাইতে বড় সমস্যা। এঁদের দুঃখভাবনাগুলিও মামুলী ধরনের, অথচ আশ্চর্য ও অসাধারণের তৃষ্ণা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

সে সাধ অনেকখানি মেটানো যায় রোমাঞ্চময় বই দিয়ে। সে-সব বইতে মামুলী জিনিস থাকে না। সেখানকার জীবন নীরস ও একঘেয়ে নয়। সবই অত্যাশ্চর্য, অভাবনীয়, চাঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চময় ও মনোমোহন। এই অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতে হলে পয়সাকড়িও যৎসামান্যই লাগে। বইগুলি কেনবারও প্রয়োজন নেই; বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কিংবা লাইব্রেরী থেকে আনলেই হল। ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে এতটুকু পরিশ্রমও করতে হয় না, মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে, কিংবা তেমন হলে সিঁড়ির ধাপে বসেও পড়তে পারা যায়। তেমন বই হলে এক নিমিষেই একঘেয়ে নৈরাশ্যময় জীবন থেকে বহুদূরে এক অপূর্ব রোমাঞ্চময় জগতে বিনা খরচে চলে যাওয়া যায়। দেখতে দেখতে মনের সব গ্লানিও দূর হয়ে যায়।

রোমাঞ্চের বইকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুঃসাহসিক অভিযানের

গল্প আর রহস্যের গল্প। প্রথমটিকে সাধারণতঃ কিশোর-পাঠ্যও মনে করা হয়। কথাটা অবশ্য ভুল, কারণ ভ্রমণকাহিনী, নানান আবিষ্কারের গল্প, শিকারের গল্প, অনেক যুদ্ধের গল্প, সবই এই বিভাগে পড়ে। এসব গল্প মনগড়াও হতে পারে, বাস্তবধর্মীও হতে পারে। বাংলায় এই ধরনের রচনা যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেনি। এসব প্রসঙ্গের একরকম বলিষ্ঠতা থাকে যার তুলনা হয় না।

রহস্যের গল্পও নানান রকমের হয়। যেমন অলৌকিক কাহিনী, আজকালকার তথাকথিত বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প; আর গোয়েন্দা কাহিনী। শেষেরটির জনপ্রিয়তা সব চাইতে বেশি বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই ইংল্যাণ্ডে এ ধরনের গল্পের কথা শোনা যায়। অনেক নামকরা সাহিত্যিক এই ধরনের রচনায় হাত দিয়েছেন। তার ফলে গোয়েন্দা কাহিনীর মান সেখানে এতখানি উন্নত হয়েছে যে অনেকগুলি বই উত্তম সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সাহিত্যের মর্যাদা অবশ্য সাহিত্যিকের উপর নির্ভর করে, প্রসঙ্গের উপরে নয়।

সে যাই হোক, বর্তমান শতকের আরম্ভ থেকেই বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। গোড়ার দিকে ইংরিজি বই থেকে যথেষ্ট ধার ও চুরি হলেও, তার পরে অনেক মৌলিক কাহিনীও রচিত হয়েছে। অবশ্য সবগুলিকে সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সত্যি কথা বলতে কি সাধারণ লোকে অতটা সাহিত্যের ধার ধরে না। তারা চায় রহস্য এবং সেই ধরনের রোমাঞ্চ, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যার একান্ত অভাব। স্বচ্ছন্দে বলা চলে সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের মধ্যে এই ক্ষেত্রের সম্রাট ছিলেন অতুলনীয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর অনেক গল্পের মান ভাল বিদেশী ডিটেকটিভ গল্পের চেয়ে একটুও কম নয়। তার পরেই নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাম করতে হয়।

উন্নাসিক পাঠকবৃন্দ যাই বলুন না কেন, উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনী লেখা বড় সহজ কাজ নয়। মনের তাগাদা ও অনুপ্রেরণা ছাড়াও এর জন্য কতকগুলি বলিষ্ঠ উপকরণের প্রয়োজন হয়। এবং শৈলীও আলাদা রকমের। গল্পকে হতে হবে বাহুল্য-বর্জিত, ঝরঝরে, প্রাণবন্ত, গতিশীল। প্রতি পদক্ষেপে কাহিনীকে অগ্রসর হতে হবে, ঝুলে গেলে চলবে না। গল্প হবে মৌলিক, অভিনব; কোথাও কার্যকারণের জটিল জাল এতটুকু ছিঁড়লে চলবে না; শেষ পর্যন্ত রহস্যকে রক্ষা করে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অপরিহার্য পরিণামে পৌঁছতে হবে।

এই তো গেল একটা দিক। আরও ঝামেলা আছে। গল্পের অর্ধেক চরিত্র চোর, জোচ্চোর, ঠগ, ঠ্যাঙাড়ে, জালিয়াৎ, ধাপ্পাবাজ, ছেলেধরা, বিশ্বাসঘাতক, ব্ল্যাকমেলার, নৃশংস পাপব্যবসায়ী, খুনে গুণ্ডা, অথচ ধার্মিকের মুখোশ এঁটে লেখকের মামুলী নীতির

বুলি ঝাড়লে চলবে না। ওদিকে আবার এটাও স্পষ্ট করে দেখানো চাই যে অন্যায়কারীর সাজা হোক বা না হোক, অন্যায় চিরকাল অন্যায়।

কথাটা বলতে যত সোজা, কাজের বেলায় আদৌ তা নয় এবং সেই কারণেই পৃথিবীতে প্রতি বছর যে লাখ-লাখ ডিটেকটিভ বই লেখা হয়, তার মধ্যে মাত্র খানকতক স্থায়ী খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশেও তাই। এখনও জীবিত পঁচিশজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, ঐতিহাসিকের নাম করা যায়, কিন্তু উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকের কথা ভাবতে গেলে, ঘুরেফিরে শরদিন্দুবাবু আর নীহারবাবুর নাম করতে হয়। তবে বলাই বাহুল্য কমবয়সী লেখকদের মধ্যে দু-চারজন চেষ্টা করলেই ভাল গোয়েন্দা গল্প লিখতে পারবেন বলে মনে হয়। গুণী লেখকরা যতদিন ডিটেকটিভ গল্পকে কৃপার চক্ষে দেখবেন, ততদিন তাঁদের হাত দিয়ে ভাল গোয়েন্দা কাহিনী বেরুনো সম্ভব নয়।

অনেকের মতে গোয়েন্দার গল্প কখনও শিক্ষিত বয়স্ক পাঠকের উপযুক্ত হতে পারে না, ওসব হল গিয়ে কিশোর-পাঠ্য। এমন কি কিশোররাও ওরকম চাঞ্চল্যকর অন্যায় কাজের গল্প যত কম পড়ে, ততই মঙ্গল। এখানে এই কথা মনে রাখা ভাল যে মন্দ রচনা সর্বদাই মন্দ, তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। যে কোন শ্রেণীর রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে, সেই বিভাগের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির কথাই চিন্তা করা উচিত। গোয়েন্দা কাহিনীর বেলাও তাই।

যিনি ডিটেকটিভ গল্প লিখবেন, তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তি থাকলেও, অনেকদিন ধরে নিজেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে প্রস্তুত করতে হয়। গল্পের কাঠামো মজবুত হওয়া চাই, বিতর্ক বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই, মনস্তত্ত্ব নির্ভুল হওয়া চাই, বিস্তৃত সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই, যুক্তিপ্রয়োগে দক্ষতা চাই, মৌলিক চিন্তা চাই, বিচিত্র ভাবনা চাই।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত এইসব পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর কোন দোষ-দুর্বলতা নেই বলছি না। মাঝে মাঝে একটু অসাবধান হয়ে যান, তবু তাঁর কৌশলে অতিশয় দক্ষতা দেখা যায়। সমস্ত পূর্বাপর তথ্য, কার্যকারণ সম্পর্ক ও ঘটনার পারম্পর্য এমনই নিপুণ ভাবে দৃঢ়সংবদ্ধ করে দেন যে কাঠামো এতটুকু টস্কায় না। ওদিকে পাঠকের জল্পনা-কল্পনাকেও প্রচুর অবকাশ দেওয়া হয় এবং শেষ পরিণামে উপনীত হলে পাঠকের ক্বচিৎ নিজেকে বিড়ম্বিত বোধ হয়। গল্পের খোলা সূত্রগুলিকে যত্ন করে গিঁট বেঁধে দেওয়া হয়।

প্রায়ই আরেকটি সমস্যার উদ্রেক হয়। বিষয়বস্তু হল দুষ্কর্ম, আইন-অমান্য ইত্যাদি, ভূমিকায় পাপী ও দুষ্কর্মকারী, তাদের সঙ্গে রেষারেষি করতে হবে, অথচ গল্পকারের নিজের কলমটিকে পরিষ্কার রাখতে হবে। একদিকে গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপরদিকে

অন্যায়কারীকেও তার যোগ্য হওয়া চাই, নইলে গল্প জমবে কেন ? কিন্তু অন্যায়কারীকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় বাহাদুর বানাতে গেলে শুধু কিশোরদের কেন, বহু দুর্বলমতি বয়স্ক পাঠকেরও সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বুদ্ধিমান লেখক তারই মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে, শেষ পর্যন্ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন।

সব সময় সেটি করা যায় না, কে দুষ্ট আর কে শিষ্ট তাই নিয়ে গোলমাল বাধে। মাঝে মাঝে কোন্যান ডয়লের মত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও বঞ্চিত নিপীড়িত অন্যায়কারীকে নিষ্কৃতি দেন। অতিশয় গুণধারী লেখক না হলে এমন কাজে হাত দেওয়া মুশকিল। মনের মধ্যে একটা অতিসূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য মাপকাঠি থাকলে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-দণ্ডকে মাঝে মাঝে হাত বদল করা যায়। তবে নীহারবাবু সাধারণতঃ এই সব চুলচেরা বিচারের মধ্যে যান না। তাঁর অন্যায়কারীরা বাস্তবিকই অন্যায়কারী, এবং অনেক সময় কিরীটী রায় তাদের দেখবামাত্র চিনতে পারেন!

পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে নীহাররঞ্জন গুপ্তকে আমরা ক্ল্যাসিকেল সাহিত্যিক বলি না, কিন্তু সফল ও সার্থক গল্পকার বলে উচ্চপ্রশংসা দান করি। তিনি সাহিত্যিক অলঙ্করণের কিংবা ভাষার কারুকার্যের ধার ধারেন না, ঝরঝরে জবানিতে গল্প বলে যান। মনে হয় এগুলি লেখা গল্প নয়, মুখে বলা গল্প। তাঁর কৌশলটিও খাসা। কোথাও বাড়তি কথা, লম্বা মন্তব্য, অনাবশ্যক সংলাপ নেই। পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। আধুনিক নাটকের মত ঘর ও ঘরের আসবাবের খুঁটিনাটি বর্ণনা, চরিত্রদের চেহারা ও বেশভূষার বিশদ বিবৃতি। তার ফলে নীরস পাঠকের চোখের সামনেও স্থান ও পাত্র স্পষ্ট রূপ নেয়। তারপর ঘটনার পর ঘটনার বিজ্ঞপ্তি, কিন্তু এমনই কাহিনীর প্রবলতা যে পাঠককে আগাগোড়া সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে, কচিৎ বিরাম দেয়, কখনও খেই হারাতে দেয় না।

প্লট তৈরির এই প্রবলতা এ ধরনের লেখকের হাতের প্রধান অস্ত্র। গল্পাংশ হবে প্রবল, প্রচণ্ড, মৌলিক, আকর্ষণীয়, তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিসংগত। এগুলি কিছু তুচ্ছ গুণ নয়, এগুলিই গল্পের প্রাণশক্তি যোগায়। এর জোরেই রহস্য সজীব হয়। কারণ ঘটনা যতই না অদ্ভুত হোক, পাঠকের নীরস জীবনেও তার একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকা চাই। পাঠকের বুদ্ধিকে ও মনকে সন্তুষ্ট করতে পারা চাই, যাতে সে রুদ্ধশ্বাসে পাতা উলটিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তারপর না জানি কি হল, শেষ পরিণামে না জানি কি হবে, রহস্যের সমাধান না জানি কোথায়!

রোমাঞ্চের পিপাসা মানুষের চিত্তে থাকবেই; তাকে নিবৃত্ত করার জন্য আমাদের দেশেও থ্রিলার লেখা হবেই আর সেই রোমাঞ্চ কাহিনীগুলি যদি নীহাররঞ্জন গুপ্তের সুস্থ

নির্মল রচনার মত বিশুদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত ও আনন্দদায়ক হয়, তবে তো কথাই নেই।

বর্তমান গ্রন্থের চারিটি কাহিনীকে কোনমতেই কিশোরপাঠ্য বলা চলে না। কিন্তু তারা যদি পড়ে তো কোন ক্ষতি হয় না, কারণ নীহারবাবুর বইয়ে পাপ আছে কিন্তু পঙ্কিলতা নেই। কিরীটী নিজে অতি সাধু, সত্যসন্ধানী ও আদর্শবাদী, কিন্তু তাঁর মনে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। কাহিনীগুলি মৌলিক, তবে আঙ্গিকের দিক থেকে বিদেশী প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব। আমরা যত ডিটেকটিভ কাহিনী পড়ি তার শতকরা নিরানব্বইটিই বিদেশীর রচনা। শততমও হয়তো প্রভাবিত, কিন্তু এই প্রভাবে গল্পের মৌলিকত্বের হানি হয় না।

"রাত্রি যখন গভীর হয়" কয়লার খনিতে নৃশংস খুনের গল্প। এর পরিবেশ রচনা প্রশংসনীয়; ১৯৪৮ সালে রচিত এই কাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতার মনে শিহরণ জাগাবে। মামুলী উপকরণ দিয়ে তৈরি সরল অর্থলোভের গল্প, চাতুরী এইখানে যে শেষ অধ্যায়ের প্রায় শেষ পাতা পর্যন্ত আততায়ীর হদিস পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের এই কাহিনীটিকেই কিশোর-পাঠ্যও আখ্যা দেওয়া চলে।

মনে হয় মৃত্যুবাণের (রচনা ১৯৫১-৫২) কাহিনী সেকালের কুখ্যাত পাকুড় মামলার তদন্ত দ্বারা প্রণোদিত, কিন্তু গল্পটি মনগড়া। এই গ্রন্থের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা বিভূতিবাবুর রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও সাধারণতঃ নীহাররঞ্জন প্রাকৃতিক বর্ণনা বাদ দিয়ে থাকেন।

অলোকলতার (রচনা ১৯৫২) চরিত্রদের মধ্যে সম্বন্ধটি যেন আমাদের দেশের চেয়ে বিলেতেই মানাত ভাল। তবে বিরল ঘটনাই গল্পের উপজীব্য। যা সচরাচর ঘটে, তার আকর্ষণ কম।

বিষকুম্ভের (রচনা ১৯৫৬) পরিবেশটিও এদেশী নয়, কিন্তু চরিত্রগুলিকে এদেশে, বিশেষ করে এই কলকাতা শহরে, দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যাদের অস্বাভাবিক মনে হয়, কিরীটী সে সব চরিত্রেরও মন অতি সহজে বিশ্লেষণ করে অন্যান্য চরিত্রদের সঙ্গে পাঠকের সামনেও উপস্থিত করেন। অস্বাভাবিক আর অসাধারণ আলাদা জিনিস। দুটিই বিরল। নীহাররঞ্জন দুই নিয়েই কারবার করেন।

লীলা মজুমদার

কিরীটী—৩য়

বিষকুম্ভ

www.boiRboi.blogspot.com

॥ এক ॥

তাসের ঘর।

সেই তখন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম একপাটি চকচকে তাস নিয়ে কিরীটী তার বসবার ঘরে, শিথিল অলস ভঙ্গিতে সোফাটার উপরে বসে, সামনের নিচু গোল টেবিলটার ওপরে নানা কায়দায় একটার পর একটা তাস বসিয়ে, তাসের একটা ঘর তৈরি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবারই কিছুটা গড়ে উঠবার পর ভেঙেচুরে তাসগুলো টেবিলের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে। এবং বারংবার সেই প্রচেষ্টার একই পুনরাবৃত্তি দেখছিলাম তারই উল্টো-দিকে অন্য একটা সোফার ওপরে বসে আমি নিঃশব্দে।

প্রতিবারের ভেঙে-পড়া তাসের ঘরের পুনর্গঠনের মধ্যে নিজে ব্যস্ত থাকলেও কিরীটীর সমস্ত মনটাই যে কোনো একটি বিশেষ চিন্তার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল সেটা আমি জানতাম বলেই তার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে বসেছিলাম কোনরূপ সাড়াশব্দ না করে।

নিস্তব্ধ ঘরটার মধ্যে দেওয়াল-ঘড়ির মেটাল-পেণ্ডুলামটা কেবল একঘেয়ে বিরামহীন একটা টকটক শব্দ তুলে চলছিল।

ফাল্গুনের ঝিমিয়ে-আসা শেষ বেলা।

কলকাতা শহরে এবারে শীতটা যেমন একটু বেশ দেরিতেই এসেছিল তেমনি এখনো যাই যাই করেও যেন যাচ্ছে না।

একটা মৃদু মোলায়েম শীত-শীত ভাব যেন শেষ-হয়ে-যাওয়া গানের মিষ্টি সুরের রেশের মতই দেহ ও মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অবিশ্যি তিন-চার দফা চা পান উভয়েরই হয়ে গিয়েছে। এবং কিরীটীর শেষবারের চায়ের কাপটার অর্ধনিঃশেষিত চাটুকু তারই সামনে টেবিলের উপরে তখনো ঠাণ্ডা হচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হবে এসেছি কিন্তু কিরীটী আমার পদশব্দে চোখ না তুলেই সেই যে, আয় সুব্রত বস্, বলে তাসের ঘর তৈরিতে মেতে আছে তো আছেই। আর আমিও সেই থেকে আসা অবধি বোবা হয়ে বসে আছি তো আছিই।

ঘড়ির পেণ্ডুলামটা তেমনিই টকটক শব্দ করে চলেছে।

নিচের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল হর্ণ বাজিয়ে ইঞ্জিনের শব্দ তুলে।

শেষ পর্যন্ত বসে বসে একসময় কখন যেন কিরীটীর তাসের ঘর তৈরি দেখতে দেখতে

তন্ময় হয়ে গিয়েছি নিজেই জানি না।

দেখছিলাম তাসের পর তাস সাজিয়ে ঘরটা এবারে কিরীটী অনেকটা গড়ে তুলেছে। হঠাৎ সব আবার ভেঙে টেবিলের উপরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল, যাঃ! আবার ভেঙে গেল!

সম্পূর্ণভাবে সোফার গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, জানি তাসের ঘর এমনি করেই ভেঙে যায়। বৃথা চেষ্টা।

আমিও প্রশ্ন করলাম, কি হল?

পাচ্ছি না। দাঁড়াবার মত কিছুতেই যেন একটা শক্ত ভিত পাচ্ছি না।

কেন?

কেন আর কি! টুকরো টুকরো সূত্রগুলো এমন এলেমেলো যে, একটার সঙ্গে অন্যটা কিছুতেই জোড় দিতে পাচ্ছি না।

তাসগুলো টেবিলের উপরে তেমনিই ছড়িয়ে রয়েছে।

দিনান্তের শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ইতিমধ্যে কখন জানি ধূসর আবছা অন্ধকার একটু একটু করে চাপ বেঁধে উঠেছে।

বাঁ-দিকে উপবিষ্ট সোফার হাতলের উপর থেকে রক্ষিত চামড়ার সিগারকেস ও দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে, তা থেকে একটা সিগার বের করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে, সিগারে অগ্নিসংযোগ করে নিল কিরীটী। জলন্ত ওষ্ঠধৃত সিগারটায় কয়েকটা মৃদু সুখটান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করে কিরীটী আবার কথা বললে, ভুজঙ্গ ডাক্তারকে কেমন লাগল আজ সুব্রত?

ভুজঙ্গ ডাক্তার। ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী, এফ্. আর. সি. এস্. (লণ্ডন)।

মনে পড়ল মাত্র আজই সকালে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

কিরীটীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আজকের সকালের সমস্ত দৃশ্যটাই যেন মুহূর্তে মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী।

নামে ব্যবহারে চেহারায় কারও মধ্যে এতটা সামঞ্জস্য, আবার সেই অনুপাতে অসামঞ্জস্যও থাকতে পারে ইতিপূর্বে যেন আমার সত্যিই ধারণারও অতীত ছিল।

ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বার থেকে তার সঙ্গে আলাপ করে ফিরবার পথে ঐ কথাটাই বারবার আমার যে মনে হয়ছিল সেও মনে পড়ে ঐ সঙ্গে।

সামঞ্জস্যটা ওর চেহারা ও নামের মধ্যে। মনে হয়েছিল শিশুকালে যিনিই ও ভুজঙ্গ নামকরণ করে থাকুন না কেন, দূরদর্শী ছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে। কারণ আর যাই করুন

না কেন কানা ছেলের নাম যে পদ্মপলাশলোচন রাখেননি এটা ঠিকই।

কিন্তু ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়বে না। এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবে নজরে আসবে এবং বলাই বাহুল্য চোখ ফিরিয়ে নিতে হবেই। না নিয়ে উপায় নেই। সমস্ত মনটা ঘিনঘিন করে উঠবে। এবং সেই সঙ্গে মনে হবে লোকটার ঐ ভুজঙ্গ নাম ছাড়া দ্বিতীয় কোন আর নাম বুঝি হতেই পারত না।

গায়ের রঙ লোকটির সত্যিকারের কাঞ্চনবর্ণ বলতে শুদ্ধ ভাষায় যা বোঝায় ঠিক তেমনি। চোখ যেন একেবারে ঠিকরে যায়। কিন্তু মানুষের গায়ের রঙটাই তো তার রূপের সবটুকু নয়। মুখখানা চৌকো। অনেকটা ভারী চোয়ালওয়ালা দ্রাবিড়িয়ান টাইপের মুখ। টানা দীর্ঘায়ত রোমশ ভ্রূযুগল। তার মধ্যে দু-একটা ভ্রূকেশ এত দীর্ঘ যে বিস্ময়ের চিহ্নের মত যেন উঁচিয়ে আছে। তারই নিচে ক্ষুদ্র গোলাকার পিঙ্গল দুটি চক্ষুতারকা। শানিত ছোরার ফলার মতোই সে-দুটি চোখের দৃষ্টিতে যেন অদ্ভুত একটা বুদ্ধির প্রাখর্য। শুধু কি প্রাখর্যই, আরও কি যেন আছে সেই দুটি পিঙ্গল চক্ষুতারকার দৃষ্টির মধ্যে। এবং যেটা সে-দৃষ্টির দিকে তাকালেই তবে অনুভূত হয়, অদ্ভুত এক আকর্ষণ।

চোখের নিচেই নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো যেন একটু বেঁকে রয়েছে সামনের দিকে।

গালের দু-পাশে হনু দুটি একটু বেশিমাত্রায় সজাগ, অনেকটা বদ্বীপের মত। অতিরিক্ত মাত্রায় ধূমপানের ফলে পুরু ওষ্ঠ দুটিতে একটা পোড়া তামাটে রঙ ধরেছে আর তারই মধ্যে মধ্যে কলঙ্কের মত ছোট ছোট সব শ্বেতীচিহ্ন। চিবুকটা একটু ভোঁতা এবং ঠিক মধ্যিখানে পড়ছে একটা খাঁজ।

আরও একটা বিশেষত্ব আছে মুখটার মধ্যে। প্রশস্ত কপালের ডানদিকে একেবারে প্রান্ত ছুঁয়ে আধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা একটা রক্তজড়ুল চিহ্ন। সেই জড়ুলের উপরেও দুটি দীর্ঘ কেশ।

মাথায় অত্যন্ত ঘন কর্কশ কুঞ্চিত কেশ অনেকটা নিগ্রোদের মত, ব্যাকব্রাস্ করা।

লম্বা হাড়গিলে প্যাটার্নের ডিগডিগে চেহারা। সরু লম্বা গলা। কণ্ঠা ও চিবুকের মধ্যবর্তী গলনলীর উপরে অ্যাডামস্ অ্যাপেলটা যেন একটু বেশী প্রকট। ইংরাজীতে যাকে বলে প্রমিনেন্ট।

নিখুঁতভাবে দাড়িগোঁফ কামানো। মধ্যে মধ্যে লোকটির সূচাগ্র জিহ্বার অগ্রভাগটা বের করা আর টেনে নেওয়া যেন একটা বদভ্যাস। সব কিছু জড়িয়ে মনে হয় যেন একটা বিষধর সরীসৃপ ফণা বিস্তার করে হেলে আছে। এই বুঝি ছোবল দেবে। ভুজঙ্গ নামটা

সার্থক সেদিক দিয়ে। এবং চেহারায় সরীসৃপ-সাদৃশ্যটা যেন আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে ভুজঙ্গ ডাক্তারের চাপা নিঃশব্দ হাসির মধ্যে। ডাক্তারের সদাসর্বদা জিহ্বার অগ্রভাগটা বের করা আর টেনে নেওয়ার মত আর একটি অভ্যাস যা প্রথম দৃষ্টিতেই আমার নজরে পড়েছিল, সেটা হচ্ছে তাঁর হাসি। বলতে গেলে কথায় কথায় যেন তিনি হাসেন এবং হাসির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে নিচের শ্বেতীচিহ্নিত পুরু তাম্রাভ ওষ্ঠটা নিচের দিকে নেমে আসে উল্টে আর উপরের ওষ্ঠটি সামান্য একটু উপরের দিকে কুঁচকে ওঠে। আর বিভক্ত সেই ওষ্ঠযুগলের ফাঁকে সজারুর মত ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দু'সারি অদ্ভুত রকমের সাদা সাদা দাঁত এক ঝাঁক তীরের ফলার মত যেন মুহূর্তের জন্য সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝিকিয়ে ওঠে। এবং অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে নিকোটিননিষিক্ত মাড়িটা যেন ঠেলে ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়। ঐ সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হয়েছিল, যে লোক অতবেশী ধূমপান করে তার মাড়ির সঙ্গে দাঁতেও নিকোটিনের কালচে দাগ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু দাঁতগুলো যেন মুক্তার মতই ঝকঝক করছিল।

যাহোক, বলছিলাম ভুজঙ্গ ডাক্তারের হাসির কথা। ভুজঙ্গ ডাক্তার হাসলে এবং সেই সময় তার দিকে চেয়ে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সে মুখের উপর থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিতে হবেই। ঘিনঘিন করে উঠবে সমস্ত মনটা। হঠাৎ গায়ে একটা টিকটিকি পড়লে যেমন অজান্তেই সর্বাঙ্গ সিরসিরিয়ে ঘিনঘিন করে উঠে, ঠিক তেমনি। কিন্তু আশ্চর্য! পরক্ষণেই ডাক্তারের কণ্ঠস্বর কানে গেলেই পুনরায় তার দিকে চোখ ফিরিয়ে না তাকিয়ে উপায় নেই। পুরুষোচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু যেমন সুরেলা তেমনি মিষ্টি। মনে হবে কথা তো নয় যেন গান গাইছে লোকটা। আর কথা বলার ভঙ্গিটিও এমন চমৎকার! শুধু কি কথাই! ব্যবহারটুকুও যেমনি মিষ্টি মোলায়েম তেমনি দরদেরও যেন অন্ত নেই।

শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে ব্যবহারে কথায়বার্তায় সৌজন্যতায় এমন কি আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত বেশভূষায় পর্যন্ত যেন একটা অদ্ভুত ঝকঝকে শালীনতা ও আভিজাত্য সুস্পষ্ট। তাই বলছিলাম নাম ও চেহারার সামঞ্জস্যের মধ্যে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য।

সামান্য আলাপেই যেন লোকটির একেবারে নিঃস্ব পর একান্ত অপরিচিতকেও মুহূর্তে আকর্ষণ করে আপনার করে নেবার আশ্চর্য রকমের একটা ক্ষমতা আছে।

চোখের উপরে যেন এখনও ভাসছে লোকটার চেহারাটা।

পরিধানে দামী পাতলা ট্রপিক্যাল অ্যাস কলারের ক্রীজ করা সুট। গলায় সাদা

কলারের সঙ্গে কালোর উপরে লাল স্পটেড বো, পায়ে দামী গ্রেসকীডের চকচকে ক্রেপ-সোলের জুতো।

ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী, এম্, বি. এফ. আর, সি. এস. (লণ্ডন)। কলকাতা শহরে বছর দশেক হবে প্র্যাকটিস করছেন। সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যেই শহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদের তালিকার মধ্যে অন্যতম একজন বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন।

প্রতিপত্তি ও পসারে বেশ কায়েমী ভাবেই হয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

লোকেরা বলে ভুজঙ্গ ডাক্তার মরা মানুষকেও নাকি বাঁচিয়ে তুলতে পারে এমনই পারঙ্গম চিকিৎসা-শাস্ত্রে।

সার্জারী প্র্যাকটিস করেন ভুজঙ্গ ডাক্তার। সর্বরোগের চিকিৎসক নন। সার্জারীর যে-কোন কঠিন রোগীর ঘরে ভুজঙ্গ ডাক্তার পা দিলেই নাকি লোকেরা বলাবলি করে, তার অর্ধেক রোগ সেরে যায়। এমনি অচল বিশ্বাস ও আস্থা সকলের, ভুজঙ্গ ডাক্তারের উপরে বর্তমান।

পার্কসার্কাস অঞ্চলে তিনতলা একটা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলার চারঘরওলা একটা সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নিয়ে ভুজঙ্গ ডাক্তারের কনসালটিং চেম্বার ও নার্সিংহোম। একজন জুনিয়ার ডাক্তার অ্যাসিসটেণ্ট ও চারজন শিক্ষিতা ট্রেণ্ড নার্স। দুজন ইউরোপীয়ান, একজন অ্যাংলো-চায়নীজ, একজন বাঙালী। চেম্বারের সঙ্গে সংলগ্ন চার-বেডের নার্সিংহোমটির সঙ্গেই লাগোয়া একটি অপারেশন থিয়েটারও আছে।

প্রচুর পসার।

চেম্বারের কনসালটিং আওয়ার প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা। আবার সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা।

চেম্বারের ঐ নির্দিষ্ট টাইমটা ছাড়াও ভুজঙ্গ ডাক্তারকে হাসপাতাল ও প্রাইভেট কল অ্যাটেণ্ড করবার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু একটা ব্যাপার ভুজঙ্গ ডাক্তার সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত যে রাত নটার পর বাড়িতে একবার ঢুকলে, তখন হাজার টাকা অফার করলেও তাঁকে দিয়ে কোন রোগী দেখানো তো যাবেই না, এমন কি রাত নটা থেকে পরদিন ভোর ছটার আগে পর্যন্ত তিনি নিজে কোন ফোন-কলও অ্যাটেণ্ড করবেন না। ঐ সময়ের মধ্যে যদি কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে বা করতে হয় তো বাড়ির অন্য লোক মারফৎ করতে হবে।

আশ্চর্য! গত পাঁচ বৎসর ধরেই শোনা যায়, প্রতিদিন রাত্রি নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত, ঐ আট ঘণ্টা সময় তিনি নাকি সমস্ত দায়িত্ব ও কাজকর্ম থেকে নিজেকে একেবারে

সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিজের শয়নঘর ও তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী ঘরের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখেন।

বলতে গেলে বাইরের জগতে তো নয়ই এমন কি তাঁর গৃহেও ঐ আট ঘণ্টা সময় তো তিনি সকলের কাছ থেকেই দূরে বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে থাকেন।

শোনা যায় ভুজঙ্গ ডাক্তারের বয়স নাকি প্রায় বিয়াল্লিশের কাছাকাছি। অকৃতদার। এবং নারী জাতি সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত তাঁর কোনরূপ দুর্বলতার কথা কেউ কখনও শোনে নি।

সংসারে আপনার জন বলতে বিকলাঙ্গ, অর্থাৎ ডান পা-টি খোঁড়া, বেকার একটি সহোদর ভাই আছে। বয়সে ভাইটি ডাক্তারের থেকে আট বৎসরের ছোট। নাম ত্রিভঙ্গ। ভাই ত্রিভঙ্গ চৌধুরীও মূর্খ নয়। বি. এ. পাস। ত্রিভঙ্গ বিবাহিত। ভুজঙ্গ ডাক্তারই ত্রিভঙ্গের বিবাহ দিয়েছেন। অপূর্ব সুন্দরী বি. এ. পাস একটি গরীবের মেয়ের সঙ্গে। সেও বছর ছয়েক হবে। নাম মৃদুলা। আর আছে বছর সাড়ে চারের মৃদুলা ও ত্রিভঙ্গর একমাত্র পুত্রসন্তান অগ্নিবান।

ভাইপোটি শোনা যায় ভুজঙ্গ ডাক্তারের অত্যন্ত প্রিয়। বাড়িতে আর লোকজনের মধ্যে ভুজঙ্গর অনেক দিনের খাস ভৃত্য, রামচন্দ্র বা রাম। সে একমাত্র ভুজঙ্গেরই কাজকর্ম করে। দ্বিতীয় ভৃত্য হচ্ছে ভূষণ। একটি ঝি রাতদিনের, সুরবালা, রাঁধুনী বামুন কৈলাস, সোফার হরিচরণ ও নেপালী দারোয়ান রাণা।

ভুজঙ্গ ডাক্তারের ইদানীং পসার খুব বৃদ্ধি হলেও ফিজ পূর্বের মতই রেখেছেন, বাড়ান নি। চেম্বারে ষোল ও বাড়িতে বত্রিশ। শোনা যায় ফিজ সম্পর্কে ভুজঙ্গ ডাক্তারের নাকি অপূর্ব একটা নীতি ছিল সেই প্র্যাকটিসের শুরু থেকেই।

ফরেন ডিগ্রী নিয়ে দশ বৎসর পূর্বে যেদিন তিনি পার্কসার্কাস ট্রাম-ডিপোর কাছাকাছি বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরেই পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়ায় ছোট একখানা ত্রিকোণাকার ঘর নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেন, সেইদিন থেকেই তাঁর ফিজ তিনি চেম্বারে ষোল ও গৃহে বত্রিশ ধার্য করেন।

এবং সে-সময় নতুন সদ্য-বিলাতফেরত ডাক্তারদের যা অবস্থা হয়ে থাকে, দিনের পর দিন রোগীর প্রত্যাশায় বারনারীর মতই আপনাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে, রাস্তার চলমান পদধ্বনির দিকে কান পেতে, নিজের প্রকোষ্ঠেরই কড়িকাঠ গণনা করতে হত, সে-সময়ও কচিৎ কখনও কোন রোগী তাঁর চেম্বারে এলে সর্বাগ্রে তাকে বলতেন, জানেন তো আমার ফিজ! এখানে ষোল, বাড়িতে হলে বত্রিশ। ফ্রি কনসালটেশন আমি করি না।

ফলে যা হবার তাই হত।

ভাগ্যে সপ্তাহে একটি রোগী জুটত কিনা সন্দেহ।

বন্ধুবান্ধবেরা যদি কখনও বলত, গোড়াতে ফিজটা কমাও ভুজঙ্গ। পরে যখন পসার বাড়বে ফিজ ক্রমে বাড়িয়ে যাবে।

ভুজঙ্গ নাকি হেসে জবাব দিতেন, উহুঁ। Strart ও finish আমার একই থাকবে, শুরুতে যা ধরেছি শেষেও তাই রাখব।

উপোস করে মরবে যে!

মরবে না ভুজঙ্গ চৌধুরী। প্রতিভার যাচাই অত সহজেই হয় না হে। কয়লাখনির মধ্যে যে হীরা থাকে তাকে খুঁজে বের করতে হলেও সময় ও ধৈর্যের পরীক্ষা তাদেরও দিতে হবে বৈকি। আর আমাকেও সেটা সহ্য করতে হবে।

এত বিশ্বাস!

ঐ বিশ্বাসের উপরেই তো দাঁড়িয়ে আছি হে।

ভুজঙ্গ ডাক্তারের প্রতিভা যে সত্যিই ছিল এবং সে যে মিথ্যা দম্ভ প্রকাশ করেনি, ক্রমে সকলেই সেটা বুঝতে পেরেছিল। লোকে একদিন তাকে চিনতে পারলে। সেই সঙ্গে ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারও বদল হল। বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ হল।

এবারে ঐ অঞ্চলেই একেবারে ট্রাম-রাস্তার উপরে বিরাট একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির দোতলায় সম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট নিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে ভুজঙ্গ নতুন চেম্বার ও নার্সিংহোম করলেন।

তারপর দেখতে দেখতে গত পাঁচ বৎসরে যেন হু-হু করে ভুজঙ্গ ডাক্তারের পসার ও খ্যাতি শহর ও শহরের আশেপাশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ফিজ কিন্তু তাঁর ষোল-বত্রিশের উপরে গেল না। কথা তিনি ঠিকই রেখেছিলেন। এক কথায় সকলকেই তিনি তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

প্রতিভা থাকে অবিশ্যি অনেকেরই কিন্তু সেই প্রতিভার বিকাশের ও স্বীকৃতিলাভের সৌভাগ্য কজনের হয় সত্যিকারের! সেই দিক দিয়ে ভুজঙ্গ ডাক্তার নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

চেম্বারে প্রত্যহ রোগীর ভিড় এত থাকে যে, সব রোগীকে তিনি প্রত্যহ পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া সত্ত্বেও দেখে উঠতে পারেন না। ক্ষুণ্ণ মনে অনেককেই পরের দিনের আশায় ফিরে যেতে হয়। কারণ যাকে তিনি পরীক্ষা করেন সময় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই পরীক্ষা করে থাকেন।

এনগেজমেন্টের খাতায় পাঁচ থেকে সাতদিন পর্যন্ত রোগী সব 'বুক' হয়ে থাকে চেম্বারে।

এত পসার ও খ্যাতি লোকটার তবু নাকি ব্যবহারে তাঁর এতটুকু চাল বা অহঙ্কার নেই। পূর্বে যারা তাঁকে চিনত, তারা বলে, ভুজঙ্গ ডাক্তার আগের মতই ঠিক আছে। কোন বদল হয়নি।

তাঁর সম্পর্কে গুজবের অন্ত নেই। বিশেষ করে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সম্পর্কে। তথাপি এখনও কিন্তু তিনি নিজের বাড়িও একটা করেননি।

॥ দুই ॥

ভুজঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে পূর্বে সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকলেও জনরব ও জনশ্রুতিতে লোকটি আমাদের একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। সাক্ষাৎভাবে পরিচয়-সৌভাগ্য হল মাত্র আজই সকালে।

রবিবার। হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ। হাসপাতালে সকালেই বেরুবার তাগাদা নেই। তাছাড়া রবিবার চেম্বারেও সকালে স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ব্যতীত তিনি রোগী দেখেন না। তাই ভুজঙ্গ ডাক্তার সকাল সাড়ে আটটায় কিরীটীর সঙ্গে সাক্ষাতের টাইম দিয়েছিলেন। সাক্ষাতের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল সকাল সাড়ে আটটায় ঠিক।

আমরা পাঁচ মিনিট আগেই ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছেছিলাম। বেয়ারার হাতে পূর্বেই কিরীটীর কার্ড প্রেরিত হয়েছিল। ওয়েটিং রুমটি চমৎকার ভাবে সাজানো একেবারে খাস ইউরোপীয়ান স্টাইলে।

মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট। সোফা-কাউচ। গোলাকার একটি টেবিল ঘরের মধ্যস্থলে। চকচকে সব ফার্নিচারেরই চোখ ঝলসানো পালিশ। সাদা নিরাবরণ দুধ-ধবল চুনকাম-করা দেওয়ালে কিছু ফ্রেসকোর সূক্ষ্ম কাজ। কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নেই। এক কোণে একটি বিরাট ঘড়ি স্ট্যাণ্ডের উপরে বসানো।

ঘরের জানলা ও দরজার পর্দায় ফিকে নীল সূক্ষ্ম বিলিতি নেটের সব পর্দা ঝোলানো।

ঢং করে সময়-সংকেত ঘরের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে কোথায় যেন অদৃশ্য ইলেককট্রিক-সাংকেতিক একটা শব্দ শোনা গেল, কঁ কঁ···সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকে বললে, আসুন।

বেয়ারার পিছনে পিছনে করিডোর পার হয়ে আমরা এসে সম্পূর্ণ-বন্ধ একটি কপাটের সামনে দাঁড়ালাম।

কপাটটা ঠেলতেই স্প্রিং অ্যাকশানে সরে গেল, বেয়ারা বললে, ভিতরে যান।

প্রথমে কিরীটী ও তার পশ্চাতে আমি একটি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ওয়েটিং রুমটির মতই এই ঘরটিও অনুরূপ রুচিসম্মত ভাবে সাজানো-গোছানো। দিনের বেলাতেও জানলায় ভারী মোটা ফিকে নীল স্ক্রিন টানা।

চার-পাঁচটা বড় বড় ডোমের অন্তরালে অদৃশ্য শক্তিশালী বিদ্যুৎ-বাতির আলোয় ঘরটা যেন ঝলমল করছে, বাইরের সূর্যালোক ভিতরে না আসা সত্ত্বেও।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের অদ্ভুত সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠের আহ্বান কানে এল, আসুন। Be seated Please Mr. Roy ! এক মিনিট।

কণ্ঠস্বরে সামনের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল সাদা ধবধবে অ্যাপ্রন গায়ে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অদূরে দেওয়ালের কাছে ঘূর্ণ্যমান একটা লিকুইড সোপের কাচের আধার থেকে সোপ নিয়ে ওয়াশিং বেসিনের ট্যাপে হাত ধুচ্ছেন।

ঘরের ঠিক মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিল। পুরু কাচের প্লেট তার উপরে। একটি ডোমে ঢাকা ফ্লেকসিবিল টেবিল-ল্যাম্প।

টেবিলের উপরে বিশেষ কিছুই নেই। একটি স্টেথোসকোপ, একটি প্রেসক্রিপসন প্যাড, একটি মুখখোলা পার্কার ফিফটিওয়ান, একটি কাচের গোলাকার পেপারওয়েট। একটি ঝিনুকের সুদৃশ্য অ্যাসট্রে। একটি ৯৯৯য়ের সিগারেট টিন ও একটি ম্যাচ।

বড় টেবিলটির পাশেই কাচের প্লেট বসানো একটি স্ট্যাণ্ডের উপরে সাদা এনামেলের ট্রেতে কিছু ডাক্তারী পরীক্ষার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি। তারই পাশে বসবার ঘোরানো একটি গদি-আঁটা গোল টুল। এবং তারই সামনে ডাক্তারের বসবার জন্যই বোধ হয় গদি-আঁটা একটি রিভলবিং চেয়ার। টেবিলের অন্যদিকে গদি-আঁটা সুদৃশ্য আরও দুটি চেয়ারও নজরে পড়ল। কনসালটিংয়ের সময় ঐ চেয়ারই বোধ হয় নির্দিষ্ট রোগী ও তার সঙ্গের অ্যাটেনডেন্টের জন্য। এক পাশে অন্য একটি দরজা দেখা যাচ্ছে, ভিতরে বোধ হয় সংলগ্ন আর একটি পরীক্ষা-ঘর আছে। ঘরের মেঝেতে ফিকে সবুজ বর্ণের রবার-কার্পেট বিছানো।

নিঃশব্দ পায়ে আমরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে সেই দুটি চেয়ারই অধিকার করে বসলাম।

ডাক্তার হাত ধুতে লাগলেন।

ওয়েটিং রুমের মত কনসালটিং রুমের দেওয়ালও সম্পূর্ণ সাদা এবং দেওয়ালে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নেই। একটিমাত্র গোলাকার ইলেকট্রিক ক্লক ছাড়া। মিনিটে মিনিটে বড় কাঁটাটা সরে যাচ্ছে এক এক ঘর।

হাত ধোয়া শেষ করে ডাক্তার আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই ওষ্ঠের বন্ধনীতে আলগাভাবে ধরা অর্ধদগ্ধ একটি সিগারেট। টাওয়েলের সাহায্যে হাতটা মুছতে মুছতে

এগিয়ে এসে বললেন, সাক্ষাৎ আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আপনার নামটা আমার অপরিচিত নয় মিঃ রায়। বলতে বলতে টাওয়েলটা স্ট্যাণ্ডের উপরে রেখে রিভলবিং চেয়ারটার উপরে এসে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তাকিয়েছিলাম আমি ডাক্তারের মুখের দিকেই। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন বিশ্রী লাগল। চোখটা ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

ডাক্তার বলছিলেন তখন, বুঝতেই পারেন, ডাক্তার মানুষ, বড্ড un-social নচেৎ আপনার সঙ্গে আলাপ এক-আধবার হওয়ার নিশ্চয়ই সুযোগ ঘটত।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে এবারে জবাব দিল, আপনিও সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য না হলেও আমার একেবারে অপরিচিত নন ডক্টর চৌধুরী।

মুহূর্তে ডাক্তার চৌধুরীর পিঙ্গল চোখের তারায় যেন একটা হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে মুখেও তাঁর হাসি ফুটে ওঠে।

আবার আমি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে যেন বাধ্য হলাম। একটা ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল অনুভূতি যেন আমার সর্বদেহে ছড়িয়ে গেল।

ডাক্তার তখন আবার বলছিলেন, বলেন কি মিঃ রায়! ডাক্তারদের তো শুনি লোকে যতটা পারে এড়িয়েই চলে। নেহাৎ বিপদে বা বেকায়দায় না পড়লে তাদের সামনা-সামনি কেউ বড় একটা আসে বলে তো জানি না।

ডাক্তারদের ডাক্তারিটাই তো একমাত্র পরিচয় নয় ডক্টর চৌধুরী! বলে কিরীটী।

কিরীটীর জবাবে মুহূর্তের জন্য নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর চৌধুরী, তারপরই মৃদু হেসে বললেন, কথাটা হয়তো আপনার মিথ্যা নয় মিঃ রায়। কিন্তু লোকে তো সেটা ভুলেই যায়। আমরাও যেন ভুলতে বসেছি।

সেটা কিন্তু বলব আপনাদেরই নিজেদের সেম প্রফেশনের লোকেদের উপরে একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। আর সেই কারণেই বোধ হয় চট করে বড় একটা কেউ আপনাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না।

সত্যি, আপনারও তাই মনে হয় নাকি! বলতে বলতে নিঃশেষিতপ্রায় জ্বলন্ত সিগারেটের শেষাংশটুকুর সাহায্যেই টিন থেকে একটা নতুন সিগারেট টেনে অগ্নিসংযোগ করে, টিনটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, চলে নিশ্চয়ই?

ধন্যবাদ। চলে। তবে আমি সিগার আর পাইপই লাইক করি। বলতে বলতে কিরীটী পকেট থেকে চামড়ার সিগারেটকেসটা বের করে একটা সিগার নিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করে নিল।

What about you Subrata Baboo? বলে এবার ডাক্তার আমার দিকে

টিনটা এগিয়ে দিতে দিতে মৃদু হাসলেন।

No! thanks! বলে সঙ্গে সঙ্গেই আমি আবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে যেন বাধ্য হলাম।

ওঃ, বলেন কি মশাই! ধূমপান করেন না!

না। দু-একবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রপ্ত করতে পারলাম না। বলে হাসলাম।

আমিও একসময় সিগার চেষ্টা করেছিলাম মিঃ রায়, কিরীটীর দিকে তাকিয়ে এবারে ডাক্তার বলতে লাগলেন, কিন্তু গন্ধটা এমন উগ্র যে সুব্রতবাবুর মতই রপ্ত করতে পারলাম না। এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের গায়ে সংযুক্ত কোন একটি অদৃশ্য প্রেসবটম টিপতেই কঁ-কঁ করে একটা শব্দ হল ও তার পরমুহূর্তেই ঘরের মধ্যকার তৃতীয় দ্বারটি খুলে একটি মধ্যবয়সী সুন্দরী নার্স ঘরে এসে ঢুকে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াল, আদেশের অপেক্ষায়।

টি প্লিজ, নার্সকে কথাটা বলেই ডাক্তার ফিরে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে এবং প্রশ্ন করলেন, চা চলবে তো মিঃ রায়?

আপত্তি নেই।

সুব্রতবাবু আপনি—

হেসে বললাম, আপত্তি নেই।

নার্স চলে গেল ঘর থেকে পূর্ব-দ্বার-পথে।

আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ চৌধুরী কথা বললেন, মিঃ রায়, আপনার সুব্রতবাবুর চেহারা সংবাদপত্র মারফৎ এতবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে যে, দেখামাত্রই আজ আপনাদের আমার সেইজন্যই চিনে নিতে কষ্ট হয়নি।

কিরীটী ধূমপান করতে করতে নিঃশব্দে হাসল মাত্র, কোন জবাব দিল না।

একটু পরেই বেয়ারা ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং ট্রেটা ডাক্তারের সামনে নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দেই আবার চলে গেল।

ডাক্তারই উঠে নিজহাতে চিনির পরিমাণ জেনে নিয়ে তিন কাপ চা তৈরি করে দু কাপ আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে তৃতীয় ও অবশিষ্ট কাপটি তুলে নিলেন।

চা পানের সঙ্গে সঙ্গেই গল্প চলতে লাগল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম ডাক্তার যাকে বলে একেবারে চেইন স্মোকার। একটার পর একটা সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছেন। আবার মনে হল লোকটা এত বেশি ধূমপান করে, অথচ ওর দাঁতগুলো অমন ঝকঝক করছে কি করে! কোন দাঁতে কোথাও এতটুকু নিকোটিনের ছোপ মাত্রও নেই!

রবিবারে এভাবে দেখা করতে এসে আপনাকে বিব্রত করলাম না তো ডক্টর চৌধুরী? কিরীটী বলে।

না, না—বিব্রত কেন করবেন। রবিবারে অবিশ্যি পূর্ব হতে কোন স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না থাকলে গাড়িটা নিয়ে একা একাই বের হয়ে পড়ি। সমস্তটা দিন কলকাতার বাইরে এই ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণান্তকর সভ্যতার হৈ-হট্টগোলের সীমানা পার হয়ে, কোথায়ও কোন খোলা জায়গায় গিয়ে কাটিয়ে আসি। ঐ ভাবে একটা কোনও নির্জন জায়গায় ঘণ্টাকয়েক কাটানোর মধ্যে যে কতবড় একটা রিলিফ পাই—সে জানি একমাত্র আমিই। কিন্তু পরশু আপনার ফোন পেয়ে এবং এ রবিবার সকালে কোনও স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না থাকায় আপনাদের আমি আসতে বলেছিলাম আজ। তাছাড়া আপনি আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করে আলাপ করতে আসছেন, সে লোভটাও তো কম নয় মিঃ রায়। সুযোগটাকে তাই সাদরে আহ্বান জানাতে এতটুকু কিন্তু বা দ্বিধা করি নি। কিন্তু থাক সে কথা। আপনার মত একজন লোক যে কেবল আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যই এসেছেন কথাটা কেমন যেন শুধু তাই মনে হচ্ছে না মিঃ রায়; নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণও কিছু একটা আছে। বলে ডক্টর চৌধুরী তাকালেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে।

হাসল কিরীটী। বললে, একেবারে আপনার অনুমানটা যে মিথ্যে তা নয় ডক্টর চৌধুরী। সত্যিই কতকটা নিজের তাগিদেই আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি।

না, না—সে কি কথা! বলুন না কি প্রয়োজন আপনার? কৌতূহলে ডাক্তারের পিঙ্গল দুটো চোখের তারা যেন বারেকের জন্য ঝিকিয়ে উঠল।

কিরীটী চুরুটের অগ্রভাগটা সামনের টেবিলের উপরে রক্ষিত অ্যাশট্রের মধ্যে ঠুকতে ঠুকতে মৃদুকণ্ঠে বললে, ডক্টর চৌধুরী, তাহলে আমার কাজের কথাটাও সেরে ফেলি, কি বলেন?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, বলছিলাম আপনি ব্যারিস্টার অশোক রায়কে বোধ হয় চেনেন?

কিরীটীর প্রশ্নে দ্বিতীয়বার স্পষ্ট দেখতে পেলাম ডাক্তারের চোখের তারা দুটো মুহূর্তের জন্য যেন ঝিকিয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত গলায় জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?

চেনেন তাহলে? কতদিন চেনেন?

তা বছরখানেক তো হবেই।

বছরখানেক!

হ্যাঁ।

যদি কিছু মনে না করেন তো ঐ অশোক রায় সম্পর্কেই, মানে—কিরীটী একটু ইতস্ততঃ করে।

না না—বলুন না কি বলছিলেন ?

আচ্ছা, আপনার সঙ্গে তাঁর কি সূত্রে ঠিক পরিচয়টা হয়েছিল যদি বলেন—

ডাক্তারের সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা হয়।

অর্থাৎ রোগী হিসাবেই তো। তা তিনি—

হুঁ। কিন্তু মিঃ রায়, আর বেশি প্রশ্ন করতে পারবেন না। জানেন তো ডাক্তার ও তার রোগীর মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কটা। বলে মৃদু হাসলেন ডাঃ চৌধুরী।

বলা বাহুল্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিতে যেন বাধ্য হলাম।

থাক। আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিরীটী বললে।

কিরীটীর শেষের কথায় যেন সবিস্ময়ে তাকালেন ডাঃ চৌধুরী কিরীটীর মুখের দিকে।

কেবল একটা কথার আর জবাব চাই। অশোক রায় প্রায়ই এখানে, মানে আপনার কাছে আসতেন। তাই না ? কিরটী আবার প্রশ্ন করল।

প্রায়ই বলতে অবিশ্যি আপনি ঠিক কি মীন করছেন জানি না মিঃ রায়। তবে মধ্যে মধ্যে এক-আধবার আসেন। কথাটা শেষ করে হঠাৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ চৌধুরী এবারে বললেন, কেবল ঐ সংবাদটুকু জানবার জন্যই নিশ্চয়ই এত কষ্ট করে আজ এখানে আসেননি মিঃ রায় আপনি ?

বিশ্বাস করুন ডক্টর চৌধুরী। সত্যি, ঐটুকুই আমার জানবার ছিল আপনার কাছে। বাকিটা—

বাকিটা ?

মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দিল, সেটা জানা হয়ে গিয়েছে।

অতঃপর দুজনেই যেন কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকে। তারপর ডাঃ চৌধুরীই আবার স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন, অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন ছিল আমার মিঃ রায়।

বলুন।

আমি যতদূর জানি অশোক রায় ব্যারিস্টার is a perfect gentleman !

নিশ্চয়ই। তাতে কোন সন্দেহই নেই আমারও।

কিন্তু সন্দেহ যে আপনিই মনে এনে দিচ্ছেন মিঃ রায়।

আমি ?

কতকটা তাই তো। এ দেশে একটা প্রবাদ আছে নিশ্চয়ই জানেন, পুলিসে ছুঁলে আঠার ঘা। তা আপনি আবার তাদেরও পিতৃস্থানীয়—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই আবার মৃদু হাসলেন।

না না—সে-সব কিছুই নয়। কিরীটী বোধ হয় আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের দিকে চোখ ছিল আমার। স্পষ্ট বুঝলাম আশ্বাস হলেও সে আশ্বাস-বাক্য ডাক্তারের মনে কোনরূপ দাগই কাটতে সক্ষম হয়নি। তথাপি মুখ ফুটেও আর কিছু তিনি বললেন না। কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন।

কিরীটীই আবার কথা বললে, আচ্ছা, আপনার পাশের ফ্ল্যাটে ঢোকবার সময় লক্ষ্য করলাম, একেবারে লাগোয়া, বলতে গেলে, পাশাপাশি একই রকমের দুটো গেট।

তাই। দোতলায়ও এ-বাড়ির ঠিক আমারই মত পাশাপাশি চারটে ফ্ল্যাট। আমারটা ও আমার বাঁ পাশের ফ্ল্যাটে ওঠবার সিঁড়িটা কমন। তার পাশের, ডাইনের দুটো ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে ওঠবার গেট হচ্ছে দ্বিতীয় গেটটা এবং সেটারও একটাই সিঁড়ি।

আপনার বাঁ পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আছে তো?

হ্যাঁ। একজন ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান। মিঃ গ্রিফিথ। তার স্ত্রী মিসেস্ গ্রিফিথ ও তাদের একমাত্র তরুণী কন্যা—মিস্ নেলী গ্রিফিথ।

ওঃ! ওপাশের দুটো ফ্ল্যাটে?

ও দুটোতে একটায় আছে শুনেছি একটি ইহুদী পরিবার। অন্যটায় আর একটি ক্রিশ্চান ফ্যামিলি।

ভাল কথা। আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী, রাত্রে আপনার চেম্বারে কেউ থাকে না?

হ্যাঁ, থাকে বৈকি। চেম্বারের সঙ্গে আমার নিজস্ব একটা চার বেডের নার্সিংহোম আছে যে। রোগী থাকলে তারা থাকে আর থাকে নার্স ও কুক মাধোলাল ও দারোয়ান বা কেয়ার-টেকার গুলজার সিং। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন, ব্যাপার কি বলুন তো? আমার চেম্বার ও নার্সিং হোমে কোন রহস্যের গন্ধ পেলেন নাকি? বলে মৃদু হাসলেন আবার ডাক্তার চৌধুরী।

না না—সে-সব কিছু নয়।

দেখবেন মিঃ রায়, ডাক্তারের চেম্বারে কোন রহস্য উদ্ঘাটিত হলে চেম্বারটিতে তো আমার তালা পড়বেই—সেই সঙ্গে এত কষ্টে এতদিনের গড়ে তোলা বেচারী আমার প্র্যাকটিসেরও গয়া হবে।

না না—এমনি একটা ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে একটু সাহায্য নিতে এসেছিলাম। কথায় কথায় আপনার ফ্ল্যাটের কথাটা উঠে পড়ল। আচ্ছা আর আপনাকে

বিরক্ত করব না, এবারে তাহলে উঠি। ওঠ সুব্রত—বলতে বলতে কিরীটী ও সেই সঙ্গে এতক্ষণের নীরব শ্রোতা আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

ডাক্তার চৌধুরী আমাদের তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

আচ্ছা নমস্কার। কিরীটী বললে।

নমস্কার।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিরীটীর গাড়িতে এসে উঠে বসলাম।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছুটির দিনের শহর। তবু লোকচলাচল ও কর্মব্যস্ততার যেন অন্ত নেই।

কিরীটী গাড়িতে উঠে ব্যাক-সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। তাকালাম একবার তার মুখের দিকে। বুঝলাম কোন একটা বিশেষ চিন্তা তার মস্তিষ্কের গ্রে সেল-গুলোতে আবর্ত রচনা করে চলেছে।

গত পরশুদিন দুপুরে হঠাৎ আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল ব্যাপারটা যে, সে ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছে দেখা করবার এবং আমাকেও সঙ্গী চায়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হঠাৎ ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করতে চাস কেন?

কিরীটী বলেছিল, দোষ কি! তাছাড়া মানুষ-জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকাটা তো খারাপ নয়। বিশেষ করে ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর মত একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের সঙ্গে।

বুঝলাম, কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কি?

অন্য কেউ হলে কি আর কিন্তু উঠত, এ কিরীটী রায় কিনা! হেসে জবাব দিয়েছিলাম।

মোট কথা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম, এই হঠাৎ আলাপের ব্যাপারটা একেবারে এমনই নয়, এর পশ্চাতে একটা বিশেষ কারণ আছেই। কিরীটীর চরিত্র তো আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সেদিনও যেমন সে কিছু ভেঙে স্পষ্ট করে জানায়নি, আজও জানাবে না এমন ভেবেই আর কোন প্রশ্ন না করে বসে রইলাম।

গাড়ি চলেছে মধ্যগতিতে।

হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করল, বাড়ি যাবি নাকি?

তা যেতে হবে বৈকি।

হীরা সিং, সুব্রতর বাড়ি হয়ে চল।

হীরা সিং নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল গাড়ি চালাতে চালাতেই।

বাড়িতে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল বটে কিরীটী কিন্তু মনটা সুস্থির হল না। কেবলই ঘুরেফিরে কিরীটীর ভুজঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে সকালে আলাপের কথাটা মনে পড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে মনের পাতায় ভেসে উঠতে লাগল, ভুজঙ্গ ডাক্তারের সেই চেহারাটা।

খাওয়া-দাওয়ার পরই গাড়ি নিয়ে কিরীটীর বাড়ির উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম।

এসে দেখি কিরীটী একা একা তার বাইরের ঘরে সোফার উপরে বসে এক প্যাকেট তাস নিয়ে তাসের ঘর তৈরির মধ্যে ডুবে আছে। পায়ের শব্দে চোখ না তুলেই বলল, আয় সুব্রত, বস্।

কিরীটীর কথায় হঠাৎ যেন নতুন করে চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল ভুজঙ্গ চৌধুরীর সরীসৃপসদৃশ চেহারাটা ও সেই সঙ্গে তার সেই কুৎসিত হাসির কথাটা। ব্যাপারটা স্মরণ হতেই গা-টা যেন কি এক ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে ঘিনঘিন করে উঠল।

বললাম, তোর কেমন লাগল কিরীটী, লোকটাকে ?

কিরীটী চোখ বুজে ছিল সোফার গায়ে হেলান দিয়ে। সেই অবস্থাতেই বলল, আমার ?

হুঁ।

ছোটবেলায় টুনটুনির গল্পের বইয়ে পড়া সেই সাক্ষী শেয়ালের কথা মনে পড়ছিল লোকটাকে দেখে। মনে আছে তোর গল্পটা ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল গল্পটা, বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা কি বল্ তো ?

কিসের ব্যাপার ?

বলছি হঠাৎ ভুজঙ্গ-ভবনে আজ হানা দিয়েছিলি কেন ?

কেন হানা দিয়েছিলাম ?

হুঁ।

অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য ছিল।

কথাটা বলে কিরীটী এতক্ষণে মুখ খুলল।

॥ তিন ॥

অতঃপর কিরীটীর মুখেই শোনা বর্তমান কাহিনীর আদিপর্বটা হচ্ছে :

বিখ্যাত ব্যারিস্টার রাধেশ রায়, যার মাসিক আয় কমপক্ষে আট থেকে দশ হাজার টাকা, তারই একমাত্র মাতৃহারা পুত্র নব্য ব্যারিস্টার, বাপেরই জুনিয়ার অশোক রায়। এবং কিরীটী-বর্ণিত কাহিনীটা তাঁরই সম্পর্কে।

বছর তিনেক হবে মাত্র অশোক রায় বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে বাপের জুনিয়ার হিসেবেই আদালতে যাতায়াত শুরু করেছেন।

এবং বাপের তদ্বিরে ও চেষ্টায় আয়ও হতে শুরু করেছে।

বুদ্ধিদীপ্ত, স্মার্ট এবং অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির ছেলেটি। দেখতে-শুনতেও সুপুরুষ। এখনও বিবাহ করেননি। তবে গুজব শোনা যাচ্ছে হাই-সোসাইটি-গার্ল, বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট স্বর্গীয় ডাঃ অমল সেনের সুন্দরী তরুণী কন্যা মিত্রা সেনের সঙ্গে নাকি কিছুদিন যাবৎ একটা ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে অশোক রায়ের।

সেই সূত্র ধরেই অভিজাত মহলে এমন কথাও কানাকানি চলেছে যে, এতকাল পরে সত্যি সত্যি নাকি বোহিমিয়ান মিত্রা সেন ঘর বাঁধবেন কিনা সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করেছেন।

মিত্রার বাবা ডাঃ অমল সেন, ডি. এস্.সি, একদা ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে ছিলেন, রিটায়ার করে আবার সরকারী বিশেষ একটি দপ্তরেই আরও বেশি মাহিনায় নতুন পোস্টে দিল্লীতে জয়েন করেছিলেন কিন্তু বেশিদিন তাঁর সে চাকরি করবার সুযোগ হয় নি। গত বৎসর মারা গিয়েছেন হঠাৎ রক্তচাপের ব্যাধিতে স্ট্রোক হয়ে।

এবং মৃত্যুকালে তিনি বেশ একটা মোটা টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ও কলকাতার উপরে বালিগঞ্জ অঞ্চলে চমৎকার একখানা বাড়ি রেখে গিয়েছেন।

তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে ঐ মিত্রা।

মিত্রাই সবার কনিষ্ঠ।

ডাঃ সেনের দুই ছেলেই অর্থাৎ মিত্রার দুই দাদা একজন নামকরা অধ্যাপক ও একজন ইনজিনীয়র—বড় চাকুরে। বাপের সঞ্চিত অর্থ তো ছিলই, নিজেরাও বেশ ভালই অর্থোপার্জন করেন দুই ভাই-ই। কাজেই সংসারে সচ্ছলতার অভাব নেই। মিত্রার আট বৎসর বয়সের সময় তার মা মারা যায়। বর্তমানে মিত্রার বয়স ত্রিশ না হলেও প্রায় কাছাকাছি, যদিচ কেউই সে সংবাদটি জানে না। কারণ দেখলেও বোঝবার উপায় নেই।

মিত্রা এম. এ. পাস। দেখতে বা তার গাত্রবর্ণ যাই হোক না কেন, চোখে-মুখে চলনে-বলনে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে তার। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিপছিপে মেয়েটি হাই-সোসাইটির মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছে অনেক দিন ধরে। বৌদিরাও মিত্রাকে ভালবাসেন এবং তার দাদারাও 'মিতা' বলতে অজ্ঞান। স্নেহে একেবারে অন্ধ। বালিগঞ্জে লেক টেরেসে বৈকালী সঙ্ঘ ক্লাবের সঙ্ঘমিত্রা মিত্রা সেন। তাছাড়া কোন এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপিকাও। বৈকালী-সঙ্ঘ ক্লাবের মেম্বার হচ্ছে অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়েরা।

সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রবেশ সেখানে অসম্ভব, কারণ চাঁদার হার প্রতি মাসে একশতর নিচে নয়।

তরুণ ব্যারিস্টার অশোক রায় ঐ বৈকালী সঙ্ঘের একজন নিয়মিত সভ্য। কোর্ট হতে ফিরে সন্ধ্যার পর নিজের গাড়ি নিয়ে সে বের হয়ে যায়, ফেরে কোন রাতেই সাড়ে এগারটার আগে নয়। অশোক রায় সম্পর্কে খোঁজ করতে করতেই সব জানা গিয়েছে।

অশোক রায় ঘটিত ব্যাপারটা অবশ্য কিরীটীর মুখেই আমার শোনা এবং বলাই বাহুল্য বিচিত্রও। বিখ্যাত ব্যারিস্টার রাধেশ রায়ের সঙ্গে বছর চারেক আগে কিরীটীর একটা জাল দলিলের মামলার ব্যাপারে আলাপ-পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। পূর্বেই বলেছি ঘটনার আদিপর্বটা কিরীটীর মুখ থেকেই শোনা তাই কিরীটীর জবানিতেই বলছি :

সন্ধ্যার দিকে একদিন রাধেশ রায় আমাকে ফোন করলেন : রহস্যভেদী, কাল সন্ধ্যার পরে এই ধরুন গোটা আট-নয়ের সময় আপনি ফ্রি আছেন কি ?

কেন বলুন তো ?

আসুন না। অনেককাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে আর গল্পসল্পও করা যাবে।

ব্যারিস্টার রাধেশ রায় যে কি ব্যস্ত মানুষ তা আমার অজানা নয়। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তাঁর চেম্বারে মক্কেলের ভিড় থাকে আর রাত্রেও বারোটা-একটা পর্যন্ত লাইব্রেরি ঘরে বসে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করেন।

তাই হাসতে হাসতে বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো ? ভূতের মুখে রাম-নাম ?

না, না, আসুন না—সত্যিই just a social call ! ফোনেই বললেন রাধেশ রায়।

কিন্তু বিশ্বাস হল না সম্পূর্ণরূপে ব্যারিস্টারের কথাটা।

যা হোক পরের দিন ঠিক রাত নটায় বালিগঞ্জ প্লেসে রাধেশ রায়ের বিরাট ভবনের সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম।

চেম্বারে প্রবেশ করে দেখি সব চেম্বার খালি, আশ্চর্য! কেবল রাধেশ রায়ের পার্সোন্যাল টাইপিস্ট হিমাংশু একা আপন মনে বসে বসে খটখট করে কি সব টাইপ করে চলেছে মেশিনে।

হিমাংশুকেই প্রশ্ন করলাম, ব্যারিস্টার সাহেব কোথায়?

হিমাংশু টাইপ-করা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনিই কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

বসুন—পরক্ষণে সে ভেতরে গিয়ে কলিংবেল টিপতেই ভিতর থেকে একজন উর্দিপরা বেহারা এসে দাঁড়াল।

হিমাংশু তাকে আমার আসবার সংবাদ সাহেবকে দিতে বলল।

মিনিট পাঁচেক বাদে ব্যারিস্টার সাহেবের খাস ভৃত্য কানু এসে বললে, সাহেব আপনাকে উপরে যেতে বললেন, চলুন।

চল।

কানুকে অনুসরণ করে পুরু কার্পেট মোড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলায় টানা বারান্দার শেষ ও দক্ষিণ প্রান্তে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইতিপূর্বে ও-বাড়িতে গেলে ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসেই গল্পসল্প হত। উপরে উঠলাম এই প্রথম।

দরজার পর্দা তুলে কানু আহ্বান জানাল, আসুন।

ব্যারিস্টার সাহেবের শয়নকক্ষ। মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট এবং ঘরে বহু মূল্যবান সব আসবাবপত্র, রুচি ও আভিজাত্যের চমৎকার সমন্বয় সর্বত্র।

ঘরের সংলগ্ন একটি চারিদিকে খোলা ছাতের মত জায়গা। মাথার উপরে অবশ্য খানিকটা আচ্ছাদন আছে। চারিদিকে ফুলের, পাতাবাহারের ও পামট্রির টব বসানো। ছোটখাটো একটা নার্শারী বললেও চলে।

একধারে একটি সুদৃশ্য গোল টেবিল, তার পাশে দুটি গদি-আঁটা চেয়ার। একখানা মাত্র খালি এবং অন্য একটিতে বসে আছেন ব্যারিস্টার সাহেব স্বয়ং।

টেবিলের উপরে সাদা দুধের মত ডোমে ঢাকা একটি বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। মধ্যিখানে একটি ২।৩ অংশ পূর্ণ ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট স্কচ হুইস্কির কালো রঙের বোতল, সোডা সাইফন, একটি খালি পেগ গ্লাস ও পূর্ণ একটি পেগ গ্লাস।

পদশব্দে ব্যারিস্টার মুখ তুলে তাকালেন, আসুন রহস্যভেদী, বসুন।

তারপরেই কানুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, কানু, বাইরের দরজায় বসে থাক্। যতক্ষণ না ডাকি তোকে, এদিকে আসবার দরকার নেই।

আচ্ছা। কানু জবাব দেয়।

হ্যাঁ, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে—ফোন এলে হিমাংশুই ধরবে—সে আমার লাইব্রেরি ঘরে আছে।

কানু চলে গেল।

মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে ব্যারিস্টার সাহেবের দিকে তাকালাম।

পরিধানে সাদা ফ্লানেলের পায়জামা ও ডিপ কালো রঙের কিমনো।

শোনা যায় প্রথম যৌবনে অত্যন্ত সুপুরুষ নাকি ছিলেন রাধেশ রায়। এখনও অবিশ্যি বয়স হলেও সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। উজ্জ্বল গৌর গাত্র-বর্ণ। প্রশস্ত কপাল। মাথার দু-পাশে একটু টাক পড়েছে। রগের দু-একটা চুলে পাক ধরেছে। খড়্গের মত উন্নত নাসা। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। কঠিন ধারালো চিবুক।

মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, চোখে সোনার ফ্রেমে প্যাঁসনে।

আমাকে কিছু না বললেও তাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকতেই বুঝতে কষ্ট হল না সমগ্র সেই মুখখানা ব্যেপে পড়েছে যেন কিসের একটা চিন্তার সুস্পষ্ট ছায়া।

Have a peg—রাধেশ রায় বললেন আমার দিকে তাকিয়ে।

দিন তবে ছোট একটা, জবাব দিলাম।

রাধেশ রায় নিজেই শূন্য পেগ-গ্লাসটিতে লিকার ঢেলে সোডা সাইফনটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

সোডা আমিই মিশিয়ে নিলাম।

Best of luck!

পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে দুজনেই আমরা গ্লাসে চুমুক দিলাম। মিনিট পাঁচ-সাত তারপর নিঃশব্দেই কেটে গেল।

মাঘের মাঝামাঝি হলেও শীতের তীব্রতা তেমন অনুভূত হয় না। ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মিশে আছে বায়ুতরঙ্গে মিষ্টি ফুলের নাম-না-জানা একটা পাতলা গন্ধ।

টেবিল-ল্যাম্পের আলো উপবিস্ট ব্যারিস্টারের চোখে মুখে কপালে এসে পড়েছে। হাত দুটো কোলের উপরে ভাঁজ করা।

বসবার ভঙ্গিটা যেন কেমন শিথিল অসহায় বলে মনে হয়।

বুঝতে পারছিলাম, রাধেশ রায় আজ রাত্রে বিশেষ কিছু বলবার জন্যই এভাবে আমায় ডেকে এনেছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক সংকোচ বোধ করছেন। চেষ্টা করেও যেন সংকোচ বা দ্বিধাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। আমিও তাঁকে সময় দিতে লাগলাম। যা বলবার উনি নিজে থেকেই বলুন। সংকোচ ওঁর কেটে যাক। বলতেই যখন চান। ওদিকে তাঁর গ্লাস নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, আবার গ্লাস ভর্তি করে নিলেন।

দ্বিতীয় গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেটে নিয়ে এবারে আমার দিকে তাকালেন, তারপর অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন, রহস্যভেদী, আপনার তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ ও অনুভূতির উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে মনে হচ্ছে something somewhere wrong! To tell you frankly, I want your help!

কি ব্যাপার? মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

You know my son অশোক! Recently I don't know why but I feel much worried about him!

একটু বেশ আশ্চর্য হয়েই রাধেশ রায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তারপর একটু থেমে মৃদুকণ্ঠে বললাম, কি ব্যাপার বলুন তো? আমি তো যতদূর শুনেছি আজকাল অশোকবাবু বেশ promising in the Bar—কতকটা যেন আশা দেবারই চেষ্টা করি।

হ্যাঁ হ্যাঁ—তা জানি। কিন্তু সব কথা বলবার আগে একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই মিঃ রায়—বিশেষ করে শেষের দিকে একটু যেন থেমেই কথাগুলো বললেন ব্যারিস্টার।

বলুন? ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করি।

সব কথা বলবার আগে যে কথা বিশেষ করে বলতে চাই মিঃ রায়, অশোক যেন এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানতে পারে। আশা করি বুঝতেই পারছেন, সে আমার একমাত্র ছেলে। মা নেই, বড় অভিমানী।

সংকোচটা যেন ব্যারিস্টার সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

নিশ্চিন্ত থাকুন। আশ্বাস দিই ব্যারিস্টারকে।

অবশ্য সেটা আমি জানি বলে আপনাকেই আমি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ডেকে এনেছি মিঃ রায়।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

কেবল ব্যারিস্টার সাহেব মধ্যে মধ্যে পেগ-গ্লাসটা তুলে চুমুক দিতে লাগলেন নিঃশব্দে। মুখ দেখে বোঝা যায় অন্যমনস্ক হয়ে বুঝি কি ভাবছেন। মনে মনে নিজেকেই নিজে যেন

যাচাই করে চলেছেন।

অশোক কয়েক মাস ধরে দেখছি যেন একটু বেশি খরচ করছে! হঠাৎ আবার ব্যারিস্টার সাহেব কথা বললেন।

তা অল্প বয়েস; বিয়ে-থা করেননি, যথেষ্ট ইনকাম করেন, কোনও liabilities-ও নেই—তাছাড়া এই তো খরচ করবার সময়। হাসতে হাসতে জবাব দিই।

বাধা দিলেন ব্যারিস্টার, না না—ঠিক তা নয় মিঃ রায়। যতই খরচ করুক সে, তিন-চার হাজার টাকা একজনের মাসে pocket expense—একটু কি বেশিই বলে মনে হয় না আপনার?

তিন চার হাজার! এবারে সত্যি বিস্ময়ের পালা আমার।

হ্যাঁ। না হলে আর বলছি কি? আমার আর অশোকের অ্যাকাউন্ট অবশ্য আলাদা। জীবনে স্বাবলম্বনের চিরদিন আমি বিশেষ পক্ষপাতী তাই তার নামে বিলেত থেকে সে ফিরবার পরই হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে starting একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে কোনদিনই কোন কিছু আমি আশাও করি না এবং তার রোজগার ও খরচ সম্পর্কেও কোনদিন খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু মাত্র দিন আষ্টেক আগে হঠাৎ ভুল করে, just by mistake তার ব্যাঙ্কের একখানা চিঠি আমি খুলতেই ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ল।

কি রকম?

তাই তো বলছি।

আমি আবার ব্যারিস্টার সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম।

রাধেশ রায় আবার বলতে শুরু করলেন যেন একটু থেমেই, একসঙ্গে গত তিন মাসের statement of account এসেছে—

অশোকই মনে হয় চেয়ে পাঠিয়েছিল ব্যাঙ্কে। এবং just out of curiosity সেই statement of account-টা দেখতে গিয়েই নজরে পড়ে গেল আমার প্রত্যেক মাসে সে প্রায় তিন-চার হাজার করে টাকা ড্র করেছে। এবং গত প্রত্যেক মাসের দশ তারিখে একটা করে আড়াই হাজার টাকার self-draw আছে। আমি তো চমকে গেলাম। প্রত্যেক মাসে তার এত অর্থের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আর প্রত্যেক মাসের দশ তারিখে ঐ আড়াই হাজার টাকাই বা draw করা হচ্ছে কেন? ব্যারিস্টার বলতে বলতে থামলেন বোধ হয় নিজেকে একটু গুছিয়ে নেবার জন্যই।

কোন heavy insure বা payment-ও তো থাকতে পারে। বললাম আমি।

Nothing of that kind। ওর কোন insure-ই নেই। যা হোক—কেমন

প্রশ্নটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ ওয়াটসন আমার বিশেষ বন্ধু ও অনেক দিনের পরিচিত। I rang him up। সে যা বললে, তাতে বিস্ময় যেন আরও বাড়ল। সে বললে, গত এক বৎসর ধরেই নাকি অশোক প্রতি মাসের দশ তারিখে নিজে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঐ আড়াই হাজার টাকা self cash করে নিয়ে আসে।

হুঁ।

বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কি রকম delicate! যা হোক আমি দুটো দিন ব্যাপারটা নিজে নিজেই ভাববার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও conclusion-এই পৌঁছতে পারলাম না। যতই আমার সন্দেহ বাড়তে লাগল সেই সঙ্গে ঔৎসুক্যও বাড়তে লাগল। যদিও ব্যাপারটা বিশ্রী, তবু তলে তলে গোপনে আমি তার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রেখে থাকতে পারিনি।

ব্যারিস্টার সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করে নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, মিঃ রায়, বুঝতে পারলেন কিছু?

সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আবার।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ কেটে গেল। তারপরই আমি এবারে প্রশ্ন করলাম, এমনও তো হতে পারে তাঁর কোন প্রাইভেট লোক বা কাউকে তিনি ঐ টাকাটা দিয়ে থাকেন মানে বলছিলাম কি কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে হয়ত বা সাহায্য করে থাকেন।

ব্যারিস্টার আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। সম্মুখে টেবিলের উপরে রক্ষিত এবং ক্ষণপূর্বে নিঃশেষিত পেগ-গ্লাসটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন শুধু স্তব্ধ হয়ে।

কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধভাবে কেটে গেল।

ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করলেন ব্যারিস্টার, সে রকম কিছুই না। বলে একটু চুপ করে থেকে পুনরায় শুরু করলেন, কয়েকটা ব্যাপারকে জীবনে আমি নিরতিশয় ঘৃণা করে এসেছি মিঃ রায়। অন্যের চিঠি লুকিয়ে পড়া, অন্যের গতিবিধির উপরে আড়াল থেকে গোপনে গোপনে নজর রাখা ও অন্যের ব্যাপারে অকারণ মাথা ঘামানো। পর তো কথাই নেই, এমন কি নিজের স্ত্রী-পুত্রের বেলাতেও না। কিন্তু এমনি দুর্দৈব যে, অশোক, আমার নিজের সন্তানের বেলায় তাই আমাকে করতে হল। এ যে আমার পক্ষে কতবড় লজ্জা ও দুঃখের কারণ হয়েছে মিঃ রায়, তা আপনাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

বেদনায় ও গ্লানিতে মনে হল ব্যারিস্টারের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে যেন বুজে আসছে।

আর কেউ না হলেও আমি বুঝেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা ব্যারিস্টার রায়ের পক্ষে

কতখানি বেদনার কারণ হয়েছে। এবং শুধু বেদনাই নয় তাকে কতখানি সেই সঙ্গে বিচলিতও করেছে।

শূন্য পেগ-গ্লাসটায় কিছুটা আবার লিকার ঢেলে এবং তাতে সোডা মিশিয়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন গ্লাসটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে, এ মাসের দশ তারিখে আর নিজের কৌতূহলকে চেপে রাখতে পারলাম না। আমার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা, রুচি ও নীতি-বোধকে এক পাশে ঠেলে রেখেই বেলা দশটা বাজবার কিছু আগে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্যাঙ্কের দরজার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক দশটায় দেখলাম অশোকের গাড়ি এসে ব্যাঙ্কের দরজার সামনে দাঁড়াল।

অশোক নিজেই ড্রাইভ করছিল। আর তার পাশে উপবিষ্ট দেখলাম একটি নারী।

নারী!

অর্ধস্ফুট ভাবে আপনা হতেই যেন কথাটা আমার কণ্ঠ হতে বের হয়ে এল।

হ্যাঁ। কিন্তু তার মুখ দেখতে পেলাম না। মাথায় অল্প ঘোমটা টানা। কেবল একখানা চুড়ি-পরা হাত গাড়ির দরজার উপরে ন্যস্ত দেখতে পেলাম দূর থেকে। অশোক গাড়িটা এমন ভাবে পার্ক করে রেখেছিল আর আমার ট্যাক্সি এমন জায়গায় ছিল যে, সেখান থেকে গাড়ির সামনের দিকটায় নজর পড়ে না। কেবল একটা সাইড দেখা যায় মাত্র। লজ্জায় ও সংকোচে গাড়ি থেকে নামতে পারলাম না। ভূতগ্রস্তের মতই গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম আমি। মিনিট কুড়ি বাদে ব্যাঙ্ক থেকে অশোক বের হয়ে এল এবং গাড়িতে উঠে, স্পষ্ট দেখলাম, পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই মেয়েটির হাতে নোটের বাণ্ডিলগুলো তুলে দিল। তারপর উল্টো পথে গাড়িটা বের হয়ে গেল।

গাড়িটা ফলো করলেন না কেন?

না, তা করিনি। ঘটনাটা আমাকে এমন বিহ্বল ও বিমূঢ় করে ফেলেছিল যে ঠিক ঐ সময়টাতে, যখন খেয়াল হল অশোকের গাড়ি আশেপাশে কোথায়ও নেই। তারপর দুটো দিন কেবল ভাবতে লাগলাম। আমার কেস-পত্র সব কোথায় পড়ে রইল। তৃতীয় দিনে অশোক যখন সন্ধ্যার পর চেম্বারে কেস সেরে রাত সাড়ে আটটায় বের হল, তাকে ফলো করলাম ট্যাক্সি নিয়ে। কানুকে দিয়ে আগেই ডাকিয়ে এনে তার মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিলাম গেটের অদূরে। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বৈকালী সঙ্ঘ' ক্লাবটা সম্পর্কে কিছু জানেন মিঃ রায়, মানে নাম শুনেছেন ক্লাবটার কখনও?

জানি, শুনেছি। লেক টেরেসে তো?

হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে ঢুকল অশোক। রাত সাড়ে এগারটায় বের হল ক্লাব থেকে।

আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম এত রাত্রে ক্লাব থেকে বের হয়ে বাড়ি না ফিরে সে চলেছে পার্ক সার্কাসের দিকে।

পার্ক সার্কাসের দিকে? প্রশ্ন করলাম এবারে আমিই।

হ্যাঁ। এবারে তার গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে।

অত রাত্রে ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারে?

হ্যাঁ। তবে বাইরের দরজা তো বন্ধ ছিল; দোতলায় চেম্বারের ঘরেও কোন আলো জ্বলছিল না। সব অন্ধকার।

ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারের সঙ্গে শুনেছি নার্সিং হোমও আছে, এমনও তো হতে পারে যে, অশোকবাবুর কোন জানাশুনা রোগী নার্সিং হোমে ছিল, তাকেই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন!

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? হতে পারে নার্সিং হোম, তাই বলে ওটা তো আর দেখা করতে যাবার সময় নয় ঐ মাঝরাত্রে! তাছাড়া সব দিক এই কদিন ধরে ভেবেচিন্তেই শেষ পর্যন্ত আপনার পরামর্শ নেওয়া স্থির করেই আপনাকে ডেকেছি মিঃ রায়। যাক শুনুন, অশোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দরজার গায়ে কলিং-বেলের বোতামটা টিপতেই কে যেন এসে দরজা খুলে দিল। অশোক ভেতরে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর?

আধ ঘণ্টা বাদে অশোক চেম্বার থেকে বের হয়ে এল। তারপর অবিশ্যি সে বাড়ির দিকেই গাড়ি চালাল। তারপর তিন রাত অশোককে আমি গোপনে ফলো করেছি এবং প্রত্যেক বারেই দেখেছি সে বৈকালী সঙ্ঘ ক্লাব থেকে বের হয়ে সোজা পার্ক সার্কাসে ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারেই যায়। শুধু এই নয়, আজ ছ-সাত মাস থেকেই লক্ষ্য করছি অশোকের কথায়বার্তায়, তার চালচলনে, ব্যবহারে, এমন কি চেহারাতেও যেন একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। অমন চমৎকার উজ্জ্বল চেহারা ছিল ওর; যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে তার ওপরে। সমস্ত দিন কেমন ঝিম মেরে থাকে—মনে হয় যেন খুব ক্লান্ত। চিরদিন যে হাসিখুশী হৈ-হল্লা করে চলত, সে যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। অথচ রাত্রে ফেরবার পর যতক্ষণ না ঘুমোয় পাশের ঘর থেকে শুনি কখনও গুনগুন করে গাইছে বা শিস দিচ্ছে। একেবারে অন্য প্রকৃতির। কতবার ভেবেছি ওকে ডেকে খোলাখুলি সব জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লজ্জা ও সংকোচ এসে বাধা দিয়েছে। ভেবে ভেবে যখন কোন আর কূল-কিনারা পাচ্ছি না, হঠাৎ মনে পড়ল আপনার কথা। I am sure মিঃ রায়, এর পেছনে কোন একটা গোলমাল আছে।

Somewhere something wrong! অশোক, my only son। একমাত্র ছেলে ওই আমার। যেমন করে যে উপায়েই হোক এই দুশ্চিন্তা থেকে আপনি আমায় বাঁচান, মিঃ রায়। বলতে বলতে ব্যারিস্টার কিরীটীর একটা হাত চেপে ধরলেন। আবেগে ও উত্তেজনায় তাঁর ধৃত মুষ্টিটা যেন কাঁপছে থরথর করে তখন। চোখের কোলে অশ্রু।

, ব্যস্ত হবেন না ব্যারিস্টার। কয়েকটা দিন সময় দিন; আর আমাকে একটু ভাবতে দিন।

কিন্তু একটা কথা, ও যেন ঘুণাক্ষরেও না কিছু সন্দেহ করে।

ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্ত থাকুন। দু-পাঁচদিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে আমি দেখা করব।

॥ চার ॥

সে রাত্রের মত আশ্বাস দিয়ে ডিনার শেষ করে তো ফিরে এলাম। কিন্তু তারপর পর পর চার-পাঁচদিন সর্বদা দিনে রাত্রে অশোক রায়কে ছায়ার মত অনুসরণ করেও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিরীটী বলতে লাগল, এদিকে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম শুধু গত বৎসরখানেক ধরে মিত্রা সেনের সঙ্গে নাকি অশোক রায়ের একটু বিশেষ করে ঘনিষ্ঠতা চলেছে এবং বৈকালীতে মিত্রা সেনই অশোকের আসল আকর্ষণ। যতক্ষণ বৈকালীতে ও থাকে মিত্রা ও অশোক কাছাকাছিই থাকে। কিন্তু রাত এগারটা বাজবার পর থেকেই অশোক যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে। চোখে মুখে একটা উত্তেজনা ফুটে ওঠে। রাত এগারটায় ঠিক মিত্রা সেন চলে যায়। এবং মিত্রা সেন চলে যাবার পর থেকেই অশোকের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা দেয়। অথচ মজা এই, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকালেও রাত প্রায় সাড়ে এগারটার আগে কখনো সে বৈকালী থেকে বের হয় না। এবং রাত সাড়ে এগারটা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগেই ঠিক বের হয়ে পড়ে—এক মিনিট এদিক ওদিক হয় না। এই তো গেল অশোকের ব্যাপার। তারপরই নজর দিলাম ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীর ওপরে। তাঁর চেম্বারের attendance একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। এক মিনিট এদিক ওদিক হয় না। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা; দেড় ঘণ্টা চেম্বারে বসেই চলে যান হাসপাতালে। বেলা গোটা বারো নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফিরে বাইরের

কলগুলো সেরে বেলা দেড়টায় ঠিক বাড়ি পৌঁছোন। বিকেলে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা চেম্বার অ্যাটেনডেন্স। ঠিক রাত সাড়ে আটটায় চেম্বার থেকে বের হয়ে এসে গাড়িতে চাপেন এবং সোজা চলে আসেন। আমির আলী অ্যাভিন্যুতে নিজের বাড়িতে। বাড়িতে একবার রাত্রে পৌঁছনোর পর সকলেই জানে হাজার টাকা দিলেও এবং যত সিরিয়াস কেসই হোক না কেন রাত্রে কখনও ভুজঙ্গ ডাক্তারকে কেউ বাড়ির বাইরে আনতে পারবে না। এবং নানাভাবে খবর নিয়ে দেখেছি, কথাটা মিথ্যা বা অত্যুক্তি নয়। রাত্রে চেম্বার থেকে ফেরবার পর সত্যিই আর তিনি বাইরে যান না। এদিকে ভুজঙ্গ ডাক্তার চেম্বার থেকে চলে যাবার পরই তাঁর একজন অ্যাসিস্টেণ্ট ডাক্তার ও একজন নার্স বাদে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাকি আর সব চেম্বার থেকে চলে যায়, চেম্বারের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঐ চেম্বার ও নার্সিং হোমে থাকে একজন অ্যাসিস্টেণ্ট ডাক্তার একজন নার্স ও প্রহরায় থাকে একজন শিখ দারোয়ান গুলজার সিং ও কুক্ মাধোলাল। কিন্তু মজা আছে ঐখানেই। রাত সাড়ে এগারটার পর থেকে রাত প্রায় একটা দেড়টা পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে এক-একখানা প্রাইভেট গাড়ি এসে চেম্বারের সামনে দাঁড়ায়—কখনও কোন পুরুষ, আবার কখনও কোন মহিলা গাড়ি থেকে নেমে দরজার কলিং বেলের বোতামটা গিয়ে টেপেন। নিঃশব্দে দরজা খুলে যায়। তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করেন এবং পনের মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার চেম্বার থেকে বের হয়ে এসে গাড়িতে চেপে চলে যান। প্রতি রাত্রে এই একই ব্যাপার ঘটছে।

কিরীটীর কথায় বাধা না দিয়ে পারি না, বলি, এ যে রীতিমত সিনেমা-কাহিনী হে!

তাই বটে। শোন, শেষ হয়নি এখনও। আমার next step হল যে-যে গাড়ি রাত্রে চেম্বারে আসে তাদের নাম্বারগুলো টুকে অনুসন্ধান করে তাদের মালিকদের খুঁজে বের করা। শুরু করে দিলাম। এবং এইখানে এসেই ব্যাপারটা যেন আরও বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে গেল।

কি রকম? প্রশ্ন করলাম।

শোন হে সুব্রতচন্দ্র! কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গলায় বেশ একটু আমেজ এনে বললে, চমকে উঠো না যেন এবারে নামগুলো শুনে। অশোক রায় ছাড়াও এক নম্বর সুচরিতা দেবী—হার একসেলেন্সী মহারাণী অফ সোনাপুর স্টেট। দু-নম্বর—বিখ্যাত আর্টিস্ট বর্তমানে নব্য চিত্রকরদের মধ্যমণি সোমেশ্বর রাহা। তিন নম্বর—বিখ্যাত পাল অ্যাণ্ড কোং-এর তরুণ প্রোপ্রাইটার শ্রীমন্ত পাল। চার নম্বর—স্বনামধন্য অভিনেত্রী সুমিতা চ্যাটার্জী। পাঁচ নম্বর—বর্তমানের শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা নিখিল ভৌমিক। ছ নম্বর—উদীয়মান ব্যারিস্টার মনোজ ভঞ্জ। আর চাই?

বিস্ময়ে আমি সত্যিই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কিরীটী একে একে যে সব নামগুলো করে গেল তাদের মধ্যে যে কেবল শহরের বর্তমান নামকরা ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ই আছে তাই নয়, এমন নামও করলে যাদের নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

এরাই রাত্রির বিভিন্ন যামে নিয়মিত ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বারে হানা দেয়।

কিন্তু কেন?

কিরীটীর কাহিনী শেষ হবার পর দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম। ঘরের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা স্তব্ধতার গুরুভার জমাট বেঁধে উঠেছে।

এবং এতক্ষণে যেন বুঝতে পারছি আজ সকালে কিরীটীর ভুজঙ্গ চৌধুরী দর্শনে গমনটা আকস্মিক বা সামান্য খেয়ালের বশে নয়। সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পনানুযায়ীই হয়েছিল।

সদ্য কিরীটীর মুখে শোনা বিচিত্র নামগুলো ও সেই সঙ্গে সেই লোকগুলোর চেহারা ও এতদিনকার তাদের সকলের আমাদের জানিত বাইরের পরিচয়টা মনের মধ্যে বিচিত্র এক চিন্তার সৃষ্টি করেছিল।

অশোক রায়, মহারাণী সুচরিতা দেবী, আর্টিস্ট সোমেশ্বর রাহা, পাল অ্যাণ্ড কোংএর শ্রীমন্ত পাল, অভিনেত্রী সুমিতা চ্যাটার্জী, অভিনেতা চিত্রতারকা নিখিল ভৌমিক, উদীয়-মান ব্যারিস্টার ভঞ্জ—সমাজ বা সোসাইটিতে সকলেই এমন বিশেষ পরিচিত যে নাম করলেই সকলকে চেনা যায়।

সেই একটা দিক এবং দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে প্রত্যেকের অবস্থা, অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। সকলেরই যাতায়াত আছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বারে। এবং যাতায়াতটা দিনের আলোয় প্রকাশ্যে নয়, রাত্রির অন্ধকারে বলতে গেলে এক প্রকার গোপনেই এবং ভুজঙ্গ ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে।

কিন্তু কেন?

কেন ওরা সকলেই ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বারে রাত্রে যাতায়াত করে? বিশেষ করে চেম্বার যখন বন্ধ থাকে এবং তিনি যখন সেখানে থাকেন না!

হঠাৎ কিরীটীর কথায় আবার চমক ভাঙল, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস সুব্রত?

কি?

সকলেই ভুজঙ্গ ডাক্তারের ওখানে যায় এবং রাত্রি এগারটার পর!

হ্যাঁ।

শুধু তাই নয়, সে সময় সাধারণতঃ ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ তো থাকেই এবং সে সময়টা ডাক্তার চৌধুরী তাঁর বাড়ি থেকে কখনও বের হন না। এর থেকে একটা কথা কি স্বতঃই মনে হয় না যে, ডাক্তারের ঐ সময়টা চেম্বারে অনুপস্থিতি ও ওদের সেই সময়ে গমনাগমন, কোথায় যেন একটা রহস্য রয়েছে! হয়ত এমন কোন আকর্ষণ সেখানে আছে যার টানে—

কিন্তু তাই যদি থাকে তো সেটা কি হতে পারে? তোর কি মনে হয়?

মনে তো অনেক কিছুই হয়, কিন্তু মনে হলেই তো হয় না। ভুললে চলবে কেন আমাদের, ডাঃ চৌধুরী এবং অন্যান্য সকলেরই সোসাইটিতে আজকের দিনে একটা পরিচয় ও স্বীকৃতি আছে।

তা অবিশ্যি আছে। শুধু তাই নয়, আর একটি ব্যাপার হচ্ছে ঐ বৈকালী সঙ্ঘ।

হ্যাঁ, খোঁজ নিয়ে দেখেছি আমি, ঐ সব ব্যক্তিবিশেষের বৈকালী সঙ্ঘেও নিয়মিত যাতায়াত আছে এবং তারা প্রত্যেকেই সেখানকার মেম্বার।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। কিন্তু আরও একটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে, বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী কখনও আজ পর্যন্ত বৈকালী সঙ্ঘে পা তো দেনইনি, এমন কি সঙ্ঘের ওপরেও নাকি তিনি মর্মান্তিক ভাবে চটা। সঙ্ঘের নাম পর্যন্ত নাকি তিনি শুনতে পারেন না।

কেন?

তাঁর ধারণা বৈকালী সঙ্ঘটা নাকি আসলে একটা যৌন ব্যভিচারের গোপন কেন্দ্র। যত সব তথাকথিত অ্যারেস্ট্রোক্রেটিক পয়সাওয়ালা তরুণ-তরুণীরা ঐখানে সেই উদ্দেশেই মিলিত হন। আর ঠিক সেই কারণেই আমি fill up the blank পূর্ণ করতে পারছি না কদিন ধরে ভেবেও। অথচ আমাদের ব্যারিস্টার রাধেশ রায়ের পুত্র তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীমান অশোকের যাতায়াত নিয়মিত দু জায়গাতেই। সে যাক গে, তুই একটা কাজ করতে পারবি?

কি?

মিত্রা সেনের গতিবিধি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট আমাকে এনে দিতে পারবি?

সে কি আর ঠাকুরপোর দ্বারা সম্ভব হবে? বরং আমি—

চমকে দুজনেই ফিরে তাকিয়ে দেখি বক্তা আমাদের কিরীটীগৃহিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা বৌদি। ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনার ফাঁকে চায়ের ট্রে হাতে কখন যে নিঃশব্দে কৃষ্ণা বৌদির সেই ঘরে আবির্ভাব ঘটেছে দুজনের একজনও সেটা টের পাইনি। এবং বুঝতে পারা

গেল শুধু আবির্ভাবই নয়, আমাদের শেষের আলোচনার অংশটুকু তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশও করেছে।

কিরীটীই বলে, কৃষ্ণা!

হাতের ট্রেটা সামনের ছোট টেবিলটার উপরে রাখতে রাখতে কৃষ্ণা বৌদি বললে, হ্যাঁ কৃষ্ণাই। সর্বাগ্রে চা সুধার দ্বারা গলদেশ ভিজাইয়া লওয়া হউক, তারপর যাহা আমার বক্তব্য, পেশ করিতেছি।

দুজনেই আমরা হাসতে হাসতে ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিলাম হাতে।

কৃষ্ণা বৌদিও একটি কাপ হাতে নিয়ে কিরীটীর পাশের সোফায় বসল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে শুধাল, কি বলছিলে কৃষ্ণা?

বলছিলাম তোমার মিত্রা সেনের সংবাদটা ঠাকুরপোর দ্বারা ঠিক সুবিধে হবে না, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তুমি!

হ্যাঁ। নারীর মনোলোকের সংবাদ নারীই ঠিক যোগাড় করতে পারে।

কিন্তু—

ভাবছ চিনে ফেলবে! না মা ভৈষী! একটা রাত একটু আমাকে ভাবতে দাও, তারপর আমি কাজে নামব।

কৃষ্ণা জবাব দিল।

॥ পাঁচ ॥

দিন দুই পরে কিরীটী আবার আমাকে ডেকে বলল, কৃষ্ণার কথা শুনে কিন্তু তুই চুপ করে বসে থাকিস না সুব্রত। মিত্রা সেনের সমস্ত সংবাদটা আমার চাই।

বললাম, তথাস্তু।

কিন্তু বললাম তো তথাস্তু। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! শ্রীমতী মিত্রা সেন সম্পর্কে যতটুকু জানি বা জানবার সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি গভীর জলের মৎস্য-কন্যা! এমন একটা পরিবেশের মধ্যে তাঁর বিহার যে সেখানে আমার মত একজন নগণ্য অসামাজিক রসকষহীন ব্যক্তির পক্ষে মাথা গলানো শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভব। তিনি থাকেন অভিজাত পল্লীর প্রাসাদোপম পিতৃ-নিবাসের তিনতলার একটি নির্জন কক্ষে। সিঙ্গল করা মাথার

চুল, কপাল কপোল ও ওষ্ঠ থেকে শুরু করে পদাঙ্গুলির নখাগ্র পর্যন্ত এমন সুচারুভাবে এনামেলিং করা যে, ত্রিশোত্তীর্ণ হয়েও আজ তিনি চিত্তবিমোহিনী, স্থিরযৌবনা, মনোলোভা।

অতএব দুদিন ধরে কেবল ভাবলামই। তারপর বিদ্যুৎ-চমকের মতই হঠাৎ যেন ভাবতে ভাবতে মানসপটে একখানি মুখ ভেসে উঠল।

সুধীরঞ্জন মিত্র।

হ্যাঁ, ঠিক। সুধীরের ওখানে গিয়ে হানা দিতে হবে। সে হয়তো একটা পথ বাতলে দিতে পারবে। কলকাতা শহরে সত্যিকারের পুরাতন এক বনেদী ঘরের ছেলে সুধী। ওদেরই এক পূর্বপুরুষ হেস্টিংসের আমলে বেনিয়ানগিরি করে মা-লক্ষ্মীকে এনে গৃহে তুলেছিলেন। তারপর দুই পুরুষ ধরে নর্তকী ও সুরার বিলাসিতায় সেই লক্ষ্মীর রস শোষণ করেও যা বাকি ছিল সুধীর জীবনে, ইচ্ছে করলে সুধী তার একটা জীবন হেসে-খেলে পায়ের উপর পা দিয়েই কাটিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সুধী তার পূর্বপুরুষদেরও যেন নারী ও সুরার ব্যাপারে ডিঙিয়ে গেল। এবং পিতার মৃত্যুর পর দশটা বছর যেতে না যেতেই হাটখোলার শেষ বসতবাটিটুকুও বন্ধক দিয়ে সে আজও নাকি পূর্বের মত না হলেও মেজাজেই দিন কাটাচ্ছে।

সুধীরের আরও দুটি বিশেষ গুণ ছিল যেটা তার বাপ-পিতামহ বা তস্য পিতা কোনদিনই আয়ত্ত করতে পারেননি। সুধী ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করেছিল এবং সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি অধিকার করে। পড়াশুনার বাতিকও তার ছিল প্রচণ্ড। আর বেহালা বাজানোয় সে ছিল অদ্বিতীয়। এবং সেই বিশেষ গুণটির জন্যই তথাকথিত ইউরোপীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ নতুন দিনের কালচার্ড সোসাইটির মধ্যেও সে পেয়েছিল অনায়াস প্রবেশাধিকার। এবং আজও সে অবিবাহিত। সুধীরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বছর চারেক আগে এক পার্টিতে।

সুধীরঞ্জনের কথা মনে হতেই পরদিন সকাল-সকালই বের হয়ে পড়লাম তার গৃহের উদ্দেশে।

সুধীরের কথাই ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম।

পার্টিতে সে-রাত্রে সুধীরের বেহালা বাজানো শুনে মুগ্ধই হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তারপর পরিচয় হয়ে তার পড়াশুনা ও জ্ঞান দেখে আরও বেশী করে মুগ্ধ হই। বেশ কিছুদিন আলাপও জমে উঠেছিল। তারপরই তার নারী ও সুরা-প্রীতির সন্ধান পেয়ে কি জানি কেন হঠাৎ তার প্রতি মনটা আমার বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে একসময় তার কাছ থেকে সরে এসেছিলাম।

তারপর অবিশ্যি কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ-কখনও যে দেখা হয়নি সুধীরঞ্জনের সঙ্গে তা নয়। তবে পূর্বের মত আর ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। সে-ও চায়নি হতে।

বিরাট সেকেলে প্যাটার্নের পুরাতন স্ট্রাকচারের বাড়ি। অন্দরমহলে বহু ভাড়াটে এসে বসবাস করছে। বহির্মহলেরই চারখানা ঘর নিয়ে সুধী থাকে। এখন অবিশ্যি তার চাকর ঠাকুর দারোয়ান সোফার আছে। আর আছে আপনার জন বলতে সুধীরের এক বিধবা সত্তর বৎসরের পিসী মৃন্ময়ী। ঘুম থেকে উঠে সুধীর চা পান করতে বসেছিল, এমন সময় আমার আসার সংবাদ পেয়ে ভৃত্যের মুখে আমাকে সোজা একেবারে তার শয়নঘরেই ডেকে পাঠাল।

একটা চেয়ারের উপর বসে সুধী চা পান করছিল। আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললে, এস, এস সুব্রত। হঠাৎ কি মনে করে? পথ ভুলে নাকি?

না। মনে করেই এসেছি।

বটে! কি সৌভাগ্য! বলেই ভৃত্যকে চা আনতে আদেশ দিল।

সামনেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু পরেই ভৃত্য চা নিয়ে এল। চা পান করতে করতে ভাবছিলাম কিভাবে বক্তব্যটা আমার শুরু করা যায়।

সুধীই প্রথমে কথা বললে, তারপর হঠাৎ উদয় কেন বল তো?

তোমার কাছে একজনের কিছু সংবাদ পাই যদি সেই আশায়—

সংবাদ! আমি ভাই সংবাদ দিতে পারি নারীমহলের, অন্য মহলের সংবাদ—

একজন নারী সম্পর্কেই কিছু জানতে চাই।

বল কি! ভূতের মুখে রামনাম! কি ব্যাপার বল তো হেঁয়ালি রেখে?

হেঁয়ালি নয়, সত্যিই কোন এক বিশেষ নারী সম্পর্কেই—

সত্যি বলছ? Are you serious?

নিশ্চয়ই।

হুঁ। বল শোনা যাক।

মিত্রা সেনকে চেন?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে সুধীরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল নিষ্পলক হয়ে রইল।

কি? চেন নাকি?

এককালে চিনতাম।

এখন?

দেখাশুনা হয় এইমাত্র। কিন্তু বন্ধু, সাবধান! ও হচ্ছে বহ্নি-পতঙ্গ। ও পতঙ্গের দিকে হাত বাড়ালে হাতই পুড়বে, পতঙ্গ ধরা দেবে না।

সুধীরঞ্জনের কণ্ঠস্বরে শেষের দিকে কেমন যেন একটা চাপা বেদনার আভাস পেলাম বলে মনে হল। চমকে তাকালাম ওর মুখের দিকে। মেঘে ঢাকা আলোর মত কি একটা বিষণ্ণতা যেন ওর চোখে-মুখে ক্ষণেকের জন্য ছায়া ফেলে গেল।

এখন দেখাশুনা হয় বললে, তো সেটা কি রকম?

বৈকালী সঙ্ঘের নাম শুনেছ?

চমকে উঠলাম আবার সুধীরের কথায়। বললাম, হ্যাঁ, সেইখানেই নাকি?

হ্যাঁ। বলতে পার বৈকালী সঙ্ঘের তিনিই মক্ষীরাণী!

সুধীরঞ্জনের শেষের কথায় বেশ যেন একটু ঔৎসুক্যই অনুভব করি। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার তাহলে বৈকালী সঙ্ঘে যাতায়াত আছে বল?

এককালে খুবই ছিল। তবে এখন কখনও-সখনও গিয়ে থাকি।

শেষ কবে গিয়েছিলে?

এই তো গত পরশুই গিয়েছিলাম।

হুঁ। আচ্ছা ব্যারিস্টার অশোক রায়ের নাম—

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবারে সুধীরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যাপারটা সত্যি করে কি বল তো সুব্রত? প্রথমেই করলে মিত্রা সেনের নাম, তারপরই করছ অশোক রায়ের নাম! রহস্যের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি!

ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি সুধী। আমি বিশেষ করে ঐ দুজনের সম্পর্কে ও বৈকালী সঙ্ঘ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আর তোমার কাছে সে ব্যাপারেই কিছু সাহায্য চাই।

তাই তো সুব্রত! তুমি যে আমায় চিন্তায় ফেললে!

কেন?

কারণ বৈকালী সঙ্ঘ হচ্ছে এমন একটি সঙ্ঘ যেখানে একমাত্র সেই সঙ্ঘের মেম্বার ছাড়া প্রবেশ একেবারে strictly prohibited। একেবারে দুঃসাধ্য।

কিন্তু তার কি কোন পথ নেই?

সে আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কি রকম?

তিনজন সঙ্ঘের মেম্বারের রেকমেণ্ডেশন না পেলে কারও মেম্বরশিপ সেখানে গ্রাহ্যই করা হয় না।

তুমি তো একজন আছ। আর দুজনের রেকমেণ্ডেশন তুমি যোগাড় করে দিতে পারবে না?

কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে চেষ্টা করে একবার দেখতে পারি।

দেখাদেখি নয় ভাই। যে করে হোক তোমাকে করে দিতেই হবে।

কিন্তু ভাই তোমার বেলায় আরও একটা যে মুশকিল আছে।

কেন?

এককালে তুমি পুলিসের চাকরি করতে। শুধু তাই নয়, তুমি আবার কিরীটী রায়ের সাক্ষাৎ দক্ষিণহস্ত—দুনিয়া-সমেত সকলেই জানে। তোমায় কমিটি নিতে চাইবে কিনা সেও একটা ভাববার কথা।

কিন্তু কেন নেবে না? যতদূর শুনেছি, বৈকালী সঙ্ঘ তো অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের একটি মিলন-কেন্দ্র, তাহলে আমাদের যদি বর্তমানে বা অতীতে কখনও পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকেই, সেখানে প্রবেশাধিকার পাব না কেন? তবে কি তুমি বলতে চাও সেখানে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে থাকে যাতে করে ঐ দিক থেকে তাদের ভয়ের বা আশঙ্কার কারণ আছে?

সুধীরঞ্জন প্রত্যুত্তরে হেসে বললে, তা জানি না ভাই, তবে পুলিস বা পুলিস-সংক্রান্ত লোকেদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

হেতু?

হেতু আর কি! ওরা এমন কি যেখানে যাবে, সেখানেই একটা না একটা মামলা বাধা চাই। শোনা যায়, স্ত্রীর সঙ্গেও নাকি মন খুলে কথা বলে না!

তাহলে উপায়? উপায় নেই?

তাই তো বলছিলাম—

আচ্ছা এক কাজ হয় না?

বল?

এই কথা—আসল নামে আমি যাব না। ছদ্মনাম নেব। ধর কোন জমিদার-নন্দনের পরিচয়ে!

কিন্তু তোমার ওই চেহারাটির সঙ্গে যে অনেকেরই পরিচয়-সৌভাগ্য আছে ভাই।

ভয় নেই। একেবারে অন্য চেহারায় ও বেশে—

বল কি! যদি ধরা পড়?

ধরা পড়ব! হুঁ। আরে, তুমিই দেখে চিনতে পারবে না তো অন্যে পরে কা কথা!

সুধীরঞ্জন অতঃপর কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বললে, বেশ, দিন-পাঁচেক বাদে এস। আজ কি নাম নেবে সেইটেই শুধু বলে যাও। একবার চেষ্টা করে দেখব।

তুমিই বল না, কি নাম নেওয়া যায়!

ছদ্মবেশ ও নাম তুমি নেবে, আর বলব আমি?

আচ্ছা নাম বলছি। মুহূর্তকাল ভাবলাম। পরে বললাম, সত্যসিন্ধু রায়। চক্রধরপুর কোল মাইনস-এর মালিক।

বেশ। নাম ও পরিচয়টা জোরালো দিয়েছ বটে।

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে সুধীরঞ্জনের ওখান থেকে বের হয়ে এলাম।

সুধীর কাছে গিয়ে এতটা যে সুবিধা হবে যাত্রার পূর্বমুহূর্তেও ভাবিনি।

সুধীরঞ্জনের চেষ্টাতেই সত্যসিন্ধু রায় বৈকালী সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পেল। এবং যথাসময়ে একটি গোলাকার সাদা আইভরি ডিস্কের উপরে বৈকালী সঙ্ঘের সাংকেতিক-চিহ্ন-অঙ্কিত প্রবেশপত্রও হাতে এসে পৌঁছল।

তারও দিন-পাঁচেক বাদে একদিন রাত্রি নটায় প্রথম বৈকালী সঙ্ঘের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গেটের দরোয়ান দেখলাম অত্যন্ত সজাগ ও চতুর।

আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলে, পাস দেখলাইয়ে।

বৈকালী সঙ্ঘের প্রবেশপত্র হিসাবে যেটি আমার হস্তগত হয়েছিল, সেটি হচ্ছে ক্ষুদ্র টাকার আকৃতির একটি গোলাকার আইভরি ডিস্ক। তার মধ্যে একটি লাল বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত অপূর্ব সুন্দর একখানি নারী-মুখ ও অন্য দিকে লেখা 'বৈকালী' কথাটি। আইভরি ডিস্কটি পকেট থেকে বের করে প্রহরীর সামনে ধরলাম।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী এক দীর্ঘ সেলাম দিয়ে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে বললে, যাইয়ে সাব।

মৃদু হেসে এগিয়ে গেলাম আমি।

সামনেই সরু করিডোর। অল্পদূর এগিয়েই সামনে পড়ল চকচকে আলো-পিছলে-যাওয়া বর্মা টিকের ফ্রেমে ওপেইক-গ্লাস-বসানো ভারী মজবুত দরজা। দরজার গায়ে একটি সাদা কাচের নব্ ও তার নীচে একটি সাদা চাকতিতে কালো ইংরাজী অক্ষরে লেখা: PULL। মুহূর্তকাল ইতস্তত: করে দরজার নব্‌টা ধরে টানতেই নিঃশব্দে একপাল্লাওয়ালা দরজার কপাটটা সরে এল। পাইরিথ্রাম-মেনথল-ইউক্যালিপটাস-মিশ্রিত মৃদু গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রবেশ করলাম একটা হলঘরে। মেঝেতে পুরু রবার কার্পেট বিছানো। সমস্ত হলঘরটা মৃদু একটা নীলাভ আলোয়

যেন থমথম করছে। সামনেই কার্পেট-মোড়া একটা সিঁড়ি। বুঝলাম দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি সেটা।

হলঘরে প্রবেশ করতেই সাদা-উর্দী-পরিহিত একজন বেয়ারা সামনে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। এবং মুহূর্তকাল আমার মুখের ও চেহারার দিকে তাকিয়ে বললে, কার্ড?

বুঝলাম সতর্ক প্রহরার এটি দ্বিতীয় ঘাঁটি। অপরিচিতকে এখানেও পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে। যথারীতি আমাকেও সাংকেতিক-চিহ্ন-অঙ্কিত প্রবেশ-চাকতিটি বের করে আবার দেখাতে হল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেলাম।

Up-stairs please! এবারের নির্দেশ ইংরাজীতেই।

সামনেই সিঁড়ি। এগিয়ে গেলাম। কার্পেটে মোড়া সিঁড়িটা আধাআধি উঠে ডানদিকে একটু কার্ভ নিয়ে আবার উপরে উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির পথেও নীলাভ আলো।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনেই আবার দরজা। এ দরজাটিও একটি পাল্লার এবং কাটগ্লাসের। পূর্ব দরজার মত এ দরজার গ্লাসেও নির্দেশ লেখা: PUSH।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল বিরাট একটি হলঘর। নীচের হলঘরের প্রায় দ্বিগুণ এবং মিশ্রিত হাসি ও মৃদু আলোকের একটা গুঞ্জরণের সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করল মৃদু একটা ল্যাভেণ্ডারের মিষ্টি গন্ধ। দেওয়ালের গায়ে গায়ে অদৃশ্য আলো থেকে আলোকিত ঘরটি। এবং সে আলো নীলাভ হলেও একটু বেশী স্পষ্ট। ঘরের মধ্যে মধ্যে টেবিল-চেয়ার, সোফা-কাউচ পাতা। সেই সব সোফা-কাউচে বসে এবং দাঁড়িয়েও থাকতে অনেককে দেখলাম। বিভিন্ন বয়েসের দশ-পনেরজন নর-নারী। বিভিন্ন দামী বেশভূষা গায়ে। প্রত্যেকেই তাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হাসি-গল্প করছে। আমি ঘরে সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত ব্যক্তি, হঠাৎ প্রবেশ করা সত্ত্বেও কেউ আমার দিকে বারেকের জন্যও ফিরে তাকাল না। বুঝলাম, তারা নিজেদের সম্পর্কে সেখানে কত নিশ্চিন্ত যে আচমকা কোন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলেও তারা জানে, সে এমন একজন কেউ যে তাদের দ্বারাই সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আমি ঘরের চারপাশটা তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিলাম যথাসম্ভব আড়চোখে।

হলঘরটা দৈর্ঘ্যে যতটা প্রস্থে তার অর্ধেকের কিছু বেশীই হবে। যে দরজা-পথে ঘরে প্রবেশ করেছিলাম সে দরজা ছাড়াও দুদিকে আরও চারটি অনুরূপ কাটগ্লাসেরই এক-পাল্লাওয়ালা দরজা চোখে পড়ল। এবং দরজাগুলোর মাথায় ইংরাজী অক্ষরে দেখলাম

লেখা আছে 1, 2, 3, 4; ঘরের ঐ দরজা ছাড়া আরও চারটি জানালা চোখে পড়ল কিন্তু সেগুলো একটু বেশ উঁচুতেই এবং প্রত্যেক জানালায় ভারী নীল রঙের পর্দা টাঙানো। তার উপরে চারদিকে চারটি ভেনটিলেটার। এ ছাড়াও ঘরে চারটি ফ্যান আছে। তবে সেগুলো বন্ধই ছিল; মাত্র একটি ছাড়া। দেওয়ালের চারদিকেই আলো, তবে সেগুলো অদৃশ্য। নীলাভ কাচের আবরণে ঢাকা। ঘরের দেওয়াল একেবারে দুধ-সাদা। সম্পূর্ণ নিরাবরণ। কোথাও একটি ক্যালেণ্ডার বা ছবি পর্যন্ত নেই।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত নর-নারীরা সকলেই যে গল্প করছিল তা নয়—দুটো টেবিলে জনাপাঁচেক বসে তাসও খেলছিল। আরও একটি জিনিস নজরে পড়ল, ঘরে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল। কিন্তু কাউকেও বিলিয়ার্ড খেলতে দেখলাম না। সকলেই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কি করব ভাবছি, হঠাৎ এমন সময় আমার ডাইনে 2 নম্বর দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল ও দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ, পরিধানে দামী নেভি-ব্লু ট্রপিক্যাল স্যুট—ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। এবং আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর চাপা কণ্ঠে বললেন, আসুন সত্যসিন্ধুবাবু! নমস্কার।

আমার নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম একসঙ্গে উপস্থিত ঘরের সকলেরই অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন একঝাঁক তীরের মতই আমার সর্বাঙ্গ এসে বিদ্ধ করল।

আগন্তুক তখন ঘরের উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন—Ladies and gentlemen! আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের বৈকালী সঙ্ঘের নতুন সভ্য শ্রীযুক্ত সত্যসিন্ধু রায়ের সঙ্গে। ইনি চক্রধরপুরের একজন বিখ্যাত কোল মার্চেণ্ট।

অতঃপর প্রত্যেকের সঙ্গে নাম করে করে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন আগন্তুক: ইনি সলিসিটার সানু ভৌমিক, ইনি অ্যাডভোকেট নীলাম্বর মিত্র, ইনি মার্চেণ্ট শ্রীমন্ত পাল, ইনি ব্যারিস্টার অশোক রায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রতিবারেই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। দীর্ঘকায়, বয়স মনে হয় পঞ্চাশোত্তীর্ণ, ষাটের কাছাকাছিই হবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ব্যাকব্রাশ-করা এবং একেবারে সাদা। চোখে একটি কালো কাচের চশমা। পুরু ওষ্ঠ এবং উপরের পাটির দাঁতের সামনের দুটো দাঁত যেন একটু বেশী বড়। গাল সামান্য তোবড়ানো, বোঝা যায়, মাড়ির দাঁত নেই। মুখে সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সামান্য একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ান। গলাটা ভারী এবং গম্ভীর হলেও কেমন যেন একটা অদ্ভুত মিষ্টত্ব আছে কণ্ঠস্বরে।

আচ্ছা, তাহলে আমি চললাম। Make yourself comfortable Mr. Roy! বলেই বললেন, আশ্চর্য! দেখুন, সবার পরিচয় দিলাম অথচ নিজের পরিচয়টাই

আপনাকে দিলাম না। আমার নাম রাজেশ্বর চক্রবর্তী।

ওঃ, আপনিই তাহলে এখানকার প্রেসিডেন্ট! বললাম এবার আমিই।

তাই। আচ্ছা চলি।

রাজেশ্বর চক্রবর্তী অতঃপর যে দ্বারপথে প্রবেশ করেছিলেন সেই দ্বারপথেই প্রস্থান করলেন।

এক নম্বর দরজাটি এবারে খুলে গেল এবং একজন ওয়েটার হলঘরে এসে প্রবেশ করল। দৃষ্টি পড়বার মত লোকটা। দৈর্ঘ্যে ছ ফুটেরও বেশী হবে। যে অনুপাতে ঢ্যাঙা লোকটা সে অনুপাতে কিন্তু শরীর নয়। অনেকটা তাই হাড়গিলে প্যাটার্নের মনে হয়।

লোকটার পরিধানে ছিল সাদা লংস ও গলা-বন্ধ সাদা কোট। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে কদম-ছাঁট দেওয়া। ছোট কপাল। বাঁশির মত ধারালো নাক। নিখুঁতভাবে কামানো গোঁফ।

লোকটা ঘরে ঢুকতেই একজন বললেন, মীরজুমলা, একটা বড় জিন অ্যাণ্ড লাইম দাও। অন্য একজন বলল, একটা হুইস্কি ছোটা পেগ। আর একজন বললে, একটা রাম অ্যাণ্ড লাইম।

সকলের নির্দেশেই মীরজুমলা মৃদু হেসে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

এমন সময় হঠাৎ একটি মিহি নারীকণ্ঠের আওয়াজে চমকে সেই দিকে তাকালাম। তিন নম্বর দরজাটার পাল্লাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর তার গোড়ায়ই দাঁড়িয়ে অপরূপ সুন্দরী এক নারীমূর্তি। তিনি মীরজুমলার দিকে তাকিয়ে বললেন, মীরজুমলা, কোল্ড লিমন-জুস।

শুধু আমিই নয় হলঘরে সেই নারী-মূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত সকলেরই কর্ণে সে কণ্ঠস্বর প্রবেশ করায় সকলেই একসঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সাদর আহ্বান জানালেন তাকে এবং 'Hail beautious stranger of the grove' বলে তাঁদের মধ্যে শ্রীমন্ত পাল এগিয়ে আসেন।

আর একটি সুবেশ প্রৌঢ় ব্যারিস্টার অমিতাভ মৈত্রও এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, Good evening Miss sen!

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল, আশ্চর্য! এ তো সেই মুখ। কত কাগজে দেখেছি। মিস মিত্রা সেন!

বৈকালী সঙ্ঘের সুধীরঞ্জন-বর্ণিত মক্ষীরানী।

॥ ছয় ॥

অসাধারণ প্রসাধন-নৈপুণ্যে প্রথম দর্শনেই শ্রীমতী মিত্রা সেনকে দেখে চোখ ঝলসে গিয়েছিল সে-রাত্রে আমার। সত্যিই কালো জমিনের উপরে সাদা জরির পাড় দেওয়া বহুমূল্য ইটালীয়ান সিফন শাড়িটি যেন সে বরঅঙ্গে লেপ্টে ছিল। হাতে একাগাছি হীরা-বসানো জড়োয়ার চুড়ি। কানে নীলার দুল। হীরা ও নীলার উপরে বিদ্যুতের আলো পড়ে যেন ঝিলিক দিচ্ছিল। আর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু ঐ বেশভূষাতেই যেন মনে হচ্ছিল তাকে বিশ্ব-বিজয়িনী। লম্বায় পাঁচ ফুট দু-এক ইঞ্চির বেশী হবে না। রোগাটে গড়ন। গায়ের গড়ন উজ্জ্বল শ্যাম। কিন্তু প্রসাধনের রঙে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই মিত্রা সেনকে সাদর আহ্বান জানালেও এবং সকলেই সোৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মিত্রা সেন কিন্তু সকলকেই উপেক্ষা করে তাকাল তরুণ ব্যারিস্টার অশোক রায়ের দিকে। মধুর হাসিতে দু-গালে তার টোল খেয়ে গেল। মৃদু কণ্ঠে অশোকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বললে, অশোক! আমার আসতে আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

দরদে ও আব্দারে মেশানো সে কণ্ঠের স্বর।

অশোক রায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটুখানি হাসি জেগে ওঠে।

তারপরেই অশোকের কাছে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এসে বললে, পূর্বের চাইতে যেন আর একটু চাপা কণ্ঠেই, রাগ করনি তো?

অন্য কেউ না শুনলেও কথাটা আমি শুনতে পেলাম।

দেরি হল-যে! মৃদু কণ্ঠে অশোক রায় এবার প্রশ্ন করে।

বল কেন, বৌদি কোথায় এক পার্টিতে যাবে, শাড়ি পছন্দ করে দিতে দিতে—

তা তুমি যে গেলে না?

ভুলে গেলে নাকি, শনিবার আর বুধবার রাত্রে যেখানেই যাই না কেন, রাত দশটায় এখানে আসিই!

ঐ সময় ওয়েটার মীরজুমলা এসে হলঘরের মধ্যে ঢুকল সুদৃশ্য একটা প্লাস্টিকের ট্রের উপরে পিপাসীদের বিভিন্ন সব পানীয় গ্লাসে গ্লাসে ভরে। প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে গিয়ে গিয়ে সে ট্রেটা ধরতে লাগল। এক এক করে যে যার নির্দিষ্ট পানীয় মীরজুমলার ইঙ্গিতে তুলে নিতে লাগল ট্রের উপর থেকে। মিত্রা সেনকে লিমন-জুসের গ্লাসটা দিয়ে শূন্য ট্রেটা

হাতে এবার এগিয়ে এল মীরজুমলা আমার দিকে এবং আমার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আমিও তাকালাম লোকটার মুখের দিকে।

তারপরই সুস্পষ্টোচ্চারিত নির্ভুল ইংরাজীতে প্রশ্ন করল, Any drink, Sir ?

একজন ওয়েটারের মুখে অমন সুস্পষ্টোচ্চারিত নির্ভুল ইংরাজী শুনে আমিও নিজের অজ্ঞাতেই মীরজুমলার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংবরণ করে বললাম, Yes ! Gin and bitter please.

মীরজুমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে স্থানত্যাগ করল। এবারে স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, চলার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও গতি আছে লোকটার।

আমি আবার হলের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম।

হঠাৎ ছোট একটা কথা কানে এল।

লাকি গ্যায় !

কথাটা বলছিল বিখ্যাত আর্টিস্ট সোমেশ্বর রাহা তার সামনেই দণ্ডায়মান শ্রীমন্ত পালকে।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বর একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অল্প দূরেই ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি দণ্ডায়মান মিত্রা সেন ও অশোক রায়ের দিকে।

সোমেশ্বরের দু-চোখের তারায় মনে হচ্ছিল যেন একটা কুটিল হিংসা ও সঙ্গে আরও একটা কিছু মিশে আছে।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন দৃষ্টিটা আমার সোমেশ্বরের মুখের উপর স্থির হয়ে ছিল। সোমেশ্বরকে ইতিপূর্বে চাক্ষুষ কখনও না দেখলেও ওর আঁকা ছবি দেখেছি। এবং বহু সাময়িক কাগজে ওর অনন্যসাধারণ প্রতিভার সমালোচনা পড়েছি। সেই থেকেই লোকটাকে না দেখলেও মনের মধ্যে ওর প্রতি আমার একটা প্রশংসা ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কখনও ভাবতে পারিনি লোকটার চেহারা এত কুৎসিত। বেঁটে কালো দেখতে। ছোট কপাল, রোমশ জোড়া ভ্রূ। নাকটা একটু চাপা। গোল গোল চোখ। একমাত্র হাতের মোটা মোটা কুৎসিত রোমশ আঙুলগুলি ছাড়া দেহের আর সমুদয় অংশ সযত্ন পরিধেয় পোশাকে আবৃত থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না লোকটার শরীরে লোমের একটু আধিক্যই আছে।

ভাবছিলাম ঐ রোমশ কুৎসিতদর্শন মোটা মোটা আঙুলগুলো কি করে অমন সাদা কাগজের বুকে সূক্ষ্ম শিল্প রচনা করে। লোকটার চেহারা, চোখের দৃষ্টি ও হাতের আঙুল

দেখলেই স্বতঃই মনে হয় লোকটা নিশ্চয় একটা নৃশংস খুনী। অতবড় উঁচুদরের একজন শিল্পী কোনোমতেই নয়।

বিধাতার সৃষ্টি সত্যই আশ্চর্য। নইলে এমন চেহারা ও কাজে এমন বৈচিত্র্য আসে কোথা থেকে আর কোন্ যুক্তিতেই বা। নিজের চিন্তায় বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম চার নম্বর দরজা-পথে কেউ ক্ষণপূর্বে নিশ্চয়ই প্রস্থান করেছে, দরজার কবাটটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই এদিক-ওদিক তাকাতে নজর পড়ল ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী নেই। অশোক রায় ও মিত্রা সেন। এবং নিজের অজ্ঞাতেই আবার অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা আমার ঘুরে গিয়ে পড়ল আর্টিস্ট সোমেশ্বর রাহার মুখের উপরে। দেখলাম, সোমেশ্বরের দু-চোখের স্থিরদৃষ্টি সেই চার নম্বরের দরজার বন্ধ কবাটের গায়ে যেন পিন দিয়ে কে এঁটে দিয়েছে।

ক্ষণকাল সেই বন্ধ কবাটের দিকে তাকিয়ে থেকে সোমেশ্বর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চার নম্বর দরজাটা খুলে প্রস্থান করল।

ঘড়িতে ঠিক তখন সাড়ে দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি।

দুর্নিবার এক আকর্ষণে সেই চার নম্বর দরজাটা আমায় টানছিল এবং নিজের অজ্ঞাতেই একসময় পায়ে পায়ে সেদিকে যে এগিয়েও গিয়েছি টের পাইনি। দরজার কাছাকাছি প্রায় যখন গিয়েছি হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, মীরজুমলা ট্রেতে করে আমার পানীয় নিয়ে হলঘরে এসে প্রবেশ করল।

Your drink, Sir!

ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নিতে নিতে আড়চোখে তাকালাম মীরজুমলার মুখের দিকে। মুখখানা যেন তার পাথরে কোঁদা কিন্তু চোখের কোণে স্পষ্ট যেন মনে হল একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ-চমক।

মীরজুমলা তিন নম্বর দরজা-পথে বের হয়ে গেল ট্রেটা হাতে নিয়ে। হলঘরের চারিদিকে আবার দৃষ্টিপাত করলাম। কেউ আমার দিকে চেয়ে আছে কি! কিন্তু না, সকলেই যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে কারও যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। আমি যে একজন নবাগত তাদের সজ্যে আজ রাত্রে সে ব্যাপারে কারো মনেই যেন বিন্দুমাত্রও কৌতূহলের উদ্রেক করেনি।

কিন্তু নিজের কাছেই নিজের আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লাগছিল। কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করছিলাম।

প্রেসিডেন্টের আমার সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কেউ আমার কাছে এগিয়ে এল না।

আর আলাপ করবার চেষ্টাও করল না।

এখানকার নিয়ম-কানুন রীতি-নীতিও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। গায়ে পড়ে এখানে হয়ত কেউ কারও সঙ্গে আলাপ করে না।

কিন্তু কিসের টানেই বা প্রতি রাত্রে এখানে এতগুলো বিভিন্ন চরিত্রের লোক এসে জড়ো হয়? সামান্য একটু তাস খেলা বিলিয়ার্ড খেলা বা সামান্য একটু ড্রিঙ্কের জন্যই কি? মন কিন্তু কথাটা মেনে নিতে চাইল না অত সহজে।

কিরীটী যে বলেছিল এবং সুধীরঞ্জনের কথাবার্তাতেও প্রকাশ পেয়েছিল এ সঙ্ঘটা হচ্ছে আসলে নর-নারীদের একটা যৌন-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরের একটি মিলনকেন্দ্র, কই সে রকমও তো এতক্ষণের মধ্যে তেমন কিছু চোখে আমার পড়ল না। বরং রুচি ও সংযমের পরিচ্ছন্নতাই সকলের মধ্যে লক্ষ্য করছি এযাবৎ।

তাছাড়া পুলিস বা তৎসংক্রান্ত লোকেদের এড়িয়ে চলবার মত কিছুও তো এখনও পর্যন্ত আমার নজরে পড়ল না।

ভুলেই গিয়েছিলাম যে গ্লাসটা হাতে করেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, একটি সিপও দিইনি পানীয়ে।

হঠাৎ পাশ থেকে একটি মিষ্ট মৃদু-উচ্চারিত নারীকণ্ঠে চমকে ফিরে তাকালাম।

কি নাম আপনার?

সুবেশা মধ্যবয়সী এক নারী ইতিমধ্যে কখন আমার পশ্চাতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছেন টেরই পাইনি। আমি যখন এ ঘরে প্রবেশ করি তখন ওঁকে দেখিনি। নিশ্চয়ই পরে কোন একসময় এসেছেন।

আগন্তুক মহিলা খুব সুন্দরী না হলেও প্রসাধন-নৈপুণ্যে সুন্দরীই মনে হচ্ছিল।

মৃদুকণ্ঠে ছদ্মনামটা আমার উচ্চারণ করলাম, সত্যসিন্ধু রায়।

আমার নাম বিশাখা চৌধুরী। আপনাকে আগে কখনও দেখিনি তো বৈকালী সঙ্ঘে!

না। আজই প্রথম এসেছি।

কারও সঙ্গে বুঝি এখনও আলাপ হয়নি?

নামে মাত্র কারও কারও সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে, তার বেশী হয়নি।

তা এখানে এই ঘরের মধ্যে রয়েছেন কেন? আমার তো বদ্ধ ঘরে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে!

উপায় কি? কোথায় আর যাব?

কেন, গার্ডেনে চলুন না! It's a lovely place!

গার্ডেন !

হ্যাঁ। ও, আপনি তো নতুন ! এ বাড়ির কিছুই জানেন না ! চলুন, গার্ডেনে যাওয়া যাক।

বেশ তো, চলুন।

বিশাখা চৌধুরীকে অনুসরণ করে তিন নম্বর দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। দরজা ঠেলে প্রথমে তিনি বের হলেন, তাঁর পিছনে আমিও হলঘর থেকে বের হলাম। সরু একটা প্যাসেজ। স্বল্পশক্তির একটা মাত্র বিদ্যুৎবাতির আলো প্যাসেজে। এবং সেই স্বল্পালোকে নির্জন প্যাসেজটা যেন কেমন থমথমে মনে হয়। প্যাসেজের দু-পাশে গোটা দুই বন্ধ দরজা আর একটা জানলা পার হয়ে দ্বিতীয় জানলার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চমকে উঠলাম। খোলা জানলার পথে স্বল্প আলো-আঁধারিতে মনে হল যেন একখানা মুখ চট করে সরে গেল। এবং শুধু মুখই নয়, একজোড়া চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি !

যে মুখখানা ক্ষণেকের জন্য আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল, পলকমাত্রই সে মুখখানা কিন্তু চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। ওয়েটার মীরজুমলার মুখ।

চোখের তারায় সেই সরীসৃপ চাউনি।

বুঝলাম নতুন আগন্তুক আমি এ গৃহে, এবং আমাকে তিনজন মেম্বারের সুপারিশে এখানে প্রবেশাধিকার দিলেও প্রখর দৃষ্টিই আছে আমার উপরে।

এমনি নিছক কৌতূহলেই সেই প্রখর দৃষ্টি আমার উপরে পতিত হয়েছে, না আমাকে সন্দেহ করেই এরা আমার প্রতি দৃষ্টি রেখেছে সেটাই বুঝতে পারলাম না। সে যাই হোক, বুঝলাম সাবধানের মার নেই, আমাকে এখানে সতর্ক ও সজাগ হয়ে চলতে হবে।

প্যাসেজটা শেষ হয়েছে একটা দরজায়। সে দরজাটা খুলতেই বিদ্যুতালোকে আমার চোখে পড়ল একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নীচে নেমে গিয়েছে।

আসুন ! বিশাখা সিঁড়ির ধাপে পা দিলেন।

আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই চোখে পড়ল একটি উদ্যান। নানা আকারের গাছপালাই নজরে পড়ল। আরও নজরে পড়ল উদ্যানের মধ্যে স্বল্পশক্তির নীল বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে মধ্যে মধ্যে। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো ছোট ছোট ঝোপের মতও আছে। আর আছে একটা ঘর উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে। লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে নেমে বিশাখার সঙ্গে উদ্যানে এসে দাঁড়ালাম।

ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা চোখেমুখে যেন একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ দিয়ে গেল। সরু সরু সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি গোলাকার বাঁধানো জায়গা থেকে যেন চারিদিকে হাত বাড়িয়েছে। বাঁধানো রাস্তার পরেই ঘাসের কোমল সবুজ কার্পেট যেন চারিদিকে বিছানো। তার মধ্যে মধ্যে সযত্ন-বর্ধিত নানা আকারের গাছপালা ও ঝোপ। সব কিছুর ভিতরেই যেন একটা সুপরিকল্পিত প্ল্যানের নির্দেশ আছে বলে মনে হয়।

উদ্যানটি যে কতখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত সঠিক বোঝবার উপায় নেই। কারণ সীমানা সেই স্বল্প নীলাভ আলোয় রাত্রে চোখে পড়ল না।

আবছা আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে সরু বাঁধানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়েই ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছিলাম। আমার সঙ্গিনীর মনে তখন কি চিন্তা ছিল জানি না কিন্তু আমার মনের সবটা জুড়েই সরু প্যাসেজ দিয়ে আসবার সময় ক্ষণেকের জন্য দেখা জানলা-পথে মীরজুমলার সেই পাথরে-খোদাই-করা মুখ ও সরীসৃপের মত দুটি চোখের দৃষ্টি ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমার সমস্ত চিন্তা যেন তাতেই নিবদ্ধ ছিল।

হঠাৎ বিশাখার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম, কেমন লাগছে এ জায়গাটা, সত্যসিন্ধুবাবু?

অ্যাঁ!

কি ভাবছিলেন বলুন তো?

কই, কিছু না!

একটা কথা বলব, মিঃ রায়?

বলুন না।

সত্যসিন্ধু! আপনার নামটা যেন কেমন!

কেন বলুন তো?

সে জানি না, তবে ও নামে আমি কিন্তু আপনাকে ডাকতে পারব না।

সে কি! তবে কি নামে ডাকবেন?

কেন? ঐ পোশাকী নামটা ছাড়া আপনার কি আর অন্য কোন নাম নেই? মানুষের তো কত সময় ডাকনামও দু-একটা থাকে!

ডাকনাম!

হ্যাঁ। এই ধরুন না, যেমন আমার ডাকনাম শিলু। এখন অবিশ্যি ও নামে ডাকবার আর কেউ নেই। তবে ছোটবেলায় ঐ নামটা ধরেই সকলে আমাকে ডাকত। বলুন না আপনার ডাকনামটা কি?

ঐ নামটি ছাড়া তো আমার আর দ্বিতীয় কোন নাম নেই বিশাখা দেবী। তবে

ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে সত্যবাবু বলেও ডাকতে পারেন।

কারা যেন এদিকে আসছে!

সত্যিই চেয়ে দেখি একটি পুরুষ ও একটি নারী-মূর্তি পরস্পর গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে মন্থর পদে হাঁটতে হাঁটতে এই দিকেই আসছে।

অস্পষ্ট আলোয় তাদের মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

চলুন, ঐ ঝোপের ধারে একটা বেঞ্চ আছে, সেখানে গিয়ে আমরা বসি।

রেডিয়াম-ডায়েল-দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত প্রায় এগারোটা বাজতে চলেছে। বললাম, এবারে যাব ভাবছি।

কোথায়?

বাড়িতে।

বাড়িতে বুঝি রাত জেগে বসে আছেন মিসেস?

মৃদু হাসলাম বিশাখার কথায়।

হাসলেন যে? প্রশ্ন করলেন বিশাখা।

আপনার কথায়।

কেন?

তার কারণ বিয়েই করিনি তো মিসেসের ভাগ্য আসবে কোথা থেকে!

সে কি! বাঙালীর ছেলে, এত উপার্জন, এখনও বিয়ে করেননি?

না।

আশ্চর্য! কেন বলুন তো?

কেন আর কি? সুযোগ হয়ে ওঠেনি!

বিয়ে করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি!

না। তাছাড়া শুধু সুযোগই তো নয়, মনের একটা তাগিদও তো থাকা দরকার বিয়ের ব্যাপারে।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে আমরা দুজনে এসে বিশাখা-বর্ণিত ঝোপের ধারে একটা বেঞ্চের উপরে পাশাপাশি বসেছিলাম।

বাড়িতে মিসেসের তাগিদই যখন নেই তখন বাড়ি ফেরবার জন্য এত তাড়াই বা কিসের?

রাত হল।

নিজের ছোট্ট হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিয়ে বিশাখা এবারে বললেন,

www.boiRboi.blogspot.com

মাত্র তো এগারটা! রাতের তো এখনও সবটাই বাকি!

হঠাৎ এমন সময় কানে এল মৃদু ভায়োলিন বাজনার শব্দ।

আশেপাশে কে যেন ভায়োলিন বাজাচ্ছে মনে হচ্ছে! প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ।

কে বাজাচ্ছে বলুন তো?

সুধী বাজাচ্ছে।

সুধী? মানে সুধীরঞ্জন?

হ্যাঁ। চেনেন নাকি তাকে?

হ্যাঁ। আপনাদের এখানে সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে ঐ একজনের সঙ্গেই যা একটু-আধটু পূর্বপরিচয় আছে।

সিনিক!

কে?

কে আবার, আপনার ঐ সুধীরঞ্জন।

কেন?

কিন্তু আমার 'কেন'র জবাব দিলেন না বিশাখা। চুপ করে রইলেন। সে রাত্রে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছিলাম সুধীরঞ্জনকে কেন বিশাখা চৌধুরী সে রাত্রে সিনিক বলেছিলেন।

যা-হোক, বিশাখার আমার প্রশ্নের জবাব দেবার অনিচ্ছাটা বুঝতে পেরে আমিও অন্য প্রশ্ন তুললাম। বললাম, এখানে এসে সুধী কারও সঙ্গে বুঝি মেশে না? আপনার মনে একা একা বেহালা বাজায়? তা বেহালা বাজাবার জন্য এখানেই বা ওকে আসতে হবে কেন তাও তো বুঝতে পারছি না!

কে বললে সুধী এখানে বেহালা বাজাতে আসে? ও বেহালা বাজানো শেখাচ্ছে।

বেহালা বাজানো শেখাচ্ছে! এই অন্ধকারে বাগানের মধ্যে!

মনের মানুষকে বেহালা বাজানো শেখাবার জন্যে আলো বা আঁধারের ঘর বা বাগানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে নাকি?

মনের মানুষ!

হ্যাঁ। শনিবার রাত্রে ও আসে মৃদুলাকে বেহালা বাজানো শেখানোর জন্যে।

আর কৌতূহল প্রকাশ করা হয়ত উচিত হবে না। তাই চুপ করে গেলাম। মৃদু শব্দে বেহালা বাজলেও এমন চমৎকার সুরের একটা আকৃতি সে বাজনার মধ্যে ছিল যা আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্বভাবতঃই সেইদিকে আকর্ষণ করছিল।

রাত হয়ে যাচ্ছে, তবু যাবার কথাও যেন ভুলে গেলাম।

সুধী এত চমৎকার বেহালা বাজায়, কই আগে তো কখনও জানতে পারিনি!

হঠাৎ আবার চমক ভাঙল বিশাখার কণ্ঠস্বরে, চলুন, সত্যসিন্ধুবাবু, উঠুন।

উঠব?

হ্যাঁ। এই যে বলছিলেন রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি যাবেন? যাবেন না?

হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম।

আরও তিন রাত্রি বৈকালী সঙ্ঘে যাতায়াত করবার পর বিশাখা চৌধুরীর পরিচয় আর একটু পেলাম।

ফিলসফির বিখ্যাত প্রফেসর স্বর্গীয় ডক্টর প্রতুল চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী হচ্ছেন বিশাখা চৌধুরী।

বয়স পঁয়তাল্লিশোত্তীর্ণ।

দুটি মেয়ে, তাদের দুজনেরই বিবাহ হয়ে গিয়েছে। তারা শ্বশুর-গৃহে। ডক্টর চৌধুরী নেহাত কিছু কম রেখে যাননি তাঁর বিধবা স্ত্রীর জন্য। কলকাতার উপর একখানা বাড়ি ও মোটামুটি কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ও শেয়ারের কাগজ।

ইচ্ছা করলে বিশাখা চৌধুরী তাঁর বাকি জীবনটা আরামেই কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু গত-যৌবনা, দুটি সন্তানের জননী বিশাখার মনে কামনার আগুন তখনও নিঃশেষে নির্বাপিত হয়নি। তাই তাঁকে ছুটে আসতে হয়েছিল ঘরের বাইরে, বৈকালী সঙ্ঘের রাতের আসরে। প্রতি রাতে বৈকালী সঙ্ঘে তিনি আসতেন সেই অতৃপ্ত কামনার তাগিদেই। এবং সামনে যাকে পেতেন তাকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করতেন। তিন রাত্রের আলাপেই সেটা আমার আর জানতে বাকি ছিল না। কিন্তু সে কথা জানতে পারা সত্ত্বেও আমি তাঁকে নিরুৎসাহ করিনি, কারণ তখন তাঁকে ঘিরে অন্য একটা চিন্তা আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছে। ওঁকে হাতে রাখতে পারলে এখানে আমি কতকটা নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়েই আসা-যাওয়া করতে যে পারব তা বুঝেছিলাম।

পঞ্চম রাত্রে হঠাৎ চমকে উঠলাম আর এক নবাগতার মুখের দিকে তাকিয়ে। পঞ্চম রাত্রি অবিশ্যি আমার পর পর আসা নয়। গত কুড়িদিনে পঞ্চম রাত্রি আসা বৈকালী সঙ্ঘে আমার। আজ আবার দ্বিতীয়বার রাজেশ্বর চক্রবর্তীকে দেখলাম বৈকালী সঙ্ঘে।

ইতিমধ্যে আর তাঁকে দেখতে পাইনি।

নিয়মানুযায়ী আজও প্রেসিডেন্ট রাজেশ্বর চক্রবর্তীই নবাগতাকে সঙ্ঘের অন্যান্য

মেম্বারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

কুমারী মীনা রায়।

আমি চমকে উঠেছিলাম কুমারী মীনা রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এইজন্য যে প্রথম দৃষ্টিতেই একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই তাকে চিনতে কষ্ট হয়নি।

কৃষ্ণা বৌদি। কিরীটী-মহিষী!

এমনিতেই চোখ-ঝলসানো রূপ আর চেহারা কৃষ্ণার। তার উপরে আজ তার বেশ ও প্রসাধনে এমন একটা অভূতপূর্ব চাকচিক্য ছিল, যাতে করে পুরুষ তো ছার মেয়েদেরও মনে আকর্ষণ জাগায়। এবং সেই কারণেই বোধ হয় সে রাত্রে আমার আবির্ভাবে কেউ আমার দিকে ফিরে না তাকালেও, আজ ঘরের মধ্যে উপস্থিত পনেরজন বিভিন্ন বয়েসী নরনারীর ত্রিশজোড়া কৌতুহলী চোখের দৃষ্টি যেন একঝাঁক ধারালো তীরের মতই কৃষ্ণাকে গিয়ে তার সর্বাঙ্গে বিদ্ধ করল। এবং তাকিয়েই রইল সকলে।

মনে হচ্ছিল আজ রাত্রে বৈকালী সঙ্ঘের মক্ষীরানী শ্রীমতী মিত্রা সেন এসে তার পাশে দাঁড়ালেও বুঝি ম্লান হয়ে যেতেন। কিন্তু মিত্রা সেন সে সময়ে এসে তখনও পৌঁছননি। যদিও সেটা শনিবারই ছিল।

প্রেসিডেণ্ট রাজেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর কর্তব্য-কাজটুকু সম্পাদন করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এবং নীলাম্বর মিত্র ও মনোজ দত্ত কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

॥ সাত ॥

নীলাম্বর মিত্র ও মনোজ দত্তর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলাম। হায় অবোধ! জান না তো ও বহ্নিশিখা মিথ্যা, শুধু মরীচিকা, মায়া মাত্র। ও তোমাদের বুকে তৃষ্ণার আগুন জ্বালিয়ে পালিয়েই যাবে। কোনদিনই ওর নাগাল পাবে না।

হঠাৎ এমন সময় বেহালার বাক্স হাতে সুধীরঞ্জন এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এবং সুধীকে দেখেই জাস্টিস মল্লিকের মেয়ে মিস্ রমা মল্লিক, মধুর কণ্ঠে সুধীকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, আসুন সুধীবাবু! অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। কিন্তু ভায়োলিনের বাক্স আপনার হাতে, ব্যাপার কি!

জবাব দিলেন বিশাখা আমার পাশ থেকে, হ্যাঁ। ওটা ভায়োলিনই। মৃদুলা দেবীকে

উনি যে আজকাল ভায়োলিন শেখান। কিন্তু সরি সুধীবাবু, আজ মৃদুলা অ্যাবসেণ্ট। আর রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল যখন, আজ আর কি আসবেন!

জবাব দিলেন রমা মল্লিক, নাই বা এল মৃদুলা। আজ সুধীবাবুর বাজনা আমরা শুনব। সুধীবাবু, please—একটা বাজিয়ে শোনান।

সোমেশ্বর রাহাও মিস্ মল্লিকের অনুরোধে সায় দিলেন।

সুধী হাসতে হাসতে বললে, আমি রাজী আছি, একটি শর্তে; আপনাদের মধ্যে কেউ must accompany me with your voice।

জবাব দিলেন এবারে মিস্ মল্লিক, কিন্তু কে গলা দেবে বলুন তো! মিত্রাদি absent যে! এখনও এসেই পৌঁছননি!

কেন? মিস্ সেন নেই বলে কি আর কেউ আমাকে আপনাদের মধ্যে একটু সঙ্গ দিতে পারেন না?

এবারে বললাম আমিই, মিস্ মীনা দেবী, আপনার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি অন্ততঃ আমাদের নিরাশ করবেন না।

কৃষ্ণা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি!

হ্যাঁ, আপনি। আমার ধারণা নিশ্চয়ই আপনি গান জানেন।

সামান্য একটু-আধটু; কিন্তু আপনাদের কি তা ভাল লাগবে?

আমাকে আর জবাব দিতে হল না।

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, লাগবে। লাগবে।

বেশ। গাইছি, পরে কিন্তু শুনে নিন্দে করতে পারবেন না।

সুধীরঞ্জন বেহালাটা বাক্স থেকে বের করে সুর বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, ধরুন···

কি গাইব? কৃষ্ণা শুধায়।

যা খুশি। সুধী বলে।

কৃষ্ণা তখন গান ধরল। রবীন্দ্র-সংগীত। আর সুধী মেলাল সেই সুরে তার বেহালা।

নির্বাক! স্তব্ধ সমস্ত হলঘর!

সকলেরই চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা।

বুঝলাম কৃষ্ণা দেবী তার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৈকালী সঙ্ঘকে জয় করলেন তাঁর রূপ ও কণ্ঠ দিয়ে। গানের শেষ লাইনে এসে সবে পৌঁছেছে কৃষ্ণা, হলঘরে আবির্ভাব ঘটল মিত্রা সেনের।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণার কণ্ঠের সংগীত শুনে মিত্রা সেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এবং তার সে দাঁড়াবার মধ্যে যতটা কৌতূহল তার চাইতেও যে বেশি বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, আর কেউ ঘরের মধ্যে সেটা বুঝতে না পারলেও আমার সতর্ক দৃষ্টিতে কিন্তু সেটা এড়ায়নি।

এবং তার সে বিস্ময় আরও বেশি বৃদ্ধি পেল যখন কৃষ্ণার গানের শেষে ঘরের মধ্যে ঐ সময় উপস্থিত সকলের কণ্ঠ হতে অকুণ্ঠ প্রশংসাধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে কৃষ্ণাকে অভিনন্দন জানাল।

সুপার্ব! একসেলেন্ট! চমৎকার! প্রভৃতি অভিনন্দন চারিদিক হতে শোনা গেল।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি মিত্রা সেনের উপরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু আজ আর বিশেষ কারও কণ্ঠ হতে পূর্ব পূর্ব রাত্রের মত তার আবির্ভাব স্বাগত সম্ভাষণ-উচ্চারিত হল না।

মৃদু কণ্ঠে দু-একজন মাত্র বললে, গুড ইভনিং মিস্ সেন।

অকস্মাৎ যেন এক মর্মান্তিক আঘাতে মিত্রা সেনের ঐ সঙ্গে এতদিনকার সুনির্দিষ্ট আসনটি ভেঙে পড়ছে। মিত্রা সেন তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নবাগতা কৃষ্ণার দিকে। তার দু'চোখের দৃষ্টিতে শুধু যে বিস্ময় তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা চাপা বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমি মিত্রা সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম এত বড় আঘাত কোন নারীর পক্ষে সহ্য করা সত্যিই অসম্ভব। বিশেষ করে মিত্রা সেনের মত নারী, যে এতকাল এখানকার সকলের হৃদয়ে বিজয়িনীর আসন অধিকার করে এসেছে এবং কখনও অনুকম্পা, কখনও সামান্য একটু সহানুভূতি বা একটুখানি প্রশ্রয়ের কৃপা-দৃষ্টি বর্ষণ করে এখানকার অনেকেরই হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলে এসেছে, তার পক্ষে তো আরও দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখলাম, মিত্রা সেন শুধু এতকাল এতগুলো লোককে রাতের পর রাত রূপের কাজল দিয়েই মোহগ্রস্ত করে রাখেনি, বুদ্ধিও যথেষ্টই রাখে সে। মুহূর্তের মধ্যেই নিজের পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে নিয়ে ওষ্ঠপ্রান্তে তার চিরাচরিত স্বভাবসিদ্ধ বিজয়িনীর হাসি ফুটিয়ে অকুণ্ঠ চরণে কৃষ্ণার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, নমস্কার! আপনিই বোধ হয় কুমারী মীনা রায়—বৈকালী সঙ্ঘের নতুন মেম্বার!

হ্যাঁ।

আচ্ছা চলি, আজ একটু কাজ আছে। এবার থেকে আসা-যাওয়া যখন করবেন

www.boiRboi.blogspot.com

তখন পরিচয় আরও হবে। বলে সোজা দু নম্বর দরজা-পথে এগিয়ে গেল মিত্রা সেন।

কিন্তু সবে সে দরজা বরাবর গিয়েছে কৃষ্ণা অর্থাৎ মীনা তাকে বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আপনার নামটা তো জানা হল না!

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল মিত্রা সেন। মরালের মত হীরার কণ্ঠী পরা গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল কৃষ্ণার দিকে। মৃদু কণ্ঠে শুধাল, আমার নাম?

হ্যাঁ। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

মিত্রা সেন। বলেই আর দাঁড়াল না, ওষ্ঠপ্রান্তে চকিত হাসির একটা বিদ্যুৎ জাগিয়ে দরজা ঠেলে হলঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তেই।

সংগীতের আনন্দধ্বনির মাঝখানে মিত্রা সেনের আকস্মিক আবির্ভাবটা হলঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা থমথমে ভাবের সৃষ্টি করেছিল, মিত্রা সেনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা তখন কেটে গেল। সকলের কণ্ঠ হতে কৃষ্ণাকে আর একটি গান শোনানোর জন্য মিলিত অনুরোধ উচ্চারিত হল।

মীনা দেবী, আর একটি প্লিজ!

কৃষ্ণা সবার অলক্ষ্যে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝলাম আমার ছদ্মবেশে আমাকে চিনতে না পারলেও কণ্ঠস্বরে ধরতে পেরেছে সে আমাকে। চোখের ইঙ্গিতে জানালাম—গাও।

আবার একটি গান ধরল কৃষ্ণা। সুধীও তার বেহালা ধরল সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে।

এই সুযোগ।

সকলেরই দৃষ্টি কৃষ্ণার উপরে।

আমি সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে দু'নম্বর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল, আমি হলঘর থেকে বের হলাম।

দরজা ঠেলে হলঘর থেকে যেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম সেটা একটি ছোট আকারের ঘর। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। এদিক-ওদিক গোটা দুই সোফা-সেটি রাখা।

কিন্তু ঘরের চারদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য, একটি দরজা বা জানলা আমার নজরে পড়ল না।

নজরে যা পড়ল তা হচ্ছে ঘরের চার দেওয়ালে চারদিকে আঁকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানুষপ্রমাণ সাইজের বিভিন্ন বেশভূষায় চারটি ওরিয়েন্টাল নারীমূর্তি।

ক্ষণপূর্বে হলঘর থেকে মিত্রা সেন এই ঘরেই ঢুকেছে। তবে সে গেল কোথায়! এই ঘরে সে নেই তো! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তবে কি এ ঘরে কোন গুপ্ত দ্বারপথ আছে, যে

দ্বারপথে মিত্রা সেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

নিশ্চয়ই তাই। নইলে সে যাবে কোথায়?

কিন্তু কোথায় সে গুপ্ত দ্বারপথ এই ঘরে, যদি থেকে থাকেই?

এদিক-ওদিকে তাকাতে গিয়ে আবার আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি চার দেওয়ালে অঙ্কিত চারটি নারীমূর্তির প্রতি নিবদ্ধ হল।

সেই ছবিগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চকিতে একটা কথা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল। এই ছবিগুলোর মধ্যেই কোন গুপ্ত দ্বারপথের সংকেত লুক্কায়িত নেই তো! ভাবতে ভাবতে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিগুলো দেখতে শুরু করলাম, একটার পর একটা।

তৃতীয় ছবিখানির সামনে এসে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জিনিস ছবিটার মধ্যে আমার নজরে পড়ল। অপরূপ নৃত্যভঙ্গিতে লীলায়িত নারী-দেহের দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্মকুঁড়ি ধরা। এবং পদ্মকুঁড়িটি মনে হল ছবির অন্যান্য অংশের মত আঁকা নয়। যেন ডাইসের সাহায্যে গড়ে তোলা। হাত বাড়িয়ে পদ্মকুঁড়িটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একসময় চমকে উঠলাম,—সম্পূর্ণ ছবিটাই ধীরে ধীরে ঘুরে গেল যেন একটা পিভেটের উপরে। আর আমার সামনে প্রকাশ পেল অ-প্রশস্ত একটি মৃদু আলোকিত প্যাসেজ।

মুহূর্তকাল মাত্র দ্বিধা করে সেই প্যাসেজের মধ্যে পা দিলাম। কয়েক পদ এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে প্যাসেজটা। আর মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে আমার চোখে পড়ল একটি ভেজানো ঈষৎ-উন্মুক্ত কাচের দরজা।

দরজার উপরে বাইরে ঝুলছে দু-পাশে ভারী ভেলভেটের পর্দা।

পর্দার আড়ালে গিয়ে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতে যাব—মিত্রা সেনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম।

মিত্রা সেন যেন কাকে বলছে, তা যেন হল, কিন্তু ঐ কুমারী মীনা রায়ের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা কি?

তুমি তো জান মিত্রা, স্পষ্ট পুরুষকণ্ঠে প্রত্যুত্তর এল, এ সঙ্ঘের নিয়ম, তিনজন মেম্বার যখন কাউকে মেম্বারশিপের জন্য রেকমেণ্ড করে দলভুক্ত হবার পারমিশন দেয় তখন আর তার সম্পর্কে কোন কৌতূহলই কারও প্রকাশ করা চলবে না।

হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। কিন্তু ইদানীং দেখছি বৈকালী সঙ্ঘের নিত্যনতুন মেম্বার হচ্ছে।

পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কি বলতে চাও তুমি?

কি আমি বলতে চাই, প্রেসিডেণ্টের নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না!

মিস্ সেন কি প্রেসিডেণ্টের কাছে কৈফিয়ত তলব করছেন? তাহলে আবার

আপনাকে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্মরণ করতে বলব এখানকার এগার নম্বর আইনটি। আচ্ছা মিস্ সেন, এবারে তাহলে আপনি যেতে পারেন।

বুঝলাম মিস্ সেন এবারে এখুনি ঘর থেকে বের হয়ে আসবে। আমি চকিতে দরজার পর্দার আড়ালে নিজেকে যথাসম্ভব গোপন করলাম, কেননা তখন সেখান থেকে আর পালাবার সময় ছিল না। এবং অনুমান আমার মিথ্যা নয়, পরমুহূর্তেই জুতোর খটখট শব্দ তুলে ঘর থেকে বের হয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা প্যাসেজে অদৃশ্য হয়ে গেল মিত্রা সেন।

ভাবছি আমিও এবারে স্থানত্যাগ করব, কিন্তু হঠাৎ একটা বিচিত্র কঁ-কঁ শব্দে চমকে উঠলাম।

তারপরই ঘরের সেই পূর্ব-পুরুষকণ্ঠ আবার শোনা গেল: মীরজুমলা, কি খবর! অ্যাঁ! হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক আছে। O. K.

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। নিঃশব্দ পায়ে আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই পূর্বেকার ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে আবার হলঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই বিশাখা এগিয়ে গেল আমার দিকে। প্রশ্ন করল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে যে হঠাৎ?

বুঝলাম প্রেসিডেন্টের অবস্থানটা এখানকার মেম্বারদের কাছে কোন কিছু একটা গোপন ব্যাপার নয়। দু'নম্বর দরজা দিয়ে যে প্রেসিডেন্টের ঘরে যাওয়া যায় তা এদের অজ্ঞাত নয়।

এমনিই একটু দরকার ছিল। তুমি কতক্ষণ?

বলাই বাহুল্য, আমাদের উভয়ের মধ্যে 'আপনি' পর্বটা ঘুচিয়ে দিয়ে উভয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করতে শুরু করেছিলাম ইতিমধ্যে।

তোমার কিছুক্ষণ আগে মিস্ সেন প্রেসিডেন্টের ঘর থেকে বের হয়ে এল দেখলাম। দুজনেই একসঙ্গেই গিয়েছিলে নাকি প্রেসিডেন্টের ঘরে?

না, উনি আগে গিয়েছিলেন, পরে আমি গিয়েছি।

কিন্তু দরকারটা হঠাৎ কি পড়ল তাঁর কাছে তোমার? ও-ঘরে তো বড় একটা কেউ পা-ই দেয় না এখানকার!

তাই নাকি?

হুঁ। তিন বছর এখানে যাতায়াত করছি, একদিন মাত্র ওঁর ঘরে গিয়েছিলাম। বাবাঃ, যা গম্ভীর লোকটা! কথা বলতেই ভয় করে।

কেন?

কেন আবার কি? মুখগোমড়া লোকদের দু-চক্ষে আমি দেখতে পারি না। সে যাক। তুমি এ কদিন আসনি যে বড়?

কলকাতায় ছিলাম না।

আর আমার যে এ কদিন কি ভাবে কেটেছে! কণ্ঠে বিশাখার একটা চাপা অভিমানের সুর যেন জেগে ওঠে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠি। শেষ পর্যন্ত এই বয়েসে কি সত্যিসত্যিই বিগত-যৌবনা, প্রেম-পাগল এক বিধবা নারীর মনের মানুষ হয়ে উঠলাম নাকি!

নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কৌতুকভরে বিশাখাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অন্য এক ভয়াবহ কৌতুকের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছি না তো!

বিশাখার মুখের দিকে তাকালাম একবার আড়চোখে। সুস্পষ্ট অনুরাগমাখা অভিমানের চিহ্ন দেখলাম সে মুখে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে।

বেচারী বিশাখা চৌধুরী! পলাতকা যৌবন-স্বপ্নের পিছনে পিছনে কি আশা নিয়েই না সে ছুটে বেড়াচ্ছে! হাসির চাইতে যেন দুঃখই হল। কারণ আমার নিজের দিকটা নিজের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। সেখানে কোথাও এতটুকু কুয়াশাও নেই। এবং যেদিন ও স্পষ্ট করে জানতে পারবে সেই সত্যটি, সেদিনকার সে দুঃখটা বেচারী সইবে কেমন করে?

কিন্তু যাক গে সে কথা। যে কারণে আমার এখানে আসা সেদিক দিয়ে আমি যে এখনও এতটুকু অগ্রসর হতে পারিনি।

এখানকার সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও আমার কাছে ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট।

বিশাখার কথায় হঠাৎ আবার চমক ভাঙল, চল সত্য, নীচে যাওয়া যাক।

চল।

॥ আট ॥

পরের দিন সকালে কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে তার বসবার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল।

বৈকালী সঙ্ঘে আমার কয়েক রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা কিরীটীকে বলছিলাম এবং সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। সব শুনে বললে, আমিও এ কদিন চুপ করে ছিলাম না। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজেন সিকদারকে দিয়ে বৈকালী সঙ্ঘ সম্পর্কে যতটা খোঁজ নেবার নিয়েছিলাম কিন্তু কোনরকম সন্দেহের ব্যাপারই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিসের রিপোর্ট হচ্ছে বৈকালী সঙ্ঘটি তথাকথিত ধনী এবং উচ্চশ্রেণীর অভিজাত

সম্প্রদায়ের একদল নর-নারীর সম্পূর্ণ নির্দোষ মিলন-কেন্দ্র। একটু-আধটু নাচ-গান, ফ্ল্যাশ, বিলিয়ার্ড ও ড্রিঙ্ক চলে সেখানে যেমন আর দশটি ঐ ধরনের নৈশ-ক্লাবে চলে থাকে। এবং নর-নারীর অবাধ মেলামেশার ফলে যতটুকু প্রেমঘটিত আদিরসাত্মক ব্যাপার ঘটতে পারে তার বেশী কিছুই নয়। অর্থাৎ পুলিসের গোপন কালো খাতায় বৈকালী সঙ্ঘ নৈশ-ক্লাবটির নাম নেই।

কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি কিরীটী, ঠিক যতটুকু বৈকালী সঙ্ঘ সম্পর্কে তারা রিপোর্ট দিচ্ছে সেটাই সব নয়। একেবারে নির্দোষ নিরামিষ ব্যাপার সবটাই নয়।

অর্থাৎ তুই বলতে চাস, পুলিসের সতর্ক দৃষ্টির অলক্ষ্যে আরও একটা গোপন ব্যাপার সেখানে ঘটে যার আকর্ষণে বিশেষ একদল নরনারী সেখানে রাতের পর রাত ছুটে যায়!

হ্যাঁ। আর সেটা যে ঠিক কী হতে পারে সেটাই এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না।

তোর মতের সঙ্গে যে আমার খুব একটা অমিল আছে তা নয় সুব্রত, কিন্তু তুই ও কৃষ্ণা যে পথে চলেছিস সে পথে গেলে কোনদিনই তোরা ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছতে পারবি না।

মানে?

অর্থাৎ মাতালের আড্ডায় গেলে তোকেও তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করতে হবে। নচেৎ কোনদিনই তাদের আপনার জন বলে তারা তোকে ভাববে না। মাঝখান থেকে শুধু খানিকটা পণ্ডশ্রমই হবে। অত দূর থেকে নয়, সত্যি করে প্রেম করতে হবে বিশাখা চৌধুরীর সঙ্গে তোর।

তার মানে?

মানে আবার কি! ওরকম প্রেমের অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি প্রেমে পড়তে হবে তোকে।

ওরে বাবা! ঐ বিশাখা চৌধুরীর সঙ্গে! ওটা তো একটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েমানুষ!

কিরীটী আমার কথায় মৃদু হাসে।

হাসছিস! বিশাখা চৌধুরীর পাল্লায় পড়লে বুঝতে পারতিস!

বিশাখার বয়স হয়ে গিয়েছে একটু বেশী, এই তো? আরও বছর পনের তার বয়স কম হলে, নিশ্চয়ই এমনি আপত্তিটা তোর করে অভিনয় করতিস না প্রেমের?

কখনও না।

নিশ্চয় তাই। আরে ভুলে যাস কেন, প্রেমের ব্যাপারটাই তো একটা হিস্টিরিয়া।

মানি না তোর কথা।

মানবি রে মানবি। আগে সত্যিকারের কারও প্রেমে পড়্, তখন বুঝবি।

থাক, হয়েছে। এখন একটা কাজের কথা বল্ তো। বৈকালী সঙ্ঘের যাদের সম্পর্কে তোকে আমি বলেছি, তাদের সম্পর্কে তোর মতামতটা কি?

সকলেই তো দেখা যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মুশকিল তো সেখানেই হয়েছে। তবু তোকে আমি স্পষ্টই বলছি ওদের মধ্যে তিনজন সম্পর্কে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

কোন্ তিনজন?

এক নম্বর হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দু নম্বর ওয়েটার মীরজুমলা ও তিন নম্বর মক্ষীরানী শ্রীমতী মিত্রা সেন।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, আর কারও ওপরে তাহলে তোর সন্দেহ নেই?

না।

কিন্তু আমি হলে যতটুকু তোর মুখে শুনলাম তা থেকে আরও একজনের সম্পর্কে বেশ একটু বেশী রকমই চিন্তিত হতাম, সজাগ থাকতাম!

কে? কার কথা বলছিস?

একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবি, কার কথা আমি বলতে চাই।

কিন্তু—

কিরীটী বাধা দিয়ে বললে, আমাকে বলে দিতে হবে না—চোখ মেলে রাখ্, নিজেই দেখতে পাবি।

বাইরে এমন সময় পদশব্দ পাওয়া গেল। সতর্ক পদশব্দ।

কে?

সমীরণ!

এস সমীরণ, ভেতরে এস।

কিরীটীর আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবয়েসী ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। কিন্তু ভৃত্যশ্রেণীর হলেও বেশভূষা ও চেহারায় একটা ধনীগৃহের ভৃত্যের ছাপ আছে। পরিষ্কার একটি ধুতি পরিধানে, গায়ে তদ্রূপ একটি ফতুয়া ও পায়ে একটা চপ্পল। মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো, দাড়িগোঁফ কামানো। কপালের উপরে ঠিক দক্ষিণ ভ্রূর উপরে একটা বড় আব আছে।

বোসো। আগন্তুককে কিরীটী তার সামনেই একটা সোফার উপরে বসবার জন্য নির্দেশ জানাল।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথমত ভৃত্যের নাম সমীরণ—ব্যাপারটা আমার মনে কেমন একটু খটকা লাগিয়েছিল, তারপর তাকে কিরীটীর সাদর আহ্বান আমাকে বিশেষ কৌতূহলী করে তোলে।

লোকটা সোফার উপরে বসে একটিবার মাত্র আড়চোখে আমার দিকে তাকাতেই দুজনের আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল এবং মুহূর্তের তার সেই চোখের দৃষ্টিতেই যেন একটা সন্দেহের বিদ্যুতের ইশারা পেলাম।

সুব্রতকে তুমি চেন্ না সমীরণ? দেখনি ওকে কোনদিন?

সুব্রতবাবু! নমস্কার! বলে সমীরণ এবারে পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবারে। বলে, নাম শুনেছি ওঁর তবে দেখা-সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য হয়নি।

কিরীটী এবারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সমীরণ সরকার ইউ. পি'র স্পেশাল ব্র্যাঞ্চে ছিল, মাসখানেক হল বাংলা দেশে বদলি হয়ে এসেছে।

আমি প্রতিনমস্কার জানালাম।

পরে জেনেছিলাম ভ্রূর উপরে ঐ আবটি দেহের পোশাক ও মাথার চুলের মতই অবিশ্যি ছদ্মবেশের উপকরণ।

বয়েসে ও আমাদের চাইতে ছোট বলে সমীরণের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, কিন্তু এভাবে দিনের বেলায় আমার এখানে আসাটা কিন্তু তোমার উচিত হয়নি সমীরণ।

কিরীটী পরিচয় দেবার পর আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিলাম সমীরণ সরকারের দিকে। নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছেন বটে ভদ্রলোক।

উপায় কি? সমীরণ প্রত্যুত্তরে তখন কিরীটীকে বলছিলেন, এই সময়টাই হচ্ছে বেস্ট সময়। ডাক বা খোঁজ পড়বে না। আর তিনি বাড়িতেও থাকেন না এ সময়টা।

না। তাহলেও অন্যায় হয়েছে। তুমি তাকে চেন না সমীরণ। অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি লোকটার।

সে অবিশ্যি আমিও যে লক্ষ্য করিনি তা নয়। অতি সাধারণ গতিবিধির মধ্যেও কোথায় যেন একটা নিঃশব্দ সজাগ ও সতর্ক আসা-যাওয়া আছে যা চট করে কারোরই নজরে পড়বে না।

যাক। এখন এ কদিনের অবজারভেশনে কি জানতে পারলে বল?

সমীরণ সরকার তখন বলতে শুরু করে।

আপনি ঠিকই সংবাদ পেয়েছিলেন মিঃ রায়। বাড়িতে নিজেদের বলতে ডাক্তার, তাঁর বিকলাঙ্গ ভাই ত্রিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গের স্ত্রী মৃদুলা—

নামগুলো শুনেই চমকে উঠলাম। ত্রিভঙ্গ মানে ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিকলাঙ্গ ভাই নয়তো ?

কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। বললে, ভুজঙ্গ ডাক্তারের একজন ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, ব্যাপারটা পূর্বাহ্ণেই জানতে পেরে ডাক্তারের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সুপারিশে সমীরণকে সেখানে ভৃত্যের চাকরিটি করিয়ে দিয়েছি। কিরীটী আবার সমীরণের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর কি বলছিলে বল, সমীরণ !

বলছিলাম ঐ মৃদুলা দেবীর কথাই। সমীরণ তার বক্তব্য আবার শুরু করে, ভদ্রমহিলার বয়স আমার কিন্তু মনে হয় তার স্বামী ত্রিভঙ্গের চাইতে এক-আধ বছর বেশী না হলেও সমবয়সীই হবে প্রায়। এবং ডাক্তারের গৃহের সর্বময় কর্তৃত্ব তারই হাতে। কিন্তু বয়স তার যাই হোক, যৌবন তার দেহে এখনও অটুটই আছে। দেখতে কালো এবং রোগাটে বটে তবে সে কালোর মধ্যে আছে একটা আশ্চর্য রকমের যৌবনদীপ্ত শ্রী। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য তার চোখ দুটি। বুদ্ধির একটা অদ্ভুত জ্যোতিও সে চোখের তারায়।

তারপর ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ত্রিভঙ্গ লোকটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। গোবেচারী টাইপের। দোতলার একটা ঘরে সর্বদা বই নিয়েই পড়ে আছে। বাড়ি থেকে তো দূরের কথা, সেই ঘর থেকেই বড় একটা বের হয় না। নিজের দাদার সঙ্গে তো নয়ই, স্ত্রীর সঙ্গেও বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

ত্রিভঙ্গর স্ত্রী মৃদুলা কি আলাদা ঘরে থাকে, না একই ঘরে ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

স্বামী/ স্ত্রী আলাদা আলাদা ঘরে থাকে। বাড়িটা তিনতলা হলেও বাড়ির মধ্যে ঘর সর্বসমেত আটটি। অবশ্য রান্নাঘর, স্টোর রুম বাদ দিয়ে। একতলা ও দোতলায় তিনখানি করে ছখানি ঘর, তিনতলায় দুখানি ঘর। তিনতলার দুখানা ঘর নিয়ে থাকেন ডাঃ চৌধুরী, ডাঃ চৌধুরী যখন থাকেন না সে দুটি ঘরে তালা দেওয়াই থাকে দেখেছি।

বাইরে থেকে আলাদা তালা দেওয়া থাকে নাকি ?

আলাদা কোন তালা নয়, দরজার সঙ্গেই ইয়েল-লকের সিস্টেম আছে, তাতেই চাবি দেওয়া থাকে। আর ডাঃ চৌধুরী বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন তখনও একমাত্র ডাঃ চৌধুরীর খাস ভৃত্য রাম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির তাঁর ঘরে প্রবেশের হুকুম নেই। কেউ যায়ও না।

শুনেছিলাম ত্রিভঙ্গের একটি নাকি ছেলে আছে, যে ছেলেটাকে ডাঃ চৌধুরী অত্যন্ত ভালবাসেন ?

হ্যাঁ, অগ্নিবাণ। তার ব্যাপারটা যেন ও বাড়িতে একটু স্বতন্ত্র।

কি রকম?

দিনের বেলা একটা-দেড়টার পর ডাঃ চৌধুরী যখন হাসপাতাল থেকে ফেরেন, ভাইপোটিকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে যান। অগ্নিবাণ দুপুরে তাঁর সঙ্গেই খায়। সারাটা দ্বিপ্রহর সে তার জ্যাঠার কাছেই থাকে। বিকেলে চেম্বারে যাওয়ার আগে যখন ডাক্তার তিনতলা থেকে নেমে আসেন, অগ্নিবাণকে সঙ্গে করে দোতলায় দিয়ে যান। আবার রাত্রে সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে যখন বাড়ি ফিরে আসেন, অগ্নিবাণকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে যান। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রাত্রে যা খাবার খায়, তারপর রাম তাকে তার মার কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। অগ্নিবাণকে ডাঃ চৌধুরী শুধু ভালবাসেন যে তা নয়, তার উপরে ডাক্তারের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে বলেই মনে হয় আমার।

মৃদুলা দেবীর সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্ক কি রকম?

বিশেষ বোঝবার উপায় নেই। দুজনেই অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ও স্বল্পবাক।

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না?

হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে দুজনের কথাবার্তা হয় দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, ডাঃ চৌধুরী, তাঁর ভাই ত্রিভঙ্গ, তাঁর স্ত্রী মৃদুলা দেবী যেন যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। একই বাড়িতে সকলে থাকেন বটে তবে কারও সঙ্গে কারও হৃদয়ের বড় একটা যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই যেন যে যার এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করছে। কখনও কোন চেঁচামেচি বা গোলমাল শুনবেন না। অদ্ভুত শান্ত যেন বাড়িটা। ও বাড়িতে অগ্নিবাণ যদি না থাকত তো বাড়িটাতে মানুষ-জন আছে বলেই মনে হত না। কেমন যেন একটা চাপা আশঙ্কার থমথমানি বাড়িটার সর্বত্র।

বাড়িটা ঠিক রাস্তার ওপরে, নয়?

না। বড় বড় দুটো চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির মাঝখান দিয়ে সরু একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলে তবে বাড়িটা। প্যাসেজটা অবশ্য সরু হলেও তার মধ্যে দিয়ে বড় গাড়ি অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারে। প্রায় দশ-বার কাঠা জায়গা নিয়ে বাড়িটা। কাঠা তিনেক জায়গার ওপরে বাড়িটা। পিছনের দিকে একটা বাগান আছে। বাগানের চারপাশে প্রায় মানুষপ্রমাণ উঁচু প্রাচীর বাড়ির সীমানাটাকে ঘিরে রেখেছে।

পিছনে বাগানের ওপাশে কোন রাস্তা আছে লক্ষ্য করেছ?

হ্যাঁ, একটা ব্লাইণ্ড লেন আছে। তার ওপাশে একটা বস্তি।

বাগান থেকে সেই ব্লাইণ্ড লেনে যাতায়াত করবার কোন দরজা আছে?

আছে। তবে সেটা সর্বদা তালা লাগানোই থাকে দেখেছি।

বাড়ির ভেতর থেকে পিছনের বাগানে যাবার দরজা কোনখানে ?

দুটো দরজা আছে। একটা অন্দরে, অন্যটা বাইরে দিয়ে। সেই পথ দিয়েই মেথর যাতায়াত করে। বাড়ির পিছন দিকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে—মেথরদের দোতলার ও তিনতলার বাথরুমে যাবার জন্য।

ডাঃ চৌধুরী শুনেছি রাত্রি নটার পর বাড়ি ফিরে আর কোথায়ও বের হন না!

তাই।

কখনও বের হন না ?

না, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি গত পনর দিন খুব মাইনিউটলি। সত্যিই তিনি কোথায়ও আর বের হন না।

গাড়িও বের হয় না ?

না, সোফার হরিচরণ রাত্রে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই গ্যারেজে গাড়ি তুলে রেখে দেয় আর গাড়ি বের করে আবার পরের দিন সকালে। গত পনর দিন ঐ নিয়মের কোন ব্যতিক্রমই দেখিনি।

ডাক্তারকে নিজে কখনও গাড়ি চালাতে দেখেছ ?

না। হরিচরণের মুখেই একদিন শুনেছি ডাক্তার গাড়ি চালাতে জানেন না।

ঠিক আছে। এবারে তুমি যাও সমীরণ। আর ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে হলে একটা কার্ড ড্রপ কোরো আমার নামে; খুব যদি জরুরী হয় তো ভুজঙ্গ ডাক্তারের বাড়ির কাছে বড় রাস্তার ওপরে যে ড্রাগ হাউস নামে ডিসপেনসারিটা আছে, তার মালিক ভবতারণবাবুকে আমি বলে রেখে দেব, সেখানে ফোন আছে, সেখান থেকেই আমাকে ফোন করতে পারবে। আর একটা কথা, ডাক্তারের বাড়িতে যে ফোন আছে সেটা কোথায়, কোন্ ঘরে ?

তিনতলায়—বারান্দার দেওয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের উপরে বসানো। ঠিক ডাক্তার চৌধুরীর শোবার ঘরের দরজার মুখে।

॥ নয় ॥

সমীরণ সরকার বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

স্পষ্ট বুঝলাম ঘরে বসে থাকলেও কিরীটী চারদিকে সতর্ক নজর রেখেছে। এবং ব্যারিস্টার রাধেশ রায়ের একমাত্র পুত্র তরুণ ব্যারিস্টার অশোক রায়ের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিরীটীর চিন্তাধারা যে যে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল সেই সব দিকগুলো এখনও তার মন জুড়ে রয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস যা আমাকে বিস্মিত করেছিল, অশোক রায়ের ব্যাপারে কিরীটীর এবারকার নিষ্ক্রিয়তা। কখনও কোন রহস্যের সম্মুখীন হলে ইতিপূর্বে কিরীটীকে কখনও এমনি দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে বড় একটা বসে থাকতে দেখিনি।

তাই প্রশ্ন না করে পারলাম না, সোজাসুজি কথাটা পাড়লাম।

অশোক রায়ের ব্যাপারটা আর কিছু ভেবেছিস কিরীটী?

কিরীটী বোধ হয় নিজের চিন্তার মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল। হঠাৎ আমার প্রশ্নে চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললে, কি বলছিলি সুব্রত?

বলছিলাম অশোক রায়ের কথা—

না। সেদিন তোকে তার সম্পর্কে যতটুকু বলেছিলাম তার বেশী আর বিশেষ কিছুই এখনও জানতে পারিনি।

তোর কি মনে হয় অশোক রায়ের ব্যাপারে আমাদের ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীর সত্যি কোন যোগাযোগ আছে?

তোর কি মনে হয়? কিরীটী আমাকে পালটা প্রশ্ন করল।

আমার তো মনে হয়, অশোক রায়ের যদি কোন কিছু মিস্ট্রি থাকে তা ঐ বৈকালী সঙ্ঘের মধ্যেই, মিত্রা সেনের সঙ্গেই। ভুজঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে বৈকালী সঙ্ঘের তো কোন যোগাযোগই আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না।

এবং তাতে করে তো সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ হয় না যে, ভুজঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অশোক রায়ের কোন গোপন যোগাযোগ নেই, ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক বাদেও। বরং আমার তো মনে হয় বৈকালী সঙ্ঘের মেম্বারদের অনেকেরই যখন গভীর রাত্রে গোপন অভিসার আছে ডাক্তারের চেম্বারে, তখন দুয়ে দুয়ে চারের মত সব কিছুর ভেতরে একটা গোপন যোগসূত্রও আছে। কিরীটী বলে।

তাহলে তুই বলতে চাস ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীরও অলক্ষ্যে যোগাযোগ আছে বৈকালী সঙ্ঘের সঙ্গে ?

বলতে চাইলেই বা সেটা বলতে পারছি কোথায় ! ডাক্তার তো শুনলাম ভুলেও কোনদিন রাত নটার পরে বাড়ি থেকে বের হন না। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে কখনও বৈকালী সঙ্ঘের ধারে-কাছেও যেতে দেখেনি। তাছাড়া সম্মানিত, খ্যাতিসম্পন্ন একজন নামকরা চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সমাজে সর্বত্র পরিচয়। এবং শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত বৈকালী সঙ্ঘ সম্পর্কেও কোন খারাপ রিপোর্ট পুলিস সংগ্রহ করতে পারেনি। আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারছিস বোধ হয় !

পারছি। মৃদু কণ্ঠে বললাম।

আর একটা কথা। এ মাসের তিন তারিখে দূর থেকে অশোক রায়ের গাড়ি ফলো করে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

তারপর ?

যথারীতি এবারেও সে আড়াই হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে তার সঙ্গিনী এক নারীর হাতে—যিনি গাড়িতেই উপবিষ্টা ছিলেন—তুলে দিতে দেখেছি।

সঙ্গিনী সেই নারীকে দেখলি ?

দেখলাম, কিন্তু দুঃখিত, তিনি তোমার মিত্রা সেন নন।

তবে ?

মিত্রা সেন নন এই পর্যন্ত বলতে পারি। তবে বয়সে দূর থেকে তাঁকে তরুণী বলেই মনে হল। এবং দেখতেও সুন্দর।

তারপরেও তাদের নিশ্চয়ই ফলো করেছিলি ?

করেছিলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেক সমস্ত ডালহৌসি স্কোয়ার, ধর্মতলা ও ফ্রি স্কুল স্ট্রীটটা চক্কর দেবার পর থিয়েটার রোড ধরে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় দেখলাম শ্রীযুক্ত অশোক রায়ের বদলে গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁর সেই সঙ্গিনীটি এবং অশোক রায় গাড়িতে নেই কোথায়ও।

বলিস কি !

তাই। তবে বার চার-পাঁচ ট্রাফিকের জন্য গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল চার-পাঁচ জায়গায়। এবং এর পরে বুঝেছিলাম সেই সময়েই এক ফাঁকে অশোক রায় গাড়ি থেকে নেমে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে। তবে এর মধ্যেও একটা কথা আছে যা ভাবছি—

কি ?

প্রতিবারই ব্যাঙ্ক থেকে ফেরবার পথে সেদিনকার মত ঐরকম অনির্দিষ্টভাবে গাড়িটা

রাস্তায় রাস্তায় চক্কর দিয়ে এক সময় অশোক রায়কে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়, অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য, না সেদিন আমি তাদের ফলো করছি জেনেই ঐ পন্থা ধরেছিল ?

নিশ্চয় না। তুই যে সেদিন তাদের ফলো করবি তা তারা জানবেই বা কি করে ?

তোর কথাই যদি মেনে নিই তো ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ সেদিন না হলেও কোন একদিন কেউ তাদের ফলো করবে ভেবেই যদি তারা প্রতিবারই ঐ ধরনের সাবধানতা নিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে প্রথমতঃ ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার নয়। দ্বিতীয়ত এর পশ্চাতে যে ব্রেন আছে তা রীতিমত তীক্ষ্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। আচ্ছা গাড়িটা কার ?

অশোক রায়েরই নিজস্ব গাড়ি, মরিস টেন লেটেস্ট মডেলের। কিন্তু তারপর আরও আছে বন্ধু! ঘটনাটির ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ নয়।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে আবার।

কিরীটী বলতে লাগল, ফলো করতে করতে গাড়িটা এসে একসময় দাঁড়াল হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের বাড়ির সামনে। আরোহিণীগাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। আমি অপর ফুটপাথে আমার ভাড়াটে ট্যাক্সিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম দরজার দিকে তাকিয়ে তীর্থের কাকের মত।

তারপর ?

মিনিট দশেক বাদে এবারে যিনি দোকান থেকে বের হয়ে সোজা গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন, তিনি কিন্তু সেই মহিলাটি নন, যিনি এতক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

তবে আবার কে ?

কে বলে মনে হয় ? নামটা শুনে জানি চমকে উঠবে, তবু শোন, স্বয়ং অশোক রায়।

বলিস কি!

হ্যাঁ। এবং সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা এবারে ব্যারিস্টার সাহেব হাইকোর্টের দিকেই চললেন।

আর সেই তরুণীটি ?

মিথ্যা সে মরীচিকার পিছনে আর ছুটে লাভ নেই বলে আমিও সুবোধ বালকের মত গৃহে পুনরাগমন করলাম। তাহলেই বুঝতে পারছ লেনদেনের ব্যাপারটা একটু জটিল।

তবে মিত্রা সেনের সঙ্গে অশোক রায়ের ব্যাপারটা কি? প্রশ্ন করলাম এবারে

আমিই : সেটাও কি তবে নিছক প্রেম নয় ? অন্য কিছু ?

অতদূর অবিশ্যি এখনও পৌঁছতে পারিনি। তবে আজ রাত্রে একটা ব্যাপারে অনেস্ট অ্যাটেম্পট্ নেব ভেবেছি।

কিসে ?

ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার।

কোথাও যাবে নাকি ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

পার্ক সার্কাসে ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বার-কাম্-নার্সিং হোমে।

রাত্রে মানে কখন ? কটার সময় ?

রাত ঠিক বারোটায়।

কিন্তু তোকে অত রাত্রে সেখানে ঢুকতে দেবে কেন ?

যাতে দেয় সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। রাত্রে নটার পর আসিস। এলেই যথাসময়ে সব জানতে পারবি।

কিরীটীর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম বটে কিন্তু কিরীটীর মুখে শোনা অশোক রায়ের ব্যাপারটাই মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। কে সে তরুণী, যাকে প্রতি মাসে এমনি করে গত আট-ন মাস যাবৎ ঠিক নিয়মিত মাসের প্রথমেই আড়াই হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সে! আর কেনই বা মাসে মাসে ঐ টাকা দিচ্ছে ? মিত্রা সেনের সঙ্গেই বা তাহলে অশোক রায়ের সম্পর্কটা কি! তা ছাড়া কিরীটী ইঙ্গিতে যে কথা বললে, বৈকালী সঙ্ঘের সঙ্গে ভুজঙ্গ ডাক্তারের চেম্বারের একটা অলক্ষ্য যোগাযোগ আছে, সেটাই বা আসলে কি ধরনের যোগাযোগ! ভুজঙ্গ ডাক্তারকে তো গত পনের-কুড়ি দিনে কখনও দেখি নি বৈকালী সংঘে যেতে। অবশ্য লোকটার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও যেন কেমন একটা অস্বাভাবিকতা আছে। ঠিক একেবারে নরম্যাল নয়।

কিরীটী বলেছিল রাত্রি নটার পর তার ওখানে যেতে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব যেন আর সইছিল না। সাড়ে সাতটার পরই বের হয়ে পড়লাম কিরীটীর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

কিরীটী তার বাইরের ঘরেই বসে একটা কাগজের গায়ে পেনসিলের সাহায্যে কিসের যেন নক্সা আঁকছিল। আমার পদশব্দে মুখ না তুলেই বললে, আয়, সুব্রত! এত

তাড়াতাড়ি এলি, খেয়ে আসিসনি নিশ্চয় !

না।

ঠিক আছে, একসঙ্গে খাওয়া যাবে'খন।

কিরীটীর পাশে বসে তার সামনে অঙ্কিত নক্‌শাটার দিকে তাকালাম, কিসের নক্‌শা রে ওটা ?

ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বার ও নার্সিং হোম যে ফ্ল্যাট্‌ বাড়িটার মধ্যে আছে সেই বাড়ির নক্‌শা। বাড়িটার মালিক এককালে ছিলেন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায়ী আলি ব্রাদাসের ছোট ভাই মহম্মদ আলি।

একদিন ছিল মানে ? এখন আর নেই নাকি ?

না। নক্‌শাটার উপরে পেনসিলের আঁচড় কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল কিরীটী।

তবে বর্তমান মালিক কে ?

ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কথাটা শুনে যেন আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিরীটী বলে কি ! বর্তমানে বাড়িটার মূল্য ন্যূনপক্ষে হলেও দেড় লক্ষ টাকার কম নয় !

বললাম, সত্যি বলছিস ?

॥ দশ ॥

আমার কণ্ঠের বিস্ময়ের সুরটা কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়াতে পারেনি পরমুহূর্তেই বুঝলাম, কারণ সে হাতের নক্‌শাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও এবং আমার দিকে না তাকিয়েই পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠে বললে, বিস্ময়ের এতে কি আছে। বর্ণচোরা আমের ধর্মই যে ওই ! বাইরে থেকে অত সহজে বোঝবার উপায় নেই। মাস ছয়েক হল আলি ম্যানশনটি ডাঃ চৌধুরীর নামে রেজেষ্ট্রি অফিসে রেজেষ্ট্রি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বাড়িটার দাম দেড় লক্ষ টাকার তো কম হবে বলে আমার মনে হয় না !

তাই। তবে ক্রেতা মাত্র আশি হাজার টাকায় ক্রয় করেছেন। কিন্তু এর চাইতেও একটা বেশি ইনটারেসটিং সংবাদ তোকে আমি দিতে পারি যা তোর জানা নেই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। ও কিন্তু তখনও হাতের আঁকা নক্‌শাটার দিকেই তাকিয়ে আছে। এবং এবারেও আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, সংবাদটা অবিশ্যি শুভ। প্রজাপতি-ঘটিত সংবাদ।

প্রজাপতি-ঘটিত সংবাদ !

হ্যাঁ। শ্রীমান অশোক রায় শীঘ্রই বিবাহ করছেন।

কাকে ?

শ্রীমতী মিত্রা সেনকে।

সত্যি বলছিস ?

হ্যাঁ। অশোক রায় তার বাপকে গতকাল রাত্রে জানিয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে রাধেশ রায় সে সংবাদটি ফোনে আমাকে জানিয়েছেন।

কিন্তু অশোক রায়ের চাইতে যে মিত্রা সেন বয়সে বড় !

তাতে কি ? এ হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেমের ব্যাপার ! পঞ্চশরের কৌতুক !

তা রাধেশ রায় আর কি বললেন ? ভদ্রলোক নিশ্চয় খুশী হতে পারেননি সংবাদটা শুনে ?

তা অবশ্য হননি। কিন্তু বাপ হয়ে উপযুক্ত পুত্রের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাঁর করারই বা কি আছে ! বড়জোর তিনি বলতে পারতেন, ব্যাপারটা তিনি খুশীমনে নিতে পারছেন না। জবাবে হয়তো ছেলে বলে বসত, বিবাহটা যখন সে-ই করবে তখন পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তার পছন্দ বা মতামতটাই সর্বাগ্রগণ্য।

তা বটে, তবে বিয়েটা হচ্ছে কবে ? তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ, আগামী মাসের ছ তারিখে মঙ্গলবার অর্থাৎ হাতে আর দিন দশ মাত্র সময় আছে।

আজ তো আর যাওয়া হল না। আগামী কাল বৈকালী সংঘে গেলেই হয়ত সেখানে সংবাদটা পেতাম।

সম্ভব না। কারণ এতদিনেও যখন কেউ সেখানকার ব্যাপারটা জানতে পারেনি, বিবাহের পূর্বে কেউ জানতে পারবে বলে মনে হয় না। বিবাহের ব্যাপারটা তারা দুজনের একজনও জানাজানি করতে চায় না বলেই আমার ধারণা।

যাই বল, মুখরোচক এই সংবাদটা জানাজানি হয়ে গেলে ওদের সোসাইটিতে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। এতকাল ধরে বহু হতভাগ্য পতঙ্গকে পুড়িয়ে মিত্রা সেন রূপিণী বহ্নিশিখা শেষ পর্যন্ত যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে মালাবদল করছেন, একটা সেনসেশনের ব্যাপারই বটে !

জংলি এসে ঘরে ঢুকল। বললে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, খানা টেবিলে এখন দেওয়া হবে কিনা ?

হ্যাঁ, দিতে বল্।

খাবার-টেবিল থেকে আমরা বাইরের ঘরে এসে বসলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দশটা বাজে প্রায়।

কিরীটী সোফাটার উপরে বেশ আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বসে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল। বুঝলাম আমাদের নৈশ অভিযানের এখনও দেরি আছে। মাথার মধ্যে তখনও আমার কিরীটীর কাছ থেকে শোনা সংবাদ দুটিই ঘোরাফেরা করছিল। বিশেষ করে অশোক রায় ও মিত্রা সেনের বিবাহের ব্যাপারটা। দীর্ঘদিন ধরে একান্ত ভাবে বোহিমিয়ান জীবন কাটিয়ে আজ হঠাৎ মিত্রা সেন ঘর বাঁধবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল কেন! এতদিনে কি তবে সে বুঝতে পেরেছে জীবনে ঘর বাঁধবার প্রয়োজনীয়তা! কিন্তু তাও তো বিশ্বাস করতে মন চায় না। এখনও তার হাবভাব, চালচলন ও ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা রয়েছে এবং যে উচ্ছৃঙ্খলতা দীর্ঘদিন ধরে রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছে সেটাকে সে অস্বীকার করতে কি এত সহজেই পারবে এবং তার মত একজন তীক্ষ্ণধী মেয়ের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না যে, তার প্রতি অশোক রায়ের আকর্ষণটাকে আর যাই বলা যাক প্রেম নয়। বরং বলা চলে ক্ষণিকের একটা মোহ। তাই যদি হয়, সেই মোহটা যখন কেটে যাবে তখনকার পরিস্থিতিটা কি ও ভাবছে না একবারের জন্যও? না ওসবের কোনও বালাই-ই নেই ওদের এই বিবাহ ব্যাপারে—কোনও একটা বিশেষ কারণেই এই যোগাযোগটা ঘটছে!

বুঝতে পারিনি কিরীটীর চিন্তাধারাটাও আমার মত একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তার প্রশ্নে যেন তাই হঠাৎ পরক্ষণেই চমকে উঠলাম।

অশোক রায় ও মিত্রা সেনের বিয়ের ব্যাপারটা তোর কি মনে হয় সুব্রত? কিরীটী সহসা প্রশ্ন করল।

মানে? কি ঠিক তুই বলতে চাইছিস?

বলছি, বিয়েটা ওদের সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত হবে বলে তোর মনে হয়?

সে আবার কি! এই তো বললি অশোক রায় তার বাপকে বিয়ের তারিখটা পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে!

তা অবশ্য দিয়েছে। কিন্তু মক্ষীরাণীর বিয়ে হয়ে গেলে বৈকালী সংঘের কি হবে?

কি আবার হবে, সিংহাসন শূন্য নাহি রবে। তাছাড়া বিয়ে করলেই যে মিত্রা সেন সংঘ ছেড়ে দেবে তারও তো কোনও মানে নেই!

তা অবশ্য নেই। তবে চিরযৌবনা কুমারী মক্ষীরাণীকে সকলে যে চোখে দেখত অশোক রায়ের স্ত্রী হলে কি আর তারাই সে চোখে তাকে দেখবে, না, অশোক রায়ই

সেটা তখন পছন্দ করবে ?

অশোক রায় তো জেনেশুনেই বিয়ে করছে। আর এতদিনের অভ্যাস মিত্রা সেনের, ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়তে সে পারবে নাকি! যেমন গর্ধবচন্দ্র তেমন তার ফল ভোগ করাই উচিত। সারা দেশে যেন আর মিত্রা সেন ছাড়া পাত্রী ছিল না!

হঠাৎ ঐ সময় আমাদের কথার মাঝখানে ঘরের ফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল। কিরীটী সোফা থেকে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো! কে? হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি, বলুন। ব্যবস্থামত নার্সিং হোম থেকে কল এসেছে। যাচ্ছি! হ্যাঁ—এক্ষুনি যাচ্ছি। মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই আপনার ওখানে পৌঁছে যাব।···

কিরীটী রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ডাক এসে গিয়েছে। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি। এক্ষুনি আমরা বেরুব, তুই একটু বস্।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বসে বসে একটা পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, পদশব্দে মুখ তুলে তাকাতেই যেন হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় এক পাঠান আমার সামনে দাঁড়িয়ে। পরিধানে সালোয়ার পাঞ্জাবি, মাথায় পাঠানী পাগড়ি। মুখে চাপদাড়ি, পাকানো পুরুষ্ট গোঁফ।

গলাটা একটু ভারি ভারি করে কিরীটী কথা বলল, আদাবস্ সাব্···

কি ব্যাপার! হঠাৎ এ বেশ কেন? মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম।

বান্নু বেগমের ভাই পীর খাঁ। এ বেশে না গেলে চলবে কেন?

তা যেন হল, কিন্তু পাঠান পীর খাঁর সঙ্গে আমাকে বাঙালী দেখলে লোকের সন্দেহ হবে না?

হওয়াই স্বাভাবিক। আর এক প্রস্থ সাজসজ্জা তোর জন্যেই ঘরে রেডি করে এসেছি। বি কুইক্। ভোল পালটে আয়।

কিরীটীর ল্যাবরেটারি ঘরের সংলগ্ন ছোট একটি অ্যান্টিরুমের মত আছে, তার মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণের সব রকম ব্যবস্থাই থাকে আমি জানতাম। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি উঠে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটা টেবিলের উপরে পাঠান-বেশ নেবার সবই প্রস্তুত ছিল। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলাম কাজ।

মিনিট আষ্টেকের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে যখন কিরীটীর সামনে এসে দাঁড়ালাম, ক্ষণেকের জন্যে আমার আপাদমস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে সে বললে, ঠিক আছে।

তোর নাম হবে, আয়ুব খাঁ। পীর খাঁর বোন বান্নু বেগমের স্বামী।...

সর্বনাশ! বলিস কি! শেষ পর্যন্ত অপরিচিত এক ভদ্রমহিলার স্বামীর প্রক্সি দিতে হবে নাকি! না ভাই, স্বামী সেজে কাজ নেই, পাঠানী খানদানী ব্যাপার, ওরা কথায় কথায় ছোরা চালায়।

ভয় নেই রে, ভয় নেই। বান্নু বেগম ও পীর খাঁ, ভাই ও বোনের দুজনের সম্মতি-ক্রমেই আজকের এ নৈশ অভিসার আমাদের arranged হয়েছে। তাছাড়া বান্নু বেগমের স্বামী আয়ুব খাঁ এখন বহু পথ দূরে পেশোয়ারে। চল চল—আর দেরি নয়, বান্নু বেগমের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সে তার স্বামী ও ভাইকে দেখবার জন্য তার আত্মীয়ের বাড়িতে জরুরী টেলিফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে এবং সৌভাগ্যক্রমে দুজনেই আজ দুপুরে কলকাতায় এসে গিয়েছে। একজন লাহোর থেকে, অন্যজন পেশোয়ার থেকে। আর তার আত্মীয় নার্সিং হোমে টেলিফোনে সেই সংবাদ দিয়ে বলেছেন, পীর খাঁ ও আয়ুব খাঁ দুজনেই নার্সিং হোমে যাচ্ছেন এখুনি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয় আমার।

রাত্রে ডাঃ চৌধুরীর নার্সিং হোমে হানা দেবার জন্য কিরীটী চমৎকার একটি প্ল্যান দাঁড় করিয়েছে।

গাড়িতে উঠে বসে বললাম, এখন কোথায়?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কিরীটী বললে, সোজা রসা রোডে আল্লাবক্সের গৃহে। তারপর তাঁরই গাড়িতে আমরা যাব ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর নার্সিং হোমে।

রাত ঠিক এগারটা বেজে দশ মিনিটে আল্লাবক্সের গাড়িতে চেপে আমরা তিনজন পার্ক সার্কাসে ডাঃ চৌধুরীর নার্সিং হোমের সামনে এসে নামলাম।

আল্লাবক্সই এগিয়ে গিয়ে দরজার গায়ে যে ইলেকট্রিক বেল তার বোতামটা টিপল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে বিরাটকায় পাঞ্জাবী গুলজার সিং।

আল্লাবক্স ও গুলজার সিংয়ের মধ্যে কি কথাবার্তা হল উর্দুতে। আমাদের সকলকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় গুলজার সিং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গুলজার সিংকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে আমরা তিনজনে দোতলায় উঠলাম। ডাক্তারের চেম্বারের দরজা অতিক্রম করে আমরা প্যাসেজটা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সুসজ্জিত ঘরটি ওয়েটিং রুম বলেই মনে হল।

গুলজার সিং আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রস্থান করল। আমরা তিনজন তিনটি চেয়ারে বসলাম। এবং বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে প্রবেশ করল একজন সুট-পরিহিত

তরুণ। আগন্তুক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাবক্স উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন, বানু বেগম কেমন আছে ডাঃ মিত্র ?

সেই রকমই। খুব restless। ডাঃ মিত্র বললেন।

অতঃপর আল্লাবক্স আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে ডাক্তারের সঙ্গে।

ডাঃ মিত্র আমাদের নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসুন আপনারা। চার নম্বর কেবিনে পেসেণ্ট আছে।

ঘরের মধ্যস্থিত দুটি দ্বারপথের একটি দ্বার দিয়ে প্রথমে এগিয়ে গেলেন ডাঃ মিত্র, তাঁর পশ্চাতে আমরা তিনজন অগ্রসর হলাম তাঁকে অনুসরণ করে।

সরু একটা প্যাসেজ, ডান দিকে পর পর অনুরূপ চারটি দরজা এবং প্রত্যেক দরজার মাথায় পর পর ইংরাজীতে এক দুই তির চার ক্রমিক নম্বর লেখা।

পরে বুঝেছিলাম একটা হলঘরকেই সম্পূর্ণ সিলিং পর্যন্ত পার্টিশন তুলে পর পর চারটি কিউবসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবং সেই কিউবসগুলোই এক-একটি কেবিন। প্রত্যেকটি কেবিনের সঙ্গেই একটি করে ছোট্ট অ্যাটাচড্ বাথরুম। চার নম্বর অর্থাৎ সর্বশেষ কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ডাঃ মিত্র বললেন, যান আপনারা ভিতরে কিন্তু রোগিণীর কনডিশন ভাল নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হয়ে আসার চেষ্টা করবেন। জানেন তো—আল্লাবক্সের দিকে তাকিয়ে এবারে ডাঃ মিত্র বললেন, রাত্রে আমরা নার্সিং-হোমে কখনও কোনও ভিজিটার্সকে আসতে দিই না। ডক্টর চৌধুরীর কড়া আদেশ আছে। সম্পূর্ণ আমার নিজের রিস্কে আসতে দিয়েছি আপনাদের, কেবলমাত্র রোগিণীর কথা ভেবেই।

জবাব দিল আল্লাবক্স, আপনার এ উপকারের কথা আমরাও ভুলব না ডাঃ মিত্র।

মৃদু হেসে ডাঃ মিত্র যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই আবার প্রস্থান করলেন। আমরা তিনজনে চার নম্বর কেবিনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

কিরীটীর চোখের ইঙ্গিতে আল্লাবক্স কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেডে শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এক রোগিণীকে আমরা ককাতে শুনলাম রোগযন্ত্রণায়।

আল্লাবক্স বেডের কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, বানু—

ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রোগিনী আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। রোগশীর্ণ মুখখানি, তবু তাতে যেন লেগে রয়েছে কষ্টসাধ্য একটুখানি হাসি।

ভাইজান—

কোনখান থেকে শুনেছিলে তুমি পরশু রাত্রে মানুষের গলার আওয়াজ?

বাথরুমের মধ্যে যাও। ঢুকতে ডান দিককার দেওয়ালের গায়ে দেখবে একটা কাঁচের চৌকো বাক্সের মধ্যে আলোটা বসানো আছে। সেই কাঁচের বাক্সটার সামনে দাঁড়াতেই সে রাত্রে মানুষের গলা শুনেছিলাম।

অতঃপর আর সময়ক্ষেপ না করে প্রথমে কিরীটী ও সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাতে আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

বাথরুমের আলোর সুইচটা ঘরে ঢুকবার মুখেই কিরীটী অন্ করে দিয়েছিল। বাথরুমটা ছোট্ট। একটা স্নানের টব একপাশে ও দেওয়ালে বসানো একটা সিঙ্ক ও কমোড।

ঘরে ঢুকতেই আমাদের নজরে পড়ল, ডান দিককার দেওয়ালের গায়ে গাঁথা চৌকো একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে একটা বাল্ব জ্বলছে।

ঘষা কাঁচে তৈরি আলোর বাক্সটি। হাত দিয়ে একবার পরখ করে কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল, তারপর পকেট থেকে ছুরি বের করল। ছুরির ইস্পাতের তৈরি শক্ত ফলাটা বাক্সটার এক জায়গায় বসিয়ে সামান্য একটু চাড় দিতেই ডালাটা খুলে গেল, হাত ঢুকিয়ে কিরীটী বাল্বটা খুলে নিতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। অত্যন্ত স্পষ্ট।

হ্যাঁ, স্পষ্ট কথাটাই তোমাকে আমি বলতে এসেছি। আজ এবারে আমি মুক্তি চাই।

জবাব শোনা গেল গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠে, তোমাকে আমি বেঁধে রাখিনি, ইচ্ছে করলেই তো তুমি যখন খুশি চলে যেতে পার। কিন্তু আমার কথা যদি শোন তো বলি এভাবে ছেলেমানুষি করে লাভটাই বা কি?

ছেলেমানুষি!

তা ছাড়া আর একে কি বলব!

তাই বটে! অদৃশ্য নাগপাশে আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে—

সেও তোমার ভুল ধারণা। বাঁধনই যদি মনে কর তো সেটা তোমার নিজেরই সৃষ্টি।

আমার সৃষ্টি?

তাই নয় তো কি?

তা তো বলবেই। আজ ওর চাইতে বেশি প্রাপ্য আর আমার কি থাকতে পারে!

শোন, আবোল-তাবোল কল্পনার দ্বারা নিজেকে মিথ্যা পীড়িত করো না। বাড়ি যাও। কয়েক দিন তোমার ভাল করে বিশ্রাম ও সুনিদ্রার দরকার। এই নাও। এই শিশি থেকে একটা ক্যাপসুল খেয়ে শুয়ো, দেখবে খুব সাউণ্ড স্লিপ হবে।

ধন্যবাদ। ঘুমের ওষুধের দরকার যদি আমার হয় তো তোমার কাছে হাত পাততে হবে না।

তারপরই সব স্তব্ধ।

বাথরুমের আলোটা আবার জ্বলে উঠল।

দেখলাম ইতিমধ্যে কখন একসময় কিরীটী বাল্বটা হোলডারে লাগিয়ে দিয়ে কাঁচের পাল্লাটা আটকে দিচ্ছে।

আমরা দুজনে বাথরুম থেকে আবার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

আল্লাবক্স ও বানুবেগম নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের মধ্যে যেন কি কথাবার্তা বলছিল, আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আমাদের মুখের দিকে তাকাল দুজনেই।

কিরীটী আল্লাবক্সকে চোখের ইঙ্গিতে কি যেন নির্দেশ দিল দেখলাম। আল্লাবক্স এগিয়ে গিয়ে একটা ইলেকট্রিক বোতাম টিপে দিল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল, ঘরে এসে প্রবেশ করলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত ডাঃ মিত্র।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেবিন থেকে বের হয়ে এলাম।

ডাক্তার মিত্র আমাদের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে মাঝামাঝি নেমেছি হঠাৎ নিচে থেকে জুতোর শব্দ কানে এল।

তারপরই চোখে পড়ল স্যুট-পরিহিত এক পুরুষ-মূর্তি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। আমি হঠাৎ গায়ে কিরীটীর নিঃশব্দ অঙ্গুলি-সংকেত স্পর্শ পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালাম সিঁড়ির ধাপের উপরেই। আগন্তুক ধীরে ধীরে উঠে নিঃশব্দে আমাদের পাশ কাটিয়ে উপরে চলে গেল।

আগন্তুক কিন্তু আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। বরং পাশ দিয়ে উঠে যাবার সময় যেন মনে হল, পাছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চোখাচোখি না হয়ে যায়, সেজন্য বিশেষ একটু সতর্কতা অবলম্বন করেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে নিলেও আগন্তুককে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। বিখ্যাত কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত পাল, বৈকালী সংঘের অন্যতম মেম্বার।

বাকি সিঁড়ি কটা অতিক্রম করে নিচে নেমে আসতেই প্রহরারত গুলজার সিংয়ের সঙ্গে দেখা হল।

গুলজার সিং নিঃশব্দে আমাদের মুখের দিকে তাকাল এবং নিঃশব্দ সে দৃষ্টির মধ্যে আর কিছু না থাকলেও খানিকটা সন্দেহ যে উঁকি দিচ্ছিল সেটা বুঝতে কিন্তু কষ্ট হল না। কিন্তু কোনরূপ বাক্যব্যয় না করে সে যেমন দরজা খুলে দিল, আমরাও তেমনি

বিনা বাক্যব্যয়ে নার্সিং হোম থেকে বের হয়ে এলাম।

আমাদের পশ্চাতে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

॥ এগার ॥

হীরা সিং কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমত গাড়িটা খানিকটা দূরেই পার্ক করে রেখেছিল। আমরা গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, শ্রীমন্ত পালের চকচকে ফোর্ড কনসাল গাড়িটা নার্সিং হোমের সামনেই পার্ক করা আছে। অদূরে রাস্তার লাইটপোস্টের আলোয় দেখলাম, গাড়ির মধ্যে কোন ড্রাইভার নেই। শূন্য গাড়িটা পার্ক করা আছে মাত্র। গাড়ি ও গাড়ির নাম্বার দুটোই আমার যথেষ্ট পরিচিত। হীরা সিং সজাগই ছিল।

আমরা এসে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে ঘাড় ফিরিয়ে হীরা সিং প্রশ্ন করল, কিধার যায়গা সাব ?

কোঠি চল। কিরীটী বললে।

প্রথম থেকেই অর্থাৎ সেই বাথরুম থেকে বের হয়ে আসা পর্যন্ত কিরীটী যেন হঠাৎ কেমন চুপ করে গিয়েছিল। একটি কথাও বলেনি। বুঝতে পারছিলাম কিরীটীর মনের মধ্যে বিশেষ কোন একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই আমিও কথা বলা নিরর্থক ভেবে চুপ করেই গিয়েছিলাম।

গাড়ি ছুটে চলেছে নিঃশব্দ গতিতে রাত্রির জনহীন পথ দিয়ে। দু-পাশের বাড়িগুলো যেন ফ্রেমে আঁকা ছবির মত মনে হয়।

রাস্তার দু-পাশে লাইট-পোস্টের আলো ও রাত্রির অন্ধকার মেশামেশি হয়ে যেন আলোছায়ার একটা রহস্য গড়ে তুলেছে। সেই আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে জাগরণ-ক্লান্ত চোখ দুটো আমার যেন কেমন জড়িয়ে আসছিল। হঠাৎ কিরীটীর কথায় চমকে ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম।

আমাদের নামবার সময় সিঁড়ি দিয়ে যে লোকটা উপরে উঠে গেল তাকে চিনতে পেরেছিস সুব্রত ?

হ্যাঁ। শ্রীমন্ত পাল।

কিন্তু আমি যদি বলি সে শ্রীমন্ত পাল নয়!

তার মানে ? বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, শ্রীমন্ত পাল নয়। কিরীটী আবার বললে।

কি বলছিস কিরীটী ?

ঠিকই বলছি। যদিও সামনাসামনি একদিন মাত্র ভদ্রলোকটিকে দেখেছিলাম তবু বলতে পারি সিঁড়িতে যার সঙ্গে একটু আগে আমাদের দেখা হয়েছে সে শ্রীমন্ত পাল নয়। হুবহু শ্রীমন্ত পালেরই ছদ্মবেশে অন্য কেউ। তবে এও বলব, সে যেই হোক তার অদ্ভুত একটা দক্ষতা আছে ছদ্মবেশ ধারণের। কিরীটীর কথাগুলো যতখানি বিস্ময় ঠিক ততখানি কৌতূহলের উদ্রেক করে আমার মনে। এবং আমি কোন কথা বলবার পূর্বেই কিরীটী আবার বলে, আচ্ছা, বৈকালী সংঘ থেকে ডাক্তারের চেম্বারের দূরত্ব কতটা হতে পারে ?

মনে মনে একটা হিসাব করে বললাম, মাইল তিন কি সাড়ে তিনের বেশি হবে বলে তো মনে হয় না।

তাহলে অ্যাভারেজ স্পীডে গাড়ি চালালে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে কত সময় লাগতে পারে ?

তা রাস্তা খালি থাকলে পনের-ষোল মিনিটের বেশি নিশ্চয় নয়।

অর্থাৎ খুব বেশি লাগলে কুড়ি মিনিটের বেশি নয় !

তাই।

হঠাৎ এরপর কিরীটী সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

বললে, কাল যাচ্ছিস তো বৈকালী সংঘে ?

হ্যাঁ, যাব। দু-তিনদিন যাইনি।

হ্যাঁ যাস। আর চেষ্টা করে দেখিস যদি বিশাখা চৌধুরীর কাছ থেকে মিত্রা-অশোক সংবাদ কিছু সংগ্রহ করতে পারিস।

বৌদিও কাল যাচ্ছে নাকি ?

না। তার সেখানে যাবার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তা মিটে গিয়েছে।

কি রকম ?

বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করবার জন্য সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন ছিল—শ্রীমতী সেটা দিয়ে এসেছেন।

ও। তাহলে বৌদির বৈকালী সংঘে যাবার ব্যাপারে তোর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল, বল্ ?

তা ছিল।

বুঝতে কষ্ট হল না, কৃষ্ণা বৌদির বৈকালী সংঘের ব্যাপারে একটি পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আবার গত কুড়ি-বাইশ দিনের সমস্ত ব্যাপারগুলো পর পর ভাববার চেষ্টা করি।

কোথায় কোন্ ঘটনা, কোন্ সূত্রে কার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। নতুন করে আবার ভাববার চেষ্টা করি।

পরের দিন রাত্রে সাড়ে দশটা নাগাদ যখন বৈকালী সংঘে গিয়ে হাজির হলাম তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, ঘটনার গতি কত দ্রুত বিশেষ একটি পরিণতির কেন্দ্রে এগিয়ে এসেছে।

পূর্ব-পূর্ব রাতের মত আজও হলঘরে নরনারীদের ভিড় ছিল। ভিড়ের মধ্যে কোথাও বিশাখা চৌধুরীকে দেখতে পেলাম না। এবং দ্রুত অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা চারদিকে সঞ্চালন করেও ঘরের মধ্যে কোথাও আরও দুটি পরিচিত মুখও নজরে পড়ল না। একটি অশোক রায়, দ্বিতীয়টি মিত্রা সেন। বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে গতকাল কিরীটীর মুখ থেকে মুখরোচক সংবাদটি পেয়েছিলাম—এবং যে সংবাদটি পাওয়া অবধি মনের মধ্যে একটা কৌতূহল আমাকে কেবলই চঞ্চল করে তুলছিল—মিত্রা সেনকে অবিশ্যি ঐ সময় প্রতি রাত্রে দেখিনি, সে একটু দেরি করেই আসত। কিন্তু অশোক রায় ঠিকই উপস্থিত থাকত। মিত্রা সেন এলে তবে সে হলঘর থেকে যেত।

হঠাৎ এমন সময় এক নম্বর দরজাপথে বিশাখা চৌধুরী হলঘরে প্রবেশ করে আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

দুদিন আসনি যে বড়!

একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।

লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিশাখা যেন হাঁপাচ্ছে। শুধু তাই নয়, চোখের মণি দুটো যেন তার কি এক উত্তেজনায় চকচক করছে। রক্তচাপে মুখখানাও যেন থমথম করছে।

কোথা থেকে আসছ? জিজ্ঞাসা করলাম।

ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল, বারে গিয়েছিলাম। চল না, যাবে? কিছু ড্রিঙ্ক করবে?

না। ড্রিঙ্ক আমি করি না জান তো।

তা হোক। চল, আমার অনুরোধে না হয় আজ একটু অরেঞ্জ বা লিমনই ড্রিঙ্ক করলে।

কেন। Any special occassion!

যদি বলি হ্যাঁ—তারপরই মৃদু হেসে বললে, না, না—সে রকম কিছু না। চলই না, বলতে বলতে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে বিশাখা আমার হাতটা ধরতেই অ্যালকহলের তীব্র একটা গন্ধ তার গায়ের দামী প্যারিস সেন্টের গন্ধকেও যেন ছাপিয়ে এসে আমার নাসারন্ধ্রে ঝাপটা দিল।

চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

দু চোখের তারায় বিশাখার নেশাগ্রস্ত বিলোল দৃষ্টি। এতক্ষণে বুঝলাম বিশাখা ড্রিঙ্ক করেছে। একটু আশ্চর্যও হয়েছিলাম। গত পনের-কুড়ি রাত্রির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে কখনও তাকে আজ পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করতে দেখিনি। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই তাকিয়েছিলাম বিশাখার মুখের দিকে।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্নোচ্চারিত হল, কি দেখছ অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যসিন্ধু?

সহসা এমন সময় ভয়ার্ত চাপা নারী-কণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ আর্তশব্দে চমকে সামনের দিকে তাকালাম।

সোনপুর স্টেটের মহারানী স্নচরিতা দেবীর কণ্ঠস্বর।

Horrible। How Horrible!

কি! কি! ব্যাপার কি মহারানী!

কি ব্যাপার স্নচরিতা দেবী!

কি হল মহারানী!

একসঙ্গে আট-দশটি বিভিন্ন পুরুষ ও নারী-কণ্ঠোচ্চারিত প্রশ্ন মহারানীকে উদ্দেশ করে যেন বর্ষিত হল। আমি আর বিশাখাও এগিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রৌঢ়া মহারানীর স্নন্দর মুখখানা যেন নিদারুণ একটা ভীতিতে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে কাগজের মত। সমস্ত দেহটা তাঁর তখনও কাঁপছে মৃদু মৃদু।

শ্রীমন্ত পাল ও মনোজ দত্ত মহারানীর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি মহারানী? কী?

মিত্রা—মিত্রা সেন—

কি? কি হয়েছে মিত্রা সেনের?

She is dead! Stone dead! একটা আর্ত অস্ফুট চাপা আর্তনাদের মতই যেন ভয়াবহ ঐ কথা দুটি কোনমতে উচ্চারণ করে দু হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফার উপরে বসে পড়লেন মহারানী কাঁপতে কাঁপতে।

বন্দুকের ব্যারেল থেকে যেন একটা বুলেট বের হয়ে এসেছে। এবং শুধু একজনের নয়, একসঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে তখন উপস্থিত সকলেরই বক্ষ যেন ভেদ করেছে সেই একটিমাত্র বুলেট একসঙ্গে।

মহারানী তখনও কম্পিতকণ্ঠে বলে চলেছে, Oh God! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!……

মিত্রা সেন মারা গিয়েছে? সে কি! প্রথমেই কথাটা উচ্চারণ করলেন জমাট স্তব্ধতার মধ্যে তরুণ ব্যারিস্টার মনোজ দত্ত।

হ্যাঁ, আমি স্বচক্ষে এইমাত্র বাগানে দেখে এলাম। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বুঝি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বার বার ডেকেও সাড়া না পেয়ে, এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই—বলতে বলতে হঠাৎ শিউরে উঠলেন মহারানী।

এবার এগিয়ে গিয়ে আমিই কথা বললাম, আপনি স্থির-নিশ্চিত তো মহারানী! সত্যিসত্যিই মিত্রা সেন মারা গেছেন?

কি বলছেন আপনি সত্যসিন্ধুবাবু! I am sure, she is dead, stone dead.

কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে একবার দেখা দরকার এখুনি।

আমার কথায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলের যেন এতক্ষণে খেয়াল হয়। সকলেই একসঙ্গে আমার প্রস্তাবে সায় দেয়, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, চলুন চলুন সত্যসিন্ধুবাবু।

চলুন তো মহারানী। কোথায়?

আমি মহারানীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতেই তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন মহারানী, না, না—আমি আর সেখানে যেতে পারব না। Don't request me। যান। আপনারা যান।

ঘরের মধ্যে তখন উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্ত পাল, মনোজ দত্ত, মহারানী অফ সোনপুর, সুচরিতা দেবী, অভিনেত্রী সুমিত্রা চ্যাটার্জী, আমি ও বিশাখা চৌধুরী।

॥ বার ॥

মহারানীর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের পর হলঘরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তখন একটা মৃত্যুর মতই কঠিন পীড়াদায়ক স্তব্ধতা নেমে আসে।

সকলেই যেন একটা আকস্মিক আঘাতে বোবা হয়ে গিয়েছি। কারও মুখে কোন কথা নেই।

এবং সুকঠিন সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্বপ্রথম কথা বললেন শ্রীমন্ত পাল।

শ্রীমন্ত পালই জিজ্ঞাসা করেন, কোথায়? কোথায় আপনি দেখেছেন মহারানী মিত্রা সেনকে?

কামিনী ঝোপের সামনে যে বেঞ্চটা আছে, সেই বেঞ্চে—

আমিই এবার শ্রীমন্ত পালের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, জানেন আপনি জায়গাটা মিঃ পাল?

হ্যাঁ, আসুন।

শ্রীমন্ত পালকে অনুসরণ করেই অতঃপর সকলে আমরা হলঘরের এক নম্বর দরজা দিয়ে বের হয়ে লোহার সেই ঘোরানো সিঁড়িপথে উদ্যানে এসে নামলাম।

আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ। মৃদু চন্দ্রালোক উদ্যানটার মধ্যে একটা আলোছায়ার রহস্য যেন গড়ে তুলেছে। অদ্ভুত স্তব্ধ চারধার।

শ্রীমন্ত পালকে অনুসরণ করেই সকলে আমরা অগ্রসর হলাম। উদ্যানের একেবারে পূর্ব কোণে গোটা দুই কামিনী ফুলের গাছ পাশাপাশি ডালপালা ছড়িয়ে একটা ঝোপ সৃষ্টি করেছে। সেই ঝোপটা ঘুরে সামনে এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালাম।

মৃদু চন্দ্রালোকে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল আজও আমার যেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

লোহার ব্যাকওয়ালা একটা বেঞ্চ। তারই একধারে উপবিষ্ট ভঙ্গীতে দেখলাম মিত্রা সেনকে।

মাথাটা বুকের সামনে ঝুলে পড়েছে। হাত দুটো কোলের উপরে ভাঁজ করা। পরিধানের সাদা জর্জেটের জরি ও চুমকি বসানো আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। চাঁদের আলোয় সেই আঁচলার জরির কাজ ও চুমকিগুলো যেন চিকচিক করে জ্বলছে।

আশেপাশে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

স্তিমিত চন্দ্রালোকে সমস্ত দৃশ্যটা এমনি করুণ যে, কয়েক মুহূর্ত কারও কণ্ঠ থেকে যেন স্বরটুকু পর্যন্ত বের হয় না। মৃত্যুর হাতে কি মর্মান্তিক করুণ আত্মসমর্পণ! মিত্রা সেনের সমস্ত দম্ভ, আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য যেন নিঃশেষে তার শেষ করুণ ভঙ্গিটির মধ্যে নিবিড় এক আত্মসমর্পণে ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

নির্বাক চিত্রার্পিতের মত মৃতের চারিপাশে সব দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে আমিই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম উপবিষ্ট মৃতদেহের সামনে সর্বপ্রথম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার ভাল করে তাকালাম মৃতার দিকে।

তারপর একসময় আবার ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম মৃতার পশ্চাতের দিকে। এবং হঠাৎ সেই সময় নজরে পড়ল সেই মৃদু চন্দ্রালোকে মাটিতে কি একটা বস্তু চকচক করছে। কৌতূহলভরে নিচু হয়ে দেখতে যেতেই বুঝলাম সেটা একটা ছোট কাচের পেগ-গ্লাস।

সন্তর্পণে মাটি থেকে পেগ-গ্লাসটা তুলে নিলাম।

আমার হাতে পেগ-গ্লাসটা দেখে অস্ফুটকণ্ঠে ব্যারিস্টার মনোজ দত্ত বললেন, পেগ-গ্লাস না ?

হ্যাঁ।

গ্লাসটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই একটা আলতো অ্যালকহলের গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করল।

মনোজ দত্তই আবার কথা বললেন, মিস্ সেন তো কখনও ড্রিঙ্ক করতেন না। পেগ-গ্লাস এখানে এল তবে কি করে ?

মনোজ দত্তর কথায় মনে পড়ল, সত্যিই মিত্রা সেনকে আজ পর্যন্ত কখনও ড্রিঙ্ক করতে দেখিনি এবং বিশাখার মুখেই শুনেছি তিনি ড্রিঙ্ক করেন না কখনও। এবং বৈকালী সংঘের সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ড্রিঙ্কের ব্যাপারটা আদপেই নাকি পছন্দ করতেন না। এমন কি তিনি দু-একবার এমন প্রস্তাবও নাকি তুলেছিলেন যে, বৈকালী সংঘ থেকে ড্রিঙ্কের ব্যাপারটা একেবারেই তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু অন্যান্য সভ্য ও সভ্যাদের প্রতিবাদের জন্যই সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি আজও।

সেই মিত্রা সেনের রহস্যপূর্ণ আকস্মিক হত্যার অকুস্থানে পেগ-গ্লাস তাহলে এল কি করে। আর শুধু তাই নয়, পেগ-গ্লাসটার মধ্যে এখনও সদ্য অ্যালকহলের গন্ধ জড়িয়ে আছে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সেই রুমালের মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে পেগ-গ্লাসটা জড়িয়ে পকেটের মধ্যেই আবার রেখে দিলাম।

মনোজ দত্ত ও আমার মধ্যে হঠাৎ দু-একটা কথাবার্তার শব্দের পরই যেন অকস্মাৎ সব আবার নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে।

মৃদু চন্দ্রালোকে একবার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান নির্বাক নিশ্চল নরনারীদের মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল কেউ যেন তারা জীবিত নয়। কতকগুলো পটে আঁকা ছবি মাত্র আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

পকেট থেকে এবারে সরু পেনসিল-টর্চটা বের করে মৃতার আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে টর্চটা জ্বেলে, বাঁ হাত দিয়ে মিত্রা সেনের চিবুকটা স্পর্শ করতেই একটা বরফ-শীতল বিদ্যুৎ-স্পর্শে যেন হাতের আঙুলগুলো আমার শিহরিত হল।

মৃতের ঝুলন্ত শিথিল মুখখানি ঈষৎ উত্তোলিত হল আমার হাতের মধ্যে। বুঝলাম মৃত্যু বেশিক্ষণ ঘটেনি। এখনও মৃতদেহে রাইগার মর্টিস্ সেট ইন্ করেনি। আমার হস্তধৃত টর্চের আলোয়, সেই মুহূর্তে উত্তোলিত মুখখানির মধ্যে যেটা আমার দু'চোখের প্রখর দৃষ্টির সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, সেটা হচ্ছে মিত্রা সেনের প্রসাধন-চিহ্নিত সমগ্র

মুখখানি জুড়ে নীলাভ একটি ছায়া। আর বিস্ফারিত দুটি চক্ষু, ঈষৎ বিভক্ত দুটি ওষ্ঠের প্রান্ত বেয়ে একটি লালা ও রক্তমিশ্রিত কালচে ধারা নেমে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অজ্ঞাতেই যেন মনের ভেতর থেকে কে আমায় বলে উঠল, বিষ! কোন তীব্র বিষেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

তীব্র কোন বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু।

মনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটা বোধ হয় অকস্মাৎ মুখ দিয়েই আমার অজ্ঞাতে অস্ফুটে শব্দায়িত হয়ে উঠেছিল ঃ বিষ!

সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজনের কণ্ঠ হতে প্রতিশব্দের মতই যেন দু-অক্ষরের কথাটি উচ্চারিত হয় ঃ বিষ!

হ্যাঁ, বিষেই মৃত্যু হয়েছে, ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বললাম আমি।

কথা বললে এবারে বিশাখা, আত্মহত্যা! সুইসাইড!

সুইসাইডও হতে পারে, হোমিসাইডও হতে পারে। কথা হচ্ছে, বিষ যখন মৃত্যুর কারণ এবং মৃত্যু যখন সকলেরই আমাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে ঘটেছে, এখুনি সর্বাগ্রে আমাদের একটা পুলিসে সংবাদ দেওয়া কর্তব্য।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চার-পাঁচটি কণ্ঠ হতে যুগপৎ অস্ফুটে উচ্চারিত হল ঃ পুলিস।

হ্যাঁ, পুলিসে এখুনি একটা সংবাদ দিতে হবে বৈকি!

বিশাখা চৌধুরী বললে, পুলিস! পুলিস কেন?

বললাম তো, সাস্‌পিসাস্‌ ডেথ্‌। আপনারা একজন কেউ যান, পুলিসে একটা ফোন করে দিন। নিকটবর্তী থানা যেটা সেখানে ফোন করলেই হবে।

সকলের মুখের দিকে তাকিয়েই কথাটা আমি বললাম। কিন্তু কারোর মধ্যেই যেন সাড়া পেলাম না।

পরস্পর তারা বারেকের জন্য পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে যেন সকলে নিশ্চল পূর্ববৎ দাঁড়িয়েই রইল।

বুঝলাম কেউ এগুবে না।

তখন আমিই শ্রীমন্ত পালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, চলুন শ্রীমন্তবাবু, ফোনটা কোন্‌খানে আমাকে দেখিয়ে দেবেন চলুন।

চলুন, বারে ফোন আছে। শ্রীমন্ত পাল মৃদু কণ্ঠে যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করলেন।

স্থানত্যাগের পূর্বে আমি সকলকে সম্বোধন করে বললাম, একটা কথা বলা প্রয়োজন,

পুলিস না আসা পর্যন্ত—অর্থাৎ তাদের বিনানুমতিতে যেন এখান থেকে বাইরে কেউ যাবেন না।

বাইরে যাব না! অভিনেত্রী সুমিতা চ্যাটার্জী প্রশ্ন করলেন আমাকে।

না। এ অবস্থায় পুলিস এসে এখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত বুঝতেই তো পারছেন এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে রিস্ক আছে। যদি শেষ পর্যন্ত মিত্রা সেনের মৃত্যুর ব্যাপারটা সুইসাইড না হয়ে হোমিসাইডই প্রমাণ হয়, হয়ত আপনাদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা ভাবে পুলিসের জবানবন্দির সম্মুখীন হতে হবে। আপনারা তাহলে অপেক্ষা করুন। আমি একটা ফোন করে দিয়ে আসি। আর একটা কথা, মৃতদেহের আশে-পাশে কেউ যেন যাবেন না, মৃতদেহ স্পর্শও যেন কেউ করবেন না।

কিন্তু আপনি সত্যসিন্ধুবাবু, এত কথা জানলেন কি করে? হঠাৎ মনোজ দত্ত আমাকে প্রশ্ন করলেন।

আমি!

হ্যাঁ—these are all law points.

আমি পূর্বে কিছুদিন লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চে চাকরি করেছিলাম।

C. I. D.? অস্ফুট কণ্ঠে বললেন মনোজ দত্ত।

আর নিজের আত্মপরিচয় গোপন রাখা বৃথাই, তাই এবারে স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দিলাম, হ্যাঁ মিঃ দত্ত, তবে সরকারী নয়, বে-সরকারী শখের সত্যসন্ধানী আমি। কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন?

কিরীটী রায়! একসঙ্গে সকলের কণ্ঠ হতেই নামটা উচ্চারিত হল। হ্যাঁ, কিরীটী রায়ের সহকারী আমি সুব্রত রায়।

সে কি!···অস্ফুট আর্তকণ্ঠে বললে এবারে বিশাখা চৌধুরী।

তাই বিশাখা দেবী। সত্যসিন্ধু আমার ছদ্মনাম, ছদ্মপরিচয়। আমি সুব্রত রায়। বলেই শ্রীমন্ত পালের দিকে এবারে তাকিয়ে বললাম, চলুন মিঃ পাল, we must inform the police!

একটা আকস্মিক বজ্রপাতের মতই যেন আমার সত্যকার পরিচয়টা সমস্ত পরিস্থিতি-টাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে একেবারে ঠাণ্ডা বরফের মতই জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছিল।

বিমূঢ় নিশ্চল মানুষগুলোর মুখের দিকে আর না তাকিয়েই এবারে আমি শ্রীমন্ত পালকে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

॥ তের ॥

বারের মধ্যে চার-পাঁচজন নরনারী টেবিলের সামনে বসে ড্রিঙ্ক করছিল। একপাশে একটা ঘেরা কাচের পার্টিশন তোলা জায়গায় ফোন ছিল। পার্টিশনের মধ্যে ঢুকে সর্বাগ্রে নিকটবর্তী থানায় পরিচিত থানা-অফিসার রজত লাহিড়ীকে দুঃসংবাদটা দিয়ে কিরীটীকে ফোনে ডাকলাম।

হ্যালো! কিরীটী রায় কথা বলছি। তারে কিরীটীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আমি সুব্রত, বৈকালী সংঘ থেকে বলছি রে।

কি ব্যাপার?

মিত্রা সেন খুব সম্ভবতঃ murdered!

সংবাদটা শুনে কিন্তু অপর পক্ষের কণ্ঠে কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ পেল না। শান্ত প্রত্যুত্তর শোনা গেল: শেষ পর্যন্ত murdered! কিন্তু এতটা ঠিক তো আশা করিনি! নিজের পরিচয় দিয়েছিস নাকি?

হ্যাঁ, এইমাত্র দিলাম।

এত তাড়াতাড়ি! আর একটু পরে দিলেই হত। যাকগে, থানায় সংবাদ দিয়েছিস?

হ্যাঁ, রজত লাহিড়ীকে জানিয়েছি। তিনি এখুনি আসছেন।

অশোক রায় ঐখানেই আছে তো?

অশোক রায়! কই না, তাকে তো এখন পর্যন্ত দেখিনি।

খোঁজ নে, আমি আসছি। হ্যাঁ ভাল কথা, ক্লাবের প্রেসিডেন্টের খবর কি?

এখনও খবর নিতে পারিনি।

কেউ যেন না সটকাতে পারে। Keep an eye।

হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করেছি।

যাচ্ছি আমি।

ফোন রেখে বের হয়ে এলাম। শ্রীমন্ত পাল পার্টিশনের সুইং-ডোরের অল্প দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। এবং ঘরের মধ্যে যাঁরা টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছিলেন তাঁরা দেখলাম পূর্ববৎ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। বুঝলাম এ ঘরের নরনারীদের মধ্যে এখনও দুঃস্বপ্নের ধাক্কাটা এসে পৌঁছয়নি।

কিন্তু সত্যিই অশোক রায়কে তো এতক্ষণ পর্যন্ত আজ এখানে আসা অবধি একবারও দেখিনি। মিত্রা সেন এসেছিল অথচ জোড়ের অন্যটি অশোক রায় আসেননি এ তো

হতে পারে না—বিশেষ করে আজ আবার শনিবার। মিত্রা সেনের অনিবার্য উপস্থিতির রাত যখন, তখন অশোক রায়ের আসাটাও অনিবার্য।

বিশেষ করে ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ল। মাত্র আগের দিনই কিরীটীর মুখে শুনেছি মিত্রা ও অশোকের বিবাহের ব্যাপারটা স্থির হয়ে গিয়েছে। সে অবস্থায় আজকের রাত্রে মিত্রা সেন এসেছেন অথচ অশোক রায় আসেনি এবং শুধু আসাই নয়, মিত্রা সেন বিষপ্রয়োগে নিহত অথচ অশোক রায় অনুপস্থিত। কথাটা ভাবতে ভাবতেই শ্রীমন্ত পালের দিকে এগিয়ে গেলাম।

চলুন মিঃ পাল, প্রেসিডেণ্টের ঘরে একবার যাওয়া যাক।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে শ্রীমন্ত পাল বললেন, চলুন।

ঘর থেকে বের হয়ে অপরিসর প্যাসেজটা দিয়ে পাশাপাশি যেতে যেতে আমিই আবার প্রশ্ন করলাম, অশোক রায়কে দেখছি না, তিনি কি আজ আসেননি নাকি?

কই, আমি তো তাকে আজ দেখিনি একবারও।

কখন আপনি এসেছেন আজ?

রাত সাড়ে নটার পর।

আপনি যখন হলঘরে এসে ঢোকেন কাকে কাকে দেখেছিলেন সেখানে, মনে আছে?

হ্যাঁ।

মিত্রা সেন তাদের মধ্যে ছিলেন কি?

না। তাকেও দেখিনি।

তবে কে কে ছিলেন তখন হলঘরে?

মহারানী, সুধীরঞ্জন, সুমিতা চ্যাটার্জী, নিখিল ভৌমিক, মনোজ দত্ত, সোমেশ্বর আর রমা মল্লিক ছিল।

বিশাখা ছিলেন না?

না, কই! তাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

ভাল করে মনে করে দেখুন, আর কাউকে হলঘরের মধ্যে দেখেননি?

আমার বেশ মনে আছে। আর কাউকে তখন হলঘরে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। পাশাপাশি চলতে চলতেই বললেন শ্রীমন্ত পাল।

চলুন একবার প্রেসিডেণ্টের ঘরে যাওয়া যাক, বললাম আমি।

চলুন।

সরু প্যাসেজটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। ডান দিকে ঘুরতেই সামনে একটা দরজা আমার চোখে পড়ল।

দরজার গায়ে একটা সাদা বেকালাইটের প্রেস বাটন আছে দেখলাম।

শ্রীমন্ত পালই এগিয়ে গিয়ে দরজার গায়ে প্রেস বাটনটা টিপলেন।

ধীরে নিঃশব্দে আমাদের চোখের সামনে দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে আহ্বান শোনা গেল, আসুন।

প্রেসিডেণ্ট রাজেশ্বর চক্রবর্তীর গলা।

প্রেসিডেণ্টের ঘরের যে দ্বারপথটি সেদিন আমার নজরে পড়েছিল, সেটা ছাড়াও একটি তাহলে ঘরে যাবার অন্য আর একটি দ্বার।

এ ধরনের আরও দ্বারপথ আছে কিনা তাই বা কে জানে!

শ্রীমন্ত পালের সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রেসিডেণ্টের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

প্রেসিডেণ্ট আমাদের দিকে পিছন ফিরে টেবিলের সামনে বসে একতাড়া ভাউচার সই করতে ব্যস্ত ছিলেন।

একটা ব্যাপার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলাম। পশ্চাতের দ্বারের পাল্লাটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে দেওয়ালের গায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বাইরের থেকে প্রবেশদ্বারটি বোঝা গেলেও আকৃতি ও দ্বারের বৈশিষ্ট্য থেকে, ভিতর থেকে সেটা বোঝবারও উপায় নেই। সমস্ত দ্বারপথটি জুড়ে দেওয়ালের গায়ে আঁকা রয়েছে একটি নৃত্যরতা চৈনিক সুন্দরীর নিখুঁত প্রতিকৃতি। বুঝলাম বাইরে থেকে জানা গেলেও ঘরের ভিতর থেকে দ্বারপথটি বোঝবার কোনও উপায় বা চিহ্ন নেই। তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে ঐটি একটি গোপন দ্বারপথ।

ভাউচারগুলি সই করতে করতেই পূর্ববৎ চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বললেন, কি খবর শ্রীমন্তবাবু?

শ্রীমন্ত পালের দিকে না তাকিয়েই বুঝলাম প্রেসিডেণ্ট তাঁকে চিনতে পেরেছেন তা সে যে ভাবেই হোক।

সত্যসিন্ধুবাবু মানে সুব্রতবাবু—

শ্রীমন্ত পালের কথা শেষ হবার পূর্বেই চকিতে মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেণ্ট আমাদের দিকে। কালো চশমার অন্তরালে সেই মুহূর্তে তাঁর চোখের দৃষ্টির মধ্যে কি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল না টের পেলেও তাঁর চকিত শিরোত্তোলন ও তাকাবার ভঙ্গী থেকেই বুঝেছিলাম, আমার নামটা তাঁর কানে আকস্মিকভাবেই প্রবেশ করেছে।

সুব্রতবাবু! সত্যসিন্ধুবাবুর সঙ্গে সুব্রতবাবুর কি সম্পর্ক?

সেই শুভ্রকেশ শান্ত চেহারা।

কথা বললাম এবারে আমিই, আমার নাম ও পরিচয়ের ব্যাপারে আমি গোপনতার

আশ্রয় নিয়েছিলাম, মিঃ প্রেসিডেণ্ট। তার জন্য আমি দুঃখিত—

গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার জন্য আপনি দুঃখিত মিঃ সুব্রত রায়! কিন্তু কেন বলুন তো? একটা সুতীক্ষ্ণ শব্দভেদী বাণের মতই যেন প্রেসিডেণ্টের শান্ত কণ্ঠ হতে উচ্চারিত প্রশ্নটা আমাকে এসে বিদ্ধ করল।

আপনার সে প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আপনাকে একটা দুঃসংবাদ জানাতে চাই মিঃ চক্রবর্তী।

কিন্তু আমার কথার ধার দিয়েও যেন গেলেন না রাজেশ্বর চক্রবর্তী। আপন মনেই বললেন, অজ্ঞাতকুলশীল! সুধীরঞ্জন is responsible—বলতে বলতে টেবিলের গায়ে একটা অদৃশ্য বোতাম বোধ হয় টিপলেন।

মুহূর্ত পরেই সম্মুখেই দ্বারপথে মীরজুমলাকে দেখা গেল।

মীরজুমলা, সুধীরঞ্জন—

মীরজুমলা আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারপথে ক্ষণপূর্বে যেমন আবির্ভূত হয়েছিল ঠিক তেমনি করেই অন্তর্হিত হল।

আমরা দুজনেই এতক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রেসিডেণ্ট আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, আপনার সত্যকার পরিচয় তাহলে সুব্রত রায় আপনি! লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন সি. আই. ডি.!

তা যা বলেন।

হুঁ। তা বেশ। কিন্তু কি যেন দুঃসংবাদের কথা বলছিলেন একটুক্ষণ আগে?

মিত্রা সেন মারা গেছেন।

কি? কি বললেন? অত্যন্ত চমকিত বিস্ময়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

মিত্রা সেন মারা গেছেন এবং কোনও তীব্র বিষই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তাঁর মৃতদেহ বাগানের বেঞ্চিতে—

মানে, এখানে?

হ্যাঁ।

Are you mad Mr. Roy! কি সব আবোল-তাবোল বকছেন?

নিজেই স্বচক্ষে বাগানে দেখবেন চলুন না। আপনার একবার দেখা দরকার। থানায় অবশ্যি আমি এইমাত্র ফোন করে দিয়েছি।

কিন্তু কে—কে আপনাকে গায়ে পড়ে সর্দারি করতে বলেছে মিঃ সুব্রত রায়, জানতে পারি কি?

আমার কর্তব্য বলে মনে করেই থানায় আমি ফোন করেছি মিঃ চক্রবর্তী।

All right! আপনি এখন যেতে পারেন এ ঘর থেকে। আর একটা কথা জেনে যান, এই মুহূর্ত থেকে আর আপনি বৈকালী সংঘের মেম্বার থাকলেন না।

ধন্যবাদ! আমারও এ ঘর ছেড়ে যাবার পূর্বে একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার, পুলিস না আসা পর্যন্ত এ বাড়ি ছেড়ে আপনি যেন কোথাও যাবার চেষ্টা না করেন।

ধন্যবাদ!

আমারই ক্ষণপূর্বের ধন্যবাদটা যেন ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট আমাকে।

আমি ঘর থেকে দ্বিতীয় দ্বারপথে বের হয়ে সোজা হলঘরে চলে এলাম।

হলঘরে ঢুকতেই কানে এল ভায়োলিনের মিষ্টি করুণ সুর।

চেয়ে দেখি নির্জন হলঘরের মধ্যে একাকী এককোণে একটা চেয়ারে বসে সুধীরঞ্জন আপন মনে ভায়োলিন বাজাচ্ছেন।

সুধীরঞ্জন কি তবে প্রেসিডেন্টের পরোয়ানা এখনও পায়নি। মীরজুমলা কি এ ঘরে আসেনি!

এগিয়ে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, সুধীরঞ্জন!

প্রথম ডাকটা সে শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার ডাকতেই মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলিন বাজানো বন্ধ করে বলল, কি?

প্রেসিডেন্ট যে তোমাকে ডাকছেন, শোননি?

না।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

এসেই একটু বাইরে গিয়েছিলাম, এই মিনিট কয়েক হল ফিরে হলঘরে কাউকে না দেখতে পেয়ে একা একা কি করি, তাই একটু ভায়োলিন বাজাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কি ব্যাপার? আজ যে আসর একদম ফাঁকা! সব গেল কোথায়?

একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাই তো একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দুর্ঘটনা! ওর মধ্যে নতুনত্ব তো কিছু নেই!

না, না—সত্যিই—

আমি কি বলছি মিথ্যে—

খুব সম্ভব মিত্রা সেন নিহত হয়েছেন!

What! কি বললে?

মিত্রা সেন নিহত হয়েছেন, বিষপ্রয়োগে।

এ যে সত্যিই Arabian Night-এর গল্প শোনাচ্ছ হে! কিন্তু সংবাদটা দিলে কে?

মহারানী অফ সোনপুরই প্রথম বাগানে মিত্রা সেনের মৃতদেহ আবিষ্কার করেন।

তার মানে, এইখানে?

হ্যাঁ!

হঠাৎ এমন সময় পশ্চাতে মীরজুমলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: স্যার! আপনাকে প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘরে ডাকছেন।

সুধীই প্রশ্ন করে মীরজুমলার মুখের দিকে তাকিয়ে, কাকে?

তোমাকে। বললাম আমি।

আমাকে?

হ্যাঁ, আমার সম্পর্কে আলোচনার জন্যই বোধ হয় তলব পড়েছে তোমার।

তোমার সম্পর্কে? হঠাৎ—

সত্যকার পরিচয়টা যে এইমাত্র তাঁকে দিয়ে এলাম।

সর্বনাশ করেছ! তারপর?

মীরজুমলা আবার ঐ সময় বললে, চলুন স্যার।

সময় নেই যাবার এখন, প্রেসিডেন্টকে গিয়ে বল মীরজুমলা। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল সুধীরঞ্জন।

কিন্তু স্যার—

যা বললাম তাই বলগে—যাও!

ঠিক সেই মুহূর্তে হলঘরের প্রধান দরজা খুলে গেল এবং হলঘরে এসে প্রবেশ করল প্রথমে দারোয়ান, তার পশ্চাতে থানা অফিসার রজত লাহিড়ী এবং সর্বশেষে কিরীটী ও দুজন ইউনিফর্ম-পরিহিত পুলিস। পুলিস দুজনের দিকে তাকিয়ে রজত লাহিড়ী বললেন, তোম দোনো এই দরওয়াজা পর খাড়া রহো। বিনা হুকুম সে কই বাহার না যায়। আউর বাহারসে ভি কোই নেই অন্দর ঘুষে!

কিরীটী ততক্ষণে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বলা বাহুল্য আমার ছদ্মবেশই ছিল। তথাপি কিরীটী মুহূর্তকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, মেক্-আপটা বেশ জুতসই নিয়েছিস তো সুব্রত!

হেসে ফেললাম আমি।

চল্, কোথায় ডেড বডি আছে?

বাগানে।

এস হে রজত! কিরীটী রজত লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে আহ্বান জানাল।

হঠাৎ ঐ সময় লক্ষ্য করলাম হলঘরের মধ্যে কোথাও মীরজুমলা নেই।

নিঃশব্দে ইতিমধ্যে কখন একসময় যেন সে সবার অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হয়েছে।

সুধীরঞ্জনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল।

দোতলার সরু প্যাসেজটা দিয়ে কিরীটী ও লাহিড়ীকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যাবার সময় কিরীটী প্রশ্ন করল, অশোক রায় কোথায়?

এখনও পর্যন্ত তার কোনও হদিস পাই নি।

সে আজ এসেছিল, না মোটে আসেইনি?

তাও বলতে পারি না। এখনও বিশেষ কারও সঙ্গে কোন কথাই হয়নি। তবে আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই এসেছিল।

কিসে বুঝলি?

আজ শনিবার। বিশেষ করে তোকে তো বলেছিলাম বৃহস্পতি ও শনিবার মিত্রা সেন এখানে আসবেই, এ তো অশোক জানে।

আমার কথার প্রত্যুত্তরে কিরীটীর দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অতঃপর আমরা লোহার ঘোরানো সিঁড়িপথে নেমে এসে একের পর এক নীচের বাগানে পা দিলাম। ইতিমধ্যে চাঁদ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে অনেক হেলে পড়ায় তার আলোও ঝিমিয়ে এসেছিল।

দেখলাম যে কজন নরনারীকে প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পূর্বে বাগানের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে চিত্রার্পিতের মত দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে গিয়েছিলাম, তাঁরা তখনও সেইখানেই যে-যার দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তেমনি। এবং মনোজ দত্তও ইতিমধ্যে কখন একসময় যেন আবার বাগানের মধ্যে ফিরে এসেছেন প্রেসিডেন্টের ঘর থেকে। আমাদের পদশব্দে ওঁরা সকলেই একবার মুখ তুলে তাকালেন। কিরীটীও দেখলাম সেই মৃদু চন্দ্রালোকে সকলের মুখের দিকে পর পর একবার তাকিয়ে মৃতদেহের দিকে দৃষ্টি দিল।

কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে কিরীটী লাহিড়ীকে সম্বোধন করে নিম্নকণ্ঠে যেন কি বলল।

লাহিড়ী দণ্ডায়মান নরনারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যান, সকলে হলঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি। আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের কিছু কথা আছে।

এতক্ষণ তাঁরা যেন সকলে ঐ বিশেষ নির্দেশটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

সকলেই একে একে স্থান ত্যাগ করলেন।

ধীরে ধীরে অনেকগুলো পদশব্দ বাগানের অপর প্রান্তে আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল।

অদ্ভুত স্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে মধ্যে কেবল মৃদু পত্রমর্মর ও একটানা একটা ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে।

মৃতদেহ ঠিক পূর্ববৎ বেঞ্চের উপরে উপবিষ্ট রয়েছে।

পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বের করে টর্চের আলো ফেলে পায়ে পায়ে কিরীটী মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

মৃতার চিবুক স্পর্শ করে, মুখে টর্চের আলো ফেলে ক্ষণকাল সেই মৃত্যু-নীল মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, সত্যিই বিষ সুব্রত!

শুধু বিষই নয়। এই যে বিষ-পাত্রও পেয়েছি! বলতে বলতে পকেট থেকে পেগ-গ্লাসটি বের করে কিরীটীর সামনে এগিয়ে ধরলাম।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে বার দুই ঘুরিয়ে দেখে নিম্নকণ্ঠে কিরীটী বললে, এ যে দেখছি সুরাপাত্র! মিত্রা সেনের কি সুরাসক্তি ছিল নাকি?

না, আমি কখনও দেখিনি এবং সকলে তাই বললেনও এখানে।

তাই তো মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সুইসাইড নয়তো?

অসম্ভব বলে স্ত্রী-চরিত্রে কোন কিছুই নেই! তাই সে সম্ভাবনাটাও আমাদের চিন্তা থেকে বাদ দিতে পারব না। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে জীবনে যার মধুযামিনী এমনি করে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, কোন্ দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাবে। তাছাড়া এ বিবাহে যখন দুজনেরই মন দেওয়া-নেওয়ার পর্বটা সমাপ্ত করে অগ্রসর হয়েছিল তখন আচমকা এমনি করে আত্মহত্যাই বা একজন করতে যাবে কেন?

কিরীটীর কথাটা একেবারে যুক্তিহীন নয়।

কিরীটী আবার বললে, সে যাই হোক, এখানে মৃতদেহের কাছেই পেগ-গ্লাসটা যখন পাওয়া গিয়েছে অবশ্যই তার একটা তাৎপর্য আছে। তা সে মিত্রা সেন কোনদিন ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত থাকুন বা নাই থাকুন। তাছাড়া আরও একটা কথা এর মধ্যে ভাববার আছে। মিত্রা সেনের মত মেয়ে যদি আত্মহত্যাই করে থাকেন তো এই বিশেষ স্থানটি ও সময় বেছে নিলেন কেন? তাঁর চরিত্রের ভ্যানিটির কথাটাও আমাদের ভুললে চলবে না।

কথাগুলো বলে কিরীটী আবার চারপাশে আলো ফেলে ফেলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তারপর আবার ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, মৃতের চোখেমুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট-

আছে বটে। তবে মৃতদেহের সহজ 'পশ্চার' দেখে মনে হয় মৃত্যুর কারণ যে বিষই হোক না কেন, সেটা অত্যন্ত তীব্র ও দ্রুত কার্যকরী ছিল। আর খুব সম্ভবতঃ ব্যাপারটা যা মনে হচ্ছে, যদি হত্যাই হয়ে থাকে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে মিত্রা সেন হত্যাকারীর হাত থেকে বিষ গ্রহণ করে পান করেছিলেন। তারপর ভাববারও আর সময় পাননি, অবধারিত মৃত্যুকে বরণ করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে হয় হত্যাকারী পূর্ব হতেই জানত আজ রাত্রে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিত্রা সেন এখানে আসবেন বা থাকবেন, না-হয় তাঁরই পূর্ব-পরিকল্পনা বা প্ল্যানমত মিত্রা সেনকে এখানে কোন একসময় আজ রাত্রে আসতে হয়েছিল। পরের ব্যাপারটাই যদি সত্যি হয় তো বলতে হবে হত্যাকারী পূর্ব থেকেই বিষ নিয়ে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু একটা কথা কিরীটী—বাধা দিলাম আমি।

কি?

ধরেই যদি নেওয়া যায় যে, ঐ পেগ-গ্লাসেই মিত্রা সেনকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তাহলে মদ ভিন্ন কি এমন পানীয় যা মিত্রা সেনকে বিষ মিশ্রিত করে হত্যাকারী তার হাতে তুলে দিয়েছিল!

হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্যি ভাববার। তবে তারও পক্ষে একমাত্র যুক্তি তো তোর যে, মিত্রা সেনের ড্রিঙ্ক করবার হ্যাবিট ছিল না, এই তো? কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবনে কখনও যে তিনি ড্রিঙ্ক করেননি বা করতে পারেন না তারও তো কোন মানে নেই। দৈব-কার্যকারণ বলে একটা কথা আছে ম্যানিস তো?

তা মানি। কিন্তু তাই যদি হবে তো সে এমন কেউ হওয়া দরকার যার দ্বারা সেটা হওয়া সম্ভব।

সে তো এখানেই কেউ হতে পারে।

মানে?

মানে এখানে সকলের সঙ্গেই তো তার ভাব ছিল, হৃদ্যতা—অর্থাৎ তোমার অশোক রায় থেকে শুরু করে বিশাখা চৌধুরী বা স্বয়ং মহারানী অফ সোনপুরও তো হতে পারেন। বলেই কিরীটী হেসে ফেললে, কিন্তু থাক সে কথা, স্বেচ্ছাকৃত বিষ গ্রহণ যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে সময় দ্বিতীয় কোনও নরনারীর সুনিশ্চিত এখানে আবির্ভাব ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, ঐ সঙ্গে একটি কথা ভুললে চলবে না সুব্রত, মিত্রা সেনের বিবাহের দিন অত্যাসন্ন হয়ে এসেছিল এবং বর্তমানের অতি আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সোসাইটির সে ছিল অন্যতমা। কিন্তু আর এখানে নয়। রাত অনেক হল, এবারে এখানকার ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণকে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। পুলিসের হুমকি দিয়ে অনেকক্ষণ

তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। কি বলেন মিঃ লাহিড়ী ?

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যেন নির্বাক দর্শকের মতই একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিঃ লাহিড়ী। একটি কথা বা একটি মন্তব্যও করেননি। কিরীটীর প্রশ্নোত্তরে মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ, রাতও অনেক হয়েছে, প্রায় সাড়ে এগারোটা।

চল্। চল সুব্রত। হলঘরে একবার যাওয়া যাক।

॥ চোদ্দ ॥

হলঘরে আমরা প্রবেশ করবার মুখেই কানে এসেছিল বহু কণ্ঠের মিশ্রিত চাপা একটি গুঞ্জন। আমাদের ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেটা সহসা থেমে গেল। ভাষাহীন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা যেন সহসা ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠল।

কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হলঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম।

বুঝতে পারলাম, ইতিমধ্যেই দুঃসংবাদটা বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। কারণ হলঘরের মধ্যে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেখতে পেলাম না কেবল সকলের মধ্যে বিশেষ দুটি প্রাণীকে। একজন হচ্ছেন বৈকালী সংঘের প্রেসিডেন্ট রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বিতীয় অশোক রায়। আরও একটা ব্যাপার যা আমার দৃষ্টিকে এড়ায় নি, সেটা হচ্ছে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত নরনারীর চোখেমুখেই যেন একটা চাপা ভয় ও আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেরই মনের উদ্বেগ যেন প্রত্যেকের নীরবতার মধ্যেও চাপা থাকেনি।

ঘরের মধ্যে সে সময় উপস্থিত ছিলেন, মহারানী অফ সোনপুর স্টেট, সুচরিতা দেবী, ব্যারিস্টার মনোজ দত্ত, শ্রীমন্ত পাল, সুধীরঞ্জন, অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জী, বিশাখা চৌধুরী, নিখিল ভৌমিক, রমা মল্লিক, সোমেশ্বর রাহা আর দুজন ভদ্রলোক, যাঁদের মধ্যে মধ্যে দেখলেও নাম জানতাম না, পরে ঐ রাত্রেই জবানবন্দি নেবার সময় জেনেছিলাম,—রঞ্জন রক্ষিত ও সুপ্রিয় গাঙ্গুলী। ওঁদের মধ্যে রঞ্জন রক্ষিত শেয়ার মার্কেটের একজন চাঁই, বয়স পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ও সুপ্রিয় গাঙ্গুলী একজন ফিল্ম-জগতের প্রোডিউসার-ডাইরেকটার।

কিরীটীর পরামর্শমতই বার-রুমে রজত লাহিড়ীকে সামনে রেখে কিরীটী তার জেরা শুরু করল—প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সেই ঘরে একের পর এক ডেকে এনে।

প্রথমেই ডাক পাঠানো হল মীরজুমলার সাহায্যে প্রেসিডেন্টকে। তিনি তাঁর নিজস্ব

ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ডান পা-টি একটু টেনে টেনে একটা মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

বসুন মিঃ চক্রবর্তী, আপনিই এখানকার প্রেসিডেন্ট ? প্রশ্ন করলেন রজত লাহিড়ী।

নির্দিষ্ট চেয়ারটা টেনে একটু যেন কষ্ট করেই বসতে বসতে প্রেসিডেন্ট মৃদুকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ।

আপনার ডান পায়ে কি কোন দোষ আছে নাকি মিঃ চক্রবর্তী ? হঠাৎ প্রশ্ন করে এবার কিরীটী।

কিরীটীর দিকে না তাকিয়েই মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন প্রেসিডেন্ট, আর বলেন কেন, old age-এর বায়নাক্কা কি একটা! রিউম্যাটিজম্, এনলার্জড প্রস্টেট, তার উপরে আবার ক্রনিক ব্রংকাইটিস। বলার সঙ্গে সঙ্গেই খুকখুক করে বারকয়েক কাশলেন রাজেশ্বর চক্রবর্তী। নেহাত এরা ছাড়ে না, নাহলে এ বয়সে আর এইসব ঝামেলা পোষায়! বলে যেন কথাটা শেষ করলেন কোনমতে।

চোখেও তো দেখছি আবার কালো চশমা ব্যবহার করছেন! চোখেও কোন দোষ আছে নাকি মিঃ চক্রবর্তী ? কিরীটী আবার শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। সে তো আজ নয়, বহুদিন থেকেই ভুগছি, হাইপার মেট্রোপিয়া না কি ডাক্তারেরা বলেন। জবাব দিলেন রাজেশ্বর।

হুঁ। তা শুনেছেন বোধ হয় দুঃসংবাদটা ?

হাঁ, সত্যসিন্ধুবাবু—আপনাদের ঐ সুব্রতবাবুই একটু আগে মিঃ পালের সঙ্গে আমার অফিসঘরে গিয়ে সুসংবাদটা দয়া করে শুনিয়ে এসেছেন। চমৎকার ছদ্মনামটি নিয়েছিলেন বটে সুব্রতবাবু! সত্যসিন্ধু! সত্যের একেবারে সাক্ষাৎ মূর্তি! বলেই আবার বারকয়েক কেশে নিলেন।

কিরীটী যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে রাজেশ্বর চক্রবর্তী বলে উঠলেন, তা দেখুন—ভাল কথা, আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি শেষ করলেন কথাটা।

জবাব দিলাম আমিই, ওর নামটা শোনেননি ? কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় ? মানে সেই শখের গোয়েন্দা—

হ্যাঁ।

সুখী হলাম মিঃ রায় আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তা দেখুন মিঃ রায়, আমি বলছিলাম, নামেই এখানকার প্রেসিডেন্ট আমি। কাজকর্মের মধ্যে কেবল হিসাব-

নিকাশটাই রাখতে হয় বৈকালী সংঘের। অবিশ্যি ঐ সঙ্গে এখানকার ডিসিপ্লিন রাখবারও দায়িত্ব একটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কমিটি থেকে। কিন্তু এখানকার মেম্বারদের পার্সোনাল ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্বই নেই।

কথাটা একটু স্পষ্ট করে যদি বলেন মিঃ চক্রবর্তী ? প্রশ্ন করলেন লাহিড়ীই এবার।

বলছিলাম এরা যদি কেউ পরস্পরের প্রেমে পড়ে বা আত্মহত্যা করে সে ব্যাপারে আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি বলুন ? আপনাদের ঐ সত্যসিন্ধুবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, কিছুদিন তো এখানে উনি যাতায়াত করেছেন, এখানকার হাল-চালও নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝেছেন। আমার সঙ্গে এই সংঘের ঐ প্রেসিডেণ্টের পদটি ছাড়া আর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। নতুন মেম্বার এলে তার পরিচয়টা করিয়ে দিই একবার হলঘরে এসে, নচেৎ হলঘরই বলুন, বারই বলুন বা এ বাড়ির অন্য কোন জায়গাই বলুন, কখনও আমি পা বাড়াই না। বলে আবার বার দুই কাশলেন।

কিন্তু একটা কথা যে আপনার আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ চক্রবর্তী ? কিরীটী প্রশ্ন করে আবার।

বলুন ?

এখানকার ডিসিপ্লিনের ব্যাপারটা যখন এঁরা আপনার হাতেই তুলে দিয়েছেন—

তা দিয়েছেন বটে। তবে সেটা একান্ত অফিস-সংক্রান্তই। কারোর ব্যক্তিগত গণ্ডি পর্যন্ত সেটা যেমন কখনও এন্‌ক্রোচ করেনি এবং করার আমি প্রয়োজনও বোধ করিনি কোনদিন। এখানকার যারা মেম্বার, তারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়, সমাজ বা সোসাইটিতে তাদের যথেষ্ট পরিচয় ও স্বীকৃতি আছে। ভাল-মন্দ বোঝবার নিজের নিজের তাদের বয়সও হয়েছে।

কিন্তু এ কথাটা কি সত্যি নয় মিঃ চক্রবর্তী যে, এ সংঘ গড়বার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে ? প্রশ্ন করেন আবার লাহিড়ীই।

উদ্দেশ্য আর কি ! দশজনের কোন একটা জায়গায় মেলামেশার মধ্যে দিয়ে খানিকটা নির্দোষ আনন্দ লাভ করা।

শুধুমাত্র নির্দোষ খানিকটা আনন্দই ? আর কিছু নয় ? জিজ্ঞাসা করে কিরীটী।

না। আমি যতদূর জানি তাই।

কিন্তু এখানে ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা আছে ? ফ্ল্যাশও চলে শুনেছি ? কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে।

তা চলে একটু-আধটু।

একটু-আধটু নয়। পুরোপুরি নাইট ক্লাবই এটা একটা।

নাইট ক্লাব বলে আপনি ঠিক কি মীন করতে চাইছেন জানি না মিঃ রায়, তবে

আপনাদের তথাকথিত আইনভঙ্গের কোন ব্যাপারই এখানে ঘটে না। সেটা ভাল করে খোঁজ নিলেই একটু জানতে পারবেন। বলে আবার একটা কাশির ধমক যেন সামলে নিলেন মিঃ চক্রবর্তী।

নাইট ক্লাব বলতে ঠিক যা মীন করে আমিও ঠিক তাই মীন করেছি মিঃ চক্রবর্তী। কিন্তু যাক সে কথা। আপনার এখানকার কাজটা কি পেইড? না অনারারী?

সম্পূর্ণ অনারারী, মিঃ রায়।

তাহলে এ সংঘের ওপর আপনারও একটা অন্তরের টান আছে বলুন। নইলে প্রতি রাত্রে এই বয়সে, বিশেষ করে আপনার এ নানাবিধ রোগজর্জর দেহ নিয়ে—সাড়ে নটা থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত এখানে চেয়ারে বসে থাকেন কি করে?

আর একটা কাশির দমক সামলে নিয়ে মিঃ চক্রবর্তী বললেন, তা যে একেবারে নেই, বললে মিথ্যাই বলা হবে মিঃ রায়। কথাটা তাহলে খুলেই বলি। বিয়ে-থা করিনি, বাপ-পিতামহ জমিদারি করে বেশ কিছু অর্থও রেখে গিয়েছিল, একমাত্র বংশধর তাদের আমি। চিরকাল হেসে-খেলে স্ফূর্তি করেই কাটিয়ে বছর সাতেক আগে গাঁয়ের বসবাস তুলে দিয়ে কলকাতায় যখন চলে আসি, সময় কাটছিল না। সেই সময়ই এখানকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুখময়বাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এখানে এসে ঢুকি।

হুঁ, তারপর?

পরে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এরা সকলে মিলে আমাকে ধরে বসল, প্রেসিডেন্টের পদটা আমাকেই নেবার জন্য। ভাবলাম মন্দ কি, এমনিতেই তো এ বয়সে ঘুম কম। সময়টা কাটানো যাবে।

তা বেশ করেছেন। সময় ভালই কাটাচ্ছেন, কি বলেন? প্রশ্ন করলেন আবার রজত লাহিড়ী।

আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ যদি শেষ হয়ে থাকে—

হ্যাঁ, আপাততঃ আপনি যেতে পারেন। বললে কিরীটী। কেবল একটা প্রশ্ন, সামনের শনিবার অশোক রায়ের সঙ্গে মিত্রা দেবীর বিবাহের সব স্থির হয়েছিল জানেন কিছু?

না।

এবার এলেন মহারানী সুচরিতা দেবী।

বসুন মহারানী ঐ চেয়ারটায়। রজত লাহিড়ী বললেন।

মহারানী চেয়ারে বসবার পর কিরীটী প্রশ্ন করল, আপনিই প্রথমে মিত্রা সেনের মৃতদেহ দেখতে পান, তাই না?

আমিই প্রথমে সকলকে হলঘরে এসে জানাই।

লক্ষ্য করলাম প্রশ্নটার জবাব একটু ঘুরিয়ে দিলেন মহারানী।

আজ রাত্রে কখন আপনি এখানে আসেন ?

রাত পৌনে নটা হবে বোধ হয় তখন।

আপনি যখন হলঘরে এসে ঢোকেন আর কেউ সে ঘরে ছিলেন ?

ছিল।

মনে আছে আপনার, কে কে ছিলেন তখন হলঘরে ?

হ্যাঁ, শ্রীমন্ত পাল, সুমিতা চ্যাটার্জী, নিখিল ভৌমিক, রমা মল্লিক আর সুপ্রিয় গাঙ্গুলী।

আর কেউ ছিল না ?

না।

তারপর আপনি হলঘর থেকে কখন বেরিয়ে যান ?

মিনিট পনের বাদেই।

মানে সওয়া নটা নাগাদ বলুন ?

ঐ রকমই হবে।

কোথায় যান হলঘর থেকে বের হয়ে ?

বার-রুমে।

সেখানে কতক্ষণ ছিলেন ?

মিনিট পনের-কুড়ি হবে। মাথাটা সন্ধ্যা থেকেই ধরেছিল তাই বার-রুমে গিয়ে একটা রাম ও লাইম খেয়েও যখন মাথাটা ছাড়ল না, বাগানে গিয়েছিলাম একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরতে।

সঙ্গে সে সময় আপনার কেউ ছিল, না একাই গিয়েছিলেন বাগানে ?

একাই গিয়েছিলাম।

বার-রুমে যখন আপনি যান সে সময় সে ঘরে আর কেউ ছিল ?

ছিল।

কে ?

রঞ্জন রক্ষিত আর বিশাখা চৌধুরী।

আর কেউ ছিল না ?

না।

অশোক রায় বা মিত্রা সেনকে তাহলে আপনি হলঘর বা বার-রুমে কোথাও আজ দেখেননি ?

না।

বেশ। তারপর বলুন বাগানে গিয়ে আপনি কি করলেন ?

বাগানের মধ্যে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াই, তারপর দক্ষিণ দিকের ঐ কুঞ্জের কাছাকাছি যেতেই মনে হল—

কি, থামলেন কেন ? বলুন—কিরীটী তাড়া দিল মহারাণীকে।

মনে হল একটা যেন দ্রুত পদশব্দ বাঁ-দিককার বড় ঝোপটা বরাবর মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে সময় অতটা খেয়াল হয়নি।

কেন ?

কারণ বাগানে তো অনেকেই যেত, তাই ভেবেছিলাম হয়তো কেউ—

তারপর বলুন।

আর একটু এগুতেই আবছা চাঁদের আলোয় হঠাৎ নজরে পড়ল, বেঞ্চের উপর একাকী বসে আছে যেন কে! প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তাছাড়া যে বসেছিল তার সামনাসামনি যাবারও আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না। ফিরে আসছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন মনটার মধ্যে কিন্তু বোধ হওয়ায় যে বসে ছিল তার বসবার বিশেষ ভঙ্গীটি দেখে এগিয়ে গেলাম আরও একটু কাছে। এবারে মনের কিন্তুটা যেন আরও স্পষ্ট হল। যে বসে আছে, তার মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে যেন কি এক অসহায় ভঙ্গীতে। কাছে এগিয়ে যেতে এবারে চিনতেও পেরেছিলাম, সে আর কেউ নয়, মিত্রা সেন। কয়েক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম তার দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে। সাড়া দেবার জন্য গলা-খাঁকারি দিলাম। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। এবারে কেমন একটু যেন বিস্মিতই হলাম। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, মিস্ সেন! কোন সাড়া নেই তবু। এই পর্যন্ত বলে মহারাণী থামলেন।

বলুন, তারপর ? আবার কিরীটী তাগিদ দিল।

আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে এবারে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকলাম মিস্ সেন! মিস্ সেন! তবু সাড়া নেই। যেমন তিনি বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে বসেছিলেন তেমনই রইলেন।

ঘুমিয়ে পড়েননি তো ভেবে হাত বাড়িয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, মিস্ সেন! মিস্ সেন! না। তবু সাড়া নেই। এবারে কেন জানি না হঠাৎ গা-টা যেন আমার কেমন ছমছম করে উঠল। চারদিকে একবার তাকালাম। আশেপাশে কেউ নেই। কেবল চাঁদের আলো ও অন্ধকারে আবছা একটা আলোছায়ার থমথমানি। ঠিক সেই মুহূর্তে কী আমার মনে হয়েছিল জানি না।

পরক্ষণেই আঙুল দিয়ে তার কপাল স্পর্শ করতেই যেন মনে হল, কোনও মানুষের জীবন্ত শরীর নয়, অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রাণহীন কি একটা স্পর্শ লাগল আমার আঙুলের ডগায়। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার। বলতে বলতে হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতেই আবার শিউরে উঠে মহারাণী কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত চাপা কণ্ঠে বললেন, that uncanny sensation! I will never forget and I can't explain you even what it was!

হঠাৎ চুপ করে গেলেন মহারাণী।

সকলেই আমরা মহারাণীর ভয়-বিহ্বল মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছি। স্তব্ধ ঘরটার মধ্যে কেবল ওয়াল-ক্লকের পেণ্ডুলামটার একঘেয়ে টকটক শব্দ হয়ে চলেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যেই কেটে গেল।

বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তারপর আবার মহারানী বলতে শুরু করলেন, এবং যখন সম্বিৎ ফিরে এল হঠাৎ যেন মনে হল, মিস সেন বেঁচে নেই। সে মৃত। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধশ্বাসে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসি। সোজা একেবারে হলঘরে এসে ঢুকি। Now I find she is really dead! সত্যিই সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু এখনও যেন আমি ভাবতে পারছি না, মিঃ রায়, কী করে এ দুর্ঘটনা ঘটল, আর কেনই বা ঘটল; কেন সে আত্মহত্যা করল!

কিন্তু আত্মহত্যা তো নয় মহারানী! বললে কিরীটী।

চমকে তাকলেন মহারানী কিরীটীর মুখের দিকে। প্রশ্ন করলেন, আত্মহত্যা নয়? তবে—

নিষ্ঠুর হত্যা। Cold-blooded murder!

মার্ডার! She has been murdered! এ আপনি কী বলছেন, মিঃ রায়! How impossible!

আমার ধারণা আমি ঠিকই বলেছি। মিস সেনকে হত্যাই করা হয়েছে মহারানী।

কিন্তু কে তাকে হত্যা করবে, আর কেনই বা করবে? She was so nice! So charming! সকলেই তাকে ভালবাসত।

আপনি হয়ত জানেন না মহারানী, বুকভরা ভালবাসার অমৃত থেকেই অনেক সময় বিষের ফেনা গেঁজিয়ে ওঠে। তাছাড়া এখানে আপনারা যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের কার মনে কোন গোপন ভালবাসা, ব্যর্থতা, ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষ জমা হয়ে আছে তাই বা জানবেন কি করে?

কিন্তু—

না, মহারানী! তা যদি না হত তো এমনি নিষ্ঠুর হত্যা তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেত না। কিন্তু থাক সে কথা। আজ এই মুহূর্তে না হলেও জানতে আমরা পারবই। আর একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করব।

বলুন।

জানতেন কি, অশোক রায় ও মিত্রা সেনের মধ্যে বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল?

Absurd, impossible! বিশ্বাস করি না আমি।

সত্যিই হয়ে গিয়েছিল, রেজেষ্ট্রি অফিসে তাদের নাম পর্যন্ত রেজেষ্ট্রি হয়ে গিয়েছিল।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ। একবর্ণও মিথ্যে নয়, যা আমি বললাম।

আশ্চর্য তো!

মাত্র একটি শব্দই নির্গত হল মহারানীর কণ্ঠ হতে।

মহারানীর চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত আশ্চর্য শব্দটি ও সেই মুহূর্তের তাঁর চোখ ও মুখের চেহারা স্পষ্টই যেন আমার কাছে ব্যক্ত করল। বিস্ময়ই নয় আরও একটা কিছু সেই সঙ্গে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী যেন বুঝে উঠতে পারলাম না।

পরমুহূর্তে আবার কিরীটী প্রশ্ন করল মহারানীকে, তা এতে আশ্চর্য হবার কি আছে মহারানী? এতদিন পরে হয়ত মিস সেন তাঁর জীবনের যোগ্য সাথী খুঁজে পেয়েছিলেন তাই তাঁরা বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন।

আজ যখন মিত্রা বেঁচে নেই তখন আসল কথাটা বলতে আর আমার দ্বিধা নেই মিঃ রায়। মিত্রাকে আমি দীর্ঘদিন থেকে জানি। একসময় she was my class-mate। সেই থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়। পুরুষ জাতটার প্রতিই she had a peculiar complex.

কি রকম?

সে বলতো পুরুষের জন্মই নাকি মেয়েদের মন যোগানোর জন্য এবং যে কোন পুরুষের চোখের সামনেই দেহের প্রলোভন তুলে তাকে নাচানো যেতে পারে। আর সেইটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র নিষ্ঠুরতম খেলা। বা সেই নিষ্ঠুরতম খেলার মধ্যে দিয়ে আনন্দলাভ করাটাই একমাত্র নেশা! স্ত্রীলোক হয়ে জন্মেও সে যে কত বড় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম। আর সেই নিষ্ঠুর খেলায় শুধু অশোক রায় কেন, তার আগে অসীম বোস, সুধীর মিত্র প্রভৃতি কতজনার যে সে সর্বনাশ

করেছে সে তো আমার অজানা নয়।

কথাগুলো বলতে বলতে একটা অবিমিশ্র ঘৃণা যেন মহারানীর কণ্ঠ হতে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। আমরা সকলেই নিঃশব্দে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর কথাগুলো শুনছিলাম। কয়েকটা মুহূর্ত থেমে আবার মহারানী বলতে লাগলেন, তাই বলছিলাম, অশোক রায় মিত্রার মৃত্যুর কথা জানতে পারলে আজ দুঃখ পেলেও পরে একদিন বুঝতে পারবে মিত্রার মৃত্যু was a blessing to him in disguise!

॥ পনের ॥

মহারানীর জবানবন্দির পর ঘরে এসে ঢুকলেন শ্রীমন্ত পাল কিরীটীরই নির্দেশে।

শ্রীমন্ত পালকে চেয়ারে বসতে বলে সোজাসুজিই কিরীটী তার প্রশ্ন শুরু করে, আপনি আজ এখানে কখন এসেছেন মিঃ পাল?

আজ অন্যান্য দিনের চাইতে একটু তাড়াতাড়িই এসেছিলাম। বোধ হয় তখন রাত সাড়ে আটটা কি আটটা চল্লিশ হবে।

অন্যান্য দিন আরও দেরিতে আসেন?

হ্যাঁ, অফিসের কাজকর্ম সেরে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে নটা দশটা বেজে যায়।

আচ্ছা, আজ যখন আসেন তখন কাকে কাকে হলঘরে দেখেছিলেন মনে আছে?

হলঘরে তখন তিনজন ছিল। সুমিতা চ্যাটার্জী ও সুপ্রিয় গাঙ্গুলী, আর ছিল ওয়েটার মীরজুমলা।

ওঁরা দুজন বুঝি গল্প করছিলেন?

হ্যাঁ, সুপ্রিয়র next production-এ নায়িকার রোলে অভিনয় করবার জন্য কনট্রাক্ট করেছে সুমিতা, সেই সম্পর্কেই ওঁরা আলোচনা করছিলেন।

আর মীরজুমলা হলঘরে তখন কি করছিল?

ওদের কোল্ড ড্রিঙ্ক দিতে এসেছিল। দিয়ে চলে গেল।

কতক্ষণ তারপর আপনি হলঘরে ছিলেন?

তা ঘণ্টা দুই হবে। সুব্রতবাবু আসা পর্যন্ত।

ঐ সময়ের মধ্যে একবারও আপনি হলঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি!

না।

ঠিক মনে আছে আপনার?

হ্যাঁ।

মহারানী সুচরিতা দেবী কখন হলঘরে আসেন মনে করে বলতে পারেন ?

বোধ হয় তখন রাত নটা আন্দাজ হবে। সঠিক আমার মনে নেই।

আচ্ছা বাইরে থেকে কি তিনি হলঘরে এসে ঢোকেন ?

না। মনে হচ্ছে দু'নম্বর দরজা দিয়েই যেন হলঘরে এসে ঢুকতে তাঁকে আমি দেখেছিলাম।

সঠিক আপনার মনে আছে ? ভেবে আর একবার ভাল করে বলুন মিঃ পাল !

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে মিঃ পাল এবারে বললেন, হ্যাঁ, আমার মনে আছে। দু নম্বর দরজা দিয়েই তিনি হলঘরে ঢুকেছিলেন।

হুঁ। একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, তারপর কতক্ষণ তিনি হলঘরে ছিলেন মনে আছে ?

তা মিনিট দশ-পনেরোর বেশী হবে বলে মনে হয় না।

আচ্ছা সুব্রত হলঘরে পৌছনোর আগে পর্যন্ত আর কাকে কাকে তাহলে আপনি এখানে আসতে দেখেছেন মিঃ পাল ?

এক এক করে সকলেই এসেছেন তারপর, রমা মল্লিক, মনোজ, সুধীরঞ্জন, নিখিল ভৌমিক—

আর কাউকে আসতে দেখেননি ? মিত্রা সেন, অশোক রায় বা বিশাখা চৌধুরীকে ?

অশোক রায় বা মিত্রা সেনকে দেখিনি, তবে বিশাখা চৌধুরী বোধ হয় আমারও আগেই এসেছিলেন মহারানীর মতই। কারণ মনে পড়ছে তাঁকেও মহারানীর আগেই দু'নম্বর দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম।

আচ্ছা, ওদের দুজনের মধ্যে কে আগে হলঘরে ঢুকেছিল দু'নম্বর দরজা দিয়ে মিঃ পাল, মহারানী, না বিশাখা চৌধুরী ?

আগে বিশাখা, তার মিনিট কয়েক পরেই মহারানী ঢোকেন হলঘরে।

আচ্ছা মিঃ পাল, আপনি কতদিন এই সংঘে যাতায়াত করছেন ?

তা বছর তিনেক তো হবেই।

তাহলে তো দেখছি আপনি এই বৈকালী সংঘের একজন পুরাতন মেম্বার ?

তা বলতে পারেন একদিক দিয়ে। তবে আমার চাইতে পুরাতন মেম্বার এখানে আরও আছেন।

আপনার চাইতেও পুরাতন মেম্বার এখানে আর কে কে আছেন মিঃ পাল ?

প্রথমেই ধরুন মহারানী। বলতে গেলে She is the oldest ! তাঁর সমসাময়িক

ছিলেন মিত্রা সেন। শুনেছি দু-চার মাস এদিক-ওদিক এখানে এসেছেন তাঁরা। তারপর শুনেছি মীরা চৌধুরী, তিনিও আমার আগেই এসেছেন এখানে।

মীরা চৌধুরী? তাঁকে কখনও এখানে আজ পর্যন্ত দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না মিঃ পাল! কথাটা এবার বললাম আমিই।

আমার দিকে ফিরে তাকালেন শ্রীমন্ত পাল। তারপর মৃদু হেসে বললেন, না সুব্রতবাবু দেখেননি। কারণ তিনি মাস দুই হবে এখানে আর আসছেন না।

কেন? এ সংঘ কি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন? প্রশ্নটা করলে কিরীটী।

তা ঠিক বলতে পারি না, মিঃ রায়। আপনার এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট।

কি রকম? কাউকে এখান থেকে সরাতে হলে কি আপনাদের প্রেসিডেন্টই final authority?

সেই রকমই তো আমার মনে হয়। কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে শ্রীমন্ত পাল বললেন।

কেন?

কারণ এখানকার ভাল-মন্দ শুভাশুভের জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট যতখানি দায়ী আর কেউ ততখানি দায়ী বলে তো আমার মনে হয় না।

আর একটা কথা মিঃ পাল, এই বাড়িতে প্রবেশের মেইন গেট ছাড়া অন্য কোন দ্বারপথ আছে বলে আপনি জানেন?

যতদূর জানি প্রবেশ ও নির্গমের এ বাড়িতে একটিমাত্র দ্বার ছাড়া দ্বিতীয় কোন দ্বারপথ নেই মিঃ রায়।

তারপর আবার কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার মধ্যেই কেটে যায়।

উপস্থিত ঘরের মধ্যে সকলেই যেন অত্যন্ত চুপচাপ।

হঠাৎ আবার সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই কথা বলে।

বললে, হ্যাঁ, ভাল কথা মিঃ পাল, আপনি জানতেন কি মিত্রা সেন ও অশোক রায়ের বিবাহের সব স্থির হয়ে গিয়েছিল?

সে কি! কই না! রীতিমত একটা বিস্ময়ের সুরই যেন প্রকাশ পায় মিঃ পালের কণ্ঠস্বরে।

জানতেন না? শোনেননি?

না। এই প্রথম শুনছি। আর শুনলেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

কেন বলুন তো?

মিত্রা সেন কাউকে কোনদিন বিবাহ করতে পারতেন এ আমি ভাবতেও পারি না মিঃ রায়।

ভাবতেও পারেন না! কিন্তু কেন বলুন তো মিঃ পাল?

কারণ তিনি ছিলেন আমার মতে এমন এক জাতীয় মেয়েমানুষ যাঁরা ঠিক অনেকটা হংসের মত, সর্বক্ষণ জলে থাকলেও গায়ে জলবিন্দুটিও বসে না। পুরুষজাতটার সব কিছুই তাঁর কাছে ছিল ঐ জলেরই মত।

হুঁ, আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন মিঃ পাল। হ্যাঁ, দয়া করে নীচের তলায় যে বেয়ারাটি থাকে তাকে যদি একবার পাঠিয়ে দেন! কি যেন তার নামটা?

আপনি শশীর কথা বলছেন? আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নীচের রিসেপশন রুমের বেয়ারা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে স্যার শশী হাজরা।

তোমার ডিউটি নীচের রিসেপশন ঘরে বুঝি? কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে।

হ্যাঁ স্যার।

কতক্ষণ থাকতে হয় তোমার সেখানে?

রাত আটটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত।

প্রতি রাত্রেই তুমি থাক?

হ্যাঁ।

তোমার কোনরকম অসুখ-বিসুখ করলে?

আজ পর্যন্ত কখনও হয়নি স্যার।

এখানে তুমি কতদিন কাজ করছ শশী?

সাত বছর স্যার।

সাত বছর! 'মিঃ চক্রবর্তী শুনেছি এখানকার প্রেসিডেণ্ট গত সাত বছর ধরে। তুমি আর তিনি কি তাহলে একসঙ্গেই এখানে আস? কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। প্রেসিডেণ্টই আমাকে আর মীরজুমলাকে এখানে কাজ দেন স্যার।

তোমাদের দুজনকে বুঝি তিনি আগে থাকতেই চিনতেন?

হঠাৎ এবারে কিরীটীর প্রশ্নে শশী যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়, এখানকার দারোয়ানের মুখে এখানে লোকের

প্রয়োজন শুনে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করি, তিনি তখন কাজ দেন।

দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার এখানে কাজ হয়ে গেল, সঙ্গে কারও জোরালো সার্টিফিকেট ছিল বুঝি তোমার শশী ?

সার্টিফিকেট !

হ্যাঁ ?

কই না !

তবে এমন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানে চাওয়া মাত্রই কাজ পেয়ে গেলে ? আগে কোথায় কাজ করতে ?

আগে আর কোথায়ও কখনও কাজ করিনি।

এইখানেই প্রথম ?

হ্যাঁ।

ভাগ্যবান তুমি শশী ! এই চাকরির অভাবের বাজারে চাওয়া মাত্রই কাজ পেয়ে গেলে ! তা মাইনে কত পাও ?

ষাট টাকা।

তুমি দেখছি ডবল ভাগ্যবান ! তা থাক কোথায় ? কোথাকার লোক তুমি ? এর আগে কলকাতাতেই বরাবর ছিলে নাকি ?

পর পর কিরীটীর প্রশ্নগুলো যেন শশী হাজরাকে বেশ একটু বিচলিত করে তোলে। কিন্তু লোকটা দেখলাম বেশ চালাক-চতুর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ভাগ্যবান যদি বলেন তো স্যার, তাও আপনাদেরই শ্রীচরণের দয়া। আপনারা শ্রীচরণে আশ্রয় না দিলে কে আমাদের মত গরিব-দুঃখীকে দেখবে বলুন ? প্রেসিডেণ্ট সাহেব এখানকার বিচক্ষণ ও মহৎ। মানুষ চেনেন তিনি। চাকরির আগে অবিশ্যি থাকতাম বেলেঘাটায় এক বস্তিতে। তারপর এখানে চাকরি হবার মাস দুই পর থেকে এখানেই থাকবার হুকুম পেয়েছি। এখন এখানেই থাকি। বাড়ি আমার মেদিনীপুর জেলায়, পাঁশকুড়া থানা।

হুঁ। আর মীরজুমলা ? সেও এখানেই থাকে ?

হ্যাঁ। নীচের ঘরে, আমি, দারোয়ান, মীরজুমলা—তিনজনে থাকি।

আচ্ছা শশী, বলতে পার আজ কে কে এখানে এসেছিলেন রাত্রে ? এবং পর পর কে কখন এসেছেন ?

ঠিক তো স্মরণ নেই স্যার ! কে কখন এসেছেন—

যতটা পার স্মরণ করেই বল।

শশী হাজরা অতঃপর মনে মনে কী যেন ভেবে নিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে থেমে থেমে বলতে শুরু করলে—

সর্বপ্রথমে আসেন মিস সেন। তারপর—

মানে মিত্রা সেন?

হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর বিশাখা চৌধুরী, তারপর বোধ হয় অশোকবাবু। তারপর—

অশোকবাবু তাহলে আজ রাত্রেও এসেছিলেন? বাধা দিল কিরীটী।

হ্যাঁ স্যার।

কখন তিনি আবার তাহলে চলে গিয়েছেন?

তা রাত তখন পৌনে নটা হবে বোধ হয়।

আচ্ছা মনে করে বলতে পার তিনি কখন এসেছিলেন আজ এখানে?

রাত আটটার দু-পাঁচ মিনিট পরেই হবে স্যার।

কি করে বুঝলে?

তারই কিছু আগে নীচের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত আটটা বাজতে শুনেছিলাম। তাতেই মনে আছে স্যার সময়টা।

হ্যাঁ। আর মিত্রা সেন?

তার মিনিট দশেক পরে।

আর বিশাখা চৌধুরী?

তার দু-পাঁচ মিনিট পরেই।

মহারাণী কখন এসেছেন?

ঐ বিশাখা চৌধুরীর কয়েক মিনিট বাদেই স্যার।

তোমাদের প্রেসিডেন্ট?

রাত দশটায়।

সাধারণতঃ রাত কটা নাগাদ তোমাদের প্রেসিডেন্ট এখানে আসেন শশী?

তার কোন ঠিক নেই। তবে পৌনে দশটা থেকে দশটার মধ্যেই আসেন বরাবর দেখছি।

আচ্ছা শশী, বলতে পার, এখানে যাঁরা আসেন সাধারণতঃ তাঁদের ভেতরে ঢুকতে হলে কি ওপরের হলঘরের মধ্যে দিয়েই ঢুকতে হয়?

না। তা কেন হবে? হলঘরের দরজার মুখেই ডান দিকে যে ঘরটা আছে, তার

মধ্যে দিয়েও ঢুকে প্যাসেজ দিয়ে আর একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে চার নম্বর দরজা দিয়েও তো ইচ্ছে করলে হলঘরে ঢুকতে পারা যায় স্যার। প্রেসিডেন্টের ঘর থেকেও তিন নম্বর বা চার নম্বর দরজা দিয়েও হলঘরে ঢোকা যায়। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব তো কখনও হলঘর দিয়ে ঢোকেনই না স্যার। ঐ প্যাসেজ দিয়ে সোজা তাঁর ঘরে চলে যান। আবার সেই রাস্তা দিয়েই বের হয়ে আসেন।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পার, মীরজুমলাকে এবারে পাঠিয়ে দাও।

সেলাম জানিয়ে শশী বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

শশী ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই পকেট থেকে কাগজের উপরে আঁকা ঐ বাড়িটার একটা নকশা বের করে আমি কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, এই নে কিরীটী, আমি এ বাড়ির একটা নকশা গতকাল বসে বসে এঁকেছিলাম। এ বাড়ির সব কিছু সন্ধান এর মধ্যেই পাবি।

কিরীটী আমার হাত থেকে নকশাটা নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল। থানার ও. সি. রজত লাহিড়ীও নকশার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

পদশব্দ শোনা গেল আবার দরজার ওপাশে। নকশার উপরে চোখ রেখেই কিরীটী বললে, মীরজুমলাকে আসতে বল্ সুব্রত ঘরে।

আমিই মীরজুমলাকে ঘরে ডাকলাম।

॥ ষোল ॥

তোমার নাম মীরজুমলা? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

জী!

দেশ কোথায়?

ঢাকা জিলা।

বাঙালী তুমি?

হ্যাঁ।

তুমি আর শশী এখানে সাত বছর কাজ করছ, তাই না?

শশী বলেছে বুঝি?

যেই বলুক, কথাটা সত্যি কিনা?

একটু ইতস্ততঃ করে মীরজুমলা বললে, হ্যাঁ।

তবে একটু আগে ও কথা বললে কেন মীরজুমলা ?

আজ্ঞে মানে লোকটা বড় মিথ্যাবাদী কিনা তাই—

হুঁ, আচ্ছা আজ রাত্রে এখানে অশোক রায় এসেছিলেন ?

হাঁ।

মিস সেনের আগে না পরে ?

কয়েক মিনিট পরেই বোধ হয়।

তারপর অশোক রায় কখন চলে যান জান কিছু ?

না। দেখিনি।

অশোক রায় ও মিত্রা সেনকে তুমি কোথায় দেখ ?

মিস সেন এসেই নীচে বাগানে চলে যান, আমি তখন হলঘরে। যাবার সময় বলে যান আমাকে, অশোকবাবু এলে তাঁকে বাগানে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

অশোক রায় এলে তুমি বলেছিলে তাকে সে কথা ?

হ্যাঁ। বলেছি বৈকি।

তুমিই তো এখানে সকলকে ড্রিঙ্ক সরবরাহ কর মীরজুমলা ?

হাঁ।

মিত্রা সেন ড্রিঙ্ক করতেন ?

না।

কখনও ড্রিঙ্ক করেননি ?

না।

অশোক রায় ?

করতেন মধ্যে মধ্যে।

মহারানী ?

করতেন প্রত্যহ।

বিশাখা চৌধুরী ?

প্রত্যহ করতেন।

আজ ওঁরা কেউ ড্রিঙ্ক করেছিলেন ?

বিশাখা চৌধুরী ও মহারানী করেছেন।

তুমি দেখেছিলে আজ মহারানী ও বিশাখ চৌধুরীকে আসতে ?

মহারানীকে দেখেছি কিন্তু বিশাখা চৌধুরীকে দেখিনি।

কেন ? তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

www.boiRboi.blogspot.com

বারে।

আচ্ছা আপাততঃ তুমি যেতে পার। রঞ্জনবাবুকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।

মীরজুমলা চলে গেল।

মীরজুমলা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই কিরীটী লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বললে, লাহিড়ী সাহেব, প্রত্যেককে আমি আমার যা জিজ্ঞাসা করবার জিজ্ঞাসা করছি বলে আপনার কাউকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে কিন্তু চুপ করে থাকবেন না।

না, না—আপনিই জিজ্ঞাসা করুন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করে যাচ্ছি প্রত্যেকের জবানবন্দি। সেরকম কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু আপনি যেখানে জিজ্ঞাসা করছেন সেখানে কোন প্রশ্ন তোলার কোনরকম প্রয়োজন থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। মৃদু হেসে কথাটা শেষ করেন লাহিড়ী।

তাই বলে সব দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চাপাবেন নাকি?

এতবড় সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে নাকি। হাসতে হাসতে জবাব দেন লাহিড়ী আবার।

আসুন রঞ্জনবাবু!

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করলেন তাঁকে আহ্বান জানাল কিরীটী।

রোগাটে চেহারার ভদ্রলোক, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট দু-তিন ইঞ্চির বেশী হবে না। পরিধানে দামী সুট। বেশভূষা ও চেহারার মধ্যে একটা সযত্নরক্ষিত পরিচ্ছন্নতা। বয়স চল্লিশের কোঠা প্রায় পার হতে চলেছে বলেই মনে হয়।

মাঝখানে সিঁথি করে চুল ব্যাকব্রাশ করা। ছোট কপাল, চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ ও সজাগ। নাকটা একটু চাপা।

রঞ্জন রক্ষিত ঘরে ঢুকেই বললে, হলঘরে ওঁরা সব অস্থির হয়ে উঠেছেন। কতক্ষণ আর তাঁদের এভাবে আপনারা আটকে রাখতে চান, ওরা জানতে চাইছেন।

জবাব দিল কিরীটীই, সুব্রত, ওঘরে গিয়ে বলে আয় যাঁদের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে তাঁরা আপাততঃ যেতে পারেন বটে যে যাঁর বাড়ি কিন্তু পুলিস কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে আপাততঃ তাঁরা কেউ কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবেন না। কি বলেন লাহিড়ী সাহেব?

হ্যাঁ, তাই বলে আসুন সুব্রতবাবু। আর অসুবিধা না হলে প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে নেবেন ওঁরা যাবার আগে।

বললাম, প্রত্যেকের ঠিকানা তো প্রেসিডেন্টের খাতা থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

তবে তো কথাই নেই, they can go now। যেতে পারেন তাঁরা।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে পাশের হলঘরে গিয়ে ঢুকলাম কিরীটীর তথা লাহিড়ী সাহেবের নির্দেশটা জানিয়ে দেবার জন্য।

ঘরের মধ্যে ছত্রাকারভাবে বৈকালী সংঘের মেম্বাররা সকলে এদিক-ওদিক বসে ফিসফিস করে কি যেন সব আলোচনা করছিলেন পরস্পর নিজেদের মধ্যে, আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই অকস্মাৎ তাঁদের আলোচনার গুঞ্জনটার মধ্যে যেন একটা ছেদ পড়ল। বুঝলাম পরস্পরের মধ্যে আলোচনারত প্রত্যেকেরই মনটা পড়েছিল এক নম্বর দরজার দিকেই। যুগপৎ অনেকগুলো চোখের সপ্রশ্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন এসে সর্বাঙ্গে ছুঁচের মত বিদ্ধ হল।

আমি গম্ভীর হয়ে মৃদুকণ্ঠে রজত লাহিড়ীর তথা কিরীটীর নির্দেশটা জানিয়ে দিয়েই সকলের মুখের উপর দিয়েই দ্রুত দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলাম।

আমার কথার কেউ কোন জবাব না দিলেও অনেকের মুখেই যে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল সেটা আমার দৃষ্টিকে এড়াল না।

নিঃশব্দে যেমন আমি হলঘরে প্রবেশ করেছিলাম তেমনিই নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এসে পূর্বোক্ত বার-রুমে ঢুকলাম।

॥ সতেরো ॥

ঘরে ঢুকি শুনি রঞ্জন রক্ষিত কিরীটীর কোন একটা প্রশ্নের জবাবে তখন বলছেন, সে আপনি যাই বলুন না মিঃ রায়, আমি তবু বলব রীতিমত এটা একটা টরচার। বিশেষ করে এখানে যাঁরা মহিলারা উপস্থিত আছেন, just think of them. ভেবে দেখুন তাঁদের কথা।

কিন্তু এভাবে প্রশ্ন না করা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি বলুন মিঃ রক্ষিত। কিরীটী বলে।

কেন, আপনারা কি মনে করেন এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে কেউই মিস সেনকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়ে তাঁর হাতে বিষের পাত্র তুলে দিয়েছিল? তাই যদি ভেবে থাকেন তো বলব, এটা যেমন অ্যাবসার্ড তেমনি হাস্যকর। ভুলে যাবেন না মিঃ রায়, এখানে যাঁরা আছেন বা আজ রাত্রে উপস্থিত আছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা বংশপরিচয়, সমাজ ও শিক্ষা, কৃষ্টির ঐতিহ্য আছে। প্রত্যেকেই তাঁরা কালচার্ড সোসাইটি থেকে এসেছেন।

কথাটা আমি আপনার নিশ্চয় অবিশ্বাস করছি না মিঃ রক্ষিত। কারণ প্রথমতঃ যে দুর্ঘটনার সঙ্গে আপনারা সকলে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবেই বলুন জড়িত হয়ে পড়েছেন আজ এখানে সেটা আইনের চোখে অপরাধমূলক বলেই এ ধরনের জবানবন্দি পুলিসের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে আপনারা বাধ্য, তা সে আপনাদের ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য ইচ্ছে করলে আপনারা চুপ করে থাকতে পারেন, যেটা বলব সম্পূর্ণ যে যার আপনাদের নিজ নিজ রিস্কে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা সমাজ বা পরিচয়ের যে নজির আপনি তুলেছেন তার জবাবে এইটুকুই আমি বলতে পারি, পাপকে কি আজও আমরা শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজ-পরিচয়ের দিক থেকে গণ্ডী দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছি? কিন্তু যাক সে কথা, আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব পেলে সুখী হব।

সে আপনি চাইবেন না কেন মিঃ রায়, আমি কিন্তু তবু বলব মানুষের নার্ভের ওপরে এ আপনাদের নিছক একটা জুলুম।

জুলুম!

নিশ্চয়ই।

জুলুম যদি হয় তো মিঃ রক্ষিত আমার প্রশ্নগুলোর জবাব আপনাদের কাছ থেকে আমার পাবার চেষ্টা করতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে আপনি আমার সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে রাজী আছেন কিনা?

মুহূর্তকাল গম্ভীর হয়ে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে মিঃ রক্ষিত নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, বেশ বলুন, কি জানতে চান আপনারা আমার কাছ থেকে?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে এবারে মৃদু হেসে তার প্রশ্ন করল। বললে, আজ রাত্রে আপনি কখন এখানে এসেছেন?

আমি এখানে মশাই নিয়মিত যাকে বলে আসি না। মধ্যে মধ্যে আসি।

সে প্রশ্ন তো আপনাকে আমি করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করেছি আজ রাত্রে কখন আপনি এসেছেন?

তা ঠিক সময়টা আবার মনে নেই।

আন্দাজ করেই না হয় বলুন। দু-চার মিনিট এদিক-ওদিক হলেই বা।

মুশকিলে ফেললেন মশাই। এমনি করে আজ সময়ের জবাবদিহি করতে হবে জানলে কারেক্ট টাইমটাই দেখে রাখতাম।

বেশ। আপনাকেই আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মিঃ রক্ষিত, একটা ব্যাপার আজকের রাত্রের; তা থেকে হয়ত আজ রাত্রে এখানে কখন এসেছেন টাইমটা আপনার মনে পড়তে

পারে। রাত নটা নাগাদ আজ আপনি ও বিশাখা চৌধুরী বার-রুমে ছিলেন, মনে পড়ছে?

দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, আমার আজ রাত্রের মুভমেণ্টের অনেক ডিটেলসই তো দেখছি আপনারা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে বসে আছেন। ভাল। তা ছিলাম। বিশাখার সঙ্গে বসে দুটো পেগ ড্রিঙ্ক করেছি বটে এখানে এসে। কিন্তু সেটা যে ঠিক রাত নটার সময়ই তা হলফ করে বলি কি করে বলুন?

বেশ। সে যাক। বার-রুমে যাবার কতক্ষণ আগে আপনি আজ এখানে আসেন? পনের, বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা?

তা বোধ হয় রাত সাড়ে আটটা হবে। দু-চার মিনিট আগে বা পরেও হতে পারে।

আপনি সোজা হলঘরে এসেই ঢোকেন তো?

হ্যাঁ, সেটা আমার মনে আছে।

সে সময় হলঘরে কে কে ছিল আপনার মনে আছে মিঃ রক্ষিত?

বিশাখা চৌধুরী আর অশোক রায় ছিল হলঘরে।

অশোক রায় ছিলেন হলঘরে সে সময়?

তাই আমার মনে হয়। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছিলাম তাকে দু'নম্বর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তার পিছনটা আমি দেখেছিলাম।

তাহলে আপনি সিওর নন যে, তিনিই অশোক রায় কি না?

বা রে! অশোক রায়কে আমি চিনি না? অশোক রায়ই। তার হাঁটবার ভঙ্গীটুকু পর্যন্ত যে আমার পরিচিত।

অশোক রায়ের সঙ্গে তাহলে কি আপনার এই সংঘ ছাড়াও অন্যরকম ভাবে জানা-শোনা ছিল?

ছিল বৈকি। শেয়ার মার্কেটে যাদের যাওয়া-আসা আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয় আছে।

সত্যি! আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আপনি শেয়ার মার্কেটের একজন বিশেষ পরিচিত। আপনার বুঝি অফিস আছে কোন?

হ্যামডেন অ্যাণ্ড রক্ষিত কোম্পানির আমিই তো মেজর শেয়ারহোলডার।

হুঁ, আচ্ছা মিঃ রক্ষিত, আপনার তো শেয়ার মার্কেটের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে। এখানে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন, মানে আপনাদের এখানকার এই মেম্বারদের মধ্যেকার কার কার শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত আছে বা শেয়ার সম্পর্কে কারা ইনটারেস-টেড—নামগুলো যদি বলেন?

এখানকার অনেকেই তো শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে ইনটারেসটেড—অশোক রায়, মনোজ দত্ত, মহারানী, সুধীরঞ্জন, নিখিল ভৌমিক!

আপনাদের প্রেসিডেন্ট?

Do'nt talk about him ; a hopeless fellow! ও জানে শুধু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব করতে আর নিজের ঘরের মধ্যে গুম্ হয়ে নিজের ধার-করা vanity নিয়ে বসে থাকতে!

কিরীটী রঞ্জন রক্ষিতের কথায় মৃদু হাসে। তারপর আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনার অফিসে যাতায়াত আছে বাইরের এমন দু-চারজন ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোকের নাম করতে পারেন?

কেন পারব না! অনেক মহাত্মাই তো শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে ইনটারেসটেড!

যথা?

এই ধরুন না ব্যারিস্টার ব্রজেন সোম, সলিসিটার আর. এন. মিত্র, ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী!

হঠাৎ রঞ্জন রক্ষিতের মুখে ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর নামটা শুনে চমকে ওঠে যেন কিরীটী, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নেয়।

ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীকে আপনি তাহলে চেনেন?

খুব ভালভাবেই চিনি। চমৎকার লোক।

কিন্তু তিনি তো শুনেছি অত্যন্ত busy ডাক্তার। তা তিনি এ সবের সময় পান?

হুঁ। জানেন না তো শেয়ার মার্কেটের একজন পোকা বললেও চলে লোকটাকে! তিনটে-চারটে নাগাদ প্রত্যহ একবার যানই আমার অফিসে। নেহাত না যেতে পারলে টেলিফোন করেন।

যাক সে কথা। আপনি যে একটু আগে বলছিলেন হলঘরে ঢুকে আজ আপনি বিশাখা চৌধুরীকে দেখেছিলেন, তিনি তখন হলঘরে কি করছিলেন?

একটা সোফার ওপরে বসে ছিলেন চুপটি করে। আমার যাবার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন মিঃ রক্ষিত, I was waiting for you! বললাম, সে কি? তার জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন একটু dull লাগছে, কিছু ভাল লাগছে না। চলুন একটু ড্রিঙ্ক করা যাক। যদি আপনার আপত্তি না থাকে। অগত্যা কি আর করি বলুন? একজন ভদ্রমহিলা ড্রিঙ্ক অফার করছেন! দুজনে গিয়ে ঢুকলাম বারে।

তারপর?

তারপর বোধ হয় আধঘণ্টা সেই ঘরেই বসে দুজনে ড্রিঙ্ক করেছি।

আপনারা যে সময় বারে বসে ড্রিঙ্ক করছিলেন তখন মহারানী সে ঘরে এসেছিলেন?

কে, মহারানী?

হ্যাঁ।

মনে হচ্ছে যেন একবার এসেছিলেন।

কতক্ষণ সেখানে ছিলেন মহারানী?

তা ঠিক মনে নেই।

বিশাখা চৌধুরী আপনার সঙ্গে বার-রুমে কতক্ষণ ছিলেন?

মাঝখানে মনে পড়ছে ড্রিঙ্ক করতে করতে মিনিট পনের-কুড়ির জন্য বোধ হয় একবার উঠে যান বার থেকে। তারপর আবার এসে বসেন।

অশোক রায় বা মিত্রা সেনকে সামনাসামনি আপনি আজ রাত্রে একবারও দেখেছেন?

না।

আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন। দয়া করে বিশাখা চৌধুরীকে একবার এ ঘরে যদি পাঠিয়ে দেন—

দিচ্ছি।

রঞ্জন রক্ষিত ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এবারে এলেন ঘরে বিশাখা চৌধুরী।

কিরীটীই তাঁকে আহ্বান জানাল, আসুন মিসেস চৌধুরী, বসুন।

নির্দিষ্ট চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে বিশাখা চৌধুরী একবার তেরছাভাবে তীব্রদৃষ্টিতে যেন আমার দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে সে-সময় আমার প্রতি আর যাই থাক ভালবাসা যে বিন্দুমাত্রও ছিল না সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। এবং কেন জানি না, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলতেই চোখটা আমি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম।

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে আবার চমকে ফিরে তাকালাম।

কিরীটী বিশাখা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বলছে, সুব্রতর ওপরে যেন আপনি অবিচার করবেন না মিসেস চৌধুরী। আপনাকে আমি এ-কথা হলপ করে বলতে পারি, আপনার প্রতি ওর গত কদিনের ব্যবহারের মধ্যে আর যাই থাক, এতটুকু প্রতারণাও ছিল না। আর ছদ্মবেশে ওর এখানে আসাটা ওর নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি, আমারই পরামর্শমত!

থাক। ওঁর কথা আর বলবেন না। একটা যেন অতর্কিত থাবা দিয়েই কিরীটীর বক্তব্যটা অর্ধপথে থামিয়ে দিলেন বিশাখা চৌধুরী। তারপরই বললেন, আপনাদের সমস্ত

ব্যাপারটা তাহলে pre-arranged ! আগে থেকেই সব প্ল্যান করা ছিল !

সত্যি কথা বলতে গেলে, কতকটা 'হাঁ'-ও বটে আবার কতকটা 'না'-ও বটে। যাক সে কথা। আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। যদি অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেন।

সাধ্য হলে দেব।

অবিশ্যি আপনার সাধ্যের বাইরে কোন প্রশ্ন আপনাকে আমি করব না।

দেখুন মিঃ রায়, আমার ঘণ্টাখানেক ধরে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, যা আপনার জিজ্ঞাস্য আছে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে আমাকে ছেড়ে দিলে বিশেষ বাধিত হব।

মিসেস চৌধুরী—

প্লিজ। আমাকে বিশাখা চৌধুরী বলে ডাকলেই বাধিত হব।

স্যরি। আচ্ছা আপনি আজ কখন এখানে আসেন ?

সোয়া আটটা কি আটটা বিশ হবে।

সোজা আপনি হলঘরে এসেই ঢোকেন তো ?

হ্যাঁ।

হলঘরে তখন আর কেউ ছিল ?

ছিল, অশোক রায়।

আর মিত্রা সেন ?

না, তাকে দেখিনি।

মিত্রা সেনকে আজ একবারও দেখেননি ?

না।

মহারানীকে দেখেছিলেন কখন প্রথম ?

ঠিক মনে করে বলতে পারছি না। দুঃখিত।

মহারানীকে হলঘরে এসে মিত্রা সেনের মৃত্যুসংবাদ দেবার আগে একবারও দেখেছেন কি না আপনার মনে পড়ছে না ?

না।

আচ্ছা মিঃ রক্ষিতের সঙ্গে এই ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে আপনি নাকি উঠে বাইরে কোথায় মিনিট পনের-কুড়ির জন্য গিয়েছিলেন, তারপর আবার এই ঘরে ফিরে আসেন, কথাটা কি সত্যি ?

Funny ! কে আপনাকে একথা বলেছে মিঃ রায় ? আমি এ ঘর থেকে বের

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে যাবার পর আর তো এ ঘরে ফিরে আসিনি। আমি এ ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে হলঘরেই ছিলাম।

এ ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার আপনি এ ঘরে ফিরে আসেননি তাহলে?

Certainly not!

কিন্তু যদি বলি আজ রাত্রে মিত্রা সেনের মৃতদেহ বাগানের মধ্যে আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই একবার আপনি কোন একসময় নিচের বাগানে গিয়েছিলেন?

তাহলে বলতে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বাধ্য হব যে, আপনার অনুমানটা বা জানাটা সম্পূর্ণ ভুল!

বিশাখা চৌধুরীর সদম্ভ উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর মুখখানা যেন সহসা কঠিন হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা মৃদু কণ্ঠে এবারে সে বলে, ভুল!

হ্যাঁ।

তারপর কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই যেন এগিয়ে গেল দু'পা উপবিষ্টা বিশাখা চৌধুরীর দিকে এবং হাত বাড়িয়ে তার মাথার কেশ থেকে ছোট পাতা সমেত কামিনীগাছের একটা ভাঙা শাখা টেনে বের করে বলল, মিত্রা সেন যেখানে বেঞ্চের ওপর মৃত অবস্থায় ছিলেন তার পিছন দিকে একটা কামিনীগাছের ঝোপ আছে, আপনার নিশ্চয়ই অজানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু মিত্রা সেনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পর আপনারা যখন সকলে মিলে বেঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, সে সময় কেমন করে এই বস্তুটি আপনার চুলের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে বলতে পারেন! যদি সত্যি আপনার কথাই মেনে নেওয়া যায় যে, সেই সময়ই প্রথম আপনি আজ নীচের বাগানে গিয়েছিলেন!

বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে মুখের কোথায়ও যেন বিন্দুমাত্র রক্ত আর নেই। সমস্ত রক্ত যেন তাঁর মুখ থেকে কে ব্লটিং পেপারে শুষে নিয়েছে। শুধু তাই নয়। কিরীটীর মুখের দিকে স্থাপিত তাঁর দু চোখের বোবা দৃষ্টির মধ্যে সেই মুহূর্তে যে অসহায় করুণ একটা ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন যেন।

ন যযৌ ন তস্থৌ।

কী, জবাব দিন?

বিশাখা চৌধুরীর এতক্ষণের সমস্ত দৃঢ়তা যেন কিরীটীর শেষ প্রশ্নের নির্মম আঘাতে গুঁড়িয়ে একেবারে চুরমার হয়ে গেল।

হঠাৎ দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে চাপা আর্ত করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন এবারে বিশাখা,

বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি—আমি—মিত্রার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জানি না। কিছু জানি না।

কিন্তু নিষ্ঠুর কিরীটী।

পূর্ববৎ কঠিন কণ্ঠেই এবারে সে বললে, আপনি তাহলে মিসেস চৌধুরী স্বীকার করছেন এখন যে, আগে আর একবার আপনি আজ রাত্রে কোন একসময় নীচের বাগানে গিয়েছিলেন?

মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে এবার প্রত্যুত্তর এল ছোট একটিমাত্র শব্দে, হ্যাঁ।

হুঁ। তাহলে এই ঘরে বসে যখন রঞ্জনের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করছিলেন তার আগেই, অর্থাৎ মিঃ রক্ষিতের সঙ্গে দেখা হবার আগেই আপনি একবার বাগানে গিয়েছিলেন!

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি কিছু জানি না। মিত্রার ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।

সত্যিই যদি তাই হয় তো আপনাকে আমি এইটুকুই আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার শঙ্কিত হবারও কোন কারণ নেই। তবে আমি যা-যা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি তার মধ্যে যেন কোন কিন্তু রাখবেন না। সত্য জবাবই দেবেন যা জানেন।

বলুন।

আপনি এখানে এসে সোজা তাহলে বাগানেই যান?

একটু ইতস্তত: করে বিশাখা জবাব দেন, হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? এসেই সোজা বাগানে গেলেন কেন?

অশোককে যেতে দেখেছিলাম।

তার মানে আপনি তাঁকে ফলো করেছিলেন। তাই কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? কেন ফলো করেছিলেন তাঁকে?

প্রত্যুত্তরে এবারে চুপ করে রইলেন মাথাটা নীচু করে বিশাখা চৌধুরী।

কই? জবাব দিন?

একজন আমাকে অশোক ও মিত্রার ওপরে নজর রাখতে বলেছিল।

হুঁ, কে? সে লোকটি কে?

ক্ষমা করবেন আমাকে মিঃ রায়। তার নাম আমি করতে পারব না।

পারবেন না?

না।

কেন? শুনুন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এটুকু বিশ্বাস আমাকে করতে পারেন,

আপনার কাছ থেকে যে নামটা আমি জেনেছি এ-কথা কাউকেই আমি জানাব না। ইচ্ছে করলে আপনি নামটা একটুকরো কাগজেও লিখে আমাকে জানাতে পারেন।

ক্ষমা করবেন। তবু পারব না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তাহলে এই আমি বুঝব যে আপনি বলবেন না ইচ্ছে করেই!

বললাম তো আপনাকে আমার কথা। আপনি এখন যা বোঝেন।

মুহূর্তকাল প্রত্যুত্তরে কিরীটী চুপ করে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, নামটা যখন বলবেনই না বলে আপনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, মিথ্যে পীড়াপীড়ি আর আপনাকে আমি করব না। তবে এটা ঠিকই জানবেন বিশাখা দেবী, এই মুহূর্তে না হলেও তার নাম জানতে খুব বেশী দেরি আমার হবে না। নাম তার আমি জানবই। যাক সে কথা। আপনি নীচে গিয়ে কী করেছিলেন আর কখনই বা ফিরে আসেন?

॥ ষোল ॥

আমি যখন নীচের বাগানে যাই, বলতে লাগলেন বিশাখা চৌধুরী, প্রথমটায় অশোককে কোথায়ও দেখতে পাইনি। তাই ইতস্ততঃ তার সন্ধান করতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে শেষে সেই কামিনী ঝোপের পশ্চাতে গিয়ে উপস্থিত হতেই একটি চাপা সতর্ক নারীকণ্ঠস্বর আমার কানে এল।

নারীকণ্ঠ!

হ্যাঁ।

চিনতে পেরেছিলেন সে নারীকণ্ঠ?

না। কারণ ইতিপূর্বে সে কণ্ঠস্বর কখনও আমি শুনেছি বলে মনে হয় না।

হু। তারপর বলে যান—

শুনতে পেলাম সতর্ক নারীকণ্ঠে কে যেন বলছে, এক মুহূর্তও আর এখানে থেক না। যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে চলে যাও। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এবং অন্যান্য মেম্বাররা সব এসে পড়লে তখন মুশকিলে পড়বে। সেই নারীকণ্ঠের প্রত্যুত্তরে শুনলাম কে যেন বললে, কিন্তু হাত-পা আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পারব না, আমি পালাতে পারব না। তার জবাবে সেই পূর্ব-নারীকণ্ঠস্বর এবারে বললে, ছি, তুমি না পুরুষমানুষ! এত ভীতু তুমি! এইটুকু সাহস তোমার নেই! যাও। শিগগির পালাও এখান থেকে। এরপর পালাবার আর পথ পাবে না। জবাবে এবার পুরুষ বললে, কিন্তু

পালালে কি সকলের সন্দেহ আমার ওপরেই পড়বে না? পূর্ব-নারী এবারে জবাব দিল, সে পরের কথা পরে। এখনও পালাও। তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, সকলেই তোমার সঙ্গে ওর ইদানীংকার ঘনিষ্ঠতার কথা জানে। এমনিতেও তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না, অমনিতেও না। এই পর্যন্ত বলে বিশাখা চৌধুরী থামলেন।

বলুন, তারপর?

তারপরই একটা দ্রুত পদশব্দ পেলাম, সেটা যেন দূরে চলে গেল ক্রমে ক্রমে।

বলতে বলতে বিশাখা চৌধুরী আবার থামলেন। কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপরই আবার কিরীটী বললে, থামলেন কেন, বলুন যা বলছিলেন মিসেস চৌধুরী।

মিসেস চৌধুরী আবার বলতে শুরু করলেন, তারপর কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন স্তব্ধ অনড় হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

এবং কতকটা তারপর ধাতস্থ হবার পর, অতি সন্তর্পণে সেই কামিনী ঝোপের মধ্যে ঢুকে আরও একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, পিছন ফিরে কে যেন বেঞ্চের ওপর বসে আছে। আর আশেপাশে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর ঝোপ থেকে সন্তর্পণে বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াতেই, মৃদু চাঁদের আলোয় বেঞ্চের ওপরে উপবিষ্টা মিত্রাকে দেখে যেন চমকে উঠলাম। প্রথমটায় অতটা খেয়াল হয়নি। তারপরই হঠাৎ মনে হল অমন নিঝুম হয়ে মিত্রা বেঞ্চের ওপর বসে আছে কেন? মাথাটা বুকের ওপরে ঝুলে পড়েছে! মনটার মধ্যে কেমন যেন ছাঁত করে উঠল। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, মিত্রা! মিত্রা! কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। সন্দেহটা এবারে যেন আরও দৃঢ় হল। ভয়টা আরও চেপে বসল। আবার ডাকলাম, মিত্রা! মিত্রা! না, তবু কোন সাড়া-শব্দ এল না মিত্রার দিক থেকে। এবারে সত্যি সত্যিই ভয়ে ও আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা যেন কেমন আমার কেঁপে উঠল। এগিয়ে গিয়ে ওর মাথা স্পর্শ করতেই সভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলাম। সেই মুহূর্তেই আশঙ্কা আমার দৃঢ় হল, মিত্রা মরে গিয়েছে। এবং মিত্রা মারা গেছে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে সঠিকভাবে আরও চার-পাঁচ মিনিট চলে গেল। হাত-পা সর্বাঙ্গ তখন আমার কাঁপছে। হঠাৎ এমন সময় ফিরে আসবার জন্য পা বাড়াতেই আমার পায়ে যেন কী ঠেকল। তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিতেই দেখি একটা রেকর্ড সিরিঞ্জ, যা ডাক্তাররা সাধারণতঃ ইনজেকশনের জন্য ব্যবহার করে।

ইনজেকশনের সিরিঞ্জ!

হ্যাঁ, এই যে দেখুন। বলতে বলতে বিশাখা তাঁর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি কাঁচের রেকর্ড টু সি-সি সিরিঞ্জ বের করে কিরীটীর হাতের উপর তুলে দিলেন।

কিরীটী সিরিঞ্জটা হাতের উপর নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, আমিও তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। টু সি-সি কাঁচের রেকর্ড সিরিঞ্জ একটা এবং ছোট অত্যন্ত সরু একটা হাইপোডারমিক নীডল তখনও তাতে পরানোও আছে। তবে নীডলটা একটু বেঁকে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে সিরিঞ্জটা দেখা হয়ে গেলে সামনের টেবিলে রেখে কিরীটী পুনরায় বিশাখা চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল। বললে, তারপর বলুন?

সিরিঞ্জটা ব্যাগের মধ্যে পুরে সোজা আর মুহূর্তকাল দেরি না করে উপরে বার-রুমে চলে এলাম। মাথার মধ্যে তখনও আমার যেন কেমন করছে। মীরজুমলার কাছ থেকে একটা স্টিফ পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে হলঘরে ঢুকে সোফার ওপরে বসে পড়লাম। তারই দু-তিন মিনিট বাদে রঞ্জন রক্ষিত এসে হলঘরে ঢুকল। সেখান থেকে দু-এক মিনিট বাদেই আমরা আবার এসে এই ঘরে ঢুকি।

তাহলে রঞ্জনবাবুর সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে আবার আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, কেন?

প্রেসিডেণ্টকে সংবাদটা দিতে।

দিয়েছিলেন তাঁকে সংবাদটা?

না। কারণ তখনও তিনি তাঁর ঘরে এসে পৌঁছাননি। তাই এ ঘরেই আবার আমি ফিরে আসি। এবং তারই দু-এক মিনিট বাদে মহারানী এসে এই ঘরে ঢোকেন।

একটা কথা বিশাখা দেবী, কিরীটী প্রশ্ন করে, বাগানের সেই পুরুষকণ্ঠটি চিনতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ।

কার কণ্ঠস্বর সেটা?

অশোকের।

আর নারীকণ্ঠস্বরটি?

বললাম তো, চিনতে পারিনি।

এখানকার মেম্বারদের কারও গলার সঙ্গেই মেলে না?

না।

আর একবার ভাল করে ভেবে বলুন।

না। কারণ এখানকার কারও কণ্ঠস্বরই আমার অপরিচিত নয় মিঃ রায়।

হুঁ। আচ্ছা এবারে আপনি তাহলে যেতে পারেন।

বিশাখা চৌধুরী অতঃপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এরপর বাকি সকলকে একের পর এক ডেকে দু-চারটি প্রশ্ন করে কিরীটী তাঁদের ছেড়ে দিতে লাগল।

জবানবন্দি নেবার পালা যখন শেষ হল রাত তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে।

একটা চুরোটে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে কিরীটী বললে, এবারে চল, ওঠা যাক লাহিড়ী। আপাততঃ উপরের তলার সমস্ত ঘরগুলোতে তালা দিয়ে দুজন কনস্টেবলকে প্রহরায় রেখে দাও। কাল সকালে তোমার থানায় আমি আসছি। পরবর্তী কাজের প্ল্যান সেখানেই আমরা চক-আউট করব।

সেইমতই ব্যবস্থা করে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, আমরা বৈকালী সংঘ থেকে বের হয়ে এলাম এবং রজত লাহিড়ীকে থানায় নামিয়ে দিয়ে কিরীটীর সঙ্গে তার গাড়িতে তারই বাসায় এসে উঠলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ সতের ॥

কিরীটীর বাসায় যখন ফিরে এলাম রাত্রির শেষ প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।

কিরীটী একটা সোফার উপরে বসে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

বুঝলাম বাকি রাতটুকু কিরীটীর মাথার মধ্যে এখন মিত্রা সেনের হত্যার ব্যাপারের জটিল ও দুরূহ চিন্তাটাই পাক খেয়ে খেয়ে ফিরবে। এখন আর ওকে ডাকলেও সাড়া মিলবে না। অতএব বড় সোফাটার পরে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলাম।

সারাটা রাত্রির ক্লান্তি। তাই বোধ হয় চুপ করে সোফার উপরে বসে থাকতে থাকতে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাও মনে নেই।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল পাশের ঘরের ক্যাজেল ঘড়ির সুমধুর পাঁচটা বাজবার সংকেত-ধ্বনিতে।

চেয়ে দেখি কিরীটী ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে হাত দুটি পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ, পায়চারি করছে যেন আপন মনেই। সামনেই টেবিলের ওপরে দেখি সোজা করে পাতা আছে একটা পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা, বৈকালী সংঘের বাড়িটার আমারই দেওয়া তাকে কাগজে আঁকা প্ল্যানটা ও একটা কাগজ। ভাল করে চেয়ে দেখি সেই কাগজে কতগুলো নাম ও তার পাশে পাশে সময় বসানো। আর তারই পাশে রয়েছে কিরীটীর প্রিয় মুখখোলা কালো রঙের সেফার্স কলমটা।

বুঝলাম বাকি রাতটুকু কিরীটী চোখের পাতা এক তো করেইনি, এবং মস্তিষ্কের সংখ্যাতীত কোষগুলিতেও চিন্তার যে ঘূর্ণাবর্ত এতক্ষণ ধরে বয়ে গিয়েছে তারও সমাপ্তি এখনও ঘটেনি।

কিরীটীকে ডেকে তার ধ্যান ভাঙব কি ভাঙব না ভাবছি, ঐ সময় চায়ের ট্রে হাতে কৃষ্ণা বৌদি এসে ঘরে প্রবেশ করল। খুব ভোরেই স্নান সেরে নিয়েছে বোঝা গেল। সিক্ত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠদেশ ব্যেপে রয়েছে। পরিধানে সাদা-কালো-চওড়া-পাড় তাঁতের শাড়ি ও গায়ে লাল ভেলভেটের ব্লাউজ।

একটু যেন ইচ্ছে করেই সামনের ত্রিপয়ের উপরে চায়ের ট্রে-টা রাখতে রাখতে কৃষ্ণা তার স্বামীকে সম্বোধন করে বলল, মুনিবর! এবারে ধ্যান ভঙ্গ করুন। চা রেডি।

কিরীটী মৃদু হেসে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল, তারপর সোফার উপরে বসে একটি ধূমায়িত চা-ভর্তি কাপ তুলে নিল হাতে নিঃশব্দে।

আমিও একটা কাপ তুলে নিলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, কৃষ্ণা, গত রাত্রে বৈকালী সংঘে মিত্রা সেনের হত্যার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে কিছুটা দায়ী কিন্তু তুমিই।

কৃষ্ণা বৌদি তখন সবেমাত্র কিরীটীর পাশেই সোফায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। চকিতে কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, মানে?

মানে আর কী! তোমাদের নারীচরিত্রের পরস্পরের প্রতি সহজাত চিরন্তন ঈর্ষা এবং তুমিই অকস্মাৎ তোমার রূপ-বহ্নি নিয়ে বৈকালী সংঘে উপস্থিত হয়ে সেই ঈর্ষায় ইন্ধন যুগিয়েছিলে অন্য এক নারীর মনে।

হুঁ। তারপর?

তারপর আর কী! যার ফলে গতরাত্রের দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নারী, তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

কিছুতেই না। বিশ্বাস করি না তোমার কথা। প্রতিবাদ জানায় কৃষ্ণা বৌদি।

বিশ্বাস কর না কর কিন্তু আমি নাচার। যাক সে কথা, গতরাত্রে বৈকালী সংঘে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন মোটামুটি তাঁদের একটা গতিবিধির টাইম-টেবল তৈরি করেছি। কাগজটা পড়ে দেখ তো সুব্রত, কোথায়ও ভুলল রইল কিনা। বলে এবার কিরীটী আমার দিকে তাকাল।

জানি এসব ব্যাপারে কিরীটীর কোন দিনও ভুল হয় না এবং হতেও দেখি নি। তবু কাগজটা তুলে চোখের সামনে ধরলাম।

দেখলাম কিরীটী গতরাত্রে যারা বৈকালী সংঘে উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজনকে

বাদ দিয়ে বাকি সকলকে নিয়ে একটা টাইম-টেবিল তৈরি করেছে তাদের গতিবিধির।

প্রথমেই দেখলাম মিত্রা সেনের নাম। তার পাশে লেখা আছে ঃ

মিত্রা সেন—বৈকালী সংঘে গতরাত্রে এসেছিল, আটটা বাজতে দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে। এবং সম্ভবতঃ সোজা সে নীচের বাগানে চলে যায়। কিন্তু কেন? বাগানে (?) ৭-৫০ মিঃ—পূর্ব-পরিকল্পনামত কারও না কারও নির্দেশক্রমে ৭-৪৫ মিঃ বা নিজের ইচ্ছাতেই বা নিজের প্ল্যানমত কারও সঙ্গে দেখা করতে। যদি তাই হয় তো কার সঙ্গে দেখা করতে! সম্ভবতঃ হত্যাকারীই ঐ সময় মিত্রা সেনকে বাগানে আসতে বলেছিল যাতে করে নির্বিঘ্নে সে তার কাজ হাসিল করতে পারে। হত্যার জন্য বাগানের ঐ স্থানটি সে বেছে নিয়েছিল কারণ মৃত্যুসময়ে কোনরূপ কাতর শব্দ মিত্রা সেনের কণ্ঠ হতে নির্গত হলেও কারও কানে সেটা পৌঁছবে না এবং নিশ্চিন্তে সে কার্য সমাধা করতে পারবে। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে মনে হয় মিত্রা সেনকে রাত আটটা থেকে আটটা দশের মধ্যেই কোন একসময় তীক্ষ্ণ মারাত্মক কোন বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

অশোক রায়—সকলের জবানবন্দি থেকে বোঝা যাচ্ছে অশোক রায় বৈকালী সংঘে গতরাত্রে মিত্রা সেনের ঠিক পরে-পরেই এসেছিল—রাত আটটা থেকে আটটা দশ মিনিটের মধ্যে কোন একসময়ে। সে ৮-১০ মিঃ মধ্যে কিন্তু সোজা বাগানে যায়নি। হলঘরে বোধ হয় ৮-২০ মিঃ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু কেন? কার জন্য অপেক্ষা করছিল? মিত্রা সেনের জন্যই কি? বিশাখা চৌধুরী ৮-৩৫ মিঃ নাগাদ অশোক রায়কে হলঘরে বসে থাকতে দেখেছিল। এবং বৈকালী সংঘে সে রাত্রের উপস্থিত মেম্বারদের মধ্যে একমাত্র বিশাখা চৌধুরী ব্যতীত অন্য কেউই অশোক রায়কে সে রাত্রে ওখানে দেখেনি। তার কারণ হয়তো অশোক রায় হলঘরে কিছুক্ষণ থেকেই বাগানে চলে যায়, নীচে অন্যান্য মেম্বারদের পৌঁছবার পূর্বেই। বিশাখার স্টেটমেণ্ট যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে অশোক রায় বাগানে গিয়েছিল। শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট থেকে বোঝা (৮-৪৫ মিঃ) যাচ্ছে অশোক রায় রাত পৌনে নটা নাগাদ আবার বৈকালী সংঘ থেকে চলে যায়। অর্থাৎ ৮-৮।১০ মিঃ এসে ৮-৪৫ মিঃ-এ চলে যায়। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অশোক রায় তাহলে বৈকালী সংঘে সেখানে ছিল। হলঘরে যদি অশোক রায় কিছুক্ষণ বসে থেকে থাকে তাহলে

২৫ মিঃ থেকে আধ ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই সে বাগানে ছিল। এখন কথা হচ্ছে, ঐ সময়ের আগে না ঐ সময়ের মধ্যেই মিত্রা সেন নিহত হয়েছে? শুধু তাই নয়। বিশাখা চৌধুরীর স্টেটমেণ্ট থেকে আরও একটা ব্যাপার যা আমরা জেনেছি, সেটা হচ্ছে, অশোক রায় বৈকালী সংঘে আসার মিনিট দশেক পরেই বিশাখা চৌধুরী আসেন এবং তারই দু-চার মিনিট বাদে যদি অশোক রায় হলঘর থেকে বের হয়ে বাগানে গিয়ে থাকে তাহলে সে বাগানে গিয়েছিল সম্ভবতঃ আটটা বেজে দশ মিনিট থেকে আটটা কুড়ি মিনিটের মধ্যেই; এবং বিশাখা তাকে একপ্রকার অনুসরণ করে গিয়েই যদি তার কণ্ঠস্বর ঝোপের পাশ থেকে শুনে থাকে তো তখন সেটা হবে আটটা বেজে পঁচিশ থেকে সাড়ে আটটা। আর তাই যদি হয় তো তাহলে শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট সত্যি বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ অশোক রায় রাত পৌনে নটা নাগাদ চলে যেতে পারে। এবং সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে তো অশোক রায় বাগানে ছিল সে রাত্রে আটটা কুড়ি মিঃ থেকে আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ মাত্র পনের মিনিট সময়। ব্যাপারটি অত্যন্ত গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশাখা চৌধুরীর কথা থেকে আরও একটা ব্যাপার জানা যাচ্ছে, সে রাত্রে ঐ সময় বাগানে দ্বিতীয় কোন এক নারী ছিল। কে সে? গতরাত্রে যে কজন নারী বৈকালী সংঘে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে কি কেউ? কিন্তু বিশাখা চৌধুরী বলেছে ইতিপূর্বে সে কণ্ঠস্বর নাকি সে শোনেনি সংঘে, তার অপরিচিত। তবে যেই থাকুক এটা ঠিক সে আটটার আগেই ঐ রাত্রে সংঘে এসেছিল। অথচ শশী হাজরার কথা থেকে জানা যায় মিত্রা সেনই সর্বপ্রথম গতরাত্রে সংঘে এসেছে। স্বতই এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, শশী হাজরার ও বিশাখার স্টেটমেণ্ট সম্পূর্ণ ঠিক বা correct কি না! যদি correct হয় তো সে আর কেউ নয়! স্বয়ং (?) এবং সে-ই তাহলে হত্যাকারী কি?

মহারানী সুচরিতা দেবী—নিজে তিনি বলেছেন, তিনি নাকি গতরাত্রে পৌনে নয়টা অর্থাৎ ৮-৪৫ মিঃ নাগাদ সংঘে আসেন। তারপর তিনি হলঘরে এসে দেখতে পান, ৮-৪৫ মিঃ নাগাদ শ্রীমন্ত, সুমিতা চ্যাটার্জী, নিখিল ভৌমিক, রমা মল্লিক ও সুপ্রিয় গাঙ্গুলীকে। হলঘরে তিনি রাত ৯টা পর্যন্ত ছিলেন। সেখান থেকে যান বার-রুমে। সেখানে ৮-৩০-এ মিঃ দেখতে

পান, রঞ্জন রক্ষিত ও বিশাখা চৌধুরীকে। সেখান থেকে ৯-৫ মিঃ থেকে ৯-১০ মিঃ-এর মধ্যে যান নীচের বাগানে। তাঁর স্টেটমেণ্ট যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই অশোক রায় বাগান ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি সেখানে গিয়েছেন। তিনি একটি পদশব্দও শুনেছিলেন নাকি। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট। তার স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী মহারানী গতরাত্রে সংঘে এসেছেন মিত্রা সেন, অশোক রায় ও বিশাখার ঠিক পরে-পরেই ২।৫ মিনিটের মধ্যে। অর্থাৎ রাত ৮-২০ মিঃ থেকে ৮-২২ মিঃ-এর মধ্যে যদি বিশাখা এসে থাকে, তাহলে রাত ৮-২৫ মিঃ থেকে ৮-৩০ মিঃ-এর মধ্যেই মহারানী গতরাত্রে সংঘে এসে পৌঁছেছিলেন। এবং তাতে করে পনের মিনিট সময়ের হেরফের হচ্ছে, যে সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে মহারানী ও মিত্রা সেন এককালে ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন পরস্পর পরস্পরের।

বিশাখা চৌধুরী—মিত্রা সেন ও অশোক রায়ের পরই গতরাত্রে বৈকালী সংঘে আসে বিশাখা চৌধুরী। অর্থাৎ রাত ৮-১০ মিঃ থেকে ৮-২০ মিনিটের মধ্যে। অবশ্য যদি ৮-১০ মিঃ—শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। ৮-২০ মিঃ বিশাখা চৌধুরী নিজে বলেছেন, তিনি এসেছেন ৮-১৫ মিঃ থেকে ৮-২০ মিঃ-এর মধ্যে। অর্থাৎ শশী হাজরার ৮-২০ মিঃ স্টেটমেণ্টের সঙ্গে প্রায় মিলই আছে। বিশেষ গরমিল নেই। হলঘরে ঢুকে তিনি একমাত্র অশোক রায়কে দেখতে পান। এবং প্রকৃতপক্ষে হলঘরে এসে পৌঁছবার পরই অশোক রায় হলঘর থেকে বের হয়ে যায় নীচের বাগানের দিকে। হলঘরে সেই সময় তৃতীয় আর কেউ নাকি উপস্থিত ছিল না। সেক্ষেত্রে বিশাখার সঙ্গে অশোকের কোন কথাবার্তা হয়েছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই। সম্ভবতঃ হয়নি এবং বিশাখা যে তাকে বাগানে follow করেছিল তাও অশোক জানে না বা টের পায়নি। এখন এই স্টেটমেণ্ট থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে অশোক বাগানে গিয়েছিল ৮-২৫ মিঃ থেকে ৮-৩০ মিঃ-এর মধ্যে খুব সম্ভবতঃ। এবং বিশাখা বাগানে পৌঁছেছিল সম্ভবতঃ ৮-৩০ মিঃ থেকে ৮-৩২।৩৩ মিঃ-এর মধ্যে, বড় জোর ৮-৩৫ মিঃ-এর মধ্যে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট বোধ হয় মিথ্যে নয় যে, অশোক ৮-৪৫ মিঃ নাগাদ সংঘ থেকে

বের হয়ে যায়। বিশাখা চৌধুরী বাগানে আত্মগোপন করে থাকাকালীন সময়ে যে কোন এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনেছিল সে কে? আবার সে প্রশ্নটি মনে আসছে। কারণ তার স্টেটমেণ্ট থেকে জানা যাচ্ছে সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর নারীর সঙ্গে অশোকই কথা বলছিল। অশোক তাহলে নিশ্চয়ই চেনে সে নারীকে।

শ্রীমন্ত পাল—তাঁর নিজস্ব স্টেটমেণ্ট থেকে জানা যায় তিনি এসেছিলেন সংঘে ঐদিন রাত্রে, রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। এবং তাঁর কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, ৮-৩০ মিঃ তিনি আসবার পর অশোক রায় সেখান থেকে চলে যায়। তিনিও সোজা এসে হলঘরে প্রবেশ করেন। এবং হলঘরে প্রবেশ করে সেখানে দেখতে পান সুপ্রিয় গাঙ্গুলী, সুস্মিতা চ্যাটার্জী ও মীরজুমলাকে। অর্থাৎ ৮-৩০ মিঃ-এর সময় বার-রুমে মীরজুমলা ছিল না। সেখানে ছিল বিশাখা চৌধুরী ও রঞ্জন রক্ষিত। ৮-৩০ মিঃ থেকে ৮-৩৫ মিঃ-এর মধ্যে হলঘরে ঢোকে—রমা, মনোজ দত্ত ও নিখিল ভৌমিক। এবং তার পরে দু'নম্বর দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেন মহারানী ও বিশাখাকে —রাত ৯টা নাগাদ। মহারানী আবার ৯-১৫ মিনিটের সময় ঘর থেকে বের হয়ে যান।

রঞ্জন রক্ষিত—রঞ্জন রক্ষিত বলেছেন, তিনি এসেছেন গতরাত্রে সংঘে রাত ৮-৩০ মিঃ নাগাদ। কিন্তু সম্ভবতঃ কথাটা ঠিক নয়। কারণ শ্রীমন্ত পাল যখন ৮-৩০ মিনিটে এসে ৮-৩০ মিঃ হলঘরে প্রবেশ করেন সে সময় রঞ্জন রক্ষিত হলঘরে ছিলেন না। ছিলেন বার-রুমে। তাতে করে মনে হয় তিনি আগেই এসেছিলেন। এবং বিশাখা চৌধুরীর পরে-পরেই। সম্ভবতঃ ৭-২০ মিঃ থেকে ৮-২৫ মিঃ-এর মধ্যে কোন এক সময়। এবং তিনি যে বলেছেন সে সময় বিশাখা চৌধুরী ও অশোক রায় ঘরে ছিল কথাটা সম্ভবত সত্য। এবং বিশাখা বা অশোক রায় সে কথা জানতে পারেনি। এবং তিনি যে অশোক রায়কে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলেন ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই—কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। তারপর তিনি বিশাখা চৌধুরী সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন সেটাও হয়তো সত্যই।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। সে দেখি সোফায় হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে আপন মনে ধূমপান করছে। এবার আমি কাগজের অপর পৃষ্ঠা ও-টালাম। সেখানে শুধু একটি কথাই লেখা আছে:

মিত্রা সেনের মৃত্যু ঘটেছে সম্ভবত সন্ধ্যা ৭-৫৫ থেকে রাত্রি ৮ টার মধ্যে কোন এক সময় এবং নীচের বাগানেই তীব্র বিষের ক্রিয়ায়।

কাগজটা হাতে করে বসে নিজের মনেই কথাটা ভাবছিলাম। হঠাৎ কিরীটীর ডাকে চমকে তার মুখের দিকে তাকালাম।

কি রে, আমার বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু ভুল আছে সুব্রত ?

আর একটু বিশদ করে বললে সুখী হতাম !

॥ আঠার ॥

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, গতরাত্রে আমাদের বিশেষ আলোচ্য সময়টি হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা—ঐ একটি ঘণ্টা অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা ঐ একঘণ্টা সময়ের মধ্যে ওখানে যারা যারা উপস্থিত ছিল বা আসা-যাওয়া করেছে তাদের মুভমেণ্টস্-এর ওপরই আমাদের মিত্রা সেনের হত্যা ব্যাপারে যাবতীয় রহস্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে—এই কথাটা ধরে নিতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা statement থেকে যতটা আমরা আপাততঃ সংগ্রহ করতে পেরেছি তার মধ্যে ছুটি প্রাণী ব্যতীত অন্য কাউকেই ঐ সময়ের জালে আটকাতে পারছি না। তাদের মধ্যে আবার একজন নিহত। দ্বিতীয়জন আপাততঃ পলাতক। নাগালের বাইরে। অর্থাৎ মিত্রা সেন ও অশোক রায়। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই তুই লক্ষ্য করেছিস, বিশাখার statement যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রথমত, অশোক রায় কিছুতেই হত্যাকারী হতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ, যে নারী-কণ্ঠস্বরকে বিশাখা অশোকের সঙ্গে কথা বলতে গত রাত্রে শুনেছিল সে কার কণ্ঠস্বর ?

তোর মতে তা হলে বুঝতে পারছি সেই অদৃশ্য নারী-কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীই মিত্রা সেনের হত্যাকারিণী! অর্থাৎ এক্ষেত্রে মিত্রা সেনকে হত্যা করেছে কোন এক নারীই, পুরুষ নয়—তাই কি ?

হ্যাঁ। আমার তাই ধারণা। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, এবং শুধু তাই নয়, সেই হত্যাকারিণী নারী আগে থাকতেই অকুস্থানে উপস্থিত ছিল এও আমার স্থির বিশ্বাস।

কিন্তু কে সে নারী ?

আপাতত অন্তরালে থাকলেও খুঁজে তাকে বের করবই।

কিন্তু গতকাল বৈকালী সংঘে এমন কোন অপরিচিতা নারীর উপস্থিতির কথাই তো জানা যায়নি কারও জবানবন্দি থেকেই।

তা অবশ্যি জানা যায়নি সত্যি !

তবে শশী হাজরার স্টেটমেণ্টকে যদি নির্ভুল বলে ধরে নেওয়া যায় এবং বাইরের কোন অপরিচিতা নারী না হয়ে যদি সংঘেরই কোন মেম্বার নারী হয় তো সে মিত্রা সেনই।

কেন ?

কারণ শশী হাজরার স্টেটমেণ্ট থেকে জেনেছি মিত্রা সেনই গত রাত্রে প্রথম আসে।

না। সত্যি কথা সে বলেনি। আর সেই জন্যই লাহিড়ীকে বলে এসেছি তাকে অ্যারেস্ট না করে তার ওপরে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার জন্য।

বুঝলাম, কিন্তু তারপর ?

এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে অশোক রায়ের সন্ধান করা। তাকে খুঁজে পাওয়া গেলে হয়ত হত্যাকারিণীকে ধরতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না কারণ সেই একমাত্র হত্যাকারিণীকে দেখেছিল।

আর কোন প্রোগ্রাম নেই ?

আছে। দু-জায়গা নিঃশব্দে আজই রাত্রে রেইড করতে হবে।

একটা তো বুঝতে পারছি ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেম্বার ও নার্সিং হোম। দ্বিতীয়টি !

তাঁর আবাসগৃহ !

বলিস কি ?

হ্যাঁ।

ঐ দিনই বিকেলের দিকে ময়না-তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা গেল কিরীটীর অনুমান মিথ্যে নয়। তীব্র বিষের ক্রিয়াতেই মিত্রা সেনের মৃত্যু ঘটেছে—Curara (কুরারা) বিষের ক্রিয়ায়। এবং তার পাকস্থলীতে যা পাওয়া গিয়েছে সেটার মধ্যে আর যাই থাক অ্যালকোহলের নাম-গন্ধও নেই। শুধু তাই নয়, যে পেগ-গ্লাসটি অকুস্থানে মৃতদেহের সন্নিকটে পাওয়া গিয়েছিল সেটা কেমিকেল অ্যানালিসিস্ করেও কিছু পাওয়া যায়নি, তবে সিরিঞ্জ অ্যানালিসিস্ করে Curara বিষ পাওয়া গিয়েছে। এমন কি অ্যালকোহলও না। বিশেষ একটি ব্যাপার যা পুলিস সার্জেন জানিয়েছে কিরীটীকে সেটা হচ্ছে, মৃতদেহের পৃষ্ঠদেশে একটি নীডল পাংচারের দাগ পাওয়া গিয়েছে, সম্ভবত সেইখানেই ঐ বিষ সিরিঞ্জের সাহায্যে মিত্রা সেনের দেহে প্রবেশ করানো হয়েছিল।

যাক নিঃসন্দেহ হওয়া গেল একটা ব্যাপারে যে, মিত্রা সেনের মৃত্যুর ব্যাপারটা হত্যাই, আত্মহত্যা নয়।

বিকেলের শেষ রৌদ্রালোকটুকুও যেন যাই-যাই করছিল।

কিরীটীর ঘরের মধ্যে বসে আমি ও কিরীটী ময়না-তদন্ত রিপোর্ট ও কেমিকেল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

জংলী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল। বললে ব্যারিস্টার সাহেব রাধেশ রায় এসেছেন, দেখা করতে চান।

কিরীটী বললে, যা এই ঘরেই নিয়ে আয়।

একটু পরেই প্রৌঢ় ব্যারিস্টার রাধেশ রায় এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই যেটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে আমার চোখে ধরা পড়ল সেটা হচ্ছে গভীর একটা ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার ছায়া যেন তাঁর সমগ্র মুখখানির উপরে ফুটে উঠেছে।

বসুন মিঃ রায়। কিরীটীই রাধেশ রায়কে আহ্বান জানাল।

রাধেশ রায় সামনের দামী সোফাটার উপরে বসে বারেক মাত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলেন তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, না মিঃ রায়, তার কোন সন্ধানই করতে পারলাম না। রাত সাড়ে নটার কিছু পরে শুনলাম সে নাকি একবার বাড়িতে এসেছিল। তারপরই একটা সুটকেস হাতে সে বের হয়ে যায় মিনিট দশ-পনেরর মধ্যেই। চাকরটা জিজ্ঞাসা করেছিল কোথায় সে যাচ্ছে কিন্তু সে কোন জবাব দেয়নি। বলেনি কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কি আপনার মনে হয় মিঃ রায়, তারই এ কাজ?

কিরীটী কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

রাধেশ রায় আবার বলতে লাগলেন, অশোকের টেম্পারামেণ্ট আমার শুধু ভাল করে জানা বলেই নয়, এ ধরনের ক্রাইম, আইন-আদালত নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি সে এ কাজ করেনি মিঃ রায়। তার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

সেটা তো পরের কথা মিঃ রায়, কিরীটী বলে, কিন্তু এভাবে আকস্মিক তাঁর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে করে পুলিসের চোখে কেমন করে নিজেকে তিনি পরিষ্কার করবেন যতক্ষণ না তিনি সামনাসামনি এসে দাঁড়াচ্ছেন ও তাদের সমস্ত প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন?

কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন? আজ পর্যন্ত কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কখনও সে যায়নি। তবু আমি অবিশ্যি পাটনায় আমার ভাইয়ের কাছে, দিল্লীতে তার মেসোর কাছে 'তার' করে দিয়েছি। যথাসম্ভব পরিচিত-অপরিচিত এখানেও সকলের কাছে সন্ধান নিয়েছি।

পরিচিত কোন জায়গায় সে যায়নি। তাছাড়া কাল রাত্রে যে সময় সে বাড়ি ছেড়ে

গিয়েছে, দূরপাল্লার কোন ট্রেনই তখন আর ছিল না প্রথমতঃ এবং দ্বিতীয়ত ট্রেনে গেলেও সেখানে এত তাড়াতাড়ি সে পৌঁছতে পারত না। সে তার নিজের গাড়ি নিয়েই গিয়েছে।

না না—এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়! তার গাড়ি তো গ্যারাজেই রয়েছে।

কিরীটী এবারে প্রত্যুত্তরে মুহূর্তকাল নীরব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাধেশ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, গ্যারাজে আছে সে গাড়ি, এবং কাল রাত্রে ছিল না। সে গাড়ি গ্যারাজে ফিরে এসেছে আজ সকাল আটটায়।

কে, কে বলল আপনাকে এ-কথা ?

মিঃ রায়, আপনি যে আপনার একমাত্র পুত্রস্নেহে অন্ধ সে কথা তো আমার অজানা নয়। শুনুন রাধেশবাবু, আজ সকালে যে পাঞ্জাবী ড্রাইভার অশোকবাবুর গাড়িটা নিয়ে এসে গ্যারাজে গাড়ি রেখে সোজা আপনার বাড়ির অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল আমি তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই যে টেলিফোন আছে ওখানে। ফোনে তাকে এখুনি একবার এখানে ডেকে আনাবেন কি ?

কিরীটীর কথায় দিশেহারা বিবশ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত রাধেশ রায় তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে নিঃশব্দে। তারপর মৃদু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগতভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেন, পাঞ্জাবী ড্রাইভার !

হ্যাঁ। আপনি জানেন না রাধেশবাবু, গত রাত থেকেই প্লেন ড্রেসে আমার লোক আপনার বাড়ির প্রহরায় ছিল। এবং এখনও আছে। তারা আপনার গৃহের প্রতিটি খুঁটিনাটির ওপরে নজর রেখেছে। তারাই যথাসময়ে রিপোর্ট দিয়েছে।

কিন্তু আমার বাড়িতে তো কোন পাঞ্জাবী ড্রাইভার নেই। একজন মাত্র ড্রাইভার, বাঙালী, সেও আমারই গাড়ি চালায়। অশোক বরাবর তার নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করত। তার তো কোন ড্রাইভারই আজ পর্যন্ত নেই।

তাও আমার অজানা নয়।...তাই তো আমি জিজ্ঞাসা করছি, পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে তাহলে সে ব্যক্তিটি কে ? যে আজ সকালে আপনার ছেলের গাড়িটা গ্যারাজে এনে তুলে আপনার বাড়ির ভেতরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ?

আপনি যে কি বলছেন মিঃ রায়, বুঝতেই পারছি না। ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার কাছে যে গল্পের মতই মনে হচ্ছে !

গল্প নয় রাধেশবাবু, নিষ্ঠুর সত্য—বলতে বলতে হঠাৎ পকেট থেকে একখানা ফটোগ্রাফ চকিতে বের করে আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, আলোটা জ্বেলে দে সুব্রত।

নিঃশব্দে উঠে আমি ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলাম সুইচ টিপে, কেননা ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ চাপ বেঁধে উঠেছিল ।

হাতের ফটোটা নিঃশব্দে সম্মুখে উপবিষ্ট রাধেশ রায়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কিরীটী পূর্ববৎ শান্ত অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, এই ফটোটার দিকে বেশ ভাল করে চেয়ে দেখুন রাধেশবাবু। সেই ড্রাইভারটি যখন গ্যারাজে গাড়ি রেখে অন্দরে প্রবেশ করছিল সেই সময়ই আমার লোক দূর থেকে তার এই ফটোটা তুলে নিয়েছে। ঘণ্টা তিনেক আগেই মাত্র এটা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে । দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা, এই লম্বা লোকটি, মাথায় পাগড়ি, এ কে ?…

নির্বাক বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে রাধেশ রায় কিরীটীর দেওয়া ফটোটা হাতে নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুট-পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ি, অন্দরের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত, ঐ সময়ই স্ন্যাপটা নেওয়া হয়েছে ।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা। কেবল দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটা একঘেয়ে টকটক শব্দ জাগিয়ে চলেছে ।

কি, জবাব দিন রাধেশবাবু! এ লোকটিকে এখন পর্যন্ত আপনার বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যায়নি। কে এ লোকটি ?

রাধেশ রায় তথাপি নির্বাক।

এ হয়তো আপনার ছেলের খবর জানে। আমি এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দয়া করে ফোনে এখানে লোকটিকে একবার ডাকবেন কি ? আবার কিরীটী বলে ।

রাধেশ রায় পূর্ববৎ নিশ্চুপ।

শুনুন রাধেশবাবু, মাসখানেক আগে একদিন আপনি ব্যাকুল হয়ে এবং আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়েই সাহায্যের জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং আজ বলতে বাধা নেই, আপনার মুখে সেদিনকার সেই কাহিনী শুনেই সেদিন তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকখানিই এগুতে হয়েছিল আমাকে পরে। যার ফলে আমাকে ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত এমন একটা ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যার পশ্চাতে আমি অনুসন্ধানের দ্বারা জানতে পেরেছিলাম যে, একটা বিরাট ব্ল্যাক মেইলিংয়ের প্ল্যান রয়েছে। এবং শুধু আপনার ছেলে অশোকবাবুই নন, আরও অনেকেই সে প্ল্যানের মধ্যে, পরে জানতে পারি যে, অলক্ষ্যে জড়িয়ে পড়ে শোষিত হয়ে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। এবং সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এগুতে এগুতে হঠাৎ এক বিষধর সর্প গত রাত্রে গরল উদ্গীরণ করে সমগ্র ব্যাপারটাকে জটিল করে

তুলেছে আরও। মন বলছে আমার সেই ব্ল্যাক মেইলিংয়ের সঙ্গে মিত্রা সেনের হত্যার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না এখন পর্যন্ত, কিভাবে সেই যোগাযোগটা ঘটেছে। এবং যতক্ষণ না সেটা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি, আসল ব্যাপারে আর অগ্রসর হবারও যেন পথ করতে পারছি না। আর সেই কারণেই আপনার ছেলে অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্লিজ্ আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ঐভাবে চুপ করে থেকে আমাকে নিরর্থক দেরি করাবেন না।

ক্ষমা করবেন মিঃ রায়। যে লোকটি সম্পর্কে আপনি জানতে চাইছেন সে লোকটি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

ফটোর ঐ লোকটি—ওকেও চেনেন না?

না।

কিন্তু আমি যদি বলি রাধেশবাবু আপনি সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছেন?

এড়িয়ে যাচ্ছি!

হাঁ। কার ফটো আপনি তা না স্বীকার করলেও আমি জানি ঐ ফটোর মধ্যে যে ধরা পড়েছে সে কে? কি তার পরিচয়?

কে? ভীত-বিহ্বল কণ্ঠে অস্ফুটে কথাটা উচ্চারণ করে রাধেশ রায় তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনার ছেলে অশোক রায়। শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কিরীটী শেষ কথাটা উচ্চারণ করল। এবং কিরীটীর কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাধেশ রায়ের বিবর্ণ মুখখানি যেন আরও বিষণ্ণ, একেবারে কালো হয়ে গেল মুহূর্তে।

বোবার মতই তাকিয়ে থাকেন রাধেশ রায় কিরীটীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে অতঃপর।

॥ উনিশ ॥

কিরীটী এবারে বলে, যান, উঠুন—টেলিফোনে অশোকবাবুকে ডেকে এখানে এখুনি একবার আসতে বলুন, যদি এখনও আপনার ছেলের মঙ্গল চান।

কিরীটীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারপ্রান্তে অকস্মাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে যুগপৎ আমরা সকলেই ফিরে তাকালাম।

ডাকতে হবে না মিঃ রায়, আমি নিজেই এসেছি।

এবং অশোক রায়ের কণ্ঠস্বর শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সংযম যেন রাধেশ রায়ের মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তিনি স্থান-কাল-পাত্র এমন কি নিজেকে পর্যন্ত ভুলে গিয়ে যেন আর্ত-তীক্ষ্ণকণ্ঠে অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠলেন, অশোক!

ধীর প্রশান্ত পদে অশোক রায় ততক্ষণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠেই কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি আপনার জিজ্ঞাস্য আছে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন মিঃ রায়। I am ready.

না, না—অশোক—অশোক—বাধা দিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলেন হত-ভাগ্য পিতা।

না বাবা। আমাকে বাধা দিও না। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে দাও কি উনি জিজ্ঞাসা করবেন। আমি জবাব দেব।

কিন্তু অশোক! অশোক—

না বাবা। এই আত্মগোপনের পিছনে যে সন্দেহের কালোছায়া সর্বক্ষণ আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর চাইতে নিশ্চিন্ত মনে জেলের অন্ধকার ঘরে বাস করাও সহজ। মিঃ রায়, বলুন কি আপনি জানতে চান আমার কাছ থেকে?

বসুন অশোকবাবু। এতক্ষণে কিরীটী কথা বলল।

অশোক রায় কিরীটীর নির্দেশে সামনের খালি সোফাটার উপর বসলেন।

কিরীটী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বুঝতে পারছিলাম অশোক রায়ের ঐ সময় তারই গৃহে অকস্মাৎ আবির্ভাবের ব্যাপারটা সে-ও চিন্তা করতে পারেনি ক্ষণপূর্বেও। তাই সেও বোধ হয় একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এবং সেই কারণেই নিজের মধ্যে সে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল।

আপনি গতকাল রাত্রে বৈকালী সংঘে গিয়েছিলেন অশোকবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

গিয়েছিলাম।

ঠিক কখন গিয়েছিলেন সময়টা মনে আছে?

হ্যাঁ, রাত আটটা বাজতে মিনিট দু-পাঁচ আগেই হবে।

কিন্তু সাধারণতঃ শুনেছি আপনি তো অত আগে কখনও সংঘে যেতেন না। তাই নয় কি?

হ্যাঁ। কিন্তু কাল একটু আগেই গিয়েছিলাম।

বিশেষ কোন কারণ ছিল কি ?

একটু ইতস্ততঃ করে অশোক রায় বললেন, মিত্রা যেতে বলেছিল।

কেন ?

তার নাকি বিশেষ কি কথা বলবার ছিল।

কি কথা তার কোন আভাস তিনি দেননি ?

না। তবে বলেছিল বিশেষ জরুরী, প্রয়োজনীয়।

কখন তিনি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছিলেন ?

গতকাল দুপুরের দিকে টেলিফোনে।

কি বলেছিলেন ?

বলেছিল, ঠিক রাত আটটায় সংঘের পিছনের বাগানে বকুল বীথির সামনে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

অতঃপর কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি স্থির-নিশ্চিত যে টেলিফোনে গতকাল দুপুরে ঠিক মিত্রা দেবীর কণ্ঠস্বরই শুনেছিলেন ?

তাহলে আপনাকে কথাটা বলি, গলাটা যেন কেমন ভাঙা-ভাঙা ও একটু চাপা শুনেছিলাম, প্রশ্ন করেছিলাম সে সম্পর্কে, মিত্রা বলেছিল তার নাকি সর্দি হয়েছে হঠাৎ।

তাহলে আপনি সন্দেহ করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

বেশ। সোজা আপনি গিয়ে হলঘরেই তো প্রবেশ করেন ?

হ্যাঁ।

কেউ তখন সেই হলঘরে ছিল ?

ছিল।

কে ?

তাকে আমি চিনি না। কখনও ইতিপূর্বে দেখিনি।

পুরুষ না নারী ?

নারী।

কত বয়স হবে তার ?

পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

দেখতে কেমন ?

চকিতে এক লহমার জন্য দেখেছিলাম, আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিনি

তিন নম্বর দরজার পথে হলঘর থেকে বের হয়ে যান। তাই একটু অবাক হয়েই বোধ হয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, এমন সময় বিশাখা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

বিশাখা দেবীর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল ?

না।

কোন কথাই হয়নি ?

না। ইদানীং কিছুদিন থেকে তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ ছিল।

কেন ?

সে একান্তই আমার personal ব্যাপার। তবে এইটুকু জেনে রাখুন I hate her।

আপনি তাহলে বিশাখা চৌধুরীর হলঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের দিকে যান ?

তাই।

বাগানে গিয়ে মিত্রা সেনের সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল ?

না। She—She was then already dead! সে আর তখন বেঁচে নেই —বলতে বলতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম অশোক রায়ের কণ্ঠস্বরটা যেন জড়িয়ে এল।

কি করে বুঝলেন যে সে বেঁচে নেই ?

ডেকে সাড়া না পেয়ে দু-বারেও গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতেও যখন নড়ল না বা সাড়া দিল না তখন চমকে উঠি। তারপর ভাল করে দেখতে গিয়ে বুঝি সে—সে তখন মৃত। কিন্তু তখনও তার গা গরম ছিল মিঃ রায়। বোধ হয় আমি সেখানে পৌঁছবার অল্পক্ষণ আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

You are right, অশোকবাবু। That was the fact. আমার ধারণা সাড়ে সাতটা থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বলেই কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মিত্রা সেনের ব্যাপারে শশী হাজরার statement correct নয় সুব্রত। ৭-৪৫ মিঃ থেকে ৭-৫০ মিঃ নয়। সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি থেকে সাতটা পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই মিত্রা সেন গতকাল সংঘে এসেছিলেন এবং তাঁর সোজা গিয়ে বাগানে পৌঁছতে যদি ৫।৬ মিনিট সময় লেগে থাকে তাহলে ৭-৩০ মিঃ থেকে ৩৫ মিনিটের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আর তাই যদি হয়ে থাকে তো হত্যাকারী গতকাল যে কোন সময় সাতটা কুড়ি থেকে সাতটা পঁচিশ মিনিটের পূর্বেই সেখানে গিয়েছিল এবং উপস্থিত ছিল ঐ বৈকালী সংঘে।

বাধা দিলাম এবারে আমি। তাই যদি হয় তাহলে—বুঝতে পেরেছি, তুই কি বলতে চাস। প্রথমতঃ বৈকালী সংঘের বাড়িতে ঢোকবার একটিমাত্র দ্বারপথ ছাড়া আর দ্বিতীয়

দ্বারপথ নেই বলেই আমরা শুনেছি এবং মিত্রা সেনের পূর্বে কেউ আর এসেছিল বলেও শশী হাজরা বলেনি। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি কথাই ভাবতে হবে। এক—হয় এই মেইনডোর ছাড়াও সংঘের বাড়িতে প্রবেশের দ্বিতীয় কোন দ্বারপথ আছে নিশ্চয়ই, যে ব্যাপারটা হয়তো মেম্বারদের কাছেও গোপন ছিল। দ্বিতীয়—শশী হাজরা সত্য statement দেয়নি। শুধু তাই নয়, আরও একটা কথা ভাববার আছে। অশোকবাবু বৈকালী সংঘের একজন পুরাতন influential মেম্বার। এবং সংঘে একমাত্র মেম্বারদের ছাড়া যখন বাইরের কারোরই প্রবেশের কোনরকম অধিকারই ছিল না, সেক্ষেত্রে এমন কে নারী গত সন্ধ্যায় হলঘরে উপস্থিত ছিলেন যিনি অশোকবাবু ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিন নম্বর দ্বারপথ দিয়ে হলঘর থেকে বের হয়ে যান এবং অশোকবাবুও যাঁকে চিনতে পারলেন না! যাক, তাহলে আপাততঃ আমরা একটা ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি যে, মিত্রা সেন নিহত হয়েছেন, গত রাত্রে **সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিট থেকে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই**।

তাহলে তো অশোকের উপরে কোন সন্দেহই পড়তে পারে না মিঃ রায় ?

এতক্ষণে যেন হালকা হয়ে রাধেশ কিরীটীকে প্রশ্নটা করলেন।

না, প্রথম থেকেই আমি স্থির-নিশ্চিত ছিলাম যে অশোকবাবু হত্যা করেননি মিত্রা সেনকে। এবং সেটা সম্পর্কে ডবল করে নিশ্চয় হয়েছি ওঁর একটিমাত্র কথা শুনেই একটু আগে।

কথাটা যে কি, অন্য কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মিত্রা সেনের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে একটু আগে যে অশোক রায়ের গলা ধরে এসেছিল কিরীটীর নিশ্চয়তার পিছনে তারই ইঙ্গিত ছিল।

কিরীটী অতঃপর তার প্রশ্ন শুরু করেছে তখন।

অশোকবাবু, মিত্রা সেনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পর আপনি যখন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তখন কি কেউ আপনাকে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বলেছিল ?

মৃদুকণ্ঠে অশোক রায় প্রত্যুত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

কে সেই নারী ?

মহারানী সুচরিতা দেবী বলেই আমার মনে হয়।

মহারানী ?

হ্যাঁ। আবছা আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট তাঁকে দেখতে পাইনি। তাছাড়া মনের অবস্থাও তখন আমার এমন ছিল না যে তাঁর সম্পর্কে ভাবি। তবে মনে হয় তিনিই।

না অশোকবাবু, মহারানী নন।

তবে ? তবে কে তিনি ?

এ সেই নারী সম্ভবতঃ যাকে আপনি হলঘরে গতকাল ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলেন মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু—

আমার মন বলছে তাই।···কিন্তু যাক সে কথা। আপনি হঠাৎ আত্মগোপন করেছিলেন কেন ?

কারণ তিনিই আমাকে বুঝিয়েছিলেন আত্মগোপন না করলে মিত্রার হত্যাকারী বলে আমাকেই লোকে ভাববে। আর—সেই কথা শুনে আমারও যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল, আমি তাড়াতাড়ি পালালাম।

আপনি যাবার সময় নিশ্চয়ই হলঘর দিয়ে যাননি ?

না। প্রেসিডেন্টের ঘরের পাশ দিয়ে যে প্যাসেজ, সেই প্যাসেজ দিয়েই বের হয়ে গিয়েছিলাম।

কেউ আপনাকে বের হয়ে যাবার সময় দেখেছিল বলে আপনি জানেন ?

অত লক্ষ্য করে দেখিনি।

স্বাভাবিক। বলে একটু থামল কিরীটী। মিনিট দুয়েক স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবল, তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার বললে, অশোকবাবুকে এবারে আমার যা জিজ্ঞাস্য, সেটা আমি রাধেশবাবু আপনার অনুপস্থিতিতেই করতে চাই।

বেশ। আমি যাচ্ছি। আমি গাড়িতেই অপেক্ষা করছি। রাধেশ রায় উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু অশোক রায় বাধা দিলেন, না বাবা, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

রাধেশ রায় ইতস্ততঃ করেন। কিরীটী ব্যাপারটা বুঝে বলে, আপনি যান রাধেশবাবু, উনি পরেই যাবেন'খন।

রাধেশ রায় আর দ্বিরুক্তি করলেন না। ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

॥ কুড়ি ॥

অশোকবাবু !

সোফার উপরে নিঝুম হয়ে মাথা নীচু করে বসে ছিলেন অশোক রায়।

কিরীটীর ডাকে মুখ তুলে তাকালেন, বলুন।

গত প্রায় বৎসরখানেক ধরে প্রতি মাসের প্রথমদিকে আপনি একটা মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতেন। যদি আমাকে সে সম্পর্কে একটু enlighten করেন!

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে ধীরে ধীরে একসময় অশোক রায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সবই যখন আপনাকে বলছি মিঃ রায়, সে কথাও বলব আপনাকে।

হ্যাঁ, বলুন—

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। একটা কুৎসিত জঘন্য চক্রান্তের মধ্যে কৌশলে আমাকে ফেলে দীর্ঘদিন ধরে আমাকে ব্ল্যাকমেইলিং করা হচ্ছে। বলে একটু থেমে পুনরায় শুরু করলেন অশোক রায়, বৈকালী সংঘের মধ্যে-মধ্যে বাগান পার্টি হয়, কলকাতার বাইরে ব্যারাকপুরের এক বাগানবাড়িতে।

একটা কথা, সেই বাগানবাড়িটা কার জানেন কিছু?

না।

বেশ, বলুন তারপর।

বৎসর দুই আগে সেই রকমই এক পার্টিতে মনীষা দেবী নামে এক অত্যাশ্চর্য নারীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বলতে আপনাকে দ্বিধা নেই মিঃ রায়, অমন অদ্ভুত intelligent নারী ইতিপূর্বে বড় একটা আমার চোখে পড়েনি। মনীষা দেবীর এমন কিছু একটা বিস্ময়কর আকর্ষণ ছিল যা মুহূর্তমাত্রে যে কোন পুরুষকেই আকর্ষণ করতে পারে। কোন সংকোচ না করেই বলছি, আমিও আকর্ষিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল জীবনে তার দেখা না পেলে বোধ হয় জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। And what a fool I was! যাক যা বলছিলাম। সেই পার্টির দিন রাত্রেই সন্ধ্যার পর থেকেই কি ঝড়-বৃষ্টি সেদিন! পার্টির সকলেই প্রায় চলে গিয়েছিল তখন, কেবল ছিলাম সে বাড়িতে আমি ও মনীষা দেবী। দোতলার নিভৃত যে ঘরটিতে বসে আলাপ করছিলাম তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় হঠাৎ। এবং হঠাৎ আলো নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে মনীষা দেবী আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেন ও সেই মুহূর্তেই অন্ধকারে ক্যামেরার ফ্লাশবাল্ব জ্বলে ওঠে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে ওঠবার আগেই আবার আলো জ্বলে উঠল ও সঙ্গে সঙ্গে মনীষা, help! help! বলে চেঁচিয়ে ওঠে। তার চিৎকারে সকলে ঘরে এসে প্রবেশ করল। তার মধ্যে এক বৃদ্ধ ছিলেন যাঁকে ইতিপূর্বে সেদিন পার্টিতে দেখি-নি। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মনীষা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে বললে, আমি নাকি তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করতেই ঐ ঘরে এসেছিলাম। বুঝতেই পারছেন তখন আমার অবস্থা। সেই ঘটনারই খেসারত দিয়ে চলেছি মাসে মাসে এখনও মিঃ রায়।

সেই বৃদ্ধকে আপনি চিনতে পারেননি অশোকবাবু?

না।

কখনও দেখেননি পূর্বে?

না।

আপনার মত আর কেউ বৈকালীর মেম্বার ঐ ধরনের খেসারত দিচ্ছেন বা দিয়েছেন বলে জানেন?

আগে জানতাম না। পরে মিত্রা কয়েক দিন আগে আমাকে বলেছিল বৈকালী সংঘের মধ্যে আমার মত নাকি আরও অনেক victim ছিল।

হুঁ। আমি সেটাই আশা করছিলাম। ভাল কথা, তাঁদের কারও নাম জানেন?

জানি। দু-তিনজনের। শ্রীমন্ত পাল, মনোজ দত্ত, সুপ্রিয়।

তাঁরাও তাহলে প্রতি মাসে টাকা দিতেন?

তাই তো শুনেছি।

কার হাতে টাকাটা আপনি দিতেন তুলে প্রতি মাসে?

বিশাখার হাতে, সে-ই আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেত ছদ্মবেশে।

হুঁ।

অশোক রায় বর্ণিত কাহিনী যেন এক অবিশ্বাস্য রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করে চলেছে। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে যে রাত্রির প্রহরও গড়িয়ে প্রায় সাড়ে নটা বাজতে চলেছে সেদিকে কারও যেন তখন খেয়াল নেই।

উপবিষ্ট অশোক রায়ের চোখে-মুখে যেন একটা বিষণ্ণ ক্লান্তি। কিরীটী কেবল ঘরের মধ্যে তখন উঠে পায়চারি করে চলেছে নিঃশব্দে।

প্রবল একটা উত্তেজনায় যে তার দেহটা কাঁপছে সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

কয়েকটা মুহূর্ত আবার স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

হঠাৎ আবার কিরীটীই অশোক রায়ের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, এখন বুঝতে পারছি অশোকবাবু, এতকাল পরে এক উচ্ছৃঙ্খল নারীর মধ্যে আপনি সত্যি সত্যিই চিরন্তন স্নেহময়ী, প্রেমলিপ্সু নারীত্বকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সত্যিই সে আপনার প্রেমের স্পর্শে বিস্মরণ থেকে জেগে উঠেছিল।

বুঝতে পেরেছি আপনি মিত্রার কথা বলবেন, বলতে বলতে অশোক রায়ের চোখের কোণ দুটো অশ্রুতে ছলছল করে ওঠে। তারপর একটু থেমে বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে বলে, আমি সেটা জানতে পেরেছিলাম বলেই তার অতীতের সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম মিঃ রায়। কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ কি হয়ে গেল!

অশোক রায়ের কণ্ঠস্বর যেন শেষটায় আর শোনা গেল না, কান্নায় বুজে এল।

কথা বললে আবার কিরীটী, আর ঠিক সেই জন্যই তাঁকে এমনি নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হল অশোকবাবু। এতকাল যে শয়তান সেই নারীর মন ও দেহকে নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যবসা খুলে বসেছিল সে সেটা সহ্য করতে পারল না এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও রহস্য তার দ্বারা বাইরে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেই কারণেই আপনার ও মিত্রা দেবীর মিলনের মুহূর্তে সে মিত্রা দেবীকে সংহার করল নিজের সেফটির—নিরাপত্তার জন্য। এমনিই হয় অশোকবাবু। পাপের পথ, দুষ্কৃতির পথ,—বড় পিছল, বড় ভয়াবহ। একবার সে পথে পা পড়লে ফেরা বড় কঠিন।...এবং ফিরতে গেলেও এমনি করেই তাকে মূল্য দিতে হয়। কিন্তু যাক সে কথা। এবারে আর একটি প্রশ্ন আমার আপনাকে জিজ্ঞাস্য আছে।

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালেন অশোক রায়।

ডাক্তার ভুজঙ্গ চৌধুরীকে আপনি চিনতেন?

হ্যাঁ।

তাঁর চেম্বার ও নার্সিং হোম সম্পর্কে আপনি কিছু আমাকে বলতে পারেন?

খুব বেশী আমি জানি না মিঃ রায়, তবে বৈকালী সংঘের অনেক মেম্বারই মধ্যে মধ্যে রাত এগারটার পর সেখানে যাতায়াত করতেন।

কেন তাঁরা যাতায়াত করতেন বলতে পারেন?

না।

আপনিও তো মধ্যে মধ্যে সেখানে যেতেন।

হ্যাঁ গিয়েছি।

কেন?

জবাবে কেন জানি এবারে অশোক রায় চুপ করে রইলেন মাথা নিচু করে।

বুঝতে পারছি অশোকবাবু, কোন কিছুর একটা আকর্ষণ আপনারও সেখানে ছিল। বলতে আপনি দ্বিধা করছেন। বেশ, কথাটা আরও স্পষ্ট করেই তাহলে বলি, কোন মাদক দ্রব্যের বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর বেচা-কেনার ব্যাপার কি সেখানে আছে?

এবারে যেন সত্যিই চমকে ওঠেন অশোক রায়। বিহ্বল জড়িত কণ্ঠে বলেন, কিন্তু আপনি—আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

যদি বলি নিছক সেটা আমার একটা অনুমানই মাত্র?

অনুমান?

হ্যাঁ।

মাদক দ্রব্য কিনা জানি না মিঃ রায়। তবে এক ধরনের স্পেশাল ব্র্যাণ্ড ইজিপ্সীয়ান

সিগারেট কেনবার জন্য কেউ কেউ আমরা সেখানে যেতাম।

সিগারেট?

হ্যাঁ।

যাক। আর আমার কিছু আপনাকে জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি এবারে যেতে পারেন। কেবল একটা অনুরোধ, এই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি কলকাতা ছেড়ে কোথায়ও যাবেন না দয়া করে।

বেশ তাই হবে।

॥ একুশ ॥

অতঃপর অশোক রায় বিদায় নিলেন।

ঐদিন রাত বারোটার পর কিরীটীর পূর্ব-পরিকল্পনামত আমরা ছোট একদল সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী নিয়ে ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর আমীর আলী অ্যাভিন্যুর আবাসস্থল গিয়ে ঘেরাও করলাম।

এবং আমি, কিরীটী ও লাহিড়ী তিনজনে মিলে সদর দরজায় উপস্থিত হয়ে, কিরীটীর নির্দেশে আমিই দরজার গায়ে কলিং বেলের বোতামটা টিপলাম।

বলা বাহুল্য আমরা তো সাধারণ বেশে ছিলামই, লাহিড়ীও ছিলেন সাধারণ বেশে।

কিছুক্ষণ বাদেই দরজা খুলে দিল ডাঃ চৌধুরীর খাস ভৃত্য রাম।

কে আপনারা, কি চান?

কিরীটী জবাব দিল, ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাত্রে তো তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

করবেন। তুমি তাঁকে গিয়ে বল কিরীটী রায় এসেছেন, দেখা করতে চান। জরুরী।

মিথ্যে আপনি বলছেন বাবু। স্বয়ং মহারাজা এলেও রাত্রে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

ইতিমধ্যে কিরীটীর পূর্ব-নির্দেশমত তার নিযুক্ত লোকটি ডাক্তারের বাড়ির ছদ্মবেশী ভৃত্য রামের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং আচমকা সে পিছন দিক থেকে রামকে আক্রমণ করতেই কিরীটীও তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গেল লাফিয়ে। রাম কোনরূপ শব্দ করবার পূর্বেই তাকে হাত-মুখ বেঁধে বন্দী করা হল। এবং সেই ছদ্মবেশী ভৃত্যই তখন রামের কোমর থেকে একটা চাবির গোছা ছিনিয়ে নিল।

ঐ চাবির গোছাটা হাতাবার জন্যই এত আয়োজন পরে জেনেছিলাম।

চাবির সাহায্যে তারপর সিঁড়ির কোলাপসিবল গেট খুলে আমরা নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম।

দোতলা ও তিনতলার মধ্যে সিঁড়িতে আর একটি কোলাপসিবল গেট ছিল, সেটাও ঐ রিঙের একটি চাবির সাহায্যে খুলে আমরা তিনতলায় পা দিলাম।

ঘুটি ঘর পাশাপাশি।

দুটোরই দ্বার বন্ধ।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় দ্বারে মৃদু আঘাত করল পর পর চারটি টুক-টুক শব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দরজাটা খুলে গেল।

কিরে রাম—কথাটা বলতে গিয়ে শেষ না করেই সহসা ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী আমাদের তিনজনকে দরজার সামনে দেখে বিস্ময়ে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

নমস্কার ডাঃ চৌধুরী! এত রাত্রে নিজের শয়নকক্ষের দোরগোড়ায় আমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকেই ভুজঙ্গ চৌধুরী যেন নিজেকে সামলে নিলেন এবং মৃদু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, তা একটু হয়েছে বৈকি!

ভাবছেন নিশ্চয়ই কি করে এখানে এতরাত্রে প্রবেশ করলাম?

না। কিন্তু বাইরে কেন, ভিতরে আসুন। কষ্ট করে এসেছেনই যখন।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর পরিধানে তখন ছিল গ্রে রঙের ট্রপিক্যাল স্যুট। পায়ে রবার-সোল দেওয়া জুতো।

সেইদিকেই তাকিয়ে কিরীটী বললে, এই ফিরছেন, না কোথাও বেরুচ্ছিলেন?

অনধিকার-চর্চা ওটা আপনার মিঃ রায়। কিন্তু কেন এ গরীবের কুটিরে বেআইনী ভাবে জুলুম করে এই অসময়ে আপনার মত মহাত্মার শুভাগমন জানতে পারি কি?

জানাব বলেই তো আসা। শুনবেন বৈকি। তার আগে এই মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার আবার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

ওঁকে আমি চিনি। পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই। আপনার বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি শেষ করলে বাধিত হব।

কথা বললেন এবার রজত লাহিড়ীই। বললেন, বৈকালী সংঘ ও আপনার চেম্বারে বিনা লাইসেন্সে হ্যাস্‌হিস্‌ নামক মাদক দ্রব্যের চোরা কারবার করবার জন্য আপনাকে আমি arrest করতে এসেছি ডাঃ চৌধুরী।

I see ! তা এ মূল্যবান সংবাদটি কোথায় পেলেন ? মিঃ কিরীটী রায়ই দিয়েছেন বোধ হয় ?

সে জেনে আপনার কোন লাভ নেই ডাঃ চৌধুরী। আপনি সরে আসুন, আপনার ঘরটা একবার সার্চ করতে চাই।

করতে পারেন কিন্তু consequenceটাও মনে রাখবেন। অযথা একজন ভদ্র-লোককে এভাবে বিব্রত করা আপনাদের আইনও নিশ্চয়ই সম্মতি দেয় না।

সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। লাহিড়ী জবাব দিলেন।

আবার কিরীটী কথা বললে, তার আগে দয়া করে আপনি আপনার ছোট ভাই ত্রিভঙ্গবাবু ও তাঁর স্ত্রী মৃদুলা দেবীকে যদি একবার এখানে ডাকেন—

মিঃ রায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন না কি ! জবাবে বলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

চোখরাঙানিতে বিশেষ কোন ফল হবে না আর ডাক্তার সাহেব। যা বলছি তাই করুন। নচেৎ বাধ্য হয়ে আমাদেরই সে ব্যবস্থা করতে হবে জানবেন। আপনার মত একজন শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ক ব্যক্তির বোঝা উচিত যে প্রস্তুত হয়েই এখানে আজ আমরা এসেছি সবরকমে। মিথ্যে আর দেরি করে কোন লাভ হবে না। যা বললাম করুন। কেন মিথ্যে চাকর-বাকরদের সামনে একটা scene create করবেন !

অতঃপর মুহূর্তকাল ডাঃ চৌধুরী কি ভাবলেন। তারপর বললেন, কিন্তু তাদের ডাকতে হলেও তো নীচে আমাকে যেতেই হবে।

নীচে যাবেন কেন ? ঘরের মধ্যে কোন কলিং বেল নেই আপনার ?

কলিং বেল ?

নিশ্চয়ই। দেখুন না একটু দয়া করে মনে করে। উপর-নীচ করাটাও আপনার বিশেষ অভ্যাস নেই বলেই আমি শুনেছি ডাঃ সাহেব। চলুন, ঘরে ঢুকে ওঁদের আহ্বান করুন।

সে রকম কোন ব্যবস্থাই আমার ঘরে নেই।

তবে দয়া করে সরুন। আমাকেই দেখতে দিন।

মুহূর্তকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে একপাশে সরে দাঁড়ালেন ডাঃ চৌধুরী।

আপনিও ভেতরে চলুন। আমরা ভেতরে যাব আর আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেটা কি ভাল দেখাবে ? চলুন। বলতে বলতে কিরীটী মৃদু হাসল।

সকলে মিলে আমরা যেন কতকটা ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীকে ঘিরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

একটা ব্যাপার আজ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, কিরীটীর চোখ ও কান যেন অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে আছে। তার দেহের প্রতিটি রোমকূপ যেন চক্ষু মেলে রয়েছে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকে চকিতে সিলিং থেকে শুরু করে দেওয়ালের ও মেঝে পর্যন্ত কক্ষের সর্বত্র তার তীক্ষ্ণ অতিমাত্রায় সজাগ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল বার কয়েক।

অত্যন্ত সাধারণ ও স্বল্প আসবাবপত্রে কক্ষটি যেন একেবারে ছিমছাম।

একপাশে একটি সিঙ্গল বেডিং। একটি স্টীলের আলমারি, একটি আরাম-কেদারা, একটি বিরাট আয়না দেওয়ালে টাঙানো ও বেডিংয়ের কাছে একটি ত্রিপয়ের ওপরে অদ্ভুত একটি বৃদ্ধের কাষ্ঠমূর্তি ও একটি কাচের জলভর্তি পাত্র। মূর্তিটি বিরাট উদর-বিশিষ্ট এক বৃদ্ধের। উদরের দু-পাশে দুটো হাত। দন্তপাটি বিকশিত। পা ভাঁজ করে বসে আছে। মাথায় একটি টুপি।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখলাম ঘরের সর্বত্র ঘুরে গিয়ে ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত সেই কাষ্ঠনির্মিত বিচিত্র বৃদ্ধের মূর্তির উপরে স্থির হল।

কয়েক সেকেণ্ড মূর্তিটার দিকে কিরীটী তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ত্রিপয়টার সামনে। দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে হাত রাখল মূর্তিটার গায়ে।

আমরা সকলে স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

মৃদু কণ্ঠে কিরীটী ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, পিকিউলিয়ার! A nice curio! মূর্তিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ডাঃ সাহেব? বলতে বলতে তাকাল কিরীটী ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখের দিকে।

নির্বাক ডাঃ চৌধুরী।

শুধু তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির ফলার মত দৃষ্টি নিষ্পলক কিরীটীর দৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ।

ঘরের মধ্যে যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর থমথমে ভাব।

কিরীটী স্থির অপলক দৃষ্টিতে ডাঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছে বটে কিন্তু দেখতে পেলাম তার ডান হাতটির আঙুলগুলো নিঃশব্দে মূর্তিটার মাথায় বুলিয়ে চলেছে।

স্তব্ধতা।

বরফের মতই জমাট বাঁধানো স্তব্ধতা।

চার-জোড়া চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ।

দুখানা তীক্ষ্ণ তরবারির ফলা যেন পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে একে অন্যের মুহূর্তের অসতর্কতায় চরম আঘাত হানবার প্রতীক্ষায়।

সহসা একটা মৃদু পদশব্দ যেন মনে হল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। পদশব্দটা ক্রমে

ক্রমে এগিয়ে এসে খোলা দরজার গোড়ায় থামল। তারপরই দেখা গেল খোলা দরজার পথে এক অর্ধাবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি।

আজও মনে আছে আমার সে যেন একটা আবির্ভাব। মধ্যরাত্রি যেন মূর্তিমতী হয়ে স্বপ্নের পথ বেয়ে সেদিন আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা এক স্বপ্নচারিণী নারীমূর্তি যেন।

গাত্রবর্ণ খুব পরিষ্কার না হলেও চোখে মুখে ও দেহে সেই নারীর রূপের যেন অবধি ছিল না।

মনোমোহিনী সেই নারীমূর্তি খোলা দরজার পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই মুহূর্ত-মধ্যে যেন থমকে দাঁড়াল। এবং মুখে ফুটে উঠল একটা তাঁর চাপা আশঙ্কা।

আসুন মৃদুলা দেবী!

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিরীটীর মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

কিন্তু কিরীটীর আহ্বানে কোন সাড়াই যেন জাগল না সেই প্রস্তরীভূত নারীমূর্তির মধ্যে।

আবার কিরীটী বললে, বসুন।

তথাপি নির্বাক সেই নারীমূর্তি।

এবারে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নীচের গাড়ি থেকে অশোকবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তো সুব্রত।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম একটু যেন বিস্মিত হয়েই।

কিন্তু নীচে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কখন একসময় অশোক রায় নিজের গাড়ি নিয়ে এসে তার মধ্যে বসে আছেন চুপটি করে।

বললাম, কিরীটী আপনাকে ওপরে ডাকছে, চলুন অশোকবাবু।

ঘরের মধ্যে আমি ও অশোকবাবু এসে প্রবেশ করতেই কিরীটী বললে, আসুন অশোকবাবু, দেখুন তো ঐ উনিই আপনার সেই মনীষা দেবী কিনা।

কিরীটীর কথায় অশোকবাবু এবার চোখ তুলে তাকালেন ঘরের মধ্যেই একপাশে পাথরের মত নিঃশব্দে দণ্ডায়মান মৃদুলা দেবীর মুখের দিকে।

মৃদুলা দেবীও যেন কেমন বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলেন অশোক রায়ের মুখের দিকে। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

স্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত। কেবল ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার একঘেয়ে পেণ্ডুলামের টক-টক শব্দ।

কি, চিনতে পারছেন না অশোকবাবু?

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এবার মাথা নাড়লেন অশোক রায়।

চিনেছেন ?

হ্যাঁ। উনিই তারপর একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ, উনিই। আমার মনে পড়েছে এখন উনিই মিত্রার মৃত্যুর দিন বৈকালী সংঘে—

হ্যাঁ অশোকবাবু, কথাটা এবার কিরীটীই শেষ করে, ওঁকেই আপনি হলঘরে সে রাত্রে ঢুকে দেখেছিলেন। আর শুধু তাই নয়, বাগানে সে রাত্রে মিত্রা সেনের dead bodyর সামনে থেকে উনিই চক্রান্ত করে ভয় দেখিয়ে আপনাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি যাতে করে আপনাকেই সকলে মিত্রা সেনের হত্যাকারী বলে সহজেই মনে করতে পারে।

তবে কি—অর্ধস্ফুট আর্তকণ্ঠে কথাটা বলতে গিয়েও যেন শেষ করতে পারলেন না অশোক রায়।

হ্যাঁ, উনিই মিত্রা দেবীর হত্যাকারিণী। মৃদুলা দেবী এবং মীরা চৌধুরী একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু উনি দুর্ভাগ্যক্রমে মিত্রা দেবীকে হত্যা করার অপরাধে আজ দণ্ড নিতে বাধ্য হলেও আসল হত্যার পরিকল্পনাটা ওঁর নয়, হত্যার ব্যাপারে উনি instrument মাত্র ছিলেন। আসল পরিকল্পনাকারী বা হত্যাপরাধে অপরাধী হলেন উনি—আমাদের ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

কিরীটী ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল একবার এবং তাঁকেই সম্বোধন করে বললে, কিন্তু এ আপনি কি করলেন ডাঃ চৌধুরী! মানুষের সেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের নীচে ডুবে গেলেন!

ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী নির্বাক।

॥ একুশ ॥

বিস্মিত হতবাক সকলে।

কিরীটী বলতে লাগল, হ্যাঁ, উনি। মৃদুলা দেবীরই সাহায্যে আমাদের ডাঃ ভুজঙ্গ চৌধুরী তাঁর লাভের ব্যবসা খুলে বসেছিলেন। হতভাগ্য রূপমুগ্ধ পুরুষদের ওঁরই সাহায্যে ব্ল্যাক মেইলিং করতেন এবং নার্সিং হোমে ওঁরই হাত দিয়ে সরবরাহ করতেন হাস্‌হিস্ সিগারেট নেশাগ্রস্তদের। তারপর মিত্রা সেনকে হাতে পেয়ে বৈকালী সংঘের ব্যাপারটা তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল মিত্রা দেবী

অশোকবাবুকে ভালবাসায়। ভালবাসার সুধারসে নতুন করে জেগে উঠলেন মিত্রা দেবী। আর সেইটাই হল তাঁর কাল। পাছে তাঁর মুখ থেকে সব অতীতের সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী মৃত্যুবাণ হানলেন মিত্রার বুকে। কৌশলে তাঁকে বৈকালী সংঘে আনিয়ে মৃদুলা দেবীর সাহায্যে বিষ প্রয়োগ করালেন। পূর্বেই বলেছি অশোক রায় সে রাত্রে হলঘরে ঢুকে মনীষা দেবীকেই দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু মনীষা দেবী বা মৃদুলা দেবী ছদ্মবেশে থাকায় এবং অশোক রায় ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনীষা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ায় অশোক রায় সে রাত্রে তাঁকে চিনতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মৃদুলাই স্বীকৃতি দিলেন আদালতে।

সে স্বীকৃতি যেমন করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী।

প্রথম যৌবনে একদা মৃদুলা ভালবেসেছিল ভুজঙ্গ ডাক্তারকে। কিন্তু অর্থপিশাচ ভুজঙ্গর মনে আর যাই থাক নারীর প্রতি কোন দুর্বলতা কোনদিনই ছিল না। অথচ সে বুঝতে পেরেছিল অসাধারণ বুদ্ধিমতী মৃদুলাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে সে ভবিষ্যতে অনেক কাজ করতে পারবে, তাই সে কৌশল করে পঙ্গু ভাই ত্রিভঙ্গর সঙ্গে গরিবের মেয়ে মৃদুলার বিবাহ দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসে তার—অর্থাৎ মৃদুলার অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

আর তার পর থেকেই মৃদুলার সেই প্রেমের সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে ভুজঙ্গ ডাক্তার হতভাগিনী মৃদুলাকে।

ভুজঙ্গের প্রতি ভালবাসা ছাড়াও কিছুটা অবিশ্যি বিকৃত মনোবৃত্তি ছিল মৃদুলারও। তা না হলে তাকে দিয়ে সব কাজ হয়তো ভুজঙ্গ ডাক্তারেরও করা অসাধ্য হত।

এবং শেষ পর্যন্ত মিত্রা সেন অশোক রায়কে ভাল না বাসলে হয়তো ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঐভাবে অত দ্রুত ঘটত কিনা সন্দেহ!

ভুজঙ্গই রাত্রে ছদ্মবেশে বৈকালী সংঘে গিয়ে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসত।

সে কথাও জানা গেল মৃদুলার জবানবন্দি থেকেই।

মৃদুলা পূর্ব হতেই উপস্থিত ছিল সে রাত্রে বৈকালী সংঘে এবং শশী হাজরা যেটা তার জবানবন্দিতে গোপন করে গিয়েছিল পরে সেও স্বীকার করে। মৃদুলাই অতর্কিতে তীব্র ক্রিয়ার বিষ মিত্রার দেহে ইনজেক্ট করেছিল ভুজঙ্গর পূর্বপরামর্শ মত।

মৃত্যুবাণ

www.boiRboi.blogspot.com

চরিত্রলিপি

মৃত্যুবাণ উপন্যাসটির মধ্যে বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ দেখা দিয়েছে, বহু বিচিত্র চরিত্র। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্যই একটি সম্পূর্ণ চরিত্রলিপি দেওয়া হল।

রাজা যজ্ঞেশ্বর মল্লিক ... রায়পুর স্টেটের রাজা

রাজেশ্বর মল্লিক ... যজ্ঞেশ্বরের খুড়তুত ভাই

রাজা রত্নেশ্বর মল্লিক ... যজ্ঞেশ্বরের একমাত্র পুত্র

„ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ... রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র

কুমার সুধাকণ্ঠ মল্লিক ... ঐ মধ্যম পুত্র

„ বাণীকণ্ঠ মল্লিক ... ঐ কনিষ্ঠ পুত্র

কাত্যায়নী দেবী ... ঐ একমাত্র কন্যা ও নায়েব শ্রীবিলাস মজুমদারের ভ্রাতৃবধূ

হারাধন মল্লিক ... সুধাকণ্ঠের পুত্র, রায়পুর আদালতের মোক্তার

নিশানাথ মল্লিক ... বাণীকণ্ঠের পুত্র, শোলপুর স্টেটের চিত্র-শিল্পী, বিকৃত মস্তিষ্ক

রাজাবাহাদুর রসময় মল্লিক ... নিষ্পুত্রক রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের দত্তক-পুত্র

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক ... রসময় মল্লিকের প্রথম পক্ষের পুত্র

কুমার সুহাস মল্লিক ... ঐ দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র

প্রশান্ত মল্লিক ... সুবিনয় মল্লিকের একমাত্র পুত্র

জগন্নাথ মল্লিক ... হারাধন মল্লিকের পৌত্র

সুরেন চৌধুরী ... কাত্যায়নী দেবীর পুত্র

ডাঃ সুধীন চৌধুরী ... ঐ পৌত্র বা সুরেন চৌধুরীর ছেলে

সুহাসিনী দেবী ... সুরেন চৌধুরীর স্ত্রী

মালতী দেবী ... ছোট রাণীমা, রসময়ের দ্বিতীয় স্ত্রী

দীনতারণ মজুমদার ... রাজা যজ্ঞেশ্বরের নায়েব

শ্রীবিলাস মজুমদার ... দীনতারণের পুত্র ও শ্রীকণ্ঠ ইত্যাদির নায়েব

শিবনারায়ণ চৌধুরী ... নৃসিংহ গ্রামের নায়েব

দুঃখীরাম ... শিবনারায়ণের ভৃত্য

সতীনাথ লাহিড়ী ... রায়পুরের সদর ম্যানেজার ও সুবিনয়ের সেক্রেটারী

তারিণী চক্রবর্তী ... রায়পুর স্টেটের খাজাঞ্চী

মহেশ সামন্ত ... ঐ তহবিলদার

সুবোধ মণ্ডল ... ঐ বাজার সরকার

www.boiRboi.blogspot.com

হরবিলাস	... নৃসিংহ গ্রামের নতুন ম্যানেজার
সতীশ কুণ্ডু	... স্টেটের একজন কর্মচারী
ছোট্টু সিং	... ঐ দারোয়ান
শম্ভু	... রাজা সুবিনয় মল্লিকের খাস ভৃত্য
মহীতোষ চৌধুরী	... ঐ দূরসম্পর্কীয় ভাই
ডাঃ কালীপদ মুখার্জী	... প্রথিতযশাঃ চিকিৎসক
ডাঃ অমর ঘোষ	... ডাঃ মুখার্জীর সহকারী
ডাঃ অমিয় ঘোষ	... রাজবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক
বিকাশ সান্যাল	... রায়পুর থানার ও, সি,
কর্ণেল মেনন	... বম্বে প্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ
মুন্না	... সাঁওতাল সর্দার
কিরীটী	... রহস্যভেদী
সুব্রত	... কিরীটীর সহকারী
জাস্টিস্ মৈত্র	... হাইকোর্টের জজ
ভবানীপ্রসাদ	... উচ্ছৃঙ্খল বিত্তহীন ধনীর পুত্র
ক্ষ্যাপা বিষ্টুচরণ কৈলাস নির্মল	} ... ঐ দলের লোক
মিঃ হুড্	... কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্-এর ম্যানেজার
ডাঃ আমেদ	কলিকাতার পুলিস সার্জেন

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

২৯শে ফেব্রুয়ারী

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

জজসাহেব রায় দিলেন, জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে সুহাস মল্লিকের হত্যা-মামলার অন্যতম আসামী ডাঃ সুধীন্দ্র চৌধুরীকে।

অবশেষে একদিন সেইদীর্ঘপ্রতীক্ষিত রায়পুরের বিখ্যাত হত্যা-মামলার রায় বের হল।

বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছোটখাটোর মধ্যে অত্যন্ত সচ্ছল রায়পুর স্টেট; সেই স্টেটের ছোট কুমার শ্রীযুক্ত সুহাস মল্লিকের রহস্যজনক হত্যা-সম্পর্কিত মামলা।

জনসাধারণের চাইতেও কলকাতার ও আশেপাশে শহরতলীর বিশেষ করে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হতেই মামলাটি একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বলতে গেলে প্রত্যেকেই মামলার ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত মামলার ফলাফল কি দাড়ায়। সেই মামলার রায় আজ বের হয়েছে।

শীতের সন্ধ্যায় মজলিসটা সেদিন বেশ জমে উঠেছিল।

বহুকাল পরে সেদিন আবার কিরীটীর টালিগঞ্জের বাসায় সকলে একত্রিত হয়েছে। কিরীটী, সুব্রত, রাজু, নীতীশ, ইনস্‌পেক্টার মফিজুদ্দীন তালুকদার, পুলিস সার্জেন ডাঃ আমেদ।

আলোচনা চলছিল রায়পুরের বিখ্যাত খুনের মামলা সম্পর্কে।

আজ জজ সাহেব রায় দিয়েছেন, আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ জারি হয়েছে।

রায়পুরের ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের রহস্যজনক হত্যা-সম্পর্কিত মামলায় তিনিই ছিলেন প্রধান আসামী।

তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। কারণ, এদের মধ্যে কেউই আসামী সুধীন্দ্র চৌধুরীর দোষ সম্পর্কে একমত নয়।

কেবল ওদের মধ্যে একা কিরীটীই একপাশে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে পাইপ টানতে টানতে সকলের তর্ক-বিতর্ক শুনছিল, এবং এতক্ষণও কোন মতামত প্রকাশ করেনি।

এই মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও, কিরীটী কাগজও পড়েছে এবং আগাগোড়াই মামলাটাকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় যখন সুব্রত কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কিরীটী, তোর কি মনে হয়? তুইও কি মনে করিস ডাঃ সুধীন্দ্র চৌধুরী এই হত্যার ব্যাপারে সত্যিই দোষী? তার বিরুদ্ধে যে সব এভিডেন্স খাড়া করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোন ত্রুটিই নেই?

কিরীটী সুব্রতর প্রশ্নে চোখ মেলে তাকাল, ব্যাপারটা বিশেষ রকম জটিল ও রহস্য-পূর্ণ। কিন্তু সে-কথা যাক, মোটামুটি এই হত্যার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে গোড়া থেকেই তোমরা সকলেই একটা মস্ত বড় ভুল করছ বলেই আমার কিন্তু মনে হয়।

সুব্রত প্রশ্ন করে, কেন? কোথায় ভুল করেছি?

কিরীটী বলে, এই ধরনের হত্যা-ব্যাপারের যত কিছু রহস্য সব হত্যার গোড়াতেই থাকে। হত্যা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল রহস্যের ওপরে যবনিকাপাত। কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে, কতকগুলো বিশেষ লোক, কোন একটা বিশেষ কাজ করেছে। এই যে কতকগুলো লোকের একটা বিশেষ সংস্থান, একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, একটা বিশেষ সময়ে, এইখানেই আমাদের যত কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। কাজে কাজেই ঐ খুন বা হত্যার ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদের হত্যা-ব্যাপারের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতে হবে। সমগ্র রহস্যটুকুর মধ্যে হত্যাটাই তো শেষ পরিচ্ছেদ বা সমাপ্তি মাত্র।

কিরীটী বলে চলে, তোমরা সকলে এবং অনুসন্ধানকারীরাও ঐ শেষ পরিচ্ছেদ থেকেই বার বার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছ। তাই তোমরা সত্যের শেষ ধাপে কোনমতে পৌঁছাতে পারছ না। শুরু কর সেই প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে এবং তাহলেই আসল সত্যের মূলে আসতে পারবে।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, ধর আমাদের আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরীর ব্যাপারটাই। সুহাস মল্লিকের হত্যার সময়টিও ঠিক সে অকুস্থানে অর্থাৎ কলকাতায় ছিল না অর্থাৎ মৃত্যুর সময়টায় সে কয়েকদিনের জন্য বেনারসে চলে গিয়েছিল এবং মৃত্যুর দিন পাঁচেক বাদেই আবার সে ফিরে আসে। মাঝখানে মাত্র পাঁচ-সাতটা দিন, এতেই সে জড়িয়ে পড়ল হত্যাপরাধের ব্যাপারে। কেন না, প্রথমতঃ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে শেষবার সুহাস মল্লিক যখন রায়পুরে যান, মামলায় জানা যায় শিয়ালদহ স্টেশনে তখুনি নাকি ছোট কুমারের দেহে 'প্লেগ ব্যাসিলাই' ইন্‌জেকশন করা হয় এবং সুধীন চৌধুরী তখন সেই দলের মধ্যে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সুধীন চৌধুরী একজন ডাক্তার। ডাঃ চৌধুরীর প্রতি তৃতীয় অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সটা হঠাৎ গত মাস

দুয়ের মধ্যে বিশেষ রকমভাবে ফেঁপে উঠেছিল, যেটা তাঁর দশ বছরের ইন্‌কামের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো গেল না, এবং তিনিও নিজে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে এক প্রকার রাজীই হলেন না আদালতে বিচারের সময়। তাহলেই ভেবে দেখ ব্যাপার যাই হোক না কেন, স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে গেলে ডাঃ সুধীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সত্যিই কি বেশ জটিল নয়?

ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট সব কটি প্রাণীই যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে কিরীটীর কথাগুলো শুনছিল। কারও মুখে একটি টু শব্দ পর্যন্ত নেই। জমাট স্তব্ধতা। ঠিক এভাবে তো ওদের মধ্যে কেউই বিচার বা বিশ্লেষণ করে দেখেনি মামলাটা সত্যিই।

তোমরা হয়ত বলবে, কিরীটী আবার শুরু করে, মামলার that black man with the umbrella, সেই ছাতাওয়ালা কালো লোকটি, যার সব কিছু শেষ পর্যন্ত মিস্ট্রিই রয়ে গেল, আগাগোড়া মামলাটায়, সেই যে আসল কালপ্রিট নয় তাই বা কি করে বলা যায়?

সুব্রত প্রশ্ন করে, তুমি কি তাই মনে কর?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, মনে আমি অনেক কিছুই করি, আবার করিও না।

সুব্রত বলে, কিন্তু আমারও মনে হয়, এব্যাপারে he was only an instrument, তাকে সামান্য একটা instrument হিসাবেই এ হত্যার ব্যাপারে কাজে লাগান হয়েছিল। আসল নাটকের সেই অপরিচিত কালো লোকটি (?) একটা side character মাত্র। তার কোন importanceই নেই এই হত্যা মামলায়।

প্রত্যুত্তরে কিরীটী বলে, হয়তো তোমার ধারণা বা অনুমান মিথ্যা নাও হতে পারে সুব্রত, কিন্তু তবু সেই অজ্ঞাত ছাতাওয়ালার আগাগোড়া movementটা যদি trace করা যেত, তবে আসল হত্যাকারীর একটা কিনারা করা যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে? Side character হলেও un-important তো নয়?

মৃদুস্বরে সুব্রত বলে, আমার কিন্তু মনে হয় তা সম্ভব হত না।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে হয়ত যেত না—তবু কথাটা ভাববার কারণ প্রথমতঃ এই মামলার আসল হত্যাকারীর সঙ্গে ঐ বিশেষ লোকটির কোন যোগাযোগ ছিল বা ছিল না —কিংবা হত্যাকারী অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে সেই লোকটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রেখেছে বা রাখেনি—এবং নিজে আড়ালে থেকে লোকটিকে দিয়ে কৌশলে কাজটুকু করিয়ে নিয়েছে—সব কিছুই ভেবে দেখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ছত্রধারী লোকটি আসল ব্যাপারটা—তাকে দিয়ে যে অন্য একটি লোকের দেহে প্লেগের বিষ সংক্রমিত করা হচ্ছে সেটা সে বুঝতে শেষ পর্যন্ত পেরেছিল কিনা—আমি স্থিরনিশ্চিত যে সেই লোকটির হাতে ছাতাটা আসবার আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্তও সেই কালো লোকটি ছাতার কোন অস্তিত্বও

জানতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এবং সেই ছাতাটাই যে ছিল সকল রহস্যের মূল সে কথাটা ভুললে চলবে না।

একটা সামান্য তুচ্ছ ছাতার মধ্যে এমন কি 'মিষ্ট্রি' থাকতে পারে, তা তো বুঝে উঠতে পারছি না, বলল মিঃ তালুকদার।

ছাতাটা যে তুচ্ছ তা আপনাকে বললে কে মিঃ তালুকদার? এই হত্যা-রহস্যের মূল সূত্রই, আমার যতদূর মনে হয়, সেই তুচ্ছ ছাতাটার মধ্যেই আমাদের সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে হয়ত লুকিয়ে রয়ে গেছে। The brain behind it—তার আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। হত্যা-রহস্যের মজাই ঐ! সামান্যতম ঘটনা বা বস্তুর সঙ্গে যে কত সময় কত মূল্যবান সূত্র জট পাকিয়ে থাকে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বা বিচার-বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়ে বা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে যা হয়ত আমরা কত সময় লক্ষ্যই করি না। রায়পুরের হত্যা-রহস্যের মধ্যেও তেমনি মূল্যবান একটি সূত্র ঐ তুচ্ছ ছাতাটা, যা তদন্তের সময় বা আদলতে বিচারের সময় কেউই আবশ্যকীয় বলে এতটুকু নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু কথার তর্কে বিতর্কে রাত্রি অনেক হয়েছে এবারে এস আজকের মত সভাভঙ্গ করা যাক। নাসারন্ধ্রে সুমধুর খিচুড়ির ঘ্রাণ আসছে। এই শীতের রাত্রে গরম গরম খিচুড়ি সহযোগে ফুলকপির চপ ও আলুর ঝুরি ভাজা নেহাত মন্দ লাগবে না, কি বল হে?

কিরীটী যেন কতকটা ইচ্ছে করেই সভা ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়াল। কাজেই অন্যান্য সকলকেও উঠে দাঁড়াতে হল সেই সঙ্গে।

সত্যিই রাত্রি বড় কম হয়নি। দেওয়াল-ঘড়িটা সগৌরবে ঘোষণা করলে রাত্রি দশটা ঢং ঢং করে।

* * *

আহারাদির পর সকলেই বিদায় নিয়েছেন।

কিরীটী তার শয়নকক্ষের পশ্চিম দিকের খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। কৃষ্ণা শুয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, জানালাপথে দেখা যায়, রাত্রির এক-টুকরো আকাশ; কয়েকটি মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে।··· সুদূরের কালো ভীরু চাউনির মত মৃদু কম্পিত। খোলা জানালাপথে শীত-রাত্রির ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে হিমকণাবাহী!

কিরীটী ভাবছিল: কত না হত্যা-ব্যাপার নিয়েই সে এ জীবনে ঘাঁটাঘাঁটি করলো! কত বৈচিত্র্যই যে হত্যা-রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। কিরীটী মধ্যে মধ্যে ভাবে এমন যদি হত হত্যাকারী অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধি ও বিবেচনার

দ্বারা হত্যার পূর্বেই চারিদিক বাঁচিয়ে সমস্ত পরিকল্পনামত একান্ত সুষ্ঠুভাবে হত্যা করতে পারত, তবে কার সাধ্য তাকে ধরে! কিন্তু এরকম কখনও আজ পর্যন্ত সে হতে দেখল না। সামান্য একটু গলদ, সামান্য একটু ভুল। হত্যাকারীর সমগ্র পরিকল্পনা সহসা বানচাল হয়ে যায়। নিজের ভুলে নিজেই বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে ফেলে। এমনিই নিয়তির মার!

বাবু!

কিরীটী চমকে ফিরে তাকায়। দরজায় দাঁড়িয়ে ভৃত্য জংলী।

কি রে জংলী?

একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এত রাত্রে কে আবার ভদ্রমহিলা দেখা করতে এলেন? বসতে দিয়েছিস তো?

হুঁ, বাইরের ঘরে বসিয়েছি। বললেন আপনার সঙ্গে নাকি বিশেষ কি দরকার, এখুনি দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।

কিরীটী আদৌ আশ্চর্য হয় না কারণ এ রকম অসময়ে বহুবার বহু লোকই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এবং অনেক সময় অনেক ভদ্রমহিলাও দেখা করতে এসেছেন।

কিরীটী গরম ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে একতলায় নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল।

সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই আগন্তুক ভদ্রমহিলা সোফা হতে উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় কিরীটী দেখল, ভদ্রমহিলা বেশ বর্ষীয়সী। বয়স পঁয়তাল্লিশের উর্ধ্বে নিশ্চয়ই। পরিধানে সাধারণ মিলের একখানা সাদা থান কাপড়। গায়ে একটা ছাই রঙের পুরনো দামী শাল জড়ানো। মাথার ওপরে ঈষৎ ঘোমটা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মুখে বয়সের বলিরেখা পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। একদা যে ভদ্রমহিলা বয়সের সময়ে অতীব সুশ্রী ছিলেন, প্রথম দৃষ্টিতেই তা এখনও বেশ বোঝা যায়, বিগত সৌন্দর্যের এখনও অনেকখানিই যেন সমগ্র দেহ ও বিশেষ করে মুখখানি জুড়ে বিরাজ করছে। লম্বাটে রোগা চেহারা। চোখে শান্ত স্থির দৃষ্টি।

বসুন মা, আপনি উঠলেন কেন? কিরীটী ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে।

তোমারই নাম কিরীটী রায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ, বসুন। কিরীটী এগিয়ে এসে একখানা সোফা অধিকার করে সামনাসামনি বসল।

ভদ্রমহিলাও আবার উপবেশন করলেন। হাতের আঙুলগুলি পরস্পর জড়িয়ে হাত

দুটি কোলের উপর রাখলেন, এই অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য সত্যিই বড় লজ্জা বোধ করছি বাবা। তারপর একটু থেমে, আবার ধীর শান্তস্বরে বললেন, মা বলে যখন তুমি আমায় সম্বোধন করলে প্রথমেই, নিজের সন্তানের মতই তোমাকে আমি তুমি বলে সম্বোধন করছি। তাছাড়া তুমি তো আমার সন্তানেরই মত।

কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ; কেন যেন মনে হচ্ছিল মুখখানি খুবই চেনা। কবে কোথায় ঠিক এমন একটি মুখ না দেখলেও অনেকটা এমনি একখানি মুখের আদল দেখেছে ও।

অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতই মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠে আবার যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট হয়ে।

কিরীটীকে সামনে বসে একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন, আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ ?

কিছু না মা। ভাবছিলাম আপনার মুখখানি যেন বড় চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। হুঁ—এবারে মনে পড়েছে। রায়পুরের আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরী কি—

ঠিকই ধরেছ, আমি—আমি তারই হতভাগিনী মা। কিন্তু আমার পরিচয় তো এখনও তোমায় আমি দিইনি বাবা! কেমন করে বুঝলে ?

না, দেননি, নিম্নস্বরে কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু আপনার ছেলের মুখখানি যেন আপনারই মুখের হুবহু একখানি প্রতিচ্ছবি। আপনি তাহলে রায়পুরের মামলা সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নিয়েই আমার কাছে এসেছেন ?

হ্যাঁ। রায়পুরের ছোট কুমার সুহাসের মৃত্যুর ব্যাপারটা তো সবই বোধ হয় তোমরা জান ?

সব নয়, তবে কিছুটা কিছুটা জানি। মামলার সময় সংবাদপত্র পড়ে যতটুকু জেনেছি।

রায়পুরের মল্লিক-বাড়ির অনেক কথাই তোমরা জান না। এবং যাঁরা বিচারের নামে দীর্ঘদিন ধরে একটা নিছক প্রহসন করে আমার একমাত্র নির্দোষ ছেলেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন, তাঁরাও জানতেন না বা জানবার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করেননি। অথচ বিচার হয়ে গেল, এবং দোষী সাব্যস্ত করে দ্বীপান্তরের আদেশও হয়ে গেল।

কিন্তু মা, আপনার ছেলের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলিও তো আইনের চোখে খুবই সাংঘাতিক এবং বেশ জোরাল। তাছাড়া আইনের বিচারে তার দোষও প্রমাণিত হয়ে গেছে।

আমি সবই জানি বাবা, প্রমাণিত ঠিক না হলেও প্রমাণিত ধরে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এও জানি এ ধরনের রায় আবার উচ্চতর আদালতে নাকচও হয়ে গেছে বহুবার। সেই আশাতেই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি বাবা।

বলুন মা, এ ব্যাপারে কি ভাবে ঠিক আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি?

তোমার সঙ্গে ঠিক চাক্ষুষ কোন পরিচয় না থাকলেও, তোমার সম্পর্কে অনেক শুনেছি, অনেকখানি আশা বুকে নিয়েই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার ছেলেকে মুক্ত করে এনে দাও বাবা। জীবনে আমার মুখ দিয়ে কোন দিনও মিথ্যা কথা বের হয়নি। আমি জানি, ছেলে আমার নির্দোষ। ঘটনার দুর্বিপাকে সে এই হত্যার মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। তাকে বাঁচাও।

স্নেহসিক্ত কাকুতিতে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর যেন শেষের দিকে রুদ্ধ হয়ে আসে। কিরীটী ঠিক কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। ঘরের মধ্যে একটা দুঃসহ স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করে। বাইরে জমাট-বাঁধা শীতের অন্ধকার।

ভদ্রমহিলা আবার একসময় বলতে শুরু করেন, বড় দুঃখে তাকে আমি মানুষ করেছি বাবা। ওইটিই আমার একমাত্র সন্তান; ওর যখন মাত্র তিন বৎসর তখন আমার স্বামী অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন।...

কিরীটী যেন ওঁর শেষের কথা কটি শুনে হঠাৎ চমকে ওঠে। বলে, কি বললেন?

ভদ্রমহিলা কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে বললেন, বলছিলাম আমার স্বামীর কথা।

কিরীটী আবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললে, গোড়া থেকে সব কথা আমাকে যথাসম্ভব খুলে বলুন তো মা।

গোড়া থেকে বলব?

হ্যাঁ, এইমাত্র আপনার স্বামীর কথা যা বলছিলেন সব একেবারে গোড়া থেকে বলুন।

॥ দুই ॥

পুরাতনী

ভদ্রমহিলা ধীর শান্ত স্বরে বললেন, সব জানতে হলে সবার আগে তোমাকে রায়পুরের ইতিহাস জানতে হবে, কিন্তু সে-সব কথা আগাগোড়া বলতে গেলে রাত্রি হয়ত শেষ হয়ে

যাবে। সংক্ষেপে তোমাকে বলব। ভদ্রমহিলা একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। ঘরের ওয়াল-ক্লকটায় রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল ঢং ঢং করে।

ঠিক মধ্যরাত্রি।

ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা। স্তব্ধতা।

উত্তরের খোলা জানালাপথে শীত-রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

জায়গাটার আসল নাম রায়পুর নয়, যদিও আজ প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরে ও জায়গাটাকে রায়পুর বলে সকলে জানে। ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন মৃদু ধীর কণ্ঠে, সুহাস ও সুবিনয় মল্লিকের পিতা রায়বাহাদুর রসময় মল্লিক ছিলেন রায়পুরের পূর্বতন রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের দত্তক পুত্র। শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়রা তিন ভাই। তাঁদের পূর্ব-বর্তী সাত পুরুষ ধরে জমিদার রাজা ওঁদের উপাধি। বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ওঁরা। শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের যখন কোন ছেলেমেয়ে হল না, তখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি রসময়কে দত্তক গ্রহণ করলেন। শ্রীকণ্ঠ মল্লিকদের একমাত্র সহোদরা বোন কাত্যায়নী দেবীর একমাত্র সন্তান হচ্ছেন আমার মৃত স্বামী। আমার নাম সুহাসিনী। আমি আমার স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম, তাঁর দাদামশাই শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের পিতা নাকি মরবার আগে একটা উইল করে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই উইল আইনসিদ্ধ করবার পূর্বেই অকস্মাৎ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক একদিন ওঁদের মহাল নৃসিংহ গ্রাম পরিদর্শন করতে গিয়ে অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। উইলের ব্যাপারটা অবিশ্যি তাঁর নিহত হওয়ার পর একান্ত আপনার জনদের মধ্যে অল্পবিস্তর জানাজানি হয়।

উইলের মধ্যে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন ওঁদেরই জমিদারীর নায়েব শ্রীনিবাস চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীকণ্ঠের ছোট ভাই সুধাকণ্ঠ মল্লিক। যদিও শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের নিহত হওয়ার পরও প্রায় বৎসর খানেক পর্যন্ত নায়েবজী বেঁচে ছিলেন, তবু উক্ত উইলের ব্যাপারটা বাইরের কেউই জানতে পারেনি; অনাত্মীয় দু-একজন জানতে পারলেন নায়েবজীর মৃত্যুর দু-দিন আগে। যদিচ নায়েবজী নিজেও জানতেন না যে এ ব্যাপারটা তখন কিছুটা জানাজানি হয়ে গেছে। যা হোক, অনেকদিন থেকেই নায়েবজী হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, সেই সময় আমার শাশুড়ী কাত্যায়নী দেবী (সম্পর্কে নায়েবজীর ভ্রাতৃবধূ) নায়েবজীর রোগশয্যার পাশে ছিলেন। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে নায়েবজী তাঁর বৌদি কাত্যায়নী দেবিকে ঐ উইলের কথা সর্বপ্রথম বলেন, এবং এও বলেন, যদিও সেই উইলের প্রধান ও অন্যতম সাক্ষী স্বয়ং তিনি নিজে, এবং উইলের ব্যাপার সব কিছুই জানেন, তথাপি শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের মৃত্যুর পর সিন্দুকের মধ্যে সে উইলের আর কোন অস্তিত্বই নাকি পাওয়া যায়নি। উইলের কোন

হদিস পাননি বলেই এবং আইনের দ্বারা উইলটি সিদ্ধ করা হয়ে ওঠেনি বলেই, নেহাত নিরুপায় তিনি ও সম্পর্কে এতদিন কোন উচ্চবাচ্যই করতে পারেননি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বর্গীয় কর্তার সেই ইচ্ছা, যা কোনদিনই সফল হতে পারল না, তার আভাস অশ্রুপূর্ণ খেদোক্তির মধ্য দিয়ে কাত্যায়নী দেবীকে জানিয়ে গেলেন যে কেন, তা তিনিই জানেন।

কাত্যায়নী দেবী সমস্ত শুনে গেলেন নীরবে, এবং ঘুণাক্ষরেও আভাসে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেন না যে ঐ ব্যাপার আগে হতেই তিনি কিছুটা জানতেন। ঐ সময় আমার স্বামী সবে ওকালতি পাস করে ওকালতি শুরু করেছেন এবং স্বাধীন—আমার ছেলের বয়স তখন মাত্র আড়াই বৎসর। আমার শ্বশুরের মৃত্যু তারও বারো বৎসর আগে হয়। নায়েবজীর মৃত্যুর পর মা গৃহে ফিরে এলেন। এবং তারই মাস তিনেক বাদে হঠাৎ একদিন আমার স্বামী ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রায়পুরের স্টেটের ম্যানেজারের পদ নিয়ে রায়পুরে গেলেন। রসময় মল্লিক তখন জমিদারীর সর্বময় কর্তা—এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা থামলেন।

কিরীটী নির্বাক হয়ে একমনে রায়পুরের পুরাতন ইতিহাস শুনছিল।

আমার শ্বশুর মশায়ের মৃত্যুর পর হতেই—উনি আবার বলতে শুরু করলেন, আমাদের সংসারের অবস্থা দিন-দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পরে মার মুখে শুনেছি কী অর্থ-কষ্টের মধ্য দিয়েই না তিনি আমার স্বামীকে মানুষ করেছিলেন। যা হোক রায়পুরের স্টেটে চাকরি পেয়ে আবার সকলে সুখের মুখ দেখলেন। কিন্তু সেও প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঠিক পূর্বে যেমন ক্ষণিকের জন্য আলোর শিখাটা একটু বেশী উজ্জ্বল হয়েই আবার নিভে যায়, তেমনি। কারণ নূতন চাকরিতে আসবার মাস আষ্টেকের মধ্যেই হঠাৎ আমার স্বামী ঐ সেই নৃসিংহগ্রাম মহাল পরিদর্শন করতে গিয়েই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হলেন। ঐ ঘটনার মাস দুই আগে আমার শাশুড়ীর কাশীধামে মৃত্যু হয়েছিল।

ঠিক কি করে আপনার স্বামী নিহত হন, সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি?

এইমাত্র আপনাকে বললাম আমার স্বামী নৃসিংহগ্রাম মহাল পরিদর্শন করতে গিয়েই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হন—

রায়পুর থেকে প্রায় পনর মাইল দূরে ওদের একটা পরগনা আছে, তাকেই বলা হয় নৃসিংহগ্রাম মহাল। শুনেছি সেখানে ওঁদের একটা মস্ত বড় কাছারী বাড়ি আছে ও সংলগ্ন এক বিরাট প্রাসাদ ও অট্টালিকাও আছে। রসময় মল্লিকের পিতাঠাকুরও সেই কাছারী বাড়িতেই নিহত হয়েছিলেন। ঐ নৃসিংহগ্রামে যেতে পথেই পড়ে ওঁদের প্রকাণ্ড এক

শালবন, প্রকৃতপক্ষে রায়পুর স্টেটের যা কিছু আয় বা প্রতিপত্তি ঐ শালবনের বাৎসরিক আয় থেকেই। বছরে বহু টাকার মুনাফা হয় ঐ শালবনের আয় থেকে। মঙ্গলবার আমার স্বামী সেই কাছারী-বাড়িতে যান এবং শুক্রবার রাত্রে তিনি নিহত হন। শনিবার সকালে কাছারীর-বাড়ির তাঁর শয়নকক্ষে মৃতদেহ পাওয়া যায়। কে বা কারা অতি নিষ্ঠুরভাবে ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে তাঁর দেহটিকে এবং বিশেষ করে তাঁর মুখখানা এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে প্রায় দেহ হতে মাথাটি দ্বিখণ্ডিত করে রেখে গেছে যে, নিহত ব্যক্তিকে তখন চেনবারও উপায় নেই। নিষ্ঠুরতার সে এক বীভৎস দৃশ্য। তারপর দু-দিন পরে যখন আবার আমার স্বামীর মৃতদেহ রায়পুরে নিয়ে আসা হল, দু-দিনের মৃত সেই পচা গলা বিকৃত ও বীভৎস দৃশ্য দেখামাত্রই আমি জ্ঞান হারিয়ে সেইখানেই পড়ে যাই।

সুহাসিনী দেবী এই পর্যন্ত বলে আবার চুপ করলেন।

রসময় মল্লিকের পিতা শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু জানেন? কিরীটী কিছুক্ষণ বাদে প্রশ্ন করে।

আশ্চর্য! শুনেছি ঠিক ঐ একই ভাবে।

তারপর?

তারপর রায়পুরে থাকতে আর আমি সাহস পেলাম না; আমার তিন বৎসরের শিশু পুত্রকে নিয়ে আমি আমার পিতৃগৃহে দত্তপুকুরে দাদার আশ্রয়ে চলে এলাম। পরে অবিশ্যি রাজাবাহাদুর রসময় মল্লিক আরও বছর পাঁচেক বেঁচে ছিলেন, এবং তিনি আমাকে সাহায্যও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন সাহায্যই আমি নিইনি; কারণ রায়পুরের কথা মনে হলেই আমার চোখের ওপরে আমার স্বামীর বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃত-দেহটা ভেসে উঠত। আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে আজ চব্বিশ বৎসর হল। তারপর সুধীকে আমি কত কষ্টে মানুষ করলাম। সুধী বরাবর জলপানি নিয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বের হল। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময়েই এবং প্রথমটায় আমার অজ্ঞাতেই ছোট কুমার সুহাসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা হয়। সেও আজ চার-পাঁচ বছরের কথা হবে। এবং সেই সময় হতেই সুধী আমার অজ্ঞাতেই শুনেছি মাঝে মাঝে রায়পুরেও নাকি যেতে শুরু করে। ইদানীং সুহাস নিহত হবার কিছুদিন আগে হতেই প্রায় বছর দেড়েক ধরে প্রায়ই নানা প্রকার অসুখে ভুগত। এই তো মরবার মাস পাঁচেক আগেই একবার সুহাস 'টিটেনাস' হয়ে প্রায় যায়-যায় হয়েছিল, তখন সুধীই তার টেলিগ্রাম পেয়ে রায়পুরে গিয়ে সুহাসকে নিজে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তোলে। তুমি হয়ত বোধ হয় মামলার সময়েই শুনে

থাকবে সে সব কথা। সুহাস আর সুবিনয় বৈমাত্র ভাই। সুহাসের মা মালতী দেবী আজও বেঁচে আছেন। সুবিনয় রসময় মল্লিকের মৃত প্রথম পক্ষের সন্তান।

হ্যাঁ আমি জানি, কিরীটী মৃদু স্বরে জবাব দেয়, মামলার সময় সংবাদপত্রেই সে সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি চারটে ঘোষণা করলে।

আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি আপনার ছেলের ভার হাতে তুলে নিলাম। তবে ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। তবু এই আশ্বাসটুকু আজ এখন আপনাকে আমি দিতে পারি, সত্যিই যদি আপনার ছেলে নির্দোষ হয়, তবে যেমন করেই হোক তাকে আমি মুক্ত করে আনবই। এবং তা যদি না পারি, তাহলে জানবেন—সে কাজ স্বয়ং কিরীটীরও সাধ্যাতীত ছিল।

তোমার ফিসের জন্য বাবা—

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল মা, এবারে ঘরে ফিরে যান। আগে তো আপনার ছেলেকে আমি আইনের কবল থেকে মুক্ত করে আনি, তারপর না হয় ধীরেসুস্থে একদিন ফিস্ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

তোমাকে যে কী বলে আশীর্বাদ করব বাবা—ওঁর কণ্ঠস্বর অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

সেটাও ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক মা।

তবে আমি আসি বাবা। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

আসুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি যে আপনার কাজে হাত দিলাম, এ-কথা কিন্তু আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কাউকেই আপনি জানাতে পারবেন না, এবং আমার কাছে এসেছেন সে কথাও গোপন করে রাখতে হবে।

বেশ বাবা, তাই হবে।

আর একটা কথা মা, আমার সঙ্গে আর আপনি দেখা করতেও আসতে পারবেন না। আপনার ঠিকানাটা শুধু রেখে যান, প্রয়োজন হলে আমিই নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

২।১ বাদুড় বাগান স্ট্রীটে আমার ছোট ভাই নীরোদ রায়ের ওখানেই আমি আছি। হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে। বর্তমানে এইখানেই থাকব।

সুহাসিনী দেবী বিদায় নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

॥ তিন ॥

গত ৩১শে মে

রায়পুর হত্যা-মামলা।

অতীতের কয়েকটি পৃষ্ঠা। যেখানে এই হত্যা-রহস্যের বীজ অন্যের অলক্ষ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল একটু একটু করে। অথচ কেউ বুঝতে পারেনি। কেউ জানতে পারেনি সেদিন।

সে সময়টা মে মাসের শেষের দিকটা।

কলকাতা শহরে সেবার গ্রীষ্মের প্রকোপটা যেন একটু বেশীই। গ্রীষ্মের নিদারুণ তাপে শহর যেন ঝলসে যাচ্ছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত নানা কারণে সুহাসদের রায়পুর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে; আজ সন্ধ্যার পরে যে গাড়ি তাতেই সকলের রায়পুর রওনা হবার কথা।

সুধীন আজ সকাল হতেই সুহাসকে তার সব জিনিসপত্র গোছগাছ করতে সাহায্য করছে।

অতীতের সেই বিযাক্ত স্মৃতি, সুহাসের সংস্পর্শে এসে সুধীনের কাছে কেবলমাত্র স্মৃতিতেই আজ পর্যবসিত হয়েছে।

সুধীন মনে মনে জানে মল্লিক-বাড়ির সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা মা আদপেই পছন্দ করবেন না। হয়ত বা কেন, নিশ্চয়ই মা তার এই মল্লিক-বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা শুনলে বিশেষ রকম অসন্তুষ্টই হবেন। মুখে তিনি কাউকেই কিছু কোনদিন বলেন না বটে। তাও সে ভাল করেই জানে।

সেই ছোটবেলা থেকেই সুধীন মাকে দেখে আসছে তো! সুধীন বা অন্য কারও যে কাজটা বা ব্যবহার মার মতের বিরুদ্ধে হয়, মা কখনও তার প্রতিবাদ করেন না। এমন কি একটিবারও সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করেন না, কেন এমনটি হল? শুধু নির্বাক কঠিন দৃষ্টি তুলে একটিবার মাত্র অপরাধীর মুখের দিকে তাকান।

পলকহীন মৌন সেই দৃষ্টি হতে যেন একটা চাপা অগ্নির আভাস বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

কিছুক্ষণ ঐ রকম কঠিন ভাবে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেন।

কিন্তু তারপর প্রতি কাজের মধ্যে, প্রতিটি মুহূর্তে, সেই মৌন কঠিন দৃষ্টি যেন সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে ফেরে।

একটা অস্বোয়াস্তি যেন নিরন্তর মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে থাকে। এর চাইতে মা যদি কঠিন ভর্ৎসনা করতেন, তাও বুঝি সহস্রগুণে ছিল ভাল।

পিতাকে তো সুধীনের মনে পড়েই না, এবং মনে থাকবার কথাও নয়, কারণ যে বয়সে সুধীনের পিতা নিহত হন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে, তখন সে শিশুই।

শিশুকালের সে স্মৃতি মনের কোণে কোন রেখাপাতই করতে পারেনি। তবে ছোট-বেলায়ও অনেকের মুখেই শুনেছে একটা দীর্ঘ ঋজু দেহ, অথচ বলিষ্ঠ, গোরাদের গায়ের মত টকটকে গৌরবর্ণ গায়ের রং। মাথার চুলগুলো কদমছাঁটে ছাঁটা, অত্যন্ত স্বল্পভাষী। পিতার কথা ও মার মুখ থেকে শুনেছিল, তাও মাত্র একটিবার। সেই শেষ এবং সেই প্রথম। মনে হয়েছে সে বিষাদ স্মৃতি মা যেন চিরটা কাল ইচ্ছে করেই সুধীনের কাছ থেকে লুকিয়ে গেছেন। কখনও আর জীবনে কোন কারণে সে দুর্বলতা আর প্রকাশ হয়নি।

সেবারে ও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। কোন দিনই জীবনে ও সেই দিনটির কথা ভুলবে না।

ছুটিতে গ্রামে মামার বাড়িতে এসেছে ও। ওর বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে ওর বাবার মৃত্যুতিথি সেদিন। মা চিরদিনই ঐ দিনটায় নিরম্বু উপবাস করেন।

রাত্রি তখন বোধ করি দশটা হবে। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঘরের পিছনের আমগাছটা হাওয়ায় ওলটপালট হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘরের টিনের চালের ওপরে আমগাছের ডালপালাগুলো আছড়ে আছড়ে পড়ছে—তারই অদ্ভুত শব্দ। বৃষ্টির ধারা অবিশ্রাম টিনের চালের ওপরে চট্‌পট্‌ করে শব্দ তুলছে।

ও খাটের ওপরে শুয়ে মোমবাতির আলোয় কি একখানা বই পড়ছিল। কখন এক-সময় নিঃশব্দ পায়ে এসে মা ওর শয্যার পাশটিতে দাঁড়িয়েছেন, ও তো টেরও পায়নি। মা চিরদিন এত নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও বোঝবার উপায় নেই।

মার ডাকে ও মুখ তুলে তাকায়, সুধা! ওর মুখের দিকেই মা তাকিয়ে আছেন।

করুণ ছায়ার মতই যেন মাকে ওর মনে হয়।

ঈষৎ মলিন একখানি থান কাপড় পরা, মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে কাঁধের ওপরে।

রুক্ষ তৈলহীন চুলের গোছা কাঁধের দু-পাশ দিয়ে এসেছে নেমে গুচ্ছে গুচ্ছে।

সারাদিন উপবাসে মুখখানা শুকিয়ে যেন ছোট ও মলিন হয়ে গেছে বাসী ফুলের মত।

মোমবাতির নরম আলো মার নিরাভরণা ডান হাতখানির ওপরে এসে পড়ছে। এত

করুণ ও বিষণ্ণ লাগছিল সেই মুহূর্তটিতে—তাড়াতাড়ি বইটি একপাশে রেখে শয্যার ওপরে সুধীন উঠে বসে, কিছু বলছিলে মা ?

মা একবার পাশটিতে এসে বসলেন, এখনও ঘুমোসনি ?

একটা বই পড়ছিলাম মা।

একটা কথা তুই অনেকদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিস বাবা, কিন্তু জবাব দিইনি, আজ তোকে সেই কথাটা বলব।

মা চুপ করে যান। যেন কিছুটা সংকোচ তখনও অবশিষ্ট আছে মনের কোণায় কোথাও মার।

কি কথা মা ? সুধীনের বুকের ভিতরটা যেন অকারণ একটা ভয়ে অকস্মাৎ ঢিপ্-ঢিপ্ করে কেঁপে ওঠে। মার আজকের এ চেহারার সঙ্গে ও পরিচিত নয় যেন।

তোমার বাবার কথা। মা ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট স্বরে বলেন।

বাইরে একটা বাদল রাত্রির অশান্ত হাহাকার ক্রমেই বেড়ে ওঠে।

একটা বন্দী দৈত্য যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে দিকে দিকে।··· তারই ভয়াবহ তাণ্ডব উল্লাস !

সুধীন মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে আছে, বন্ধ দরজার মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝোড়ো হাওয়া এসে মাঝে মাঝে মোমবাতির শিখাটাকে ঈষৎ কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মার মুখের ওপরে ডান দিকটায় মোমবাতির মৃদু আলোর সামান্য আভাস। মা বলতে লাগলেন সেই করুণ হৃদয়দ্রাবী কাহিনী, আজও সে দিনটার কথা আমি ভুলতে পারিনি সুধী। তারও আগের রাত্রে এমনি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। কিসের যেন একটা অস্বোয়াস্তিতে সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। যতবার দু চোখের পাতা বোজাই, একটা না একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখে তন্দ্রা ছুটে যায়। ভোরবেলাতেই শয্যা ছেড়ে উঠলাম, সারাটা রাত্রি ঘুমোতে পারিনি, শরীরটা বড় ক্লান্ত। বেলা দশটার সময় তোমার বাবার রক্তাক্ত, প্রায় দ্বিখণ্ডিত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহখানি নিয়ে এসে রাজ-বাড়ির সান-বাঁধানো উঠোনের ওপরে নামাল বাহকেরা। একটা সাদা রক্তমাখা চাদরে দেহটি ঢাকা আগাগোড়া। তোমার দাদামশাই রাজা রসময় মল্লিক বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন ; তাঁরই নীরব আদেশে কে একজন যেন এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিলে। সেই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ ও প্রায় দেহচ্যুত ক্ষত-বিক্ষত মস্তকটি দেখে তোমার পিতা বলে আর তাকে চেনবারও তখন উপায় ছিল না। আমি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তিনদিন পরে যখন জ্ঞান হল, চেয়ে দেখি তুই তোর মামার কোলে বসে, আমাকে ঠেলা দিয়ে ডাকছিস মা মা বলে।

মা চুপ করলেন, চোখের কোলে সুস্পষ্ট অশ্রুর আভাস—মোমবাতির আলোয় চিক্‌চিক্ করছে।

বাইরে তেমনি বৃষ্টির শব্দ, দৈত্যটা তেমনি হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে একটানা।

ইতিমধ্যে মোমবাতিটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় তলায় এসে পৌঁচেছে।

ঘরের ভিতরে মৃত্যুর মত একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা! বুকের ভিতরটা যেন কেমন খালি খালি মনে হয়!

মা আবার বলতে লাগলেন, তার পরদিনই, এইটুকু তোকে বুকে করে চলে এলাম দাদার আশ্রয়ে। কিন্তু মনে আমার শান্তি মিলল কই? কতদিন ঘুমের ঘোরে দেখেছি তাঁর অতৃপ্ত দেহহীন আত্মা যেন আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি জানি এর মধ্যে কোথাও একটা কূট চক্রীর চক্রান্ত আছে। ভুলিনি আমি কিছুই। সেদিন হতেই বুকের মধ্যে দিবারাত্র জ্বলছে তুষের আগুন! আর এও জানি, চিতায় না শোয়া পর্যন্ত এ আগুন কোন দিন আর নিভবে না।

তোকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না বাবা, সে ব্যথা যে কতবড় দুঃসহ ও মর্মান্তিক! এতদিন তোকে আমি এ-কথা বলিনি, কেবল নিজের বুকের মধ্যে চেপে চেপে গুমরে মরেছি, কিন্তু এখন তুই বড় হয়েছিস বাবা, এ-কথা হয়ত তুই কানাঘুষায় শুনেছিসও কিন্তু তবু আমাকে প্রশ্ন করিসনি। আর তোর কাছ থেকে চেপে রাখা উচিত নয় বলেই আজ তোকে সবই বললাম, যারা এতবড় মর্মান্তিক অভিশাপ আমার ওপরে তুলে দিয়েছে তাদের যেন তুই ক্ষমা করিস না।

মা চুপ করলেন। এর পর সে রাত্রে মা ও ছেলে কেউই ঘুমোতে পারেনি। কারও চোখের পাতাতেই ঘুম আসেনি। ঐ মাত্র একটি দিনই মার মুখে সুধীন শুনেছিল বাবার কথা, আর কোনদিনও শোনেনি।

সেই ঝড়জলের রাত্রি ছাড়া আজ পর্যন্ত ও সম্পর্কে মা আর ওকে কোন কথাই বলেননি। এবং সেদিন মার ঐ কাহিনীর মধ্য দিয়েই সুধীন বুঝেছিল, মল্লিক-বাড়ির প্রতি কী অবিমিশ্র ঘৃণা ও ক্রোধ আজও তার মার সমগ্র বুকখানাকে ভরে রেখেছে!···

নিষ্ফল আক্রোশে অহর্নিশি মার মনে সে কী দুর্বার দ্বন্দ্ব! এবং সেইদিন থেকে সে নিজেও মল্লিক-বাড়ির যাবতীয় স্পর্শকে বাঁচিয়ে এসেছে কতকটা ইচ্ছে করেই যেন এবং মনের মধ্যে বরাবর পোষণ করে এসেছে একটা তীব্র ঘৃণা। অলক্ষ্যে বসে বিধাতা হয়ত হেসেছিলেন, তাই পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাতুল গোষ্ঠির যে যোগসূত্রটা চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল, সেই ছিন্নসূত্র ধরে দীর্ঘদিন পরে টান পড়ল সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ব্যাপারটা ঘটেছিল সুধীনেরই ফোর্থ ইয়ারে মেডিকেল

কলেজে পড়বার সময়। একদিন রাত্রে আউটডোরে সুধীন যখন ডিউটি দিতে ব্যস্ত এমন সময় খেলার মাঠ থেকে মাথায় পট্টি বেঁধে সুহাস আউটডোরে এল।

রুগ্ন লম্বা ধরনের ছেলেটি। কৈশোরের সীমা পেরিয়ে সবে তখন যৌবনে পা দিয়েছে সে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, বাঁশীর মত টিকলো নাসা, ফোটা ফুলের মতই সুন্দর ঢল-ঢল মুখখানি। ঠোঁটের ওপরে সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। দেখলেই কেমন যেন মনে জাগে একটা স্নেহের আকর্ষণ।

খেলার মাঠে বিপক্ষ দলের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় ক্রমে বচসা হতে হতে হাতাহাতি ও মারামারিতে পরিণত হয়। ডানদিককার কপালে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটি ক্ষত-চিহ্ন।

বাড়িতে মার কাছে বকুনি খাওয়ার ভয়ে, গাড়ি নিয়ে সোজা ময়দান থেকে একেবারে মেডিকেল কলেজে চলে এসেছে ড্রেসিং করাতে সুহাস।

সুধীন গোটা তিনেক স্টিচ্ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল।

এবং সেই সূত্রে ইমার্জেন্সি রুমেই দুজনের মধ্যে প্রথম আলাপের সূত্রপাত হল। ক্রমে সেই সামান্য আলাপকে কেন্দ্র করে গভীর হয়ে উঠতে লাগল পরস্পরের সৌহার্দ্য। এত মিশুকে সুহাস যে দু-চার দিনেই সুধীনকে আপন করে নিতে তার কোন কষ্টই হয়নি। এবং সব চাইতে মজা এই যে তখনও কিন্তু সুধীন সুহাসের আসল পরিচয়টুকু জানতে পারেনি।

ক্রমে আরও দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে দুজনের মধ্যে যখন একটা বেশ মিষ্ট ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে, সেই সর্বপ্রথম সুধীন হঠাৎ একদিন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জানতে পারল, সুহাসের আসল ও সত্যকারের পরিচয়টা কি। এবং সুহাস যে তাদের চিরশত্রু রায়পুরের রাজবাড়িরই ছোট কুমার এ-কথাটা ভাবতে গিয়ে অকস্মাৎ সেদিন কেন যেন বুকের ভিতর তার হঠাৎ কেঁপে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল সেদিন সুধীনের মার মুখে এক ঝড়-জলের রাত্রে শোনা সেই অভিশপ্ত কাহিনী।

মৃদু মোমবাতির আলোয় মার সেই অদ্ভুত শান্ত কঠিন মুখখানা আজও যেন ঠিক বুকের মাঝখানটিতে দাগ কেটে একেবারে বসে আছে। স্পষ্ট করে কোন কথা না বললেও মা যে ঠিক সে রাত্রে অতীতের সেই একান্ত পীড়াদায়ক কাহিনী শুনিয়ে ছেলেকে কি বলতে চেয়েছিলেন, সুধীন তার জবাবে কোন কিছু না বললেও মার কথার মর্মার্থটুকু বুঝতে তার কষ্ট হয়নি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ঘটনা যতই মর্মপীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ হোক না কেন, যে

ঘটনার সঙ্গে তার কোন সংস্রবই ছিল না, এবং ঘটনাকে উপলব্ধি করবার মত তার সেদিন বয়সও ছিল না সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে কোন প্রতিহিংসার স্পৃহাই যেন সুধীনের কোন দিন জাগেনি। যে পিতাকে সে জানবার বা বোঝবার কোন অবকাশই জীবনে পায়নি, যার স্মৃতি মাত্রও তার মনের মধ্যে কোন দিন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, তার হত্যা-ব্যাপারে নিছক একেবারে কর্তব্যের খাতিরে নিজেকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলতে কোথায় যেন তার রুচি ও বিচারে বরাবরই বেধেছে। তাই সুহাসের সঙ্গে ভাল করে ঘনিষ্ঠতার পর যেদিন প্রথম সে সুহাসের সত্যিকারের আসল পরিচয়টুকু জানতে পারলে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই পড়েছিল।

এবং একান্তভাবে মার কথা ভেবেই সে তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করে সুহাসকে এড়িয়ে চলবার জন্যে।

কিন্তু মুশকিল বাধল তার সরলপ্রাণ মিশুকে সুহাসকে নিয়েই, কারণ সুহাস ঐ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানত না। তাই সুধীন তাকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও সুহাস তাকে এড়িয়ে যেতে দিল না, সে পূর্বের মতই যখন-তখন সুধীনের বাসায় এসে হাসি গল্পে আলোচনায় সুধীনকে ব্যস্ত করে তুলতে লাগল দিনের পর দিন এবং বন্ধুত্ব ও আলাপের জেরটা টেনে টেনে সুদৃঢ় করে তুলল যেন আরও।

সুধীনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ঘনিষ্ঠতা দুজনের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এমন কি দু-তিন বার সুধীন মার অজ্ঞাতেই রায়পুর গেল।

প্রথমটায় সে অনেকবার চেষ্টা করেছে মার কাছে সব খুলে বলবার জন্য কিন্তু যখনই সেই বিস্মৃত কাহিনী ও সে রাত্রের মার মুখের সেই কঠিন ভাব মনে পড়েছে ও সংকুচিত হয়ে পিছিয়ে এসেছে।

মার কাছে আর কোন দিন বলাই হল না।

* * *

সেদিন আসন্নবর্তী রায়পুর যাত্রার জন্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে সুধীন ও সুহাসের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

সুহাস বলছিল, আজ আর তোমাকে আমি ছাড়ছি না সুধীদা। আজ সন্ধ্যার পরে একেবারে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে কিন্তু তোমার ছুটি।

কিন্তু আমার হাতে যে ভাই দুটো কেস্ আছে, দুপুরে একবার রোগী দুটি দেখে আসতেই হবে।

বেশ, ড্রাইভারকে বলে দেব, আমার গাড়ি নিয়ে রোগী দেখেই আবার চলে আসবে

এখানে, দুজনে একসঙ্গে আজ দুপুরে খাব। আবদার করে সুহাস বলে।

সুধীন হাসতে হাসতে জবাব দেয়, বেশ, তাই হবে।

সন্ধ্যার ঠিক একটু পরেই সকলে স্টেশনে এসে পৌঁছল। গাড়ি ছাড়বে রাত আটটায়।

সঙ্গে সুহাসের মা মালতী দেবী, সুহাসের দাদা সুবিনয়, সুবিনয়ের একমাত্র ছেলে প্রশান্ত, স্টেটের ম্যানেজার সতীনাথবাবু, এঁরাও সকলেই চলেছেন রায়পুর।

স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। সুহাসের পাশে পাশেই চলেছে সুধীন।

ফার্স্ট ক্লাস কুপে একটা রিজার্ভ করা হয়েছে।

সুহাসের মা মালতী দেবী একবার বলেছিলেন, আজ অমাবস্যা, আজ রওনা না হলেই হত।

হ্যাঁ! তোমাদের মেয়েদের যেমন! আজ অমাবস্যা, কাল দিকশূল, পরশু অশ্লেষা! যত সব! এত করলে বাড়ির বার হওয়াই দায়—রাগত স্বরে সুবিনয়বাবু প্রতিবাদ করেন।

কি জানি, মনটা যেন খুঁত্‌খুঁত্‌ করছে। সেবারে এরকম অদিনে গিয়েই সুহাসের টিটেনস্‌ হল। মালতী দেবী মৃদু স্বরে বলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কোন কাজে প্রতিবাদ জানাতেও তাঁর ভয় করে।

স্টেশনের গেট দিয়ে ঢোকবার সময় আগে সুহাস, তার ডানদিকে সুধীন, পিছনে সুবিনয়বাবু,—বিশ্রী রকম ভিড়, ঠেলাঠেলি চলেছে, সুহাস কোনমতে গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকতে যাবে, পাশ থেকে একটি কালো মোটা গোছের লোক, বগলে একটা নতুন ছাতা, একপ্রকার সুহাসকে ধাক্কা দিয়েই যেন প্ল্যাটফরমে ঢুকে গেল। এবং কতকটা সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাতাওয়ালা লোকটার ধাক্কা খেয়ে উঃ করে অর্ধস্ফুট যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে ওঠে সুহাস।

কি হল? সুধীন ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে সুহাসকে।

সুহাস ততক্ষণে কোনমতে ধাক্কা খেয়ে প্ল্যাটফরমের মধ্যে এসে ঢুকেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সুধীন ও সুবিনয়। সুবিনয়ও এগিয়ে আসে, কি হল!

ডান হাতের উপরে কি যেন ছুঁচের মত একটা ফুটল। উঃ—এখনও জ্বালা করছে, লংক্লথের পাঞ্জাবির উপরেই সুহাস ব্যথার জায়গাটিতে কতকটা অজ্ঞাতসারেই যেন নিজে নিজে হাত বোলায়।

দেখি!···সুবিনয় সুহাসের পাঞ্জাবির হাতটা তুলে ব্যথার জায়গাটা বেশ করে টিপে টিপে মালিশ করে দিতে দিতে বলে, কিছু না। বোধ হয়, কিছুতে খোঁচা লেগেছে। ও

এখুনি ঠিক হয়ে যাবে'খন, একটু সাবধান হয়ে চলতে ফিরতে হয়—তোমরা যেমন ব্যস্তবাগীশ !

জায়গাটা কিন্তু অসম্ভব জ্বালা করছে। মৃদুস্বরে পুনরায় কথাটা বলতে বলতে সুহাস আবার জায়গাটায় হাত বোলাতে থাকে।

এরপর সকলে নির্দিষ্ট কামরায় এসে উঠে বসে।

কথায় কথায় তখনকার মত আপাততঃ সমস্ত ব্যাপারটা একসময় চাপা পড়ে যায়।

সুধীন ট্রেনের কামরার বাইরে জানলার উপরে হাত রেখে সুহাসের সঙ্গে তখন মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিল।

গাড়ি ছাড়বার আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি আছে।

প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

হাতটা এখনও জ্বালা করছে সুধীদা ! মৃদুস্বরে সুহাস বলে।

কই দেখি ? সুধীনের প্রশ্নে, সুহাস পাঞ্জাবির হাতাটা তুলে জায়গাটা দেখাল এতক্ষণে।

'ট্রাইসেপ্স্' মাস্‌লের উপর একটা ছোট্ট রক্তবিন্দু। খানিকটা জায়গা লাল হয়ে সামান্য একটু ফুলে উঠেছে তখন সুধীন দেখতে পায়।

সুধীন বললে, একটু আয়োডিন দিতে পারলে ভাল হত। যাক্ গে—কিছুই হয়ত করতে হবে না। কালই হয়ত সেরে যাবে।

কি করে যে কি হল ঠিক যেন বুঝতে পারলাম না। তাড়াতাড়িতে মনে হল যেন কি একটা ছুঁচের মত বিঁধেই আবার বের হয়ে গেল—সুহাস মৃদু ক্লিষ্ট স্বরে বললে।

সুহাসের ঠিক পাশেই মালতী দেবী বসে, মুখখানা তাঁর বেশ গম্ভীর। মৃদু স্বরে তিনি বললেন, অমাবস্যা, তখনই বলেছিলাম। আজ না বের হলেই হত। কিন্তু তোদের সব আজকালকার সাহেবীয়ানা।...এখন ভালয় ভালয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

ট্রেন ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়ে।

যতক্ষণ গাড়ির জানলাপথে দেখা যায়, সুহাস তাকিয়ে থাকে, সুধীনও প্ল্যাট্‌ফরমের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমালটা ওড়াতে থাকে।

ক্রমে একসময় চলমান গাড়ির পশ্চাতের লাল আলোটা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়।

সুধীন গেটের দিকে অগ্রসর হয়।

॥ চার ॥

প্লেগ ব্যাসিলাই

ব্যথা কমা তো দূরে থাক, হাতটার ব্যথা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কেমন ঝিন্‌ঝিন্‌ করে সমস্ত হাতটা যেন অসাড় মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে।

সুহাস বার্থের বিস্তৃত শয্যার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা—!

সমস্ত রাতের মধ্যে সুহাস একটি বারের জন্যও চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। ব্যথায় ও অস্বোয়াস্তিতে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

সমস্ত হাতটা টন্‌টন্‌ করছে। জ্বর-জ্বরও বোধ হচ্ছে। এমনি করেই রাতটা কেটে গেল।

পরের দিন সকালবেলা স্টেশনে নেমে রাজবাড়ির মোটরে করে সকলে এসে প্রাসাদে পৌছল।

এবং সেদিনই রাত্রের দিকে সুহাসের অল্প অল্প জ্বর দেখা দেয় প্রথম।

পরের দিন সকালে রাজবাড়ির ডাক্তার অমিয় সোমকে ডেকে আনা হল, তিনি দেখে-শুনে বললেন, ও কিছু না, ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। সামান্য ঠাণ্ডা লেগে ইনফ্লুয়েঞ্জা মত হয়েছে, গোটা দুই অ্যাস্‌প্রিন্‌ খেলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। হাতটার যেখানে সামান্য ফুলে লাল হয়ে ব্যথা হয়েছে সেখানে একটু গরম সেঁক দিলেই হবে।

কিন্তু দিন দুই পরেও দেখা গেল জ্বরটা একেবারে বিচ্ছেদ হয়নি, ৯৯° থেকে ১০১°-এর মধ্যেই থাকছে। গলায় ও কোমরে সামান্য সামান্য বেদনা—হাতের ফোলাটা অবিশ্যি অনেকটা কম।

আবার ডাক্তার এলেন, সম্ভব-অসম্ভব তাঁর বিদ্যামাফিক পরীক্ষা করে তিনি নবীন উদ্যমে নতুন ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। এবং এবারও বললেন ভয় বা চিন্তার তেমন কোন কারণ নেই। এমনি করেই আট-দশটা দিন কেটে গেল এবং সেই আট-দশদিনেও জ্বর রেমিশন হল না। গলার দু পাশে, বগলের নীচে, কুঁচকিতে গ্ল্যাণ্ডস্‌গুলো ব্যথা হয়ে সামান্য বড় হয়েছে বলে মনে হল।

মালতী দেবী কিন্তু এবারে বেশ একটু চিন্তিতই হয়ে উঠলেন। হাজার হলেও মার প্রাণ তো!

সুবিনয়কে একদিন সকালে ডেকে বললেন, বিনয়, আট-দশদিন তো হয়ে গেল, কিন্তু সুহাসের জ্বর তো কমছে না কিছুতেই ; কলকাতা থেকে কোন একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখালে একবার হত না ?

সব তাতেই তোমার ব্যস্ত ছোট মা! পথে আসতে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, দু-চারদিন পরেই সেরে যাবে। তাছাড়া ডাক্তার দেখছে, ওষুধ খাচ্ছে। এতেই যদি তোমার ভয় হয়ে থাকে—তবে ডাঃ কালীপদ মুখার্জীকেই না হয় আসবার জন্য একটা তার করে দিচ্ছি।

তাই না হয় করে দাও। অমিয়র চিকিৎসায় তো এক সপ্তাহ প্রায় রইল, কোন উপকারই তো দেখা যাচ্ছে না, সময় থাকতে সাবধান হওয়াই কি ভাল নয় ? শেষে রোগ বেঁকে দাঁড়ালে মুশকিল হবে।

ডাঃ কালীপদ মুখার্জী কলকাতা শহরে একজন মস্ত বড় নাম করা ডাক্তার।

মাসে তিনি অনেক টাকাই উপায় করেন।

রায়পুরের রাজবাড়িতে তাঁর অনেক দিন হতেই চিকিৎসাসূত্রে যাতায়াত। এককথায় তিনিই স্টেটের কনসালটিং ফিজিসিয়ান।

রায়পুরের রাজবাড়িতে কখনও কোন কঠিন কেস হলে কলকাতা থেকে কাউকে আনতে হলে সর্বাগ্রে তাঁরই ডাক পড়ে, এবং বহুবার তিনি রাজবাড়ির অনেকের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করে আরাম ও সুস্থ করে তুলেছেন। এ বাড়ির সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

তাঁর অমতে বা তাঁর অজ্ঞাতে রাজবাড়িতে কখনও অন্য কোন বড় ডাক্তারকে আজ পর্যন্ত ডাকা হয়নি।

বহুবার যাতায়াতের জন্য রাজবাড়ির সঙ্গে ডাঃ মুখার্জীর অত্যন্ত হৃদ্যতা জমে উঠেছে।

রাজবাড়ির একজন হিতৈষী বন্ধুও বটে তিনি।

আর দেরি না করে ঐ দিনই সকালের দিকে তাঁকে আসবার জন্য একটা জরুরী 'তার' করবার জন্য মালতী দেবী বারংবার বলতে লাগলেন।

যদিচ অমিয় ডাক্তার বার বার বলতে লাগলেন, ভয় নেই রাণীমা, সামান্য জ্বর, ও দু-চারদিন নিয়মিত ওষুধপত্র খেলেই ভাল হয়ে যাবে।

এবং সুবিনয়ও সেই সঙ্গে সায় দিতে লাগল। তথাপি রাণীমা বলতে লাগলেন, তা হোক, ডাঃ মুখার্জীকে তার করে দেওয়া হোক, কলকাতা থেকে একটিবার এসে তিনি সুহাসকে যত শীঘ্র সম্ভব দেখে যান।

এবং শেষ পর্যন্ত 'তার' করেও দেওয়া হল। আর তার পেয়েই ডাঃ মুখার্জী রায়পুর এসে হাজির হলেন।

ডাঃ মুখার্জীর বয়স চল্লিশের কিছু উপরেই হবে। থলথলে নাদুসনুদুস গড়ন। লম্বা-চওড়া চেহারা। গায়ের রং কাঁচা হলুদের মত। সৌম্য প্রশান্ত। মাথার সামনের সামান্য টাক পড়েছে। দাড়িগোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো।

দেখলেই মনে একটা সাহস বা নিরাপত্তার ভাব আসে রোগীর মনে।

ডাঃ মুখার্জী এসে সুহাসের কক্ষে প্রবেশ করলেন, কি হে সুহাসচন্দ্র? আবার অসুখ বাধিয়েছ? তুমি যে ক্রমে একটি রোগের ডিপো হয়ে উঠলে হে?...

সুহাস ক্লান্ত স্বরে বলে, বড় দুর্বল লাগছে ডাঃ মুখার্জী।

ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আশ্বাস দেন ডাঃ মুখার্জী।

পরীক্ষার পর মালতী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন ডাঃ মুখার্জী সুহাসকে?

ডাঃ মুখার্জী বলেন, বিশেষ ভয়ের কিছু নেই, ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু তবু ডাঃ মুখার্জীকে মালতী দেবী পাঁচ-ছয়দিন রায়পুরেই আটকে রাখলেন, ছাড়লেন না, বললেন, ওকে একটু সুস্থ না করে আপনি যেতে পারবেন না।

কিন্তু সুহাসের অসুখের কোন উন্নতিই হল না পাঁচ-ছ দিনেও।

ক্রমেই সুহাস যেন বেশী অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। মালতী দেবী এবারে কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আশঙ্কা থম্‌থম্ করে।

শেষটায় মালতী দেবী বেঁকে বসলেন, সুহাসকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে; এ আমার মোটেই ভাল লাগছে না ডাঃ মুখার্জী—কলকাতাতেই ওকে নিয়ে চলুন, সেখানে আরও দু-একজনের সঙ্গে কনসাল্‌ট্ করুন।

ডাঃ মুখার্জী অনেক বোঝালেন, কিন্তু মালতী দেবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে হঠাৎ সুহাসের একখানা চিঠি পেয়ে ডাঃ সুধীন রায়পুরে এসে হাজির হল। সেও বললে, এ অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভাল হবে।

অবশেষে সত্যিসত্যিই একপ্রকার জোর করেই যেন মালতী দেবী অসুস্থ সুহাসকে ডাঃ মুখার্জী ও সুধীনের তত্ত্বাবধানে কলকাতার বাসায় নিয়ে এসে তুললেন।

সুধীন কিন্তু কলকাতায় আসবার পরের পরেরদিনই জরুরী একটা কাজে বেনারস চলে গেল।

আরও বড় বড় ডাক্তার ডাকা হল, সার্জেন, ফিজিসিয়ান কেউ বাদ গেল না।

নানা মুনির নানা মত। নানা চিকিৎসা-বিভ্রাট চলতে থাকে—যেমন সাধারণতঃ হয় অর্থের প্রাচুর্য থাকলে।

অবশেষে পূর্ব-কলকাতার একজন প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ রায় এসে রোগী দেখে ডাঃ মুখার্জীকে বললেন, রক্তটা একবার কালচার করবার জন্য পাঠানো হোক ডাঃ মুখার্জী। সবই তো করে দেখা হল।

ডাঃ মুখার্জী প্রশ্ন করলেন, রক্ত কালচার করে কি হবে ডাঃ রায় ?

রোগীর গ্ল্যাণ্ডস্‌গুলো দেখে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, মনে হচ্ছে 'প্লেগে'র মত, যেন গ্ল্যাণ্ডস্‌গুলো ফুলেছে।

ডাঃ মুখার্জী হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, প্লেগ ! ঐ সমস্ত চিন্তাটা আপনার মাথায় এল কি করে—তাও আজকের দিনে !

ডাঃ মুখার্জী হাসতে লাগলেন।

হাসবেন না ডাঃ মুখার্জী। সব রকমই তো করা হল, ওটাও না হয় করে দেখলেন, এমন কি ক্ষতি ! তাছাড়া আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজনও। শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বরে বেশ একটা দৃঢ়তা যেন ফুটে ওঠে।

না, ক্ষতি আর কি, তবে absoluletly unnecessary, কিন্তু আপনি যখন বলছেন, পাঠানো হোক। কতকটা অনিচ্ছাতেই যেন রক্ত কালচার করবার মত দিলেন ডাঃ মুখার্জী।

যাই হোক, ব্লাড নেওয়া হল কালচারের জন্য, ট্রপিক্যাল স্কুলেও পাঠানো হল। কিন্তু রক্তের কালচারের রিপোর্ট আসবার আগেই, অর্থাৎ পরদিন সকালেই সুহাসের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল।

ডাঃ মুখার্জী ডেথ্ সার্টিফিকেট দিলেন, যথা নিয়মে শবদেহের দাহকার্যও সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

* * *

সুহাসের মৃত্যুর দু-তিনদিন পরে। সুধীন আবার বেনারস থেকে ফিরে এসে সব শুনলে, কিন্তু একটি কথাও ভাল-মন্দ কিছুই বললে না। নিঃশব্দে কেবল ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল—ঘরে তখন অন্যান্য সবাই বসে ছিল।

এদিকে ট্রপিক্যাল স্কুলের ল্যাবরেটরী রুমে অধ্যক্ষ কর্ণেল স্মিথ কতকগুলি কালচার টিউব নিয়ে পরীক্ষা করছেন।

বিকেল প্রায় পাঁচটা, ল্যাবরেটরীর কর্মীরা সকলেই প্রায় যে যাঁর কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি চলে গেছেন।

এমন সময় কর্ণেল স্মিথের সহকারী ও ছাত্র ডাঃ মিত্র, কর্ণেলের সামনে একটা কালচার টিউব নিয়ে এসে দাঁড়ালেন, স্যার !

ইয়েস, ডাঃ মিত্র—? কর্ণেল ডাঃ মিত্রের দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

দেখুন তো—এই কালচার টিউবটা! প্লেগ ব্যাসিলাইয়ের গ্রোথ্ বলেই যেন সন্দেহ হচ্ছে!

What! Plague growth! Let me see! Let me see!

ব্যগ্রভাবে কর্ণেল কালচার টিউবটা হাতে নিয়ে, টিউবের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। উত্তেজনায় তাঁর চোখের তারা দুটো যেন ঠিকরে বের হয়ে আসতে চায়।

Yes! It is nothing but Plague! Yes, it's Plague.

তখুনি গিনিপিগের শরীরে সেই কালচার টিউব থেকে গ্রোথ্ নিয়ে ইন্‌জেক্ট করা হল পরীক্ষার জন্য। এবং খোঁজ করে জানা গেল, রায়পুরের ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের যে রক্ত কালচার করতে ডাঃ মুখার্জী পাঠিয়েছিলেন, এ তারই কালচার।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হল, সেটা যথার্থই প্লেগ ব্যাসিলাইয়েরই গ্রোথ্।

সেই রিপোর্ট তখুনি সঙ্গে করে নিয়ে সন্ধ্যার একটু পরেই কর্ণেল স্মিথ স্বয়ং ডাঃ রায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। কারণ তিনি ডাঃ মিত্রের কাছ থেকেই শুনেছিলেন, ওটা ডাঃ রায়ের সুপারিসেই কালচারের জন্য নাকি এসেছিল, তাছাড়া অন্য কারণও ছিল।

সে যা হোক, বিদ্যুৎগতিতে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারাটা কলকাতা শহরে চিকিৎসকদের মহলে। এবং ক্রমে সেই কথাটা পাব্‌লিক প্রসিকিউটার গগন মুখার্জীর কানে এসে উঠল। গগন মুখার্জী যেন হঠাৎ উঠে বসলেন। আরও দু-চারদিন গোপনে খোঁজখবর চলল, তারপর অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যার ঠিক আগে—পাব্‌লিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর গগন মুখার্জী, রায়পুরের ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের খুনের দায়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে, একই সঙ্গে ডাঃ মুখার্জী, সুবিনয় মল্লিক, ডাঃ অমিয় সোম এবং আরও দু-চারজনকে গ্রেপ্তার করে একেবারে হাজতে পুরলেন।

শহরে রীতিমত এক চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ সংবাদটা যেমনি অভাবনীয় তেমনি চাঞ্চল্যকর।

জামিনে ওদের খালাস করবার জন্য তদ্বির শুরু হল।

কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গগন মুখার্জী কঠিনভাবে মাথা নাড়লেন, জামিনে কারও খালাস হবে না। যতদিন না মামলার মীমাংসা হয়, কারও জামিন মিলবে না। অভিযোগ হত্যা ও হত্যার ষড়যন্ত্র! এবং নিশ্চিত প্রমাণ-সূত্র সরকার বাহাদুরের হাতে পৌঁছে গেছে।

তদন্ত শুরু হল।

গগন মুখার্জী আবশ্যকীয় সব প্রমাণাদি যোগাড় করতে লাগলেন নানা দিক থেকে। গগন মুখার্জীর সব চাইতে বেশী রাগ যেন ডাঃ মুখার্জীর ওপরেই। কিন্তু তারও একটা

কারণ ছিল বৈকি। অতীতের কুহেলী আচ্ছন্ন। অথচ কেউ সে কথা জানত না। ঐ ঘটনার বছর চার আগে, পাবলিক প্রসিকিউটার গগন মুখার্জীর বড় মেয়ে কুন্তলা আত্মহত্যা করে।

কুন্তলার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ষড়যন্ত্র করে তাদের পুত্রবধূ কুন্তলাকে পরিত্যাগ করে। কুন্তলার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে এই অভিযোগে ছেলের আবার বিবাহ দেয়। কুন্তলা যে সত্যিসত্যিই পাগল হয়ে গেছে সে সার্টিফিকেট দিয়েছিল, ঐ ডাঃ মুখার্জীরই মেডিকেল বোর্ড—যে বোর্ডে তিনি একজন পাণ্ডা ছিলেন। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া কুন্তলার শ্বশুরবাড়ির লোকের পক্ষ থেকে সাজানো। কুন্তলাকে ত্যাগ করবার একটা অছিলা মাত্র। নিষ্ফল আক্রোশে নির্বিষ সাপের মতই সেদিন গগন মুখার্জী ছট্‌ফট্ করেছিলেন। উপায় নেই। উপায় নেই। নিষ্করুণ ভাগ্যের নির্দেশকেই সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল সাশ্রুনেত্রে।

অনেক চেষ্টা করেও ডাঃ মুখার্জীর বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ খাড়া করতে পারেন নি সেদিন। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে কুন্তলা আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়লো।

শ্মশানযাত্রীরা শবদেহ এনে উঠোনের ওপরে নামিয়েছে—চেয়ে রইলেন—দু চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।···

কন্যার মৃতদেহ স্পর্শ করে মনে মনে সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মা গো, তোর দুঃখ আর কেউ না বুঝলেও, আমি বুঝেছিলাম। এর প্রতিশোধ আমি নেব।

হ্যাঁ। প্রতিশোধ! এর প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে!

আজ তিনি ডাঃ মুখার্জীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। এতবড় স্বর্ণ সুযোগ!

* * *

হাজত-ঘরে ডাঃ মুখার্জী বসে কত কথাই ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বের হবার উপায় নেই। সরকার জামিনও দেবে না বলে দিয়েছে।

আর গগন মুখার্জী মনে মনে দাঁত চেপে বললেন, এই যে যজ্ঞ শুরু করলাম, এর পূর্ণাহুতি হবে সেইদিন, যেদিন ডাঃ মুখার্জীকে ফাঁসীর দড়িতে ঝোলাতে পারব।

কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস!

আর মাত্র তিনদিন আছে মামলা আদালতে শুরু হবার।

গগন মুখার্জীর বাড়ির গেটে ও চতুষ্পার্শ্বে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে তাদের রাইফেলের সঙ্গীন উঁচিয়ে, যাতে করে মামলা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত গগন মুখার্জীর কোন প্রকার দৈহিক ক্ষতি না করতে পারে শত্রুপক্ষের লোকেরা কেউ। কারণ সে ভয় তাঁর খুবই ছিল।

এমন সময় সহসা গগন মুখার্জীর একদিন সন্ধ্যার সময় জ্বর এল, জ্বরের ঘোরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কলকাতা শহরের বড় বড় ডাক্তাররা এলেন, তাঁরা মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, ব্যাধি কঠিন, ভিরুলেন্ট টাইপের ম্যানিন্‌জাইটিস্—জীবনের আশা খুব কম।

জলের মত অর্থব্যয় হল, চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না—কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। সাজানো দাবার ছক ফেলে, মাৎ করবার পূর্বেই এতদিনকার অতৃপ্ত প্রতিশোধের দুর্নিবার স্পৃহা বুকে চেপেই পাবলিক প্রসিকিউটার গগন মুখার্জী কোন এক অজানা লোকের পথে পা বাড়ালেন।

লোকমুখে সেই সংবাদ জেলের মধ্যে বন্দী ডাঃ মুখার্জীর কানে পৌঁছল, তিনি বোধ করি আজ অনেক দিন পরে বুকভরে আবার নিঃশ্বাস নিলেন। ঘাম দিয়ে বুঝি জ্বর ছাড়ল।

॥ পাঁচ ॥

মাকড়সার জাল

যাঁর প্রতিবন্ধকতায় ডাঃ মুখার্জীর জামিন পাওয়া কোনমতেই সম্ভব হচ্ছিল না, তাঁর আকস্মিক অভাবনীয় মৃত্যুতে এতদিন পরে তা সম্ভব হল।

ডাঃ মুখার্জীর বৃদ্ধ পিতা তান্ত্রিক, কালীসাধক।

লোকে বলত, তিনি নাকি বলেছিলেন, যেমন করেই হোক কালীকে আবার আমি মুক্ত করেই আনব, আমার মা-কালীর সাধনা যদি সত্য হয়। সত্যিসত্যিই যদি আমি দীর্ঘ আঠারো বছর একাগ্রচিত্তে মা-কালীর পূজা করে এসে থাকি, তবে এ জগতে কারও সাধ্য নেই, আমার একমাত্র সন্তানকে আমার বুক থেকে এমনি করে অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে পারে।

তান্ত্রিক কালীসাধক পিতা ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মা-কালীর সাধনা শুরু করলেন। মধ্যরাত্রে পাড়ার লোকেরা শুনত, তন্ত্রধারী কালীসাধকের পূর্ণ হোমের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ। ভয়ে বুকের মধ্যে যেন সবার ছম্‌ছম্‌ করে উঠত।

গগন মুখার্জী যখন আকস্মিক অভাবনীয় রূপে ম্যানিন্‌জাইটিস্ হয়ে মাত্র তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, অনেকেই বলেছিল সেই সময়, কালীসাধক তান্ত্রিক ডাঃ মুখার্জীর পিতা নাকি 'মৃত্যুবাণ' চালিয়েছিলেন। অমোঘ সে মৃত্যুবাণ।

একবার কারও প্রতি নিক্ষিপ্ত হলে, সে নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কারও সাধ্য নেই ধ্বংস হতে তাকে রক্ষা করে।

কিন্তু সে যাই হোক, এর পর আদালতে রায়পুরের বিখ্যাত হত্যা-মামলা শুরু হল। বর্তমান উপাখ্যানের সে এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়।

আদালতে তিলধারণের স্থান নেই, অগণিত দর্শক।

হত্যাপরাধে অন্যতম অভিযুক্ত আসামী, শহরের স্বনামধন্য প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কালীপদ মুখার্জী। তাছাড়া সেই সঙ্গে আছেন নিহত ছোট কুমারের জ্যেষ্ঠ ভাই, রাজা বাহাদুর সুবিনয় মল্লিক ও রাজবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ অমিয় সোম। বিচিত্র মামলার বিচিত্র আসামী!

একজন চিকিৎসক, যার পেশা মানুষের সেবা, যার হাতে নির্বিচারে মানুষ মানুষের অতি প্রিয় আপনার জনের মরণ-বাঁচনের সকল দায়িত্ব অকুণ্ঠিত নির্ভয়ে ও আশ্বাসে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। আর একজন একই পিতার সন্তান, একই রক্তধারা হতে জন্মেছে যে ভাই, সেই ভাই। সত্যিই কি এক বিচিত্র নাটক!

পাবলিক প্রসিকিউটার গগন মুখার্জী যখন ডাঃ কালীপদ মুখার্জীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন, তখন তিনি কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়েছিলেন, এ ভয়ংকর হত্যারহস্যের পিছনে আসল মেঘনাদই হচ্ছে শয়তানশিরোমণি চিকিৎসক ডাঃ কালীপদ মুখার্জী! সেই হচ্ছে আসল brain, তারই বুদ্ধিতে এ হত্যার ব্যাপার ঘটেছে। অন্যান্য সবাই হত্যার ব্যাপারে instruments মাত্র! এও নিশ্চিত, সুহাসের শরীরে Plague Bacilli inject করে দেওয়া হয়েছে কোন উপায়ে শত্রুতা করে এবং সেই উপায়ে একজন সুস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করবার যে বিচিত্র প্রচেষ্টা তা একজন ডাক্তারের brain ছাড়া সাধারণ লোকের মাথায় আসা আদপেই সম্ভবপর নয়। It is simply impossible for a common man—with a common ordinary brain. আরও ভেবে দেখবার বিষয়, ডাঃ রায় রোগী দেখে যখন সন্দেহ করেন তখন ডাঃ মুখার্জী কেন blood culture-এ বাধা দেন! এসব ছাড়াও গগন মুখার্জীর সরকারী মহলে ছিল অসাধারণ প্রতিপত্তি—তিনি বলেছিলেন, কোন বিশেষ কারণবশতঃই বর্তমানে এ কেস্ সম্পর্কে যাবতীয় evidences তাকে গোপন করে রাখতে হচ্ছে। যাহোক—তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ ও আসামীদের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব ওলটপালট হয়ে গেল, গোপনীয় দলিলপত্রের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না—তবু মামলা চলল দীর্ঘ দিন ধরে। প্রমাণিত হল, ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের দেহে Plague Bacilli inject করেই তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গগন মুখার্জীর মৃত্যু হওয়ায়

ডাঃ মুখার্জীর স্বপক্ষে নানা প্রকার সাক্ষীসাবুদ খাড়া করে প্রমাণিত করা হল যে অতীতে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ডাঃ সুধীন চৌধুরীই সেদিন অর্থাৎ ৩১শে মে শিয়ালদহ স্টেশনে রায়পুর যাওয়ার সময় ছোট কুমারের দেহে অলক্ষ্যে 'প্লেগ ব্যাসিলাই' inject করে দিয়েছিল।

তাছাড়া আরও একটা কথা, যে কলকাতা শহরে আজ আট-দশ বৎসরের মধ্যে একটি প্লেগ কেসও দেখা দেয়নি, সেখানে কারও প্লেগে মৃত্যু হওয়াটা সত্যিই কি বিশেষ সন্দেহজনক নয়? কোথা থেকে শরীরে তার প্লেগের বীজাণু এল? এই প্রকার সব প্যাঁচে ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল।

যা হোক—ডাঃ মুখার্জীর বিপক্ষে কোন অভিযোগই প্রমাণ করা গেল না। ডাঃ মুখার্জী ও সুবিনয় মল্লিক দুজনেই বেকসুর খালাস পেলেন আর হত্যাপরাধে ডাঃ সুধীন চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হল ও তার মেডিকেল ডিগ্রী ও রেজিস্ট্রেশন বাজেয়াপ্ত করা হল। নাটকের উপর যবনিকাপাত হল।

কিন্তু আসল নাটকের শুরু কোথায়?

যবনিকাপাতের পূর্বে যে নাটকের মহড়া বসেছিল, তার মূল কোথায়?

হতভাগ্য ডাঃ সুধীনের মাকে বিদায় দিয়ে কিরীটী নিজের শয়নকক্ষে এসে শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে কাল রাত্রের সেই কথাই ভাবছিল।

এ কথা অবশ্য অবধারিত সত্য যে, ছোট কুমারকে 'প্লেগ ব্যাসিলাই' ইনজেকট করেই হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু আদালত স্থির করতে পারেনি, সেই প্লেগ ব্যাসিলাই এল কোথা থেকে? এবং এলই যদি, সেই প্লেগ ব্যাসিলাই কে আনলে এবং কেমন করেই বা আনলে!

কারণ—একমাত্র সারা ভারতবর্ষে বম্বেতে প্লেগ 'ইনস্টিটিউট্' আছে; সেখানে প্লেগ রোগ সম্পর্কে রিসার্চ করা হয়। সে রিসার্চ ইনস্টিটিউট্ সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে। ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের আদেশ বা সম্মতি ব্যতীত সেখানে কারও প্রবেশ অসম্ভব। একমাত্র যারা সেখানে কর্মচারী, ছাত্র বা ও ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তারা ভিন্ন সেখানে কারও প্রবেশও নিষেধ। তাছাড়া সেই ইনস্টিটিউটের প্রতিটি জিনিসপত্রের চুল-চেরা হিসাব প্রত্যহ রাখা হয় সুষ্ঠু ভাবে, সেখান থেকে কোন জিনিস ওখানকার কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে সরিয়ে আনা কেবল কঠিনই নয়, একপ্রকার অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু সুহাস মল্লিকের হত্যা যখন প্রমাণিত হয়েছে—প্লেগ এবং প্লেগে মৃত্যুর যখন অন্য কোন কারণ প্রমাণ করতে পারেনি আদালত ব্যাসিলাইয়ের প্রয়োগ ব্যতীত; সে অবস্থায় একমাত্র বম্বের ইনস্টিটিউটের ব্যাসিলাই ছাড়া প্লেগ কালচার অন্য কোথা হতেই

বা সংগৃহীত হতে পারে ? অবিশ্যি মামলার সময় বিভিন্ন বাদী ও প্রতিবাদীর জবানবন্দি থেকেও সেটাই প্রমাণিত হয়েছে একপ্রকার যে বম্বে থেকেই প্লেগবীজাণু আনা হয়েছিল। বাংলাদেশে আজ দীর্ঘকাল ধরে কোন প্লেগ কেস হয়নি।

তাই চারিদিক বিবেচনা করে এইটাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, 'প্লেগ ব্যাসিলাই' আনা হয়েছে নিশ্চিত বম্বে হতে এবং তারই সাহায্যে এই দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে ষড়যন্ত্র করে।

অবিশ্যি মামলার সময় প্রমাণিত হয়নি সঠিকভাবে যে কেমন করে আনীত হয়েছে বম্বে হতে প্লেগ ব্যাসিলাই। শুধুমাত্র এইটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে সুহাস মল্লিককে হত্যা করা হয়েছে প্লেগ ব্যাসিলাই ইন্‌জেকট্ করে। কেননা মৃত্যুর পূর্বে তার রক্তের কালচার রিপোর্ট থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। এই গেল মামলার মূল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা : ডাঃ সুধীন চৌধুরীকে কেন সুহাসের হত্যা-মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হল বিচারে ? অবিশ্যি গত ৩১শে মে রাত্রে শিয়ালদহ স্টেশনে যখন সুহাস মল্লিককে আততায়ী (?) প্লেগ ব্যাসিলাই ইন্‌জেকট্ করে (?) সেই সময় সুধীন সুহাসের একেবারে পাশটিতেই ছিল। এবং একমাত্র নাকি সেই কারণেই জজ সাহেব ও জুরীদের বিচারে সুধীনের পক্ষে সুহাসকে ঐ সময় প্লেগ ব্যাসিলাই ইন্‌জেকট্ করা খুবই সম্ভবপর ছিল—যদিও সেটা প্রমাণিত হয়নি এবং এও প্রমাণিত হয়নি যদি তাই ঘটে থাকতো কিভাবে সেই প্লেগ ব্যাসিলাই সুধীন ডাক্তার যোগাড় করেছিল। সুধীন ডাক্তারও বটে। এ ছাড়া 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে একটা ছিল, যেমন প্রতিহিংসা। এবং প্রতিহিংসা যে নয় তাই বা কে বললে ? পিতার নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ প্রত্যেক সন্তানের পক্ষেই নেওয়া স্বাভাবিক বলতে হবে। কিন্তু সুধীন সুহাসের পরস্পরের মধ্যে ইদানীং যে সৌহার্দ্য বা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল, সেই দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে সুধীনের পক্ষে সুহাসকে ঐ রকম নৃশংস ভাবে হত্যা করাটা কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ?

বিচারক ও জুরীদের মত, ডাঃ সুধীন চৌধুরী নাকি সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল এতদিন। এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছে।…এও তাদের মত যে, পিতার হত্যার প্রতিশোধলিপ্সু সুধীন অদূর ভবিষ্যতে যাতে করে অনায়াসেই অন্যের সন্দেহ বাঁচিয়ে সুহাসকে হত্যা করতে পারে সেই জন্যই একটা লোকদেখানো ঘনিষ্ঠতা বা সৌহার্দ্য সুহাসের সঙ্গে ইদানীং কয়েক বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কিরীটী ভাবে, তাই যদি সত্যি, তবে সুধীন প্রতিহিংসার পাত্র হিসাবে রায়পুরের রাজগোষ্ঠীর অন্য সকলকে বাদ দিয়ে নিরীহ গোবেচারী সুহাসকেই বা বেছে নিল কেন ? সুধীনের পিতাকে যখন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তখন সুহাসের তো মাত্র তিন বৎসর

বয়স। এবং তার সেই শিশুবয়েসে আর যাই হোক সেদিনকার সেই নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনক্রমেই জড়িত থাকাটা তো সম্ভবপর নয়—সেদিক দিয়ে তাকেই প্রতিশোধের পাত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হল কেন ?

তবে যদি এই হয় যে রাজগোষ্ঠীর একজনকে কোনমতে হত্যা করতে পারলেই তার পিতার হত্যার প্রতিশোধটা অন্ততঃ নেওয়া হয়, সেটা অবশ্য অন্য কথা। কারণ মানুষের সত্যিকারের মনের কথা বোঝা শুধু অসম্ভবই নয়, একেবারে হাস্যকর বলেই মনে হবে।

তারপর একটু আগে শোনা সুধীনের মার মুখে সেই সুধীনের পিতার অতীতের নৃশংস হত্যাকাহিনী, সেও শুধু একমাত্র সুধীনের পিতার হত্যাই নয়, তার আগে শ্রীকণ্ঠ মল্লিককেও তো হত্যা করা হয়েছিল একই ভাবে এবং একই স্থানে! আগাগোড়া সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমগ্র কাহিনীটি বিবেচনা করে দেখতে গেলে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হয়ত বা দেখা যাবে সব কিছুই একই সূত্রে গাঁথা।

অবিশ্যি এও হতে পারে, শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ও সুধীনের পিতার হত্যা-ব্যাপার, সুহাসের হত্যা-রহস্য হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একটার সঙ্গে অন্যটার কোন যোগসূত্রই নেই।

কিরীটীর মনের মধ্যে নানা চিন্তা এলোমেলোভাবে যেন একটার পর একটা আনা-গোনা করতে থাকে। এ যেন মাকড়সার জাল, কোথায় শেষ কে জানে! যেমন অসংবদ্ধ তেমনি জটিল।

ইতিমধ্যে কখন একসময় প্রথম ভোরের আলো শীতরাত্রির অবসান ঘটিয়েছে, তা কিরীটী টেরও পায়নি।

প্রভাতের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা বাতায়নপথে এসে জাগরণক্লান্ত কিরীটীর চোখমুখে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

আর ঘুমের আশা নেই। কিরীটী শয্যা থেকে উঠে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়।

রাস্তার ধারের কৃষ্ণচূড়ার গাছটার পত্রবহুল শীর্ষ ছুঁয়ে ভোরের শুকতারা তখনও জেগে আছে দেখা যায়।

কিরীটী চিন্তা করতে থাকে, এখন কি কর্তব্য! কোন্ পথে কোন্ সূত্র ধরে এখন সে অগ্রসর হবে ? তবে এটা ঠিক অগ্রসর হতে হলে আগাগোড়া আবার সমস্ত মামলা-টাকেই তীক্ষ্ণ বিচার দিয়ে গোড়া হতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, আর তাই যদি হয় এ-ব্যাপারে বর্তমানে যিনি তাকে সত্যি সাহায্য করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন জাস্টিস্ মৈত্র। হ্যাঁ ঠিক, জাস্টিস্ মৈত্র!…

আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করে সোজা কিরীটী ঘরের কোণে ত্রিপয়ের উপর রক্ষিত

ফোনটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফোনের রিসিভার তুলে নেয়—Put me to B. B… please!

একটু পরেই ফোনের ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, Yes!

কে, সুব্রত? আমি কিরীটী কথা বলছি। হ্যাঁ।…এখুনি একবার আমার এখানে চলে আসতে পারিস? কি বললি, হ্যাঁ। খুব দরকারী কাজ। অ্যাঁ—হ্যাঁ—আরে আয়ই না, সব শুনবি। এখানেই চা হবে, বুঝলি?

সারাটা রাত্রি জেগে চোখমুখ জ্বালা করছে।

কিরীটী অতঃপর স্নানের ঘরে ঢুকে ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে জাগরণক্লান্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল। বড় টার্কিস তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই দেখলে, সুব্রত ইতিমধ্যেই কখন এসে ঘরের মধ্যে একখানি সোফা অধিকার করে সেদিনকার প্রাত্যাহিক সংবাদপত্রটা খুলে বসে আছে।

কি ব্যাপার রে? হঠাৎ এত জরুরী তলব? কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সুব্রত মৃদু স্বরে প্রশ্ন করে।

বোস, আমি চট্ করে জামাকাপড়টা ছেড়ে আসি।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এসে কিরীটী ঘরে প্রবেশ করল, পরিধানে নেভি-ব্লু সার্জের লংপ্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা স্ট্রাইপ্ দেওয়া গরম সার্ট। মুখে পাইপ।

কৃষ্ণা ইতিমধ্যে ট্রে'তে করে চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে গেছে, সুব্রতর সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। পাশে বসে কৃষ্ণা।

কিরীটী এগিয়ে এসে সুব্রতর পাশ ঘেঁষে সোফার ওপরে বসে পড়ল। কৃষ্ণা হাত বাড়িয়ে কাপের মধ্যে দুধ চিনি ঢেলে, টি-পট্ থেকে চা ঢালতে লাগল।

তারপর, হঠাৎ এত জরুরী তলব কেন?

কিরীটী কোন মাত্র ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করে, জানিস, রায়পুরের ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের হত্যা-মামলায় দণ্ডিত অপরাধী ডাঃ সুধীন চৌধুরীর মা, গত রাত্রে তোরা সব চলে যাওয়ার পর এসেছিলেন এখানে আমার কাছে!

কৃষ্ণা বললে, কাল রাত্রে, কখন?

কিরীটী বললে, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে, তোমায় জাগাইনি—

সুব্রতও কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়, বলে, সত্যি? তা হঠাৎ তাঁর তোর এখানে আসার কারণ? মামলার তো রায় বেরিয়ে গেছে। নাটকের পরে তো যবনিকাপাত হয়ে গেছে।

তা হয়েছে, তবে দেখলাম তাঁর ও আমার মতটা প্রায় একই, মামলার একটা লোক-দেখানো সমাপ্তি ঘটলেও আসলে এখনও অনেক কিছুই অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সে এক কাহিনী।

বুঝলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, বল্ তো?

আসল ব্যাপারের জন্যই তো এই এত সকালেই তোকে ডাকতে হল। কিরীটী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মৃদু ভাবে বলে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কিরীটী তখন গত রাত্রের সমস্ত কথা যথাসম্ভব বিশদভাবে সুব্রতকে বলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে।

হুঁ—তাহলে তুই কেস্‌টা হাতে নিলি বল্?

হ্যাঁ—উপায় ছিল না।

কিন্তু—

যতদূর মনে হয় ডাঃ সুধীন চৌধুরী নির্দোষ। অবিশ্যি যদি আমার বিচারে ভুল না হয়ে থাকে।

তা যেন হল, কিন্তু আইনের চোখে যে একবার দোষী প্রমাণিত হয়ে কারাগারে গিয়ে ঢুকেছে, তাকে মুক্ত করা—ব্যাপারটা কি খুব সহজ হবে বলে ভাবিস তুই?

তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারলে কেসটা রি-ওপেন করা হয়তো কঠিন হবে বলে মনে হয় না। শোন্—এখন তোকে আমার একান্ত প্রয়োজন, যার জন্য তোকে এত সকালে তাড়াহুড়ো করে টেনে নিয়ে এলাম। এই মামলার বিচারক ছিলেন জাস্টিস্ মৈত্র। তাঁর সঙ্গে আমার কিছুটা আলাপ-পরিচয়ও আছে, তোকে এখুনি একটিবার ল্যান্সডাউন রোডে জাস্টিস্ মৈত্রের ওখানে আমার একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে। রায়পুরের মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের সমস্ত সাক্ষীসাবুদের 'প্রসিডিংস্'গুলো পড়ে যথাসম্ভব নোট করে আনবি, যেমন যেমন প্রয়োজন বুঝবি। আমাদের এখন শুরু করতে হবে শেষ থেকে। শেষের দিক থেকে কাজ শুরু করে ধীরে ধীরে আমরা গোড়ার দিকে যাব এগিয়ে।

বেশ। তাহলে আমি উঠি, তুই চিঠিটা লিখে ফেল্।

তুই বোস একটু, চিঠিটা এখুনি আমি লিখে দিচ্ছি।

কিরীটী সোফা থেকে উঠে রাইটিং টেবিলের সামনে বসে তার লেটার প্যাডে একটা চিঠি লিখে খামে এঁটে সুব্রতর হাতে এনে দিল, এই নে।

* * *

জাস্টিস্ মৈত্র লোকটি অত্যন্ত রাশভারী।

বছর কয়েক আগে একটা খুনের মামলা যখন তাঁর এজলাসে চলছিল, কিরীটীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ক্রমে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

সুব্রতর হাত থেকে কিরীটীর দেওয়া চিঠিটা খুলে, চিঠিখানা পড়ে স্মিতভাবে জাস্টিস্ মৈত্র বললেন, রহস্যভেদী কি আমার রায়কে নাকচ করবার মতলবে আছেন নাকি, সুব্রতবাবু?

সুব্রত মৃদু হাস্যসহকারে জবাব দিল, তা তো ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার যতদূর মনে হয় সে বোধ হয় কেস্‌টা সম্পর্কে একটু interested!

উঁহু! ব্যাপারটা তা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। যা হোক ওপরে চলুন আমার studyতে, কাগজপত্র আমার সব সেখানেই থাকে—কিন্তু সে তো কুরুক্ষেত্র ব্যাপার!

সুব্রত জাস্টিস্ মৈত্রের আহ্বানে উঠে দাঁড়ায়, উপায় কি বলুন! সেই কুরুক্ষেত্রই এখন ঘাঁটিতে হবে—চলুন!

দোতলার ওপর বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর। ঘরের মেঝেতে পুরু গালিচা বিস্তৃত, ধনী আভিজাত্যের নিদর্শন দিচ্ছে। মধ্যিখানে বড় সেক্রেটারিয়েট্ একটা টেবিল, খান পাঁচেক গদী-মোড়া দামী চেয়ার।

চারপাশে দেওয়ালে আলমারী-ঠাসা সব নানা আকারের আইনের কিতাব।

বসুন—জাস্টিস্ মৈত্র সুব্রতকে একখানা চেয়ার নির্দেশ করেন।

সুব্রত উপবেশন করল।

জাস্টিস্ মৈত্র একটা কাঁচের শো-কেস খুলে তার ভিতর থেকে গোটা-দুই মোটা মোটা ফাইল টেনে বের ক'রে সুব্রতর সামনে টেবিলের ওপরে এনে রাখলেন।

সুব্রত দেখলে, ওপরের ফাইলটার ওপরে ইংরাজীতে টাইপ করা লেখা Roypur Murder Case No. 1. File.

এই নিন নথীপত্র। দেখুন কি দেখতে চান। কিরীটীর বন্ধু যখন আপনি, চায়ে নিশ্চয়ই আপনার অরুচি হবে না, কি বলেন?

সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দেয়, না।

তবে বেশ, আপনি এখানে বসে বসে আপনার যা-যা প্রয়োজন দেখুন, আমার আবার একটা জরুরী কেসের রায় লিখে আজই শেষ করে নিয়ে যেতে হবে। আমি আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। রহস্যভেদীর বন্ধুত্বের 'সার্টিফিকেট্' নিয়ে আপনি এ বাড়িতে এসেছেন, কোন সংকোচ বা দ্বিধার আপনার প্রয়োজন নেই। নিজের বাড়ি বলেই মনে করবেন। টেবিলের ওপরে ঐ কলিং বেল আছে, দরজার বাইরেই আমার ভোলানাথ আছে,

প্রয়োজন হলে চেয়ে নিতে সংকোচ করবেন না। আর যদি কোথায়ও বোঝবার প্রয়োজন হয়, ভোলানাথকে দিয়ে পাশের ঘরে আমাকে একটা সংবাদ পাঠাবেন।

ধন্যবাদ। আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে হবে না জাস্টিস্ মৈত্র। আপনি আপনার কাজ করুন গে।

বেশ। বেশ।

জাস্টিস্ মৈত্র হাসতে হাসতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

* * *

মামলাটা আগাগোড়া সত্যিই অত্যন্ত জটিল ও ইন্টারেস্টিং।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ফাইলের মাঝামাঝি জায়গায় উপস্থিত হয়ে সুব্রত দেখলে আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরীর জবানবন্দি শুরু হয়েছে।

সুধীনের পক্ষে নামকরা উকিল রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার।

রাজবাড়ির পক্ষে উকিল সন্তোষ ঘোষাল। তিনিও কম যান না।

সন্তোষ ঘোষাল প্রশ্ন করছেন আসামীকে, মৃত সুহাস মল্লিকের সঙ্গে আপনার কতদিনকার আলাপ পরিচয় সুধীনবাবু?

তা প্রায় পাঁচ বছর হবে।

আপনি আপনার জবানবন্দিতে এক জায়গায় বলেছেন, সুহাস মল্লিককে সর্বপ্রথম একদিন আপনাদের কলেজের আউট্ পেসেন্ট্ ডিপার্টমেণ্টে পেসেন্ট্ হিসাবে দেখেন!

হ্যাঁ।

তার আগে সুহাস মল্লিককে কোন দিনও আপনি দেখেননি বা পরিচয়ও ছিল না— এই তো বলতে চান?

হ্যাঁ।

আর একবার ভাল করে ভেবে দেখুন তো। ছোটবেলায় কোন সময় ওই ঘটনার পূর্বে দেখা হতেও' তো পারে! ছোটবেলার ঘটনা বলেই হয়তো আপনার মনে পড়ছে না?

না—দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ সুহাসের সঙ্গে আউট্ পেসেন্ট্ ডিপার্টমেণ্টে দেখা হওয়ার পূর্বে তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কোন সংস্রবই ছিল না।

আচ্ছা একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন, রায়পুরের ছোট কুমারের নামই সুহাস মল্লিক?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম।

কোন দিন আপনার কোন কৌতূহল হয়নি, রায়পুর বা রাজবাড়ি সম্পর্কে কোন কিছু জানবার ?

না।

এখানে সুধীনের পক্ষের উকিল অনিমেষ হালদার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন : মিঃ লর্ড! এ ধরনের প্রশ্ন, এ মামলায় সম্পূর্ণ অবান্তর। আমি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

জাস্টিস্ মৈত্র বললেন, objection sustained। মিঃ ঘোষাল, অন্য প্রশ্ন থাকে তো করুন।

সুব্রত আবার নথীর পাতা ওল্টাতে থাকে।

আবার আর এক জায়গায় সন্তোষ ঘোষাল প্রশ্ন করছেন সুধীন চৌধুরীকে, দেখুন মৃত ছোট কুমার গত ৩১শে মে যখন শেষবার রায়পুর যান, আপনি সেদিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটায় কুমারকে ট্রেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত কুমারের সঙ্গেই ছিলেন, তাই নয় কি ?

সুধীন বলে, না, আগাগোড়া ছিলাম না। মাঝখানে বেলা সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ছোট কুমারের গাড়ি নিয়ে শিয়ালদহে আমার দুটি পেসেণ্ট্ দেখতে গিয়েছিলাম।

বাকী সময়টা—মানে মাঝখানের ওই দু'ঘণ্টা বাদ দিয়ে, কুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ছিলেন, কেমন ? এই তো বলতে চান ?

হ্যাঁ।

আপনি রোগী দেখতে যাবার আগে ও রোগী দেখে ফিরে আসবার পর আপনার ডাক্তারী ওষুধ ও যন্ত্রপাতির ব্যাগটা কোথায় ছিল ?

ছোট অ্যাটাচি কেস্‌টা কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল।

স্টেশনেও সেটা নিয়েই গিয়েছিলেন ?

না, গাড়ির মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম।

স্টেশনে পৌঁছনোর সময় থেকে কুমারকে গাড়িতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত যে সময়টা, সেই সময়ে আপনার হাতে আর কিছু ছিল ?

না।

বেশ। এবারে বলুন, আপনি পাস করবার পর প্র্যাক্‌টিস্ করতে শুরু করেছেন কত দিন ?

তা বছর দুই হবে।

আচ্ছা আমহার্স্ট স্ট্রীটে যে আপনার ডিস্‌পেনসারী, তার গোড়াপত্তনের—মানে

মূলধন, আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?

ঐ সময় রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার প্রতিবাদ করছেন, মি লর্ড, এ ধরনের প্রশ্নও সম্পূর্ণ অবান্তর। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে আমার মক্কেল মোটেই প্রস্তুত নয়। আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ঘোষাল জবাব দিচ্ছেন, আমার বন্ধু রায়বাহাদুর যা বলছেন তা আমি মেনে নিতে রাজী নই। কারণ আমরা বিশ্বস্ত স্থত্রে জেনেছি, আসামীর ঘরের আর্থিক অবস্থা এতটুকুও সচ্ছল নয়। তাঁর বিধবা মা অতিকষ্টে তাঁর ছেলেকে মানুষ করেছেন, এবং আসামী বরাবর স্কলারশিপ্ নিয়ে পড়ে এসেছেন। অথচ খোঁজ নিয়ে ও আসামীর ডিস্‌পেনসারীর অ্যাকাউণ্ট হতে দেখা যায় প্রথম শুরুতেই এই প্রায় হাজার আড়াই মত টাকা খরচ করা হয়েছে। তাই এখানে প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক নয় কি, যে ঐ টাকাটা কোথা হতে এল ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজী নই—কারণ এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ! স্থধীন জবাব দেয়।

বেশ। তা না হয় হল, কিন্তু বছর দুই প্র্যাক্‌টিস্ করে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা জমল কি করে ? মাসে আপনি average কত টাকা রোজগার করতেন এর জবাবটা দেবেন কি, না এও ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে যেতে চান ?

তা প্রায় দু'শো হতে তিনশো হবে বৈকি আমার গড়পড়তা মাসিক আয় !

নিশ্চয়ই শুরু হতেই আপনি অত টাকা রোজগার করেন নি, কি বলেন ?

না।

দু'তিন-শতো টাকা মাসিক আয় হতে ঠিক কত দিন লেগেছিল বলে আপনার অনুমান হয়, ডাঃ চৌধুরী ?

বলতে পারব না ঠিক, তবে আট-দশ মাস লেগেছিল।

বলেন কি ! আপনাকে তো তাহলে খুব ভাগ্যবানই বলতে হবে। তা থাক সে কথা, তাই যদি হয়, বারো কি চোদ্দ মাসে আপনি দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমালেন কি করে ? আর কোন উপায়ে আপনি অর্থোপার্জন করতেন নাকি ?

আপনার এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে আমি রাজী নই।

ওঃ—তা বেশ ! কিন্তু ডাঃ চৌধুরী, আপনি বুঝতে পারছেন কি আপনার এই ধরনের statementগুলো আপনার বিরুদ্ধেই যাবে ?

আমি তো আপনাকে বলেছিই, জবাব আমি দেব না।

তাহলে আপনার statementএর দ্বারা আদালত এটাই ধরে নেবে যে আপনার ব্যাঙ্কে যে দশ হাজার টাকা আছে তার সবটুকুই আপনার প্র্যাক্‌টিস্ বা ডিস্‌পেনসারীর

আয় থেকে সঞ্চিত নয়, কি বলেন ?

আপনার যেমন অভিরুচি।

অন্য এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, রায়পুর স্টেটের সেক্রেটারী বা ম্যানেজার সতীনাথবাবু তাঁর জবানবন্দিতে বলছেন, সুধীনের ডাক্তারীর অ্যাটাচি কেসটা যদিও সে গাড়ির মধ্যে রেখে স্টেশনে নেমেছিল, তার হাতে ছোট একটি কালো রংয়ের মরোক্কো লেদারের কেস ছিল আগাগোড়া। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এমন কি সুহাসকে ট্রেনে তুলে দেবার পরেও সতীনাথবাবু সুধীনের বাঁ হাতে সেই বাক্সটি নাকি দেখেছিলেন।

সেই সম্পর্কেই সন্তোষ ঘোষাল আবার সুধীনকে জেরা করছেন।

সতীনাথবাবু ৩১শে মে স্টেশনে আপনার বাঁ হাতে যে কালো রংয়ের একটা মরোক্কো লেদারের কেসের কথা বলছেন, সেটা সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে কি ডাঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ, আমার হাতে একটা কালো রংয়ের মরোক্কো লেদারের কেস ছিল।

কিন্তু পরশুর জবানবন্দির সময় আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, ঐ সময় আপনার হাতে কিছুই ছিল না, আপনার হাত একেবারে খালি ছিল!

সে-সময় আমার ও কথাটা মনে ছিল না।

কিন্তু কেসটা কিসের ? তার মধ্যে কি ছিল ?

কেসটার মধ্যে হিমোসাইটোমিটার (রক্তপরীক্ষার যন্ত্র) ছিল একটা।

বাক্সটা আপনি হাতে করে রেখেছিলেন কেন ?

হাতে করে রাখিনি, ভুল করে পকেটেই রেখেছিলাম, স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে কেউ পকেট থেকে চুরি করে নেয় ভয়ে, পকেট থেকে বের করে হাতে রেখেছিলাম। কারণ জিনিসটা আমার নিজস্ব নয়, ঐদিনই সকালবেলা একজন রোগীর রক্ত নেওয়ার জন্য চেয়ে নিয়েছিলাম আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে।

সেটা আবার বন্ধুকে ফেরত দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, সেই দিনই রাত্রে ফিরবার পথে ফেরত দিয়ে যাই।

বন্ধুটি কোথায় থাকেন, কি নাম জানতে পারি কি ?

ডাঃ জগবন্ধু মিত্র, ৩।২ নেবুবাগানে থাকেন।

দিন দুই বাদে আবার সেই জবানবন্দির জের চলেছে।

সন্তোষ ঘোষাল আসামী ডাঃ চৌধুরীকে প্রশ্ন করছেন, ডাঃ চৌধুরী, আপনার নির্দেশ মত নেবুবাগানের ডাঃ জগবন্ধু মিত্রের খোঁজ নিয়েছিলাম ; কিন্তু আশ্চর্য, ঐ বাড়িতে ডাঃ জগবন্ধু মিত্র বলে একজন ডাক্তার থাকেন বটে কিন্তু তিনি তো আপনার সঙ্গে কস্মিনকালেও

কোন পরিচয় ছিল বলে অস্বীকার করছেন, তা যন্ত্রটা দেওয়া তো দূরের কথা! এ সম্পর্কে কি বলেন আপনি?

কিছুই বলবার নেই। কারণ আমি যা বলেছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। দৃঢ়কণ্ঠে সুধীন জবাব দেয়।

ডাঃ জগবন্ধু মিত্র এখানেই উপস্থিত আছেন, এ বিষয়ে আপনি কোন প্রশ্ন করতে চান তাঁকে?

ডাঃ মিত্র যে এখানে উপস্থিত আছেন, সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি, আমি তো আর অন্ধ নই!

এমন সময় রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার প্রশ্ন করলেন, জজকে সম্বোধন করে, মি লর্ড, আমি ডাঃ মিত্রকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি?

জজ : নিশ্চয়ই—করুন।

ডাঃ মিত্রকে লক্ষ্য করে : আপনারই নাম ডাঃ জগবন্ধু মিত্র?

ডাঃ মিত্র : হ্যাঁ।

আপনি ৩।২ নং নেবুবাগানের বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ।

কতদিন সেখানে আছেন আপনি?

বছর চার হবে।

আপনি কোন্ কলেজ হতে এম. বি. পাস করেছেন এবং কোন্ সালে পাস করেছেন?

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে পাস করেছি। ···সালে।

ডাঃ চৌধুরী, আপনিও শুনেছি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করেন, কোন্ সালে পাস করেছেন?

ডাঃ মিত্র যে বছর পাস করেন সেই বছরই।

বেশ। আচ্ছা ডাঃ মিত্র, আপনার এম. বি. পাস করতে ক'বছর লেগেছিল?

আমি একবারেই পাস করি, ছয় বছরই লেগেছিল।

ডাঃ চৌধুরী, আপনার?

আমিও ছ বছরেই পাস করেছি।

এইবার রায়বাহাদুর হালদার সন্তোষবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আমার মাননীয় কৌনসিল বন্ধু, এর পরও কি আমাকে বলবেন আপনাদের ডাঃ মিত্র যা বলেছেন আপনার কাছে আসামীর সঙ্গে পরিচয় সম্পর্কে তার সব কথাগুলিই একেবারে খাঁটি সত্য?

সন্তোষ ঘোষাল বলেন, কেন নয়, জানতে পারি কি?

Question of common sense only, মিঃ ঘোষাল! যারা একসঙ্গে একাদিক্রমে দীর্ঘ ছ'বছর একই কলেজে পড়ল, এবং একই হাসপাতালে কাজ করল, তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে না—শুধু অসম্ভবই নয়, একেবারে অবিশ্বাস্য!

চিনতে হয়ত পারেন, কিন্তু আলাপ যে থাকবেই তার কি কোন মানে আছে?

কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় থাকাটাই বেশী সম্ভবপর নয় কি?

সুব্রত পড়ছিল আর নোট করে নিচ্ছিল বিশেষ বিশেষ জায়গায়, ইতিমধ্যে কখন বেলা বারোটা বেজে গেছে ওর খেয়ালই নেই। জাস্টিস্ মৈত্র এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, আদালতে যাবার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, কি? পরশমণির সন্ধান পেলেন সুব্রতবাবু?

সুব্রত মৃদু হাস্যসহকারে উঠে দাঁড়ায়, আজ্ঞে কিছু নুড়ি কুড়িয়েছি, এখনও সব দেখা হয়ে ওঠেনি।

তবে এখানেই আহার-পর্বটা সমাধা করুন না?

আজ্ঞে না, আজ আমি এখন যাই, সে এখন না হয় আর একদিন হবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, কাল-পরশু দুদিন সকালে একবার করে আসতে পারি কি?

বিলক্ষণ। একবার ছেড়ে যতবার খুশি, আপনার জন্য দ্বার খোলাই রইল। রহস্য-ভেদীর ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মনেও কেমন একটা কৌতূহল জেগে উঠছে। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। রহস্যভেদীকেও একটিবার আসতে বলবেন না!

বলব।

॥ সাত ॥

জবানবন্দির জের

সন্ধ্যার দিকে সুব্রত ও কিরীটীর মধ্যে আলোচনা চলছিল।

কিরীটী বলছিল, রায়পুরের হত্যা মামলার প্রসিডিংসের ভিতর থেকে যতটুকু তুই পড়েছিস ও যে যে পয়েন্টগুলো নোট করে এনেছিস, সেগুলো আগাগোড়া বেশ ভাল করেই পড়ে দেখলাম, সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখলে কয়েকটা অত্যন্ত স্থূল অসংগতি আমাদের চোখে পড়ে।

সুব্রত প্রশ্ন করে, কি রকম?

কিরীটী বলে, প্রথমতঃ এই ধর—১ নং…তারিখের জবানবন্দি, যে সময় আসামী ডাঃ

সুধীন চৌধুরী প্রথমে অস্বীকার করছে আদালতে জেরার সময়, গত ৩১শে মে স্টেশনে তার হাতে বাক্সের মত কিছু ছিল না বলে। অথচ আবার জেরার মুখে দিন-দুই পরে সতীনাথবাবুর জবানবন্দিতে প্রকাশ পাচ্ছে, সুধীনের হাতে নাকি একটা কালো রংয়ের মরোক্কো-বাঁধাই ছোট্ট কেস ছিল এবং বিপক্ষের উকিলের জেরায় সে কথা সেদিন স্বীকারও করে নিল যে তার হাতে একটা কেস ছিল। এখন কথা হচ্ছে, কেন আসামী সুধীন চৌধুরী প্রথম দিনের জেরার সময় ঐ কথাটা অস্বীকার করলে? কি এমন তার কারণ থাকতে পারে? স্বাভাবিক বুদ্ধিমত বিচার করতে গেলে, তার এই অস্বীকারের মধ্যে দুটো কারণ থাকতে পারে, ১ নং, হয় আসামীর সে কথা জবানবন্দির সময় আদপে সত্যিই মনে হয়নি এবং ব্যাপারটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকতে পারে বলে সে ভাবেওনি। ২ নং, হয়ত কোন বিশেষ কারণেই প্রথম হতে আসামী সুধীন চৌধুরী ব্যাপারটা চেপে যাবার প্রয়াস পেয়েছে। এখন যদি ব্যাপারটার একটা আপাতঃ মীমাংসা হিসাবে প্রথম কারণটা ছেড়ে দিয়ে আমরা দ্বিতীয় কারণটাই ধরে নিই, তাহলে আসামীর বিরুদ্ধে সেটা যাচ্ছে এবং তার সত্যাসত্যের একটা বিশেষ মীমাংসার প্রয়োজনও হচ্ছে আমাদের দিক হতে এখন—সত্যি কি না?

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়। কিরীটী আবার তখন বলতে শুরু করে, তাহলে দাঁড়াচ্ছে, মামলার প্রসিডিংসের মধ্যে ১ নং উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট : ছোট মরোক্কো বাঁধাই কেসটা, ২ নং পয়েন্ট : এই মরোক্কো কেসটা সম্পর্কে প্রথমে সুধীনের অস্বীকার ও পরে স্বীকৃতি।

সুব্রত প্রশ্ন করে, আচ্ছা কিরীটী, ডাঃ মিত্রর জবানবন্দি সম্পর্কে তোর কি মনে হয়?

ডাঃ মিত্র সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন বলেই আমার ধারণা এবং আগাগোড়াই বিপক্ষের কারসাজি। সুধীন চৌধুরীকে ডাঃ মিত্র শুধু যে চিনতেন তাই নয়, বেশ ভাল ভাবেই চিনতেন। কিরীটী মৃদু অথচ কঠিন স্বরে জবাব দেয়।

* * *

পরের দিন জাস্টিস্ মৈত্রর বাড়িতে।

সুব্রত ঠিক আগের দিনের মতই গতকালের দেখা ফাইলের পরবর্তী অংশটুকু দেখছিল পড়ে।

আদালতে জেরা চলছিল আবারও সেদিন আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরীর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সম্পর্কেই। সেই পুরাতন প্রশ্নের জের। প্রশ্ন করছিলেন রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার, সুধীনের পক্ষের উকীল।

ধর্মতলার জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার বোস অ্যাণ্ড চৌধুরী কোম্পানী সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন, ডাঃ চৌধুরী ?

জানি, কারণ ওয়ার্কিং পার্টনার আমিই ছিলাম বোস অ্যাণ্ড চৌধুরী কোম্পানীর।

আপনাদের কোম্পানী কি ধরনের অর্ডার সাপ্লাই করত সাধারণতঃ ?

আমরা বড় বড় ফার্মিসিউটিস্টদের কাছ থেকে উচ্চ হারের কমিশনে রীটেলে ওষুধ ও পারফিউমারী কিনে সেই সব কলকাতার বিভিন্ন ঔষধ প্রতিষ্ঠানে সাপ্লাই করতাম।

উক্ত কোম্পানীতে আপনার লভ্যাংশের কি টার্মস্ ছিল ?

নীট লাভের একের-তিন অংশ আমি পাব, এই চুক্তি ছিল।

কত দিন ধরে ঐ কোম্পানীর সঙ্গে আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ?

তা বছর দেড়েক হবে।

আপনাদের কোম্পানীর কাগজপত্র চেক করে দেখেছি, মাসে হাজার দু'হাজার টাকার মত কোম্পানীর আপনাদের নিট্ লাভ থাকত, এবং এও দেখেছি তিন মাস অন্তর আপনাদের হিসাবনিকাশ হত। তাই যদি হয়ে থাকে তবে অন্ততঃ পাঁচবার লাভের অংশ আপনি পেয়েছেন, কেমন কিনা ?

পেয়েছি, দু'বার মাত্র পেয়েছি।

দু'বারে কত পেয়েছেন ?

হাজার সাতেক হবে।

সে টাকা আপনি কি করেছিলেন ?

ব্যাঙ্কেই জমা রেখেছিলাম।

এমন সময় সন্তোষবাবু প্রশ্ন করলেন, ডাঃ চৌধুরী, আপনার ব্যাঙ্কের জমাখরচ থেকে জানা যায়, ২৭শে এপ্রিল নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও ৫ই মে আবার নগদ পাঁচ হাজার টাকা আপনি আপনার অ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন, অত টাকা আপনি একসঙ্গে কোথায় নগদ পেলেন ঐ অল্প সময়ের মধ্যে বলবেন কি ?

আপনাকে তো আগেই বলেছি মিঃ ঘোষাল, আপনার ও প্রশ্নের জবাব দিতে আমি ইচ্ছুক নই।

এবারে আবার রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন, ডাঃ চৌধুরী, ২১শে এপ্রিল বোস অ্যাণ্ড চৌধুরীর লেজার বুকে আপনার নামের againstএ যে পাঁচ হাজার টাকা credit দেখানো হচ্ছে আপনার ব্যবসার কোন একটা বড় order supplyএর ব্যাপারে লভ্যাংশ হিসাবে, সে টাকাটা আপনি কি করেছিলেন ? আপনি যে একটু আগে বলছিলেন দু'বার

মাত্র কোম্পানীতে আপনি লভ্যাংশ পেয়েছেন—এই পাঁচ হাজার টাকাটা কি তারই মধ্যে একবার ?

আমার ঠিক মনে নেই।

বেশ, তবে সেদিন আপনি আমার মাননীয় বন্ধু মিঃ ঘোষালের প্রশ্নের জবাবে কেন বলেছিলেন, একমাত্র প্র্যাকটিস ও ডিসপেন্সারী ছাড়া আপনার অন্য কোন savings বা incomeই ছিল না? মিথ্যে কথা বলেছিলেন—না ইচ্ছে করেই কথাটা গোপন করেছিলেন, বলবেন কি ?

কোন একটা বিশেষ কারণেই কথাটা আমায় সেদিন গোপন করতে হয়েছিল।

বেশ, তবে আবার সে কথা স্বীকার করলেন কেন ? মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন।

যে কারণে সেদিন আমার কথাটা গোপন করতে হয়েছিল, আজ আর সে কারণ নেই, তাই স্বীকার করেছি।

কারণটা কি আদালতকে জানাবেন ? প্রশ্ন করলেন মিঃ ঘোষাল।

না, সেটা প্রকাশ করতে আমি বাধ্য নই। আসামী সুধীন চৌধুরী জবাব দেয়।

সুব্রত মনে মনে ভাবে, আশ্চর্য! সুধীন চৌধুরী যেন কতকটা ইচ্ছে করেই নিজের প্রশ্নের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কেন ? নিজের ভাল-মন্দটাও কি সে নিজে বোঝে না ?

সুব্রত আবার পাতা উল্টিয়ে যায়।

আবার এক জায়গায় সন্তোষ ঘোষাল প্রশ্ন করছেন আসামী সুধীন চৌধুরীকে, ডাঃ চৌধুরী, আপনি কবে জানতে পারেন যে সুহাস মল্লিক অসুস্থ ?

সুহাস এবারে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসবার আগেই তার এক পত্রে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারি।

ছোট কুমার মানে সুহাসবাবু আপনাকে সেই চিঠিতে কি লিখেছিলেন ?

লিখেছিল ট্রেন থেকেই সে অসুস্থ হয় এবং অসুখ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ডাঃ কালীপদ মুখার্জী সে সংবাদ পেয়ে রায়পুরে গেছেন।

আপনি তার কি জবাব দেন ?

তাকে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় চলে আসবার জন্য লিখেছিলাম।

এই সময় ডাঃ সুধীন চৌধুরীর পক্ষের উকিল রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ আপনি তাকে কলকাতায় আসতে লিখলেন কেন ? যতদূর আমরা জানি ডাঃ মুখার্জী তো একজন বেশ নামকরা ডাক্তার !

আমি তা জানি।

তবে ?

আপনারা হয়তো জানেন না, এবারে অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে একবার সুহাসের 'টিটেনাস্' হয়েছিল। সে সময়ও ডাঃ মুখার্জীই তাকে দেখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধা হয়নি, পরে সে সংবাদ পেয়ে আমিই তাকে কলকাতায় আনিয়ে ডাঃ সেন-গুপ্তকে দিয়ে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

আপনি কি তাহলে বলতে চান ডাঃ মুখার্জীর মত প্রথিতযশা একজন ডাক্তার সামান্য 'টিটেনাস্' রোগটাও ধরতে পারেননি ?

না, এমন কথা তো আমি বলিনি !

তবে ?

বড় ডাক্তার যে সব সময়ই ঠিক ঠিক রোগ নির্ণয় করবেন তার কী মানে আছে, ভুলও তো হতে পারে ! খুব অস্বাভাবিক তো নয় !

শুধু কি এটাই একমাত্র কারণ সুহাসবাবুকে কলকাতায় আসবার জন্য আপনার চিঠি লেখবার ?

ডাঃ সুধীন চৌধুরী এবারে যেন বেশ একটু ইতস্ততঃই করতে থাকে।

জবাব দিন ?

হ্যাঁ। তাছাড়া আর কিছু না হোক, কলকাতায় এলে প্রয়োজনমত আরও দু-চারজন বড় ডাক্তারকে কনসাল্ট তো করা যেতে পারে, তাই।

আচ্ছা, সুহাস মল্লিকের সঙ্গে কি আপনার নিয়মিত পত্রবিনিময় চলত ডাঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ।

আপনার চিঠি পাওয়ার কতদিন পরে সুহাসবাবু কলকাতায় আসেন ?

দিন পাঁচ-ছয় পরে বোধ হয়।

আপনার চিঠির জবাবে সুহাস মল্লিক আপনাকে কোন পত্র দিয়েছিলেন ?

না।

এমন সময় আবার মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনি জানতেন না সুহাস মল্লিকরা কবে এখানে আসছেন ?

না।

আমি শুনেছি, যেদিন সুহাসবাবুরা কলকাতায় এসে পৌঁছান, সেই দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে—আপনি ভবানীপুর মল্লিক লজে সুহাসবাবুকে দেখতে যান, কথাটা কি ঠিক ?

ঠিক।

আপনি থাকেন শ্যামবাজারে, আপনার বাড়িতে সে সময় ফোনটা খারাপ ছিল, চিঠিও

আপনি পাননি, তাছাড়া সংবাদ নিয়েছি কেউ আপনাকে সুহাসবাবুর আসবার সংবাদও দেননি, তবে কি করে আপনি জানলেন যে ঐ দিনই সকালের ট্রেনে সুহাস কলকাতায় এসেছেন ? সন্তোষ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন।

যে ভাবেই হোক আমি সুহাসদের কলকাতায় পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবরটা জানতে পারি।

ও, আপনার জবাব শুনে মনে হচ্ছে এখুনি যদি আমরা প্রশ্ন করি যে কি ভাবে সে সংবাদটা আপনি জানলেন, আগের মতই হয়তো বলে বসবেন, আমি জবাব দিতে প্রস্তুত নই, কেমন কিনা ? Am I right ?

ডাঃ সুধীন চৌধুরী সে প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না—চুপ করে থাকে।

এবারে রায়বাহাদুর বলতে শুরু করেন, মি লর্ড, যদি আমার মাননীয় বন্ধু মিঃ ঘোষালের প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমি ডাঃ চৌধুরীকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই।

জাস্টিস মৈত্র, প্রসিড!

ডাঃ চৌধুরী, রায়বাহাদুর হালদার প্রশ্ন শুরু করলেন, মামলা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার মাননীয় বন্ধু মিঃ ঘোষালের কতকগুলো গুরুতর প্রশ্নের জবাবে আপনি ইচ্ছাকৃত মৌনবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। প্রশ্নগুলো—১নং, আপনার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দশ হাজার টাকা কোথা থেকে এল অর্থাৎ ঐ দশ হাজার টাকা আপনি কি ভাবে উপায় করেছেন ? তার কোন সদুত্তর দিতে আপনার অনিচ্ছা প্রকাশ ; ২নং, আপনার একমাত্র ডাক্তারী প্র্যাক্টিস ছাড়া আরও যে অর্থাগমের পথ ছিল সে কথা দ্বিতীয় দিন স্বীকার করবার পর আপনি বলেন কোন একটা বিশেষ কারণেই নাকি কথাটা আগের দিন আপনি গোপন করেছিলেন ; দ্বিতীয় দিন সব কথা স্বীকার করবার পর আবার বলেন, যদিও আপনাকে কথা অস্বীকার করতে হয়েছিল, পরে আর তার গোপন করবার নাকি কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ 'কারণ' যে কি তা আপনি জানাতে রাজী নন। ৩নং, শেষবার অসুস্থ অবস্থায় সুহাস মল্লিকের কলকাতায় আসবার সংবাদ আপনি যে কি করে, কোন্ সূত্রে পেয়েছেন, তাও আপনি প্রকাশ করতে রাজী নন। একটা কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাচ্ছেন না যে, অত্যন্ত রহস্যময় অথচ নিষ্ঠুর এক হত্যা-মামলার সঙ্গে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, আপনি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। অনুসন্ধানের ফলে যতটুকু জানা যায় তাতে অকুস্থানে আপনিও ছিলেন। এক্ষেত্রে আপনার সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে অনেক প্রকার প্রশ্নই উঠতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের যদি আপনি খেয়ালখুশিমত জবাব দেন, তাহলে স্বভাবতঃই আইন আপনাকে দোষী বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

যে প্রশ্নের আমি জবাব দিইনি, সেগুলোর জবাব দেওয়া সত্যিই আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিঃ হালদার। তাছাড়া আমার ধারণামত আপনাদের ঐ প্রশ্নগুলোর বর্তমানের এই মামলার সঙ্গে কোন সংস্পর্শ আছে বলেই আমি মনে করি না। প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে করি।

সেই দিন রাত্রে আবার কিরীটী ও সুব্রত মিলিত হয়ে মামলাটা সম্পর্কে আলোচনা করছিল।

কিরীটীর হাতে একখানা নোটবুক। পর পর কতকগুলো পয়েণ্ট কিরীটী সেই নোটবুকের মধ্যে লিখেছে। সেই পয়েণ্টগুলো নিয়েই দু'জনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছিল।

১নং : ৩১শে মে ডাঃ সুধীন চৌধুরী যখন সুহাসকে ট্রেনে তুলে দিতে যায়, তার হাতে একটা মরোক্কো-বাঁধাই ছোট কেস ছিল, এবং যার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম দিন সে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে জেরার মুখে আবার স্বীকার করে নেয়।

২নং : ডাঃ জগবন্ধু মিত্রের সুধীনের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল সে কথাটা অস্বীকার করা।

৩নং : সুধীনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দশ হাজার টাকার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া যায়নি।

৪নং : ডাঃ সুধীন চৌধুরী ও সুহাস মল্লিকের সঙ্গে পরস্পর পত্রবিনিময় চলত।

৫নং : কি করে সুধীন শেষবার অসুস্থ অবস্থায় যেদিন সুহাস কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসে ঐদিনই তার আসবার সংবাদ পায়।

৬নং : ঐ ধরনের কতকগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়ায় সুধীনের ইচ্ছাকৃত অস্বীকার।

৭নং : নৃসিংহ গ্রাম মহালে শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুর হত্যা।

৮নং : ঐ একই জায়গায় সুধীনের পিতার হত্যা।

৯নং : নায়েবজীর মৃত্যু-শয্যায় কোন একটি উইল সম্পর্কে তার পুত্রবধূ কাত্যায়নী দেবীকে ইঙ্গিত।

১০নং : রায়বাহাদুর রসময় মল্লিক, শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের দত্তকপুত্র।

১১নং : কাত্যায়নী দেবীর পুত্রবধূ সুধীনের মা সুহাসিনী দেবীর মুখে শোনা রায়পুরের পুরাতন কাহিনী।

১২নং : ৩১শে মে শিয়ালদহ স্টেশনে ছাতাধারী একটি কালো লোকের আকস্মিক আবির্ভাব।

১৩নং : কালো লোকটির সেই ছাতাটি।

॥ আট ॥

আরও সূত্র

সুব্রত সেদিনও জাস্টিস্ মৈত্রের বাড়িতে মামলার প্রসিডিংস পড়ছিল।

রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার ডাঃ মুখার্জীকে প্রশ্ন করছিলেন, ডাঃ মুখার্জী, আপনি তাহলে আগাগোড়া কোন সময়েই সন্দেহ করেননি যে, সুহাস মল্লিকের 'প্লেগ' হতে পারে ?

না।

ডাঃ সেনগুপ্ত যখন সে বিষয়ে আপনাকে ইঙ্গিত করেন, তখনও না ?

না।

কিন্তু কর্ণেল স্মিথের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে, সুহাস মল্লিকের প্লেগই হয়েছিল, এ কথাটা নিশ্চয়ই এখন আপনি অস্বীকার করছেন না ?

স্বীকারও করছি না।

তার মানে ?

তার মানে, যে ব্লাড কালচারের রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে কর্ণেল স্মিথ রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা যে মৃত সুহাস মল্লিকেরই ব্লাড কালচার রিপোর্ট, সেটা প্রমাণিত হত যদি তখনই মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা হত ! ব্যাপারটা যে আগাগোড়াই সাজানো নয় বা কোন ভুলভ্রান্তি হয়নি, তারও তো কোন প্রমাণ নেই।

না, তা নেই বটে, কিন্তু কর্ণেল স্মিথ এর উত্তরে কি বলেন ?

এবারে অ্যাডভোকেট হালদার কর্ণেল স্মিথকে প্রশ্ন করছেন।

আমি oath নিয়ে বলতে পারি, যে ব্লাড কালচার রিপোর্ট আমরা দিয়েছি সেটা মৃত মিঃ সুহাস মল্লিকেরই রক্তের কালচার রিপোর্ট। সে প্রমাণও আমরা দিতে পারি। কর্ণেল স্মিথ জবাব দেন।

মি লর্ড, আমি একটা প্রশ্ন কর্ণেল স্মিথকে করতে পারি কি ? ডাঃ মুখার্জী বললেন।

ইয়েস্, করুন।

কর্ণেল স্মিথ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—বললেন ডাঃ মুখার্জী, যদি সত্যিই সুহাস মল্লিকের শরীরের রক্ত কালচার করে প্লেগই প্রমাণিত হয়ে থাকে ধরে নেওয়া যায়, তবে প্লেগের বীজাণু কি করে এবং কোথা থেকে সুহাসের শরীরে এল, এর জবাব আপনি দিতে পারেন কি?

কি করে এল এবং আসতে পারে কিনা, সেটা আমার বিবেচ্য নয়। আদালতই সেটা দেখবেন।

মিঃ হালদার: এমন কি হতে পারে না কর্ণেল স্মিথ যে প্লেগ বীজাণু সুহাসের শরীরে inject করা হয়েছিল?

কর্ণেল স্মিথ: আমার মনে হয় সুহাসের শরীরে প্লেগ জার্ম ইনজেকশন করাই হয়ত হয়েছিল, সেটাই স্বাভাবিক এক্ষেত্রে।

ডাঃ মুখার্জী: ব্যাপারটা অনেকটা একটা রূপকথার মত শোনাচ্ছে না কি? আজ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের কোথাও কোন প্লেগ কেস হয়েছে বলে শোনা যায়নি, এক্ষেত্রে প্লেগ-জার্ম সংগ্রহ করে কারও শরীরে সেটা ইন্‌জেকশন করা, ব্যাপারটা শুধু অসম্ভবই নয়, হাস্যকর নয় কি?

কর্ণেল স্মিথ: আমার সহকর্মী মাননীয় ডাঃ মুখার্জী বলবেন কি, তাঁর সহকারী রিসার্চ স্টুডেন্ট ডাঃ অমর ঘোষ হঠাৎ এক মাসের ছুটি নিয়ে বম্বেতে গিয়েছিলেন কিনা এবং কেনই বা গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, গিয়েছিলেন।

তিনি কি কারণে বম্বেতে গিয়েছিলেন?

তা আমি কি করে বলব? তিনি ছুটি নিয়ে কোথায় যান না যান, সেটা দেখবার আমার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

আচ্ছা এ কথা কি সত্যি যে বম্বের প্লেগ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে ডাঃ অমর ঘোষ ডাঃ মুখার্জীরই একটি পরিচয়পত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়েছিলেন কর্ণেল কৃষ্ণমেননের কাছে?

কোথায় কথাটা শুনলেন জানি না! এবং ডাঃ ঘোষকে আমি কোন পরিচয়পত্র দিইনি!

কর্ণেল কৃষ্ণমেনন, ডাইরেক্টর অফ বম্বে প্লেগ ইন্‌স্টিটিউট আপনার পরিচিত বন্ধু, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ।

এর পর সাক্ষী দেওয়ার জন্য ডাঃ অমর ঘোষ ও কর্ণেল কৃষ্ণমেননের ডাক পড়ে আদালতে।

প্রথমে ডাঃ ঘোষকে প্রশ্ন করা হয়।

রায়বাহাদুর অনিমেষ হালদার জেরা করেন, ডাঃ ঘোষ, আপনি ডাঃ মুখার্জীর অধীনে ট্রপিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে রিসার্চ করেন?

হ্যাঁ।

কতদিন?

আজ দু বৎসর প্রায় হবে।

আপনি গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বম্বেতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

বম্বেতে আপনি প্লেগ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করবার জন্য ডাঃ মুখার্জীর কোন পরিচয়পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন?

না।

তা যদি না হয়, তাহলে কি করে আপনি বম্বের প্লেগ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে প্রবেশ-অধিকার পেলেন? আমরা যতদূর জানি, একমাত্র গভর্ণমেণ্টের স্পেশাল পারমিশন ব্যতিরেকে কারও সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কর্ণেল কৃষ্ণমেননের সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলাম দিন কয়েকের জন্য।

কত দিন কাজ করেছিলেন?

দিন কুড়ি মত হবে।

কর্ণেল কৃষ্ণমেননের সঙ্গে এই ঘটনার পূর্বে আপনার কোন পরিচয় ছিল কি?

হ্যাঁ, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে কর্ণেল কৃষ্ণমেনন কলকাতায় এসেছিলেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এ কথা কি ঠিক কর্ণেল কৃষ্ণমেনন?

হ্যাঁ—কৃষ্ণমেনন জবাব দেন।

আপনি ঠিক বলছেন, আপনার কাছে ডাঃ ঘোষ কোন লেটার অফ ইনট্রোডাকশান পেশ করেননি?

না।

ডাঃ ঘোষ, ৩১শে মে শিয়ালদহ স্টেশনে সুহাস মল্লিক অসুস্থ হবার দিন সাতেক আগে মাত্র হঠাৎ আপনি বম্বে হতে কলকাতায় ফিরে আসেন—এ কথা কি সত্য?

হ্যাঁ।

হঠাৎ কুড়িদিন কাজ করেই আবার আপনি ফিরে এলেন যে?

আমার ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় ফেরবার পর আপনাকে প্রায়ই ঘন ঘন দুপুরের দিকে ডাঃ মুখার্জীর কলকাতার বাসাভবনে যাতায়াত করতে দেখা যেত কয়েকদিন যাবৎ, এ কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ, আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম, আমি একটা থিসিস্ সাব্‌মিট করব, সেই সম্পর্কেই আলোচনা করবার জন্য ডাঃ মুখার্জীর ওখানে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হত।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, সুব্রত সেদিনকার মত উঠে পড়ল। সারাটা দিন আদালতের কাগজপত্র ঘেঁটে মাথাটা যেন কেমন টিপ্‌টিপ্ করছে।

* * *

সেই দিন সন্ধ্যায় আবার কিরীটী বলছিল, দেখা যাচ্ছে সমগ্র হত্যাকাণ্ডটাই আগাগোড়া একটা চমৎকার পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার। কিন্তু আসামী ডাঃ সুধীন চৌধুরী যেন একটা পরিপূর্ণ মিস্ত্রি, তাঁর প্রত্যেকটি statement থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কাউকে তিনি যেন সযত্নে shield করবার চেষ্টা করছেন আগাগোড়া।

তোর তাই মনে হয়! সুব্রত প্রশ্ন করে।

তাই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রসিডিংস থেকে যতদূর জানা গেছে, তাতে করে ডাঃ সুধীন চৌধুরীকে বাঁচাতে পারে এমন কেউই নেই। ভদ্রলোক একেবারে গলা-জলে।

আমাদের এখন তাকে সেই গলা-জল থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।

এখনও কি তুই মনে করিস কিরীটী, ডাঃ সুধীন চৌধুরীকে বাঁচাতে পারবি?

চেষ্টা করতে দোষ কি! হয়তো গলা-জলের মধ্যেও একটা ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড দেখা দেবে! কিন্তু সে কথা যাক, আপাততঃ আমাকে কাগজপত্র ছেড়ে কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করতে হবে।

॥ নয় ॥

হারাধন ও জগন্নাথ

সুব্রত বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ শোন্, কালই তোকে রায়পুর যেতে হবে একবার।

রায়পুর !

হ্যাঁ।

শুনেছি সেখানকার আবহাওয়াও খুব ভাল, সেখানে গিয়ে দুটো কাজ তোকে করতে হবে। প্রথমতঃ—রায়পুর রাজবাড়ির ওপরে তোকে সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। রাজা সুবিনয় মল্লিক মহাশয় এখন সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে রাজধানীতে বিরাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে যেমন করেই হোক তোকে ঘনিষ্ঠ হতে হবে,—এই হচ্ছে তোর প্রথম কাজ। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের সদর নায়েবজী বা স্টেটের ম্যানেজার বা মল্লিক মশাইয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী সতীনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে ও তাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ অমিয় সোমের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রহস্যের মূল জানবি ঐখানেই লুকিয়ে আছে। হত্যার বীজ ওখানেই প্রথম রোপিত হয়েছিল বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

কিন্তু এতগুলো অঘটন কি করে যে নির্বিবাদে সংঘটিত হতে পারে, সেটাই আমি ভাবছি কিরীটী ! সুব্রত হাসতে হাসতে বলে।

অত না ভাবলেও চলবে। এই দেখ্, আজকের দৈনিক 'ভারত জ্যোতিঃ' কাগজখানা ; দিন পাঁচেক থেকে এই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে রায়পুর স্টেটের জন্য একজন সুপারভাইজার চান রাজাবাহাদুর।

সুব্রত তখুনি আগাগোড়া বিজ্ঞাপনটা পড়ে ফেললে।—কিন্তু জমিদারীর কাজে সুদক্ষ, অভিজ্ঞ, বিশিষ্ট লোকের পরিচয়পত্র—এই যে তিনটি প্রচণ্ড বোমা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, এগুলো কোথায় মিলবে শুনি ?

ডাঃ সান্যালকে দিয়ে ডাঃ কালীপদ মুখার্জীর কাছ থেকে গতকালই তোর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কল্যাণ রায়, এম্. এ., বি. এল.-এর নামে একখানা পরিচয়পত্র আনিয়ে রাখা হয়েছে। আগামীকালের জন্য ট্রেনে সিটও রিজার্ভ হয়ে গেছে। এখন শুধু কল্যাণবাবুর গমনের প্রত্যাশাটুকু !

মানে, তুই সব আগে থেকেই রেডি করে রেখেছিস বল্ ?

হ্যাঁ।

But this is foregery—

নান্যঃ পন্থা!

*   *   *

ভোরবেলা, সবে পূর্বাকাশে উষার রক্তিম রাগ দেখা দিয়েছে, সুব্রত রায়পুর স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নামল। রায়পুর স্টেশনটি বেশ মাঝারি গোছের; গাড়ি থেকে যাত্রীও নেহাৎ কম নামেনি।

স্টেশন মাস্টারটি বাঙালী—প্রাণধন মিত্র। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। সমগ্র মাথাটি জুড়ে সুবিস্তীর্ণ চকচকে মসৃণ একখানি টাক। স্থানীয় ছেলেছোকরা আড়ালে 'টেকো মিত্তির' বলে ডাকে শোনা যায়। নধর হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা।

রায়পুরে রাজাবাবুদেরই এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিভাই হারাধন মল্লিক, স্থানীয় আদালতে মোক্তারী করতেন এককালে। সুধীন চৌধুরীর মাতুল নীরোদ রায় কিরীটীকে বলে দিয়েছিলেন, সুব্রত যেন সেইখানেই গিয়ে ওঠে। তাকে তিনি কল্যাণ সম্পর্কে চিঠিও লিখে দিয়েছেন।

রায়পুর বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা।

রায়পুরের আশেপাশে ঘন শালের বন। ঐ শালবন হতেই রাজস্টেটের বেশীর ভাগ অর্থাগম হয় আগেই বলা হয়েছে।

একটা নদীও আছে। নদীর ধারে বাঁধানো প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। সন্ধ্যায় এখানে প্রচুর লোক-সমাগম হয়।

এখানকার স্বাস্থ্য নাকি খুবই ভাল।

স্টেশন থেকে বরাবর রাজাদের তৈরী পাকা সড়ক শহর বাজার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাজবাড়ি দুটো, একটা পুরাতন, অন্য একটা নূতন, শেষোক্তটি রায়বাহাদুর রসময় মল্লিকের আমলে তৈরী আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত।

বর্তমানে রাজবাড়ির লোকেরা নতুন প্রাসাদেই থাকেন। পুরাতন বাড়িটায় অফিস, কাছারী, হাসপাতাল ইত্যাদি।

রায়পুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বাজার, থানা ও আদালত আছে। শহরের একধারে মোক্তার হারাধন মল্লিকের বাড়ি।

হারাধনের বাড়ি খুঁজে নিতে সুব্রতকে তেমন বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয়নি। হারাধন বাইরের ঘরে ফরাসের ওপরে বসে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক টানছিলেন। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে। রোগা ঢ্যাঙা চেহারা।

বাইরেটা যদিও হারাধনের রুক্ষ, মনটা তাঁর সত্যিই কোমল ও স্নেহশীল। সুব্রতকে দরজার সামনে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হারাধন উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন, কে ?

সুব্রত ঘরে ঢুকে নমস্কার করে পকেট থেকে নীরোদ রায়ের চিঠিখানা বের করে দিল।

বসুন, আপনার নাম কল্যাণ রায় ?

সুব্রত চৌকির একপাশে উপবেশন করলে।

তাকিয়ার পাশ হতে চশমাটা নিয়ে নাকের ওপরে বসিয়ে হারাধন চিঠিখানা পড়ে ফেলল।

নীরোদবাবুর কাছ হতে আসছেন! জগু? ওরে হতচ্ছাড়া জগন্নাথ! হারাধন চিৎকার করে ডাকলেন, বলি ওহে নবাবের বেটা নবাব, খাঞ্জাখাঁ, ওহে রায়পুরের জমাদার জগা—শুনতে পাচ্ছিস ?

রোগা লিক্‌লিকে আব্‌লুশ কাঠের মত কালো গায়ের রং, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ধব্‌ধবে একখানি ধুতি পরিধানে, গায়ে একটা নেটের গেঞ্জি, কুড়ি-বাইশ বৎসরের একটি যুবক ঘরে এসে প্রবেশ করল, চিৎকার করছেন কেন ?

কি বলিস বেটা ছোটলোক, নেমকহারাম ? আমি চিৎকার করছি ?

কি চাই, বলুন না ?

রায়পুরের জমাদারের কোথায় থাকা হয়েছিল শুনি ? কানে কি প্লাগ এঁটে থাকিস ? শুনতে পাস না ?

শুনতে সকলেই পায়, সকলেই কি আপনার মত কালা ?

কি বললি শালা, আমি কালা ? তবে মোক্তারী করে কে রে বেটা ?

মোক্তারী! ফু! অমন মোক্তারী না করলেই বা কি ?

দেখ্‌ জগা, ফের তুই আমার মোক্তারীকে হতচ্ছেদা করবি তো তোর সঙ্গে আমার খুনোখুনি হয়ে যাবে। এই যে বাড়ি ঘরদোর, এসব কোথা হতে এল শুনি ? এসব এই মোক্তারীর পয়সাতেই, তোর বাবার ব্যারেস্টারীর পয়সায় নয়, বুঝলি ?

জগন্নাথ এতক্ষণ সুব্রতকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ চোখ ফেরাতে সুব্রতর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, সে বেশ লজ্জিত হয়ে ওঠে, আঃ দাদু!

দাদু! যা বেটা, গরু মেরে জুতো দান! যা বেরো, তোর মুখদর্শনও আমি করব না। Get out!

তা যাচ্ছি, কিন্তু এই ভদ্রলোক—

দেখলেন মশাই, দেখলেন! কত বড় ছোটলোক, কি রকম মুখে মুখে তক্কটা করলে! শুনেছেন কখনও, দেখেছেন কখনও! দাদু—মানে সাক্ষাৎ বাপের বাপ, তার মুখে মুখে

এমনি করে কোন নাতি জবাব দেয় ? শত্রু মশাই, সব শত্রু !

দাদু, চা খেয়েছ ?

ছোটলোক নাতির সঙ্গে আমি কথা বলি না। এখন দয়া করে ঐ ভদ্রলোকের খাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও, চা-টার একটু ব্যবস্থা করে দাও। নীরোদবাবু অর্থাৎ তোর পিসেমশাইয়ের বন্ধু। কল্যাণবাবু, এইটি আমার নাতি, জগন্নাথ মল্লিক। অকালকুষ্মাণ্ড, এম. এ. পরীক্ষা দেবে না বলে বাড়িতে এসে বসে আছে। অর্থাৎ আমার অন্ন ধ্বংস করছে। আর লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে আমার মাথা খারাপ তাই সেবা করতে এসেছে। এমন কুলাঙ্গার ঘরের শত্রু বিভীষণ দেখেছেন কোথাও ?

সুব্রত এতক্ষণ সত্যিই একটু অবাক হয়ে দাদু ও নাতির কলহ শুনছিল, প্রথমে সে একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এতক্ষণে সে বৃদ্ধের অনেকটা পরিচয় পেলে তার শেষের কটি কথায়। সে হেসে ফেললে।

হারাধনের সংসারে লোকজনের মধ্যে হারাধন ও তার পিতৃমাতৃহীন নাতি জগন্নাথ, ভৃত্য শম্ভুচরণ ও রাঁধুনীবামুন কেষ্ট। বাড়িতে স্ত্রীলোকের কোন নামগন্ধও নেই। পাড়ার লোকেরা বলে তার একটিমাত্র কৃতবিদ্য পুত্রের শোকে ও স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে হারাধনের মাথার নাকি গোলমাল হয়ে গেছে।

প্রথম জীবনে হারাধন মোক্তারী করে প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন। আশেপাশের দশ-বিশটা শহরে তাঁর নামডাকও ছিল।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর হারাধনের একমাত্র পুত্র চিন্ময়, জগন্নাথের পিতা, বরাবর বৃত্তি নিয়ে এম. এ. পাস করে বিলেত হতে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করেন।

চার বৎসর মাত্র প্র্যাকটিস্ করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন, প্রচুর অর্থাগমও হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ দু'বৎসরের ছেলে জগন্নাথকে রেখে চিন্ময়ের স্ত্রী তিনতলার ছাদ থেকে রেলিং ভেঙে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চিন্ময় সে শোক সহ্য করতে পারলেন না। শ্মশান থেকে ফিরে সেই যে চিন্ময় এসে জ্বরতপ্ত গায়ে শয্যা নিলেন, সেই তাঁর শেষ শয্যা—এগার দিনের দিন তিনিও মারা গেলেন।

দু'বৎসরের শিশু জগন্নাথকে বুকে করে হারাধন রায়পুরে ফিরে এলেন কলকাতা থেকে। এই ঘটনার মাস চারেক বাদে চিন্ময়ের মা-ও মারা গেলেন। ছোট্ট শিশু জগন্নাথের সমস্ত ভার এসে হারাধনের মাথায় পড়ল। বুকে-পিঠে করে হারাধন জগন্নাথকে মানুষ করতে লাগলেন।

যত বয়স বাড়ছিল, হারাধনের স্বভাবটাও খিট্‌খিটে হয়ে যাচ্ছিল।

জগন্নাথও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির। এম. এ. পড়তে পড়তে দাদুর অসুখের সংবাদ পেয়ে সেই যে মাস পাঁচেক আগে সে বাড়িতে এসেছে, আর কলকাতায় ফিরে যায়নি।

সে এবারে বাড়িতে পা দিয়েই বুঝেছিল, দাদুর মাথার গোলমালটা একটু বেশী বেড়েছে। সর্বদা তাঁকে চোখে চোখে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

* * *

চা পান করতে করতে জগন্নাথ সুব্রতর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল।

সুব্রতর জগন্নাথকে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই ভাল লেগেছে।

স্বল্পভাষী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলেটির একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে।

জগন্নাথ বলছিল, দাদুর কথায় আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করেননি কল্যাণবাবু?

না না—সে কি!

দাদু আমার দেবতার মত লোক, আমার মা বাবা ও দিদার মৃত্যুর পর হতেই অমনি মাথাটা ওঁর গোলমেলে হয়ে গেছে।

সুব্রত তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে জগন্নাথকে জানিয়েছিল, চাকরির উমেদারি নিয়েই সে রায়পুর এসেছে। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে।

পরের দিন সকালে ডাঃ মুখার্জীর সুপারিশপত্রটি নিয়ে, জগন্নাথের নির্দেশমত সুব্রত রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক, রায়পুর স্টেটের একচ্ছত্র অধীশ্বর, তখন তাঁর খাস কামরাতেই ছিলেন। ভৃত্যের হাত দিয়ে সুব্রত সুপারিশপত্রটি রাজাবাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিল। আধঘণ্টা বাদেই সুব্রতর ডাক পড়ল খাস কামরায়।

সুব্রত ভৃত্যের পিছু পিছু রাজাবাহাদুরের খাস কামরায় এসে প্রবেশ করল।

প্রকাণ্ড একখানি হলঘর—বহু মূল্যবান আধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত।

একটা সুদৃশ্য দামী আরাম-কেদারায় শুয়ে রাজাবাহাদুর আগের দিনের ইংরাজী সংবাদপত্রটি পড়ছিলেন।

লোকটির বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা, কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং। দামী মিহি ঢাকাই ধুতি পরিধানে, গায়ে পাতলা সিল্কের গেঞ্জি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

সুব্রত কক্ষে প্রবেশ করে নমস্কার জানাল।

বসুন, আপনারই নাম কল্যাণ রায়?

আজ্ঞে।

আপনি ডাঃ মুখার্জীর পরিচয়পত্র এনেছেন, আপনাকে আমি কাজে বহাল করছি। আপাততঃ পাঁচশত টাকা করে পাবেন, কিন্তু you look so young—বলতে বলতে পাশের শ্বেতপাথরের টিপয়ের ওপরে রক্ষিত কলিংবেলটা বাজালেন।

ভৃত্য এসে ঘরে প্রবেশ করতে বললেন, এই, সতীনাথবাবুকে ডেকে দে।

একটু পরেই সতীনাথবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। সতীনাথের বয়স ত্রিশের বেশী নয়। ঢ্যাঙা, লম্বা চেহারা, মুখটা ছুঁচলো। মাথায় কোঁকড়া ঘন চুল, ব্যাকব্রাস করা। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর চক্ষু দুটি। দৃষ্টি যেন অন্তর পর্যন্ত ভেদ করে যায়। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

সতীনাথ, এঁর নাম কল্যাণ রায়। ডাক্তার মুখার্জী এঁকে পাঠিয়েছেন, এঁকেই আমি স্টেটের সুপারভাইজার নিযুক্ত করলাম। স্কুল-বাড়ির পাশে যে ছোট একতলা বাড়িটা আছে, সেখানেই এঁর ব্যবস্থা করে দিও। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি বিবাহিত কি?

আজ্ঞে না।

বেশ, তাহলে আপনি আজ আসুন, কাল সকালের দিকে আসবেন—কাজের কথাবার্তা হবে। আপনি উঠেছেন কোথায়?

কোথাও না। স্টেশনেই আমার মালপত্র রেখে এসেছি।

তবে আর দেরি করবেন না, জিনিসপত্র নিয়ে আসুন।

বেশ।

সতীনাথ, দু'জন লোক দিয়ে দাও ওঁর সঙ্গে।

না, তার কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য মালপত্র, আমি নিজেই নিয়ে আসতে পারব।

বেশ।

সুব্রত ইচ্ছে করেই হারাধনের ওখানে ওঠবার ব্যাপারটা গোপন করে গেল। সে রাজাবাহাদুরকে নমস্কার জানিয়ে সতীনাথবাবুর সঙ্গে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল।

॥ দশ ॥

অদৃশ্য ছায়া

পরের দিন রাত্রে সুব্রত কিরীটীকে চিঠি লিখছিল :—

কিরীটী,

চাকরি এক চিঠিতেই মিলে গেছে। পুরাতন রাজবাড়ির কাছেই থাকবার জন্য কোয়ার্টার মিলেছে। কাজের কথা বিশেষ এখনও কিছু হয়নি। তবে সামান্য আলাপে অনুমানে যা বুঝেছি, বর্তমানে স্টেটের মধ্যে পুকুরচুরি হচ্ছে, তারই উপর আমায় গোয়েন্দাগিরি করতে হবে, রাজাবাহাদুরের পক্ষ হতে। অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা লোক এই রাজাবাহাদুর।

ডাঃ অমিয় সোমের সঙ্গে সামান্য মৌখিক আলাপ হয়েছে। মনে হল সাধারণ নয়। গভীর জলের মাছ।

তারপর আমাদের সতীনাথ লাহিড়ী মশাই, তাঁর পরিচয় দিতে সময় লাগবে। তাঁর চোখের দৃষ্টিটি বড় সাংঘাতিক বলেই মনে হয়। এবং মনে হয় একটি আসল শিয়াল চরিত্রের মানুষ! ঈশপের গল্পের সেই শিয়াল ও বোকা কাকের গল্প মনে আছে? তারপর রায়পুর জায়গাটা, এর কিন্তু আমার মতে রায়পুর নাম না দিয়ে শালবনী নাম দেওয়াই উচিত ছিল।

শালবনের ওপারে আছে একটি ঘন জঙ্গল। শোনা যায় বন্যবরা ও ব্যাঘ্রের উৎপাতও মাঝে মাঝে হয় সেখানে, তবে ভাল শিকারী নেই এই যা দুঃখ! একটা যদি দোনলা বন্দুক পাঠাস, শিকার করে আনন্দ পেতাম। ওদিককার সংবাদ কি?

তোর কল্যাণ।

* * *

দিন দুই বাদে সুব্রতর চিঠির জবাব এল।

সু—তোর দুটো চিঠিই পেলাম। দোনলা বন্দুক চাস পাঠাব। কিন্তু রাজবাড়ির মোহে হারাধনকে হেলা করিস না। He is a jewel—একেবারে খাঁটি হীরে। তার পর আমাদের পূজ্যপাদ লাহিড়ী মশাই। তোর দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করি। জানিস না বোধ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে চক্ষুকে সজীব ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করে। রায়পুরের নামটা তো আমাদের হাতে নয়, আর আমাদের মোকররী স্বত্বও ওতে নেই, অগত্যা 'শালবনী'

নাম ছেড়ে রায়পুরই বলতে হবে। ভাল করে সন্ধান নে দেখি, পুকুরচুরির সিঁধকাঠিটা কার হাতে ঘোরে? হ্যাঁ ভাল কথা, ওখানকার অধিবাসীদের মধ্যে, মানে রাজাবাহাদুরের প্রজাবৃন্দের মধ্যে সাঁওতাল জাতটা আছে কি? অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ এটা, পর পত্রে যেন পাই—তোর 'ক'।

* * *

না, সুব্রত হারাধন ও জগন্নাথকে ভোলেনি। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই দু-তিন ঘণ্টা করে তাঁদের ওখানে গিয়ে ও কাটিয়ে আসে গল্পে গল্পে।

জগন্নাথ অত্যন্ত স্বল্পভাষী; কিন্তু এই সামান্য বয়েসেই সে এত পড়াশুনা করেছে যে ভাবলেও তা অবাক হয়ে যেতে হয়। কথা সে খুবই কম বলে বটে, কিন্তু যে দু-চারটে কথা বলে, অন্তরে যেন দাগ কেটে বসে যায়। হারাধন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, মাথার গোলমাল হওয়ার পর থেকে কথাটা তিনি একটু বেশীই বলেন। বিশেষ করে তাঁর অভিযোগটা যেন পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের প্রতি ও যে দেবতাটিকে চোখে কোনদিনও কেউ দেখতে পায় না—তাঁর প্রতি। জগন্নাথ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসায়, মুখে তিনি সর্বদা জগন্নাথকে গালাগালি দিলেও, অন্তরে তিনি বিশেষ খুশীই হয়েছিলেন। ইদানীং অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব তেমন তাঁর ছিল না। তাছাড়া বছর পাঁচ মাত্র মাথার গোলমালটা একটু বেশী হওয়ায়, জগন্নাথ নিজেই টাকাকড়ির ব্যাপারটা দেখা-শুনা করত।

সামান্য কয়েকদিনের পরিচয় হলেও, দাদু ও নাতির সুব্রতকে খুব ভালই লেগেছে।

সমস্ত দিনের কাজকর্মের পর সুব্রত নিয়মিত হারাধনের বাসায় এসে রাত্রি ন'-টা দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে যেত। বাড়ির ভিতরে খোলা বারান্দায় চেয়ার পেতে তিনজনে বসে নানা গল্পগুজব হত। বেশীর ভাগ জগন্নাথ ও সুব্রতর সঙ্গেই কথাবার্তা চলত—মাঝে মাঝে হারাধনও দু'চারটে কথা বলতেন। সেদিন কথায় কথায় হারাধন বললেন, বুঝেছ কল্যাণ, তোমাদের ঐ লাহিড়ী মশাইটি একটি আসল ঘুঘু। বয়স ওর এখনও বত্রিশের কোঠা হয়তো পার হয়নি, কিন্তু অমন ধড়িবাজ ছেলে আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। তোমাদের রাজাবাহাদুরের আসল মন্ত্রণাদাতা ঐ লাহিড়ীই। থাকেন ভিজে বিড়ালটির মত, কিন্তু ও পারে না এমন কোন অসাধ্য কাজ আছে বলে আমি জানি না।

ভদ্রলোক তো শুনেছি আজ পাঁচ-সাত বৎসর মাত্র এখানে এঁদের স্টেটে কাজ করছেন এবং রাজাবাহাদুরের খুব বিশ্বাসীও।

হারাধন একটু থেমে বলতে থাকেন—জান কল্যাণ, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'ছুঁচ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বের হওয়া।' রায়পুরের রাজবাড়ির ও শনি!

যেদিন হতে ও রায়পুরের প্রাসাদে প্রবেশ করেছে, সেদিন হতেই যেন প্রাসাদে শনির দৃষ্টি লেগেছে। রাজস্টেটে ও চাকুরি নিতে না নিতেই রসময় হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল, তারপর গেল সুহাস। আহা সোনার চাঁদ ছেলে ছিল!

সুহাস মল্লিকের ব্যাপারটা নিয়েই তো মহা হৈ-চৈ হয়ে গেল।

কিন্তু তাতে কিই-বা হল; গভীর জলের মাছ জাল ছিঁড়ে বের হয়ে গেল। মাঝখানে হতে একটা নিরীহ একেবারে নির্দোষী লোক জালে আটকা পড়ল।

কেন, এ কথা বলছেন কেন?

দেখ বাবাজী, আমিও এককালে মোক্তারী করেছি, দশজনে মানতও। হয়ত তোমরা আমার নাতির মত বলবে, হুঁ মোক্তারী,…কিন্তু বাবাজী, আইনের মারপ্যাঁচগুলো ব্যারিস্টারেরও যা, মোক্তারেরও তাই। তারা কটমট করে ইংরাজীতে বলবে, মি লর্ড, আমরা না হয় বলি ধর্মাবতার হুজুর বাংলা ভাষায়। আরে বাবা, ঐ একটা বিচার হল নাকি! প্রহসন! একটা প্রহসন!

কিন্তু আইনের চোখে ডাঃ সুধীন চৌধুরীর দোষ তো প্রমাণ হয়েছে বলেই জজ-সাহেব রায় দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের!

আসলে সত্যিকারের প্রমাণ যাকে বলে তা আর হল কোথায়?

কেবলমাত্র সন্দেহের জোরে বেচারীকে শাস্তি দেওয়া হল তাহলে বলতে চান?

তাছাড়া কি, কতকগুলো প্রশ্নের সওয়ালই নিল না; শেষ পর্যন্ত মুখ বুজেই রইল ছেলেটা—কেন তা সেই জানে। অবশেষে কতকগুলো প্রমাণ খাড়া করে কোণঠাসা করে দোষী সাব্যস্ত করা হল। হবুচন্দ্রের বিচার আর কি!

তবে কি তুমি বলতে চাও দাদু, ডাঃ সুধীন চৌধুরী দোষী নয়, তাকে অন্যায় করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? এবারে প্রশ্ন করলে জগন্নাথ।

একশোবার বলব, তাকে অন্যায় করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

কেন?

কারণ সে দোষী হতেই পারে না। ধর যদি ধরে নেওয়াই যায়, প্লেগের বীজাণুই সুহাসের শরীরে ফুটিয়ে তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছে এবং এও যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করেই নেওয়া হয় যে সুধীন নিজে ডাক্তার হওয়ায় তার পক্ষে সেটা খুবই সহজ ছিল—তবু এ কথাটা তোরা ভেবে দেখেছিস কি যে ইনজেকশন দেওয়ার পর যন্ত্রপাতিগুলো সে কোথায় সরিয়ে ফেললে? তার হাতে একটা মরোক্কো-বাঁধাই কেস ছিল কিন্তু সেটা তো হিমোসাইটোমিটারের কেস; ইনজেকশনের যন্ত্রপাতি তো তার মধ্যে ছিল না। তাছাড়া সুহাসের মা মালতী দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর

দৃষ্টি এড়ানো বড় সহজ কথা নয়। আরও একটা কথা, সুধীন যদি সে কাজ করেই থাকে, তবে তার সুহাসকে বাদ দিয়ে রসময়কেই মারা উচিত ছিল, কেননা সুধীনের বাপ যখন নৃসিংহ গ্রামে নিহত হন, তখন সুহাস তো জন্মায়ইনি। এখানে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তো উঠতেই পারে না। তাছাড়া এ জগতে এমন কেউ বোকা নেই, হত্যা করবার জন্য বিষ-প্রয়োগ করে তার চিকিৎসার জন্য আবার কলকাতায় আসতে লিখবে। ব্যাপারটা আগাগোড়াই গোলমেলে, বিচারভণ্ডুল। একটা জগাখিচুড়ী।

সুব্রত হারাধনের বিচারশক্তি ও বিশ্লেষণক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল যদিচ হারাধনের কথাগুলো এলোমেলো। সে ভাবছিল তবে কি সত্যি সত্যিই কিরীটীর কথাই ঠিক, ডাঃ সুধীন চৌধুরী নির্দোষ! মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে!

* * *

সেই রাত্রে হারাধন ও জগন্নাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুব্রত যখন রাস্তায় এসে নামল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। শহরের রাস্তাঘাট ও তার দু'পাশের বাড়ি দোকানপাট সব প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা দোকান খোলা, এবং এক-আধজন লোক রাস্তা দিয়ে চলেছে মাত্র।

রাস্তার দু'পাশে কেরোসিনের বাতিগুলো টিম্‌টিম করে জ্বলছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। সুব্রত এগিয়ে চলে। নানা চিন্তায় মনটা আচ্ছন্ন। হারাধনের বাড়ি থেকে সুব্রতর কোয়ার্টারটা বেশ খানিকটা দূর।

সুব্রত আজ প্রায় দিন কুড়ি হবে এখানে এসেছে, কাজ কিন্তু বিশেষ কিছুই এগোয়নি। অথচ কিরীটীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক পাও নড়বার উপায় নেই বেচারীর।

একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে, থাকোহরি। লোকটার বয়স হয়েছে। রাজাবাহাদুরই স্টেট থেকে বামুন ও চাকরের ব্যবস্থা করে দিতে সতীনাথবাবুকে বলেছিলেন, কিন্তু সুব্রত সতীনাথবাবুকে ও সেই সঙ্গে রাজবাহাদুরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান জানিয়েছে। থাকোহরিকে জগন্নাথই দিয়েছে।

লোকটার স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল, তবে দোষের মধ্যে একটু কালা ও রাত্রে তেমন পরিষ্কার দেখে না। অবিশ্যি তাতে সুব্রতর কোন অসুবিধা নেই। গরীব লোক, সুব্রতর কেমন একটা মায়াও এ কদিনে লোকটার ওপরে পড়ে গেছে। ছোট একতলা

বাংলো প্যাটার্নের বাড়িখানা। বাড়ির পিছনের দিকে ছোট একটা অযত্নবর্ধিত জঙ্গলাকীর্ণ বাগান। বাগানের সীমানা এক-মানুষ সমান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়িতে সর্বসমেত চারখানা ঘর। দরজায় তালা দিয়ে, বারান্দার ওপরে একটা মাদুর পেতে থাকোহরি শুয়ে ঘুমিয়েছিল। সুব্রত এসে তাকে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল, থাকোহরি!

থাকোহরি সুব্রতর ডাকে উঠে বসে।

দরজাটা খুলে দাও।

থাকোহরি দরজার তালা খুলে দিল। ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বালানো থাকে, কিন্তু আজ ঘরটা অন্ধকার।

এ কি, আলো জ্বালাওনি আজ?

আজ্ঞে, আলো তো জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, বোধ করি নিভে গেছে।

সুব্রত পকেট থেকে টর্চটা বের করে বোতাম টিপতেই ঘরের মধ্যে নজর পড়ায় চমকে ওঠে।

ঘরের মেঝেতে তার চামড়ার সুটকেসটা ডালাভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। লেখবার টেবিলের কাগজপত্র, বই, সব ওলটপালট হয়ে আছে। এলোমেলোভাবে চারিদিকে ছড়ানো।

থাকোহরি ততক্ষণ আলো জ্বালিয়ে ফেলেছে।

এসব কি—ঘরে ঢুকেছিল কে?

থাকোহরিও কম অবাক হয়নি।

তাই তো বাবু, টের পাইনি, মনে হচ্ছে নিশ্চয় ঘরে চোর এসেছিল। ওপাশের জানলাটা খোলা রেখে গিয়েছিলেন বাবু?

সুব্রত জানলার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়।

টাকাপয়সা যায়নি তো বাবু?

সত্যিই জানলাটা খোলা। সুব্রতর বুঝতে কিছুই কষ্ট হয় না। জানলা ভেঙেই চোর ঘরে এসেছে। সুব্রত খুঁজে দেখলে, না, দশ টাকার এগারখানা নোট ও কিছু খুচরো পয়সা, আনি দু'আনি, সুটকেসের মধ্যে পার্সটার ভিতরে ছিল, কিছুই চুরি যায়নি। টাকা-পয়সা, জামাকাপড় কিছুই নেয়নি, এ আবার কি ধরনের চোর? কী চুরি করতে তবে সে এসেছিল এ ঘরে? আপাতদৃষ্টিতে মূল্যবান কিছু চুরি না গিয়ে থাকলেও, কেউ যে তার অবর্তমানে তার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই। সুব্রত বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠে। তবে কি এখানে তাকে কেউ

সন্দেহ করেছে? না, তাই বা কি করে সম্ভব! কেউ তো তার পরিচয় জানে না। আচমকা মনে পড়ে আজ কয়েকদিন থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কে যেন অলক্ষ্যে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে। সে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু সর্বদা দুটি চক্ষুর দৃষ্টি তাকে যেন সর্বত্র অনুসরণ করে ফিরছে। প্রথমটায় সে এত মনোযোগ দেয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। একটা কিছু আছে। কিন্তু!...

* * *

রাত্রি গভীর। থাকোহরি বাইরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুব্রত কিরীটীকে চিঠি লিখছিল:

কিরীটী,

গত পরশু তোকে একখানা চিঠি দিয়েছি, এখানে বোধ করি সন্দেহের হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে। কে একজন অজানা অতিথির আবির্ভাব হয়েছিল আমার ঘরে, আমার অনুপস্থিতিতে থাকোহরির বধিরত্বের সুযোগ নিয়ে। ক্ষতি একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখনও চোখে পড়েনি কিছু। আজ মনে হচ্ছে কয়েকদিন ধরে অন্ধকারে কে যেন আমায় অনুসরণ করে ফিরছিল। প্রথমটায় খেয়াল করিনি, সন্দেহ জাগছে এবারে। লাহিড়ী মশাই এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রাসাদের সর্বত্রই যেন একটা থমথমে ভাব। কোথায় যেন একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে এ যেন ঝড় ওঠবার পূর্বলক্ষণ! আজ হারাধনের একটা কথায় বুঝতে পারলাম, নাটকের শুরু রসময় মল্লিককেই নিয়ে।

আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা রইল।

তোর কল্যাণ

দিন চারেক বাদেই কিরীটীর জবাব এল।

কল্যাণ,

তোর চিঠিখানা আমায় বেশ চিন্তিত করে তুলেছে। থাকোহরি না হয় কালা ও রাতকানা, কিন্তু তোর একজোড়া ড্যাবডেবে চোখ থাকতেও কি বলে এখনও ধরতে পারলি না, চোর কেন তোর ঘরে এসেছিল? ওরে আহাম্মক! তোর গোপনীয় কাগজপত্রের সন্ধানে! তোকে এবারে একটা 'ডেয়ারিং' কাজ করতে হবে। একটিবার লাহিড়ী মশাইয়ের ঘরে হানা দিতে হবে। ভদ্রলোক তো একক জীবন অতিবাহিত করেন, খুব কষ্ট হবে না। তাছাড়া রাত্রে প্রাসাদে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতেও যান, সে কথা তো তুই লিখেছিস। ওই রকম একটা দিন বেছে

নিলেই চলবে। হ্যাঁ রে, সাঁওতাল প্রজার কথা জানাতে লিখলাম কিন্তু সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যই তো করিসনি।

॥ এগার ॥

মৃত্যুবাণ

কিরীটীর চিঠি পাওয়ার পরদিনই, যে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতটা সুব্রত মনে মনে অনুভব করছিল, অকস্মাৎ সেটা সত্য হয়ে দেখা দিল। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা হবে। প্রাসাদের দিক থেকে সহসা একটা আর্ত চিৎকার রাত্রির স্তব্ধ বুকখানাকে কাঁপিয়ে তুললে। মুহূর্তে চারিদিক হতে লোকজন ছুটে এল। এমন কি রাজাবাহাদুর পর্যন্ত। সকলে এসে দেখলে, লাহিড়ী মশাই তীব্র যন্ত্রণায় প্রাসাদের অন্দর ও বাহিরের সংযোগস্থলে বাঁধানো আঙিনার উপর পড়ে ছটফট করছেন। মাঝে মাঝে আগাগোড়া সমগ্র শরীরটা আক্ষেপে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। আলো নিয়ে এসে দেখা গেল, লাহিড়ীর বুকের বাঁদিকে, একেবারে হৃদপিণ্ড ভেদ করে, একটা বিঘতপরিমাণ ইস্পাতের সরু ছাতার শিকের মত তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে আছে।

তখুনি ডাক্তারের ডাক পড়ল, কিন্তু ডাক্তার আসবার আগেই লাহিড়ী মশাইয়ের মৃত্যু ঘটল। রাজবাড়ির ডাক্তার অমিয় সোম কিছুই করতে পারলেন না। তীব্র যন্ত্রণায় লাহিড়ীর সমগ্র দেহটা বারকয়েক আক্ষেপ করে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সমগ্র মুখখানা যেন নীলাভ বিকৃত হয়ে গেছে। ডাঃ সোম বললেন, তীরের ফলার সঙ্গে কোন সাংঘাতিক বিষ মাখিয়ে, সেই তীর বিদ্ধ করে হতভাগ্য লাহিড়ীর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

সংবাদটা পেতে সুব্রতর দেরি হল না। শরীরটা একটু অসুস্থ থাকায় সুব্রত সেদিন আর হারাধনের ওখানে যায়নি। খাওয়াদাওয়ার পর শয্যায় শুয়ে একখানি ইংরেজী উপন্যাস পড়ছিল। পুরাতন রাজবাড়ি থেকে নতুন রাজবাড়িও তেমন বিশেষ দূর নয়। লাহিড়ীর আর্ত চিৎকার সুব্রতরও কানে গিয়েছিল। অকুস্থানে এসে দেখলে, রাজাবাহাদুর যেন কেমন হয়ে গেছেন। এ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! একেবারে বলতে গেলে তাঁরই প্রাসাদের মধ্যে খুন!

সুব্রতকে আসতে দেখে রাজাবাহাদুর ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেন, এই যে কল্যাণবাবু, আসুন। এই দেখুন কী ভয়ানক ব্যাপার!

কি হয়েছে ?

লাহিড়ী খুন হয়েছে।

খুন হয়েছে ? সে কি !

হ্যাঁ দেখুন না, তাকে নাকি বিষাক্ত তীর দিয়ে কে মেরেছে।

বিষের তীর !

হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না কল্যাণবাবু। এত রাত্রে কেনই বা লাহিড়ী প্রাসাদে এসেছিল, আর প্রাসাদের মধ্যেই বা কে তাকে এইভাবে নৃশংস ভাবে খুন করলে !

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভূপতিত লাহিড়ীর মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

ডান পাশ কাত হয়ে ধনুকের মত বেঁকে লাহিড়ীর প্রাণহীন মৃতদেহটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। বাঁ দিককার বুকে তখনও তীরের খানিকটা ফলা বিদ্ধ হওয়ার পর বের হয়ে আছে। ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা গায়ের জামাটা সিক্ত করে শান-বাঁধানো চত্বরের ওপরে এসে পড়েছে। মুখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে লোকটা। চোখমুখে এখনও তার সুস্পষ্ট আভাস।

মৃত্যুর পূর্বের তীব্র যাতনার আক্ষেপে বোধ হয় দু'হাতের আঙুলগুলো দুমড়ে আছে —বীভৎস মৃত্যু !···

কিন্তু সুব্রত ভাবছিল, লাহিড়ীও তাহলে নিহত হল ! যে নাটক সে সুহাস মল্লিকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছিল ভেবেছিল, আবার শুরু হল কি নতুন করে অন্য একটা অধ্যায় ?

কে জানত লাহিড়ীর গোনা দিন এত কাছে এসে গিয়েছিল ! আকস্মিক ভাবে ঘটনার স্রোত যে এই ভাবে মোড় নেবে, কয়েক মুহূর্ত আগেও সুব্রত কি তা ভেবেছিল !

এ শুধু অভাবনীয় নয়, আকস্মিক।

তার সাজানো দাবার 'ছক' সহসা যেন অপমৃত্যুর অদৃশ্য হাতের ধাক্কা লেগে ওলট-পালট হয়ে গেল।

এটা সেই গত ৩১শে মে সুহাস মল্লিকের দেহে যে হত্যাবীজ ছড়ানো হয়েছিল, তারই বিষক্রিয়া, না এ আবার এক নতুন নাটক শুরু হল !

সহসা রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে সুব্রত যেন চমকে জেগে ওঠে।

এখন আমি কি করি বলুন তো কল্যাণবাবু ? অসহায় বিপর্যস্তের মত রাজাবাহাদুর সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

সর্বপ্রথম থানায় একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন, থানার লোক এসে মৃতদেহ না দেখা পর্যন্ত, মৃতদেহ ওখান হতে নড়ানো যাবে না।

অ্যাঁ! আবার সেই থানা-পুলিস! রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে ভয়মিশ্রিত উৎকণ্ঠা, কিন্তু কেন? কি তার প্রয়োজন?

বুঝতে পারছেন না এ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, খুন! পুলিস কেস!

আবার সেই পুলিস কেস! তাহলে কি হবে?

আপনি স্থির হয়ে বসুন, আমিই থানায় খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

সুব্রত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রায়পুরের থানা-অফিসার বিকাশ সান্যালকে সুব্রত ভাল ভাবেই চেনে। এবং এ কথাও বিকাশবাবু জানেন, কেন সুব্রত কল্যাণ রায়ের ছদ্মবেশে রায়পুরের রাজবাটিতে এসে আবির্ভূত হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে সুব্রত বিকাশবাবুর সঙ্গে গোপনে একদিন দেখা-সাক্ষাৎ করে আলাপ-পরিচয় করে এসেছে।

সুব্রতর চেষ্টাতেই তখুনি সান্যালের ওখানে সংবাদ পাঠানো হল রাজবাড়ির একজন পেয়াদাকে দিয়ে।

লোকজনের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। ইতিমধ্যেই লাহিড়ী মশাইয়ের মৃত্যুসংবাদটা আগুনের মতই প্রাসাদের বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই উৎসুক ভাবে নানা প্রশ্ন একে ওকে জিজ্ঞাসা করছে।

সকলে যখন নানা আলোচনায় ব্যস্ত, ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে সুব্রত গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল কিছুক্ষণের জন্য। নূতন প্রাসাদ হতে পুরাতন প্রাসাদ মিনিট চারেকের পথ হবে মাত্র। সুব্রত জোর পায়ে হেঁটে পুরাতন প্রাসাদে লাহিড়ী মশাইয়ের বাসভবনে এসে হাজির হল।

পুরাতন প্রাসাদের দক্ষিণ অংশে, উপরে ও নীচে গোটা চারেক ঘর নিয়ে লাহিড়ী থাকত।

লোকজনের মধ্যে একটি ভৃত্য ও একটি রাঁধুনী বামুন।

তারাও গোলমাল শুনে অরক্ষিত অবস্থাতেই বাড়ি ফেলে রেখে নতুন প্রাসাদের দিকে ছুটে চলে গেছে ব্যাপার কি জানবার জন্যে।

লাহিড়ীর বাড়িটা অন্ধকার। সব আলোই নেভানো। কেবল বাইরের বারান্দায় একটা হ্যারিকেন দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।

সুব্রত দ্রুতপদে খোলা দরজাপথে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালাতেই, চোখে পড়ে নীচের সুসজ্জিত বাইরের ঘরটি।

তারই পাশ দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি। মুহূর্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করে সুব্রত অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

পাশাপাশি দুটো ঘর, সামনে ছোট একফালি বারান্দা।

কয়েকটি ফুলের টব।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। নিঝুম অন্ধকারে চারিদিক যেন থমথম করছে।

টর্চ বাতি জ্বালিয়ে সুব্রত দেখলে, সামনের দরজার গায়ে একটি তালা ঝুলছে, অন্য দরজাটি পরীক্ষা করে দেখলে, সেটি ভিতর হতে বন্ধ। লোকটা সাবধানী ছিল, সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই। কিন্তু এখন উপায় ? যেমন করেই হোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ তাকে করতেই হবে আজকের রাত্রেই এবং এই মুহূর্তেই।

সুব্রত তালাটা টেনে দেখলে, ভাল বিলিতি তালা, সহজে ভাঙা যাবে না। বাড়িতে গিয়ে তালা খোলবার যন্ত্রগুলো আনা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

সুব্রতর কোয়ার্টার এখান হতে যদিও খুব বেশী দূর নয়, মিনিট তিন-চারের রাস্তা, কিন্তু তা ভিন্ন আর উপায়ই বা কি !

সুব্রত আবার ছুটল নিজের বাসার দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই তালা খোলবার যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এল ; কতকগুলো সরু মোটা বাঁকানো ও সোজা লোহার শিক।

মিনিট পাঁচ-সাতের চেষ্টায় তালাটা খুলে গেল।

আনন্দে সুব্রতর চোখের তারা দুটো অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। দরজাটা খুলে এবারে সুব্রত ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। বেশ প্রশস্ত ঘরখানি। আসবাবপত্র ঘরের মধ্যে সামান্যই, একটা ফোলডিং ক্যাম্পখাট, একটি বইয়ের আলমারি ও কয়েকটি ছোট-বড় বাক্স। সবার উপরে একটি অ্যাটাচি কেস।

প্রথমেই সুব্রত অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেললে। কতকগুলো কাগজপত্র, হিসাবের খাতা, ক্যাশমেমো ও ব্যাঙ্কের চেকবই।

অ্যাটাচি কেসটা একপাশে সরিয়ে রেখে, সুব্রত একটা স্টীল ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে ফেললে, বিশেষ কিছুই তার মধ্যে নেই, কতকগুলো জামাকাপড়। আর একটা ট্রাঙ্কও খুললে, তার মধ্যেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে সুব্রত উঠে দাঁড়াল।. পরিশ্রমে কপালের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে তখন।

অ্যাটাচি কেস থেকে কতকগুলো কাগজপত্র ও হিসাবের খাতাটা পকেটে ভরে বাকি সব জিনিসপত্র সুব্রত সেই অবস্থায়ই ফেলে, যেমন ঘর হতে বের হতে যাবে, হঠাৎ সামনের ছাদের দিকে নজর পড়তে ও চমকে দাঁড়িয়ে গেল, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত ঘরের সম্মুখের

ছাদ দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে।

সুব্রত চট করে হাতের টর্চ বাতিটা নিভিয়ে দিল। এবং অন্ধকারে ঘরের জানলার পিছনে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

কে ঐ ছায়ামূর্তি!

কেউ কি অলক্ষ্যে তার সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে! স্তিমিত তারার আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকাল।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের একটা অংশকে বিভিন্ন কর্মচারীদের বাসের ও অফিসের জন্য ছোট ছোট ফ্ল্যাটের মত অংশে বিভক্ত করা হয়েছে পার্টিশন তুলে। তারই এক অংশ হতে অন্য অংশে ছাদ দিয়ে যাতায়াত করা যায়। যদিচ বিভিন্ন অংশের মধ্যবর্তী দরজাগুলো বন্ধ থাকে প্রায় সর্বদাই।

ব্যবধান মাত্র একমানুষ সমান প্রাচীরের। কারও পক্ষে সেটা পার হয়ে আসা এমন কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

কিন্তু ছাদ থেকে লাহিড়ীর ঘরে প্রবেশের দরজাটা বন্ধ। ছায়ামূর্তি যেই হোক, এ ঘরের মধ্যে এসে সহসা প্রবেশ করতে পারবে না। সম্ভবও নয়।

হঠাৎ সুব্রত লক্ষ্য করলে ছায়ামূর্তি ছাদের বাঁ দিকে সরে গেল, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। লোকটার চলার ধরন সুব্রতর যেন চেনা-চেনা বলেই মনে হয়। কিন্তু সামান্য আলোয় সুব্রত ভাল করে বুঝে উঠতে পারে না।

এদিকে এখানে আর বেশী দেরী করা মোটেই উচিত নয়, এতক্ষণে হয়ত থানা থেকে বিকাশবাবুও এসে গেছেন ঘটনাস্থলে, এখুনি হয়তো তার খোঁজ পড়বে।

সুব্রত ত্বরিত পদে নেমে এল।

॥ বারো ॥

নিশানাথ

অত্যন্ত দ্রুতপদে পথটা অতিক্রম করে সুব্রত যখন প্রাসাদে এসে পৌঁছল, দেখলে তার অনুমানই ঠিক। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে বিকাশ সান্যালের আবির্ভাব হয়েছে এবং তদন্তও শুরু হয়ে গেছে হত্যা-ব্যাপারের, তবে সেজন্য সুব্রতর খোঁজ এখনও পড়েনি।

বিকাশ মৃতদেহ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াতেই সুব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কি একটা কথা সুব্রতকে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ সুব্রতর চোখের ইঙ্গিতে নিজেকে সে

সংযত করে নিল।

কতক্ষণ হল এ ব্যাপার হয়েছে? বিকাশ রাজাবাহাদুরকেই প্রশ্ন করলে।

তা ঘণ্টা দুই হবে, কি বলেন কল্যাণবাবু! রাজবাহাদুর সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন।

তা হবে বৈকি, সুব্রত সায় দিল।

মৃতদেহ যেভাবে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয়, উনি প্রাসাদের দিকেই যাচ্ছিলেন। রাত্রি এখন প্রায় একটা হবে। ঘণ্টা দুই আগে যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে, তাহলে তখন বোধ করি রাত্রি এগারটা আন্দাজই হবে। তা এত রাত্রে উনি প্রাসাদের অন্দরমহলেই বা যাচ্ছিলেন কেন? উনি কি আপনারই কোন কাজে বা আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন রাজাবাহাদুর?

না, আমিও আশ্চর্য হচ্ছি, হঠাৎ উনি এত রাত্রে এদিকে আসছিলেন কেন?

এ সময় সুব্রত সহসা একটা চাল দেয়, বলে ওঠে, শুনেছি প্রায়ই রাত্রে উনি নাকি আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন, দাবা খেলতেই আসছিলেন না তো?

কথাটা ঠিকই তবে আজ আমার শরীর ভাল না থাকায়, সন্ধ্যার আগেই বলে দিয়েছিলাম, আজ আর দাবা খেলা হবে না। বললেন রাজাবাহাদুর।

সতীনাথবাবুর বাড়ির চাকরদের একবার ডাকাতে পারেন রাজাবাহাদুর? বললে বিকাশ।

আমি এখুনি তাদের ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বলে রাজাবাহাদুর চিৎকার করে ডাকলেন, শম্ভু, এই শম্ভু—

রাজবাড়ির পুরাতন চাকর শম্ভু, বর্তমানে শম্ভু রাজাবাহাদুরের খাস ভৃত্য, রাজাবাহাদুরের ডাকে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। যথেষ্ট বয়েস হলেও শরীরের বাঁধুনী খুব চমৎকার শম্ভুর।

এই এখুনি একবার কাউকে বলে দে, ম্যানেজারবাবুর বাসা থেকে বংশী আর জগন্নাথকে ডেকে আনুক, বলে যেন আমি ডাকছি।

কিন্তু শম্ভুর আর তাদের ডাকতে যেতে হল না, ভিড়ের মধ্য হতে কে একজন বলে উঠল, রাজাবাবু, তারা এখানেই আছে। এই বংশী, যা রাজাবাবু ডাকছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মিলে একপ্রকার ঠেলেই লাহিড়ীর ভৃত্য বংশীকে সামনের দিকে এগিয়ে দিল।

লাহিড়ীর বংশীই ছিল একমাত্র ভৃত্য ও জগন্নাথ উৎকলবাসী রসুয়ে বামুন। বংশীর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, জাতিতে সদ্‌গোপ। অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা, চকচকে

কালো গায়ের রং, মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা, তার প্রায় তিনের-চার অংশ পেকে সাদা হয়ে গেছে।

তোর নাম কি রে? বিকাশ প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে বংশী কর্তা, বংশী কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দেয় কোনমতে, একটা বড় রকমের ঢোঁক গিলে। লোকটা যে ভয় পেয়েছে তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। সেই কারণেই হয়ত সে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করতেই চেয়েছিল। প্রভুর আকস্মিক মৃত্যুতে সে রীতিমত ভয় তো পেয়েই ছিল, হকচকিয়েও গিয়েছিল।

বাসা থেকেই গোলমাল শুনতে পেয়েছিস?

হ্যাঁ বাবু।

কতদিন বাবুর বাসায় কাজ করছিস?

প্রায় দেড় বছর হবে বাবু।

এখানে তুই কতক্ষণ এসেছিস?

আজ্ঞে বাবু গোলমাল শুনেই তো ছুটে এলাম।

তাহলে বাসায়ই ছিলি বল্?

হ্যাঁ বাবু।

তোর বাবু কতক্ষণ বাসা ছেড়ে এসেছে বলতে পারিস?

এই তো সবে এক ঘণ্টাও হবে না, কে একটা লোক একটা চিঠি নিয়ে এল। বাবু বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন, খাবার হয়ে গেছে, খেতে আসবেন, এমন সময় চিঠি পেয়ে আমাকে বললেন, বংশী, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি, ঠাকুরকে খাবার এখন দিতে বারণ করে দে। ফিরে এসে খাব'খন।

কে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল? কোথা থেকেই বা চিঠি নিয়ে এল জানিস কিছু? বাবু বলেননি, কোথা যাচ্ছেন?

আজ্ঞে না, শুধু বলে এলেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

যে লোকটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তাকে তুই ভাল করে দেখেছিলি? চিনতে পেরেছিলি লোকটাকে?

আজ্ঞে না কর্তা, তাকে আমি আগে কখনও দেখিনি।

লোকটা লম্বা না বেঁটে? রোগা না মোটা? দেখতে কেমন?

আজ্ঞে লোকটার মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধা ছিল, লম্বাই হবে, হাতে একটা টর্চবাতি ছিল। তার মুখ আমি দেখিনি।

লোকটা চিঠিটা দিয়েই চলে গেল, না সেখানেই দাঁড়িয়েছিল?

আজ্ঞে আমি বারান্দার অন্য ধারে বসেছিলাম, লোকটা চিঠি দিয়েই চলে গেল।

কোন্ দিকে গেল?

আজ্ঞে বাড়ির বাইরে চলে গেল, দেখতে পাইনি কোন্ দিকে গেল তারপর।

লোকটা চলে যাওয়ার পরই তোর বাবু চলে আসেন?

হ্যাঁ, ভিতরে গিয়ে একটা জামা গায়ে দিয়ে বের হয়ে এলেন।

বাবু বাড়ি থেকে বের হয়ে আসবার কতক্ষণ পরে তুই গোলমাল শুনতে পাস?

তা পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই হবে হুজুর।

এর পর বিকাশ মৃতদেহের জামার পকেটগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। লাহিড়ীর পরিধানে ধুতি ও একটা সাধারণ সিল্কের পাঞ্জাবি। কিন্তু পাঞ্জাবির কোন পকেট থেকেই কোন কাগজ বা চিঠিপত্র পাওয়া গেল না, একটা সাদা ক্যালিকো মিলের রুমাল, একটা চাবির রিং ও পার্স পাওয়া গেল মাত্র, কিন্তু সেগুলো হতে কোন সূত্রই পাওয়া যায় না।

রাজাবাহাদুর বললেন, দারোগাবাবু, এখানে এত লোকজনের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে এদের জেরা না করে, আমার খাস কামরায় চলুন না? সেখানে বসেই যাকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় করবেন।

সেই ভাল কথা, চলুন।

এর পর সকলে রাজাবাহাদুরের খাস কামরায় এসে প্রবেশ করল, সুব্রতও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বিকাশ একটা আরাম-কেদারায় বেশ জাঁকিয়ে বসল। তারপর বললে, রাজাবাহাদুর, সর্বাগ্রে আপনার সঙ্গেই আমার কয়েকটা কথা আছে। তারপর যাকে যা জিজ্ঞাসা করবার করব'খন।

রাজাবাহাদুর ক্লান্ত স্বরে বললেন, বেশ। বলুন কি জানতে চান?

আপনার ম্যানেজার ও সেক্রেটারী লাহিড়ীর মৃত্যু-ব্যাপারটা যে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন! এইমাত্র অল্প কিছুদিন হবে আমার এখানে বদলি হয়ে আসবার আগে আপনাদের পরিবারের মধ্যে একটা বিশ্রী হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। যার ফলে আপনাদের কম ধকল সহ্য করতে হয়নি, অর্থব্যয়ও কম হয়নি, আবার আজকের এই ব্যাপার!

বিকাশবাবুর কথা শেষ হল না, সহসা যেন প্রচণ্ড একটা অট্টহাসির শব্দ, নিশীথের নিথর স্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—হাঃ হাঃ হাঃ···!

ও কি! অমন করে হাসলে কে? চমকে উঠে প্রশ্ন করলে বিকাশ। প্রথমটায়

রাজাবাহাদুরও যেন একটু চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু চট্‌ করে সামলে নিলেন যেন, বললেন, আমার দূরসম্পর্কীয় খুড়ো নিশানাথ মল্লিক। শোলপুর স্টেটে চিত্রকর ছিলেন, মাস পাঁচেক হয় মাথার গোলমাল হওয়ায় চাকুরি গেছে। বুড়ো মানুষ, বিকৃতমস্তিষ্ক, অথর্ব, আমার এখানে এনে রেখেছি। সংসারে ওঁর আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বিয়ে-থাও করেননি। অকারণ অমনি হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠা, চিৎকার করা, আবোল-তাবোল বকা…এই করছেন আর কি।

এরপর ঘরের সকলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন চুপ করে রইল, কারও মুখেই কথা নেই।

বিকাশই সর্বপ্রথমে আবার ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, আচ্ছা রাজাবাহাদুর, বলতে পারেন, সর্বপ্রথমে কে লাহিড়ীর মৃতদেহ দেখতে পায়?

তাও ঠিক বলতে পারি না, তবে আমি পড়াশুনা সেরে বিছানায় শুতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেয়েই ছুটে জানলার সামনে যাই। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখলাম, (কেননা আমার ঘরের জানলা থেকে সুস্পষ্টভাবে অন্দর ও বহির্মহলের মধ্যকার সংযোগস্থল, ঐ আঙিনাটা দেখা যায়) কে একজন আঙিনায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। তখুনি আমি ছুটে নীচে যাই। আমার পৌঁছবার আগেই বাড়ির অন্যান্য ভৃত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই চিৎকার শুনে সেখানে ততক্ষণে এসে জুটেছে গিয়ে দেখি।

আপনি যখন আপনার শয়নকক্ষের জানলাপথে নীচের দিকে তাকান, তখন সেখানে আর কাউকেই দেখতে পাননি?

রাজাবাহাদুর সুস্পষ্ট স্বরে বললেন, না।

এমন সময় অতর্কিত একটা কণ্ঠস্বর শুনে, সকলেই যুগপৎ সামনের খোলা দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

মিথ্যে কথা! আমি দেখেছি, সেই কালো শয়তানটা। কিন্তু এবারে আর তার হাতে ছাতা ছিল না, একটা মস্ত বড় টর্চবাতি ছিল…

একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুদর্শন পুরুষ, খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে এসে ইতি-মধ্যে কখন দাঁড়িয়েছেন, এ তাঁরই কণ্ঠস্বর। আগন্তুকের বয়স প্রায় পঞ্চাশের উর্ধ্বেই হবে। মাথায় ঢেউ-খেলানো শ্বেতশুভ্র বাবরি চুল, মুখের ওপরে বার্ধক্যের বলিরেখা সুস্পষ্টভাবে রেখাঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আগন্তুক যে যৌবনে একদিন অসাধারণ বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, বার্ধক্যেও তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট কম হয় না। পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও গায়ে সেরওয়ানী, পায়ে রবারের চপ্পল। তাই কখন যে তিনি নিঃশব্দে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পায়নি।

রাজাবাহাদুর দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন, এ কি কাকা, আপনি এখানে কেন ?

কে বিনু ? এখনও তুমি এ বাড়িতে আছ ? পালিয়ে যাও ! পালিয়ে যাও ! এ বাড়িতে সর্বত্র বিষের ধোঁয়া ! বিষে জর্জরিত হয়ে মরবে !

চলুন কাকা, আপনার ঘরে চলুন।

কোথায় যাব, ঘরে ? না না, সেখানেও মৃত্যু ওৎ পেতে আছে, মৃত্যু-বিষ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। That child of that past, again he started his old game. ভুলে গেলে এরই মধ্যে সেই শয়তান ছোটলোকটিকে ?…মনে পড়ছে না তোমার ? বলতে বলতে বৃদ্ধ একবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, কতকটা যেন স্বগত-ভাবেই বললেন, এরা কারা বিনু ? এরা এখানে কি চায় ? আমি একটা চমৎকার অয়েল পেনটিং করছি, ছবিটা প্রায় শেষ হয়ে এল। একটি তের-চোদ্দ বছরের ছোট কিশোর বালক, শয়তানীতে সে এর মধ্যেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। উঃ, কি শয়তান ! ধনুর্বান খেলায় ছলে, খেলার তীরের ফলার সঙ্গে কুঁচ ফলের বিষ মাখিয়ে, তারই একজন খেলার সাথীকে মারতে গেল। কিন্তু ভগবানের মার যাবে কোথায় ? সব উল্টে দিল। বিষ মাখানো তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগল গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় বল তো, কিছু দূরে মাঠের মধ্যে একটা গরু ঘাস খাচ্ছিল, তারই গায়ে। ছেলেটা বেঁচে গেল, কিন্তু দিন-দুই বাদে গরুটা মরে গেল। কিন্তু তুমি কি সেই মস্তবড় টর্চ হাতে কালো পোশাক পরা লোকটাকে দেখতে পাওনি বিনু ? ছায়ার মতই মিলিয়ে গেল, আমি দেখেছি তাকে। কেউ না দেখতে পেলেও আমি দেখেছি।…হ্যাঁ, আমি দেখেছি সেই শয়তানটাকে !

আঃ কাকা, ঘরে চলুন, অনেক রাত্রি হয়েছে, চলুন এবারে একটু ঘুমোবেন। রাজাবাহাদুর যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন বোঝা যায়।

রাজবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ সোম পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার, এঁকে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা কর।

ডাঃ সোম এগিয়ে এলেন, ধীর সংযত কণ্ঠে ডাকলেন, মিঃ মল্লিক !

সুব্রত অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল আগন্তুক আর কেউ নয়, সুবিনয় মল্লিক বর্ণিত তাঁর বিকৃতমস্তিষ্ক দূরসম্পর্কীয় খুড়ো, আর্টিস্ট নিশানাথ। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে নিশানাথের কথাগুলো শুনছিল। সত্যিই কি নিশানাথের কথাগুলো একেবারে স্রেফ প্রলাপোক্তি ! মনের মধ্যেই যেন একটা সংশয় জাগছে। কিছুদিন আগে জাস্টিস্ মৈত্রের বাড়িতে বসে, রায়পুর মার্ডার কেসের প্রসিডিংস পড়তে পড়তে কয়েকটা লাইন সহসা যেন মনের পাতায় স্মৃতির বিদ্যুতালোক ফেলে যায়, কালো ছাতাওয়ালা সেই কালো লোকটা !

॥ তের ॥

তারিণী, মহেশ ও সুবোধ

ডাঃ সোম ও রাজাবাহাদুর দুজনে মিলে, অনেক কষ্টে একপ্রকার যেন জোর করেই নিশানাথকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেলেন।

নিশানাথ মৃদু অস্পষ্ট আপত্তি জানাতে জানাতে, ওদের সঙ্গে যেতে যেন কতকটা বাধ্যই হলেন। তাঁর মৃদু আপত্তি তখনও শোনা যাচ্ছিল, খুঁজে দেখ বিনু! খুঁজে দেখ! ভিতর থেকে যেমন করে হোক শয়তানটাকে খুঁজে বের কর। খুঁজে দেখ, খুঁজলেই পাবে। সুহাস গেছে, কে বলতে পারে এবার হয়ত তোমারই পালা। অভিশাপ! অভিশাপ! মৃত রত্নেশ্বর মল্লিকের অভিশাপ! দুধ কলা দিয়ে তিনি কাল-সাপ পুষেছিলেন, কেউ থাকবে না! রাবণের বংশের মতই এ একেবারে নির্বংশ হয়ে যাবে রে! মনে করে দেখ রামায়ণে সেই দশাননের ক্ষেদোক্তি, এক লক্ষ পুত্র মোর, সোয়া লক্ষ নাতি, কেহ না রহিল মোর বংশে দিতে বাতি।...ক্রমে নিশানাথের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে একসময় আর শোনা গেল না।

ঘরের মধ্যে সব কটি প্রাণীই যেন স্তব্ধ অনড় হয়ে গেছে। ছুঁচ পতনের শব্দও হয়ত শোনা যাবে। নিশানাথের বিলীয়মান কথার রেশ যেন তখনও বাতাসে ভেসে আসছে করুণ মর্মস্পর্শী।

ঢং ঢং করে রাত্রি তিনটে ঘোষিত হল ঘরের দামী সুদৃশ্য ওয়াল-ক্লকটায়।

চমকে সুব্রত মুখ তুলে তাকাল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে রাত্রিশেষের দিকে। ফাল্গুনের ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা বাতায়নপথে রাত্রিশেষের আভাস জানিয়ে গেল। সহসা সুব্রতর শরীরটা যেন কেমন সিরসির করে ওঠে। বাইরের খোলা আঙিনার ওপরে লাহিড়ীর মৃতদেহটা এখনও তেমনই পড়ে আছে। ডাঃ সোম ও রাজাবাহাদুর হয়ত নিশানাথকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন। রায়পুরের প্রাসাদটা যেন একটা রহস্যের খাসমহল হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যি। চারদিকে এর মৃত্যুর বীজ ছড়ানো।

বিকাশ খস্‌খস্‌ করে কাগজের ওপরে বর্তমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে কি যেন একমনে লিখে চলেছে। হয়ত এদের জবানবন্দি। রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষটা একবার দেখা দরকার। যে লোকটা লাহিড়ীর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাই বা কে? কেই বা চিঠি দিতে গিয়েছিল? আর চিঠিতেই বা কি লেখা ছিল?

তাছাড়া এত রাত্রে লাহিড়ী প্রাসাদের দিকেই বা আসছিল কেন? তবে কি

রাজবাড়ি থেকেই কেউ তাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল? হয়ত তাই। আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাটিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হচ্ছে যেন লাহিড়ীর হত্যার ব্যাপারটা আগে থেকে একটা প্ল্যানমাফিক ঘটানো হয়েছে, আকস্মিক মোটেই নয়। লাহিড়ীকে চিঠি লিখে বাড়ি থেকে সরিয়ে এনে তারপর হত্যা করা হয়েছে। হয়ত চিঠিটা লাহিড়ীর পকেটে ছিল। হত্যা করবার পর হত্যাকারী নিশ্চয়ই চিঠিটা সরিয়ে ফেলেছে, অন্যতম নির্ভুল প্রমাণ ছিল হয়ত ঐ চিঠিখানিই। বোকার মত সে ফেলেই বা যাবে কেন? হত্যাকারী অত্যন্ত চালাক ও ক্ষিপ্র, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। হত্যার কোন সূত্রই সে পিছনে ফেলে যায়নি। নিঃশব্দে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে আত্মগোপন করেছে হত্যার পর।

ডাঃ সোম ও রাজাবাহাদুর ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

বিকাশের নোট লেখা বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াল, আসুন রাজাবাহাদুর। এবারে আমি এখানকার অন্যান্য সবাইকে প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ তো। করুন কাকে কি জিজ্ঞাসা করতে চান! রাজাবাহাদুর বললেন।

তাহলে আপনি নিজে ও তারিণী, মহেশ ও সুবোধ বাদে সকলকে আপাততঃ যেতে বলুন। স্টেটের তহশীলদার তারিণী চক্রবর্তী, খাজাঞ্চী মহেশ সামন্ত, সরকার সুবোধ মণ্ডল, সুব্রত, পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার সোম ও রাজাবাহাদুর বাদে বিকাশবাবুর নির্দেশমত তখন অন্যান্য সকলে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আমি এক-একজন করে প্রশ্ন করব, সে বাদে অন্য কেউ আর এখানে থাকবে না। বিকাশ বললে।

প্রথমেই ডাক পড়ল, তারিণী চক্রবর্তীর।

বসুন চক্রবর্তী মশাই। আপনিও চিৎকারটা শুনেছিলেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

আপনি চিৎকারটা যখন শুনতে পান, তখন কোথায় ছিলেন?

বছর প্রায় শেষ হয়ে এল, খাজনাপত্র আদায় হচ্ছে, সেই সব খাতাপত্র লেখা ও দেখাশুনা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ চিৎকার শুনে চমকে উঠি। খাজাঞ্চীঘরের সামনে যে টানা বারান্দা আছে, তার শেষ প্রান্তে দরজা পার হলে তবে প্রাসাদের ভেতরের আঙিনায় যাওয়া যায়। মনে হল যেন অন্দরমহলের দিক থেকেই শব্দটা এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি সেই দিকেই ছুটে যাই।

তারপর?

কিন্তু গিয়ে দেখি বহির্মহল থেকে অন্দরমহলে যাবার দরজাটা ভিতরমহলের দিক থেকে বন্ধ।

দরজাটা রাত্রে কি বন্ধই থাকে ?

হ্যাঁ। তবে রাত্রি বারটার পর দরজাটা বন্ধ করা হয়, ভিতরের দিক থেকে। অন্দর-মহলের দারোয়ান ছোট্টু সিং রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু চিৎকার যখন আপনি শুনতে পান, রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে, দরজা তখন তো তাহলে বন্ধ থাকার কথা নয় ?

না, তবে যদি ছোট্টু সিং আগেই আজ রাত্রে দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাকে তো বলতে পারি না, মাঝে মাঝে বারটার আগেও দরজা বন্ধ করা হয়।

দরজাটা বন্ধ দেখে আপনি কি করলেন ?

দরজাটা জোরে দু'চার ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

ছোট্টু সিংই খুলে দিয়েছিল বোধ হয় ?

না, দরজা যে কে খুলে দিয়েছিল তা আমি জানি না, কারণ দরজা খোলার পর কাউকেই আমি দেখতে পাইনি ভিতরের দিকে।

আশ্চর্য ! ছোট্টু সিংকেও নয় ?

না।

ভিতরের দিকে ঢুকে আপনি কি দেখলেন ?

প্রথমটা কিছুই দেখতে পাইনি, তারপর ভাল করে দেখতে নজরে পড়ল, কে যেন একজন আঙিনার উপরে পড়ে আছে। ছুটে গেলাম, দেখেই চিনতে পারলাম আমাদের ম্যানেজারবাবু।

তিনি কি তখনও বেঁচে ছিলেন ?

না, মারা গিয়েছিলেন।

আর কেউ সেখানে ছিল সে সময় ?

না, আমিই বোধ হয় প্রথমে মৃতদেহ দেখতে পাই। আমার যাবার পরেই প্রথমে দারোয়ান ছোট্টু সিং, মহেশদা, সুবোধ মণ্ডল, তারপরই অন্দরমহল থেকে এলেন রাজাবাহাদুর।

তাহলে প্রথমে ভেতরে প্রবেশ করে আর কাউকেই দেখতে পাননি আপনি ?

না।

আচ্ছা আপনি যখন খাজাঞ্চীঘরে বসে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন, তখন কি কাউকে অন্দরমহলের দিকে যেতে দেখছিলেন ?

না। তাছাড়া তেমন নজর দিইনি, কারণ একটা হিসাবের গরমিল হচ্ছিল আজ কদিন হতে, সেটা নিয়েই আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

এ ছাড়া আর আপনার কিছু বলবার নেই চক্রবর্তী মশাই ?

না।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন, মহেশবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

একটু পরেই মহেশ সামন্ত এসে ঘরে প্রবেশ করল। মোটাসোটা, নাদুসনুদুস, গোলগাল চেহারার লোকটি। চোখে রূপোর ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোকের ঘন ঘন কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করা একটা অভ্যাসের মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে গেছে।

বসুন, আপনারই নাম মহেশ সামন্ত ?

আজ্ঞে হুজুর। মহেশ চশমাটা চোখ হতে নামিয়ে কাপড়ে সেটা ঘষতে লাগল। মহেশের বয়স যে চল্লিশের কোঠা পার হয়ে গেছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। মাথার সামনের দিকে এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তীর্ণ একখানি টাক, নাকটা ভোঁতা।

আপনার ঘরটি, মানে বহির্মহলে আপনি কোন্ ঘরে থাকেন ?

টানা বারান্দার একেবারে শেষের ঘরটিতে।

আপনি চিৎকার শুনেই বোধ হয় ঘর হতে বের হয়ে যান ?

আজ্ঞে আমি আমার ঘরের মধ্যে বসে আজকের সংবাদপত্রটা পড়ছিলাম, তখন বোধ করি রাত্রি পৌনে এগারটা আন্দাজ হবে। মনে হল, আমার ঘরের সামনেকার বারান্দা দিয়ে কে যেন দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেল। ভাবলাম প্রাসাদের কোন চাকরবাকর হবে। তারই মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ওই চিৎকার শুনেই বাইরে এসে দেখি, অন্দর-মহলে যাবার দরজাটা তারিণীদা ঠেলছেন। একটু ঠেলাঠেলি করতেই দরজাটা খুলে তারিণীদা ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

আপনার ঘর হতে অন্দরমহলে যাবার দরজাটা কতদূর ?

তা প্রায় পনের-কুড়ি হাত হবে হুজুর।

আপনিও তখন বুঝি তারিণীবাবুকে অনুসরণ করলেন ?

হ্যাঁ। আমার পিছনে পিছনে সুবোধবাবুও এসে গেছেন ততক্ষণে।

সুবোধবাবু কোন্ ঘরে থাকেন ?

আমার দুখানা ঘর আগে।

ভেতরে ঢুকে কি দেখলেন ?

দেখলাম, তারিণীদা, ছোট্টু সিং ও বাড়ির দু'চারজন চাকরবাকর আঙিনায় এসে জড় হয়েছে। ঐ সময় রাজাবাহাদুরও এলেন।

আপনি শুধু চিৎকারটা শোনবার মিনিট পাঁচ-সাত আগে কারও অন্দরের দিকে যাওয়ার পায়ের শব্দই পেয়েছিলেন, কারও বাইরের দিকে আসবার পায়ের শব্দ পাননি ?

না।

আচ্ছা, যে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন, নিশ্চয়ই জুতো পায়ে হাঁটার শব্দ ; অর্থাৎ যার হাঁটবার শব্দ শুনেছিলেন, তার পায়ে জুতো ছিল ?

হ্যাঁ।

বেশ মচ্‌মচ্‌ শব্দ ?

আজ্ঞে না, সাধারণ জুতোর শব্দ। তবে—মহেশ ইতস্ততঃ করতে থাকে।

তবে কি ? চুপ করলেন কেন, বলুন ?

জুতোর সোলে লোহার পেরেকের নাল বসানো থাকলে যেমন শব্দ হয়, অনেকটা সেই-রকম শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

মহেশবাবু, আপনার শ্রবণশক্তির আমি প্রশংসা করি।

মহেশের ঠোঁটের কোণায় বিনীত হাসির একটা স্ফুরণ দেখা দেয়। আবার সে চশমাটি নাকের ওপর হতে নামিয়ে খুব জোরে জোরে কাপড়ের কোঁচায় ঘষতে থাকে ঘন ঘন।

কতদিন আপনি এখানে কাজ করছেন সামন্ত মশাই ?

তা আজ প্রায় বিশ বছর হবে।

এরা তাহলে আপনার বহুকালের মনিব বলুন ?

আজ্ঞে। বড় রাজার পিতাঠাকুর রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিক বাহাদুরের সময় থেকেই এ বাড়িতে আমি কাজ করছি। কি জানেন দারোগা সাহেব, এ বংশে শনির দৃষ্টি লেগেছে!

কেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন সামন্ত মশায় ?

তাছাড়া আর কি বলুন ? দেখুন না—রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিক বাহাদুর, অমন মহাপ্রাণ, সদাশয় ব্যক্তি, তাঁর কিনা অপঘাতে মৃত্যু হল! তারপর এ-বাড়ির ভাগ্নে সুধীনের বাবা তাঁরও মৃত্যু তো একরকম অপঘাতে। আমাদের বড় রাজাবাহাদুর, তাঁরও কোথাও কিছু না, হঠাৎ বিকেলের দিকে জলখাবার খাবার পর অসুস্থ হলেন, মাঝরাত্রের দিকে মারা গেলেন, ডাক্তার বদ্যি কিছুই করতে পারলে না। তারপর সর্বশেষ ধরুন আমাদের ছোট কুমার, ঠিক যেন আচার-ব্যবহারে একেবারে রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের মতই হয়েছিলেন, তা তিনিও অপঘাতে মারা গেলেন। এখন টিমটিম করছেন সবেধন নীলমণি—আমাদের এই রাজাবাহাদুর। তা রাজবাড়ির মধ্যে যে ব্যাপার চলছে, ইনিও কতদিন টিকবেন কে জানে! তাই তো বলছিলাম এসব শনির দৃষ্টি ছাড়া আর কি!

আপনাদের বর্তমান রাজাবাহাদুর লোকটি কেমন ?

হুজুর মনিব! আমরা সাধারণ কর্মচারী মাত্র, ছোটর মুখে বড়র কথা শোভা পায়

না। তা ইনিও সদাশয়, মহানুভব বৈকি।

আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন। মণ্ডল মশাইকে দয়া করে একটিবারের জন্য এ ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।

সুবোধ মণ্ডল একটু পরেই এসে ঘরে প্রবেশ করল।

আসুন মণ্ডল মশাই, বসুন।

সুবোধ মণ্ডল লোকটি যেমন ঢ্যাঙা তেমনি রোগা। নাকটা ছুঁচলো, মুখটা সরু। দু'গালের হনু দুটি চামড়া ভেদ করে বিশ্রীভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে। উপরের পাটির সামনের প্রথম চারটি দাঁত উঁচু ও মোটা। লোকটা প্রস্থের অনুপাতে দৈর্ঘ্যে এত বেশী লম্বা যে, চলবার সময় মনে হয় যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কুঁজো হয়ে চলেছে। তার চলবার ধরন দেখে বোঝা যায়, লোকটার চলাটাও বিচিত্র—ঠিক যেন খরগোশের মত অতি ক্ষিপ্রগতিতে চলতে অভ্যস্ত ও পটু।

আমায় ডেকেছেন স্যার?

হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

বলুন না স্যার কি বলতে চান, দাঁড়িয়েই তো বেশ আছি, বসলে আমার কষ্ট হয়।

কেন?

সারাটা জীবনই তো ওর নাম কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গেল—তা ওর নাম কি, মনে করুন, ঐ দাঁড়ানোটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—তাছাড়া বয়স তো কম হল না, কোমরে একটু বাতেরও মত ধরেছে আজকাল, একটা বিড়ি খেতে পারি স্যার? অনেকক্ষণ ধোঁয়া না খেতে পেয়ে ওর নাম কি, পেট যেন ফেঁপে উঠেছে।

নিশ্চয় নিশ্চয়—খান না।

সুবোধ পকেট হতে একটা বিড়ি বের করে তাতে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। চোঁ চোঁ করে একটা তীব্র টান দিয়ে, একরাশ কটু ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আঃ! এবারে ওর নাম কি, করুন স্যার, কি জিজ্ঞাসা করতে চান।

আপনিও বোধ হয় প্রাসাদের বাইরেই থাকেন?

আজ্ঞে ওর নাম কি, সকলেই যখন বাইরে থাকেন, বাজার সরকার আমি···ঐ তারিণী খুড়োর ঘরটাতেই আমি থাকি।

চিৎকারটা আপনিও তাহলে শুনতে পেয়েছিলেন? আর এও হয়তো জানতে পেরেছেন, তারিণীবাবু কখন ঘর থেকে বের হয়ে যান?

তা পেরেছিলাম বৈকি। তবে ওর নাম কি, জানি না খুড়ো কখন ঘর হতে বের হয়ে যান। মানে টের পাইনি।

কেন, সে সময় আপনি কি করছিলেন ? মানে, জেগে না ঘুমিয়ে ?

বোধ হয় ওর নাম কি, ঘুমিয়েই ছিলাম।

বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলেন, এ কথার মানে ?

আজ্ঞে, ওর নাম কি, রাজবাড়ির বাজার সরকার আমি, আমার যে কখন জাগরণ কখন নিদ্রা আমি নিজেই টের পাই না, তবে ওর নাম কি, কেমন করে বলি বলুন স্যার, আমি ঘুমিয়েই ছিলাম না জেগেই ছিলাম। কারণ ঘুমোলেও আমাদের জেগে থাকতে হয়, জাগা অবস্থাতেও ঘুমিয়ে নিতে হয়। এই দেখুন না স্যার, ওর নাম কি, আজ প্রায় পনের বছর একাদিক্রমে এই রাজবাড়িতে বাজার সরকারের কাজ করে আসছি, শরীরটা ক্রমে শণের দড়ির মত পাকিয়ে যাচ্ছে, তবু ওর নাম কি, পনের বছর আগেকার সুবোধ, একান্ত সুবোধ বালকটির মত বাজার সরকারের পদেই রয়ে গেল। আমার ছোট্‌ঠাকুর্দা বলেন, সুবোধ আমাদের সেই সুবোধই আছে। কুড়ি টাকায় ঢুকেছিলাম, এখন সাকুল্যে পঁচিশে গিয়ে ঠেকেছে। তা ওর নাম কি, করছি কি বলুন!

বিকাশ বুঝতে পেরেছিল, লোকটা একটু বেশীই কথা বলে, এবং মনে মনে খুশি নয়। ক্রমাগত বাজার সরকারের পদে একাদিক্রমে পনের বৎসর তোষামোদ ও মিথ্যার কারবার করে করে, এখন যা বলে তার হয়তো ষোল আনাই মিথ্যে। এক্ষেত্রে এ লোকটাকে বেশী ঘাঁটিয়েও বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাই সে তাড়াতাড়ি সুবোধকে বিদায় দিল।

রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এল। পূর্বাকাশে রাত্রিশেষের বিলীয়মান আবছা অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে, অস্পষ্ট আলোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এর পর রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, লাশ স্থানীয় হাসপাতালের ময়নাঘরে ময়না-তদন্তের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করে, সেদিনকার মত বিকাশ রাজবাটী থেকে বিদায় নিল।

ফেরবার পথে বিকাশ ও সুব্রত একসঙ্গেই পথ অতিক্রম করছিল। সুব্রত বললে, চলুন বিকাশবাবু, রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এল, আমার ওখানে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। এবং চা খেতে খেতে জবানবন্দিতে কি জানতে পারলেন তা শোনা যাবে।

বেশ চলুন, বকবক করে করে গলাটাও শুকিয়ে গেছে, এক কাপ চা এ সময় তো দেবতার আশীর্বাদ! জবানবন্দিতে বিশেষ কিছু জানা গেছে বলে তো আমার মনে হয় না। সবই টুকে এনেছি, পড়ে দেখুন যদি কিছুর সন্ধান পান।

দুজনে এসে সুব্রতর বাসায় উপস্থিত হল, থাকহরিকে ডেকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে

সুব্রত বিকাশকে নিয়ে বারান্দায় দুটো চেয়ার পেতে বসল। রাত্রিশেষের বিলীয়মান তরল অন্ধকারে চারিদিক কেমন যেন স্বপ্নাতুর মনে হয়।

॥ চোদ্দ ॥

আরও সাংঘাতিক

গরম গরম চা পান করতে করতে সুব্রত গভীর মনোযোগের সঙ্গে গতরাত্রের ঘটনা সম্পর্কে বিকাশের নেওয়া জবানবন্দি ও অন্যান্য নোটগুলি পড়ছিল। বিকাশের একেবারে শতকরা নিরানব্বই জন 'দারোগাবাবু'র মত কেবল পকেট ভর্তির দিকেই নজরটা সীমাবদ্ধ নয়। বেশ কাজের লোক এবং একটা জটিল মামলার মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয়গুলো বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বেছে নেওয়ার একটা ন্যাক্ আছে বলতেই হবে। বিকাশের নেওয়া নোট ও জবানবন্দির কতকগুলো কথা সুব্রতর মনে যেন একটু নাড়া দিয়ে যায়। কথার পিঠে কথা হলেও, কথাগুলোর মধ্যে বেশ একটু গুরুত্ব আছে বলে যেন মনে হয়।

চা পান ও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চালাবার পর বিকাশ সুব্রতর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তখনকার মত। বলে গেল সন্ধ্যার দিকে আবার এদিকে আসবে। বিকাশের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সুব্রতও আর মুহূর্ত দেরি না করে গতরাত্রে লাহিড়ীর ঘর থেকে চুরি করে সংগৃহীত কাগজপত্রগুলো ও হিসাবের খাতাটা খুলে নিয়ে বসল।

কাগজপত্রগুলো, সাধারণ কয়েকটা 'ক্যাশ-মেমো'—সেগুলো পরীক্ষা করে তার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব পাওয়া গেল না। তবে তার মধ্যে গোটা দুই 'ইনভয়েস' ছিল,—৬০টা ড্রাই সেল ব্যাটারী (সাধারণ টর্চবাতির জন্য যা ব্যবহৃত হয়) কেনা হয়েছে, তারই ইনভয়েস। এতগুলো ব্যাটারী একসঙ্গে কেনবার লোকটার হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হয়েছিল? এক মাসের মধ্যে প্রায় ১২০টা ব্যাটারী কেনা হয়েছে।

যা হোক ক্যাশ মেমোগুলো পরীক্ষা করে হিসাবের খাতাটা সুব্রত খুললে। সাধারণ দৈনন্দিন হিসাব নয়, মাসিক মোটামুটি একটা আয় ও ব্যয়ের হিসাব মাত্র।

৫ই নভেম্বর : দু হাজার টাকা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে।

৭ই নভেম্বর : তারাপ্রসন্ন নামক কোন ব্যক্তির নামে দশ হাজার টাকা খরচ দেখান হয়েছে।

লোকটা কত মাইনে পেত সুব্রত তা জানে। মাসে মাত্র তিনশতো টাকা, ইদানীং

মাস দুই হবে চারশতো টাকা বেতন পাচ্ছিল। অথচ সুব্রত হারাধনের ওখানে শুনেছে, এখানে আসবার পূর্বে সতীনাথের সাংসারিক অবস্থা খুব খারাপই ছিল। ইদানীং এই কয়েক বৎসর চাকুরি করে সে কেমন করে এত টাকার মালিক হতে পারে? এর মধ্যে যে একটা গভীর রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে সে বিষয়েও কোন ভুল নেই। এসব ছাড়া দেখা যাচ্ছে, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কোন শ্রীপতি লাহিড়ীর নামে প্রতি মাসে ছ'শতো থেকে সাতশতো টাকা জমা দেখানো হয়েছে। এই শ্রীপতি লাহিড়ীই বা কে? এ কি লাহিড়ীর কোন আত্মীয়? না আগাগোড়া সমগ্র শ্রীপতির ব্যাপারটা একটা চোখে ধুলো দেবার ব্যাপার মাত্র!

কিরীটী ওকে ঠিকই লিখেছিল। সতীনাথ একটি গভীর জলের মাছ, তার প্রতি ভাল করে নজর রাখতে। কিন্তু সতীনাথের কর্মময় জীবনের ওপরে যে এত তাড়াতাড়ি যবনিকা নেমে আসবে তা সুব্রত স্বপ্নেও ভাবেনি। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই আকস্মিক ও অচিন্তনীয়। তারপর আরও একটা জিনিস ভাববার আছে। লাহিড়ীর এই হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে পূর্বতন সুহাসের হত্যা-ব্যাপারের কোন সংস্পর্শ বা যোগাযোগ আছে কি না। এটা সেই কয়েক মাস আগেকার পুরাতন ঘটনারই জের, না নতুন কোন হত্যা-ব্যাপার? রাজাবাহাদুরের কাছে জানা গেল ঐ নিশানাথ লোকটা বিকৃত মস্তিষ্ক একজন আর্টিস্ট। অথচ ওর কথা কালই সর্বপ্রথম সুব্রত জানতে পারল। ইতিপূর্বে ঘুণাক্ষরেও নিশানাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুব্রত জানতে পারেনি। গতরাত্রের ব্যাপার দেখে মনে হল, নিশানাথ লোকটিকে রাজাবাহাদুর সযত্নে আড়াল করে যেন রাখতে চান। সেই কারণেই হয়ত তাড়াতাড়ি তাকে অন্য সকলের সামনে থেকে সরাবার জন্য তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কেন? লোকটা যদি সত্যিই বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়, তবে তাকে এত ভয়ই বা কেন? তারপর নিশানাথের কথাগুলো! সেগুলো কি নিছক প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর সত্যিই কিছু নয়?

এখন পর্যন্ত সুব্রত নৃসিংহ গ্রামে একটিবার গিয়ে উঠতে পারেনি। তারপর সাঁওতাল প্রজা। হ্যাঁ, শুনেছে বটে ও, নৃসিংহ গ্রামের অর্ধেকের বেশীর ভাগ প্রজাই সাঁওতাল ও বাউড়ী জাতি, এখানেও নদীর ধারে রাজাদের প্রায় একশত সাঁওতাল প্রজা আছে। এখানে আসবার পর, কাজ করবার কোন সূত্রই আজ পর্যন্ত সুব্রত পায়নি। অথচ প্রায় দেড় মাস হ'তে চলল এখানে সে এসেছে।

ঐ তারিণী চক্রবর্তী, মহেশ সামন্ত, সুবোধ মণ্ডল—লোকগুলো যেন এক-একটি টাইপ চরিত্রের। সকলেই রাজবাড়িতে বহুকালের পুরাতন কর্মচারী।

সুহাসের মা, রসময়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মালতী দেবী,—সুব্রত এখনও তাঁকে একটি

দিনের জন্যও দেখেনি। শোনা যায়, একটিমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি সহসা যেন অন্তঃপুরে আত্মগোপন করেছেন। দিবারাত্র ঠাকুরঘরে পূজা-আর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কোথাও বড় একটা বের হন না বা তেমন কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করেন না।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের স্ত্রীও মৃতা এবং তাঁর একটিমাত্র পুত্র প্রশান্ত কলকাতায় তার মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করে। ছুটিছাটায় রায়পুরে আসে কখনও ক্বচিৎ।

সুব্রত কেবল ভেবেই চলে, ভাবনার যেন কোন কূল-কিনারা পায় না। যা হোক ঐ দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে ও একটা দীর্ঘ চিঠি কিরীটীকে লেখে, সব ব্যাপারটা জানিয়ে।

* * *

দিন-পাঁচেক বাদে কিরীটীর চিঠির জবাব আসে।

কলিকাতা
২৬শে ফাল্গুন

কল্যাণ,

তোর চিঠি পেলাম। তোর চিঠি পড়ে মনে হল যেন তুই অত্যন্ত গোলমালে পড়ে গেছিস। সতীনাথের জন্য এত চিন্তার কোন কারণ নেই তো। একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবি আমার সন্দেহ ও গণনা ভুল হয়নি, এবং ক্রমে সেটাও প্রমাণিত হতে চলেছে। সতীনাথের মৃত্যুর প্রয়োজন হয়েছিল, তাই তাকে ঐভাবে মৃত্যু বরণ করতে হল। শুনেছি রহস্যময়ী পৃথিবীতে এক ধরনের নাকি সাপ আছে, যারা ক্ষুধার সময় নিজেদের দেহ নিজেরাই গিলতে শুরু করে। হতভাগ্য সতীনাথও সেই রকম কোন ক্ষুধার্ত সাপের পাল্লায় পড়েছিল হয়ত। নইলে—যাক্ গে সেকথা, কিন্তু তোর শেষ চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছি আর একজনের কথা। তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে, তবে এই ভরসা সতীনাথের মত অত চট্ করে তাকে হত্যা করা হয়ত চলবে না। রীতিমত ভেবেচিন্তে তাকে এগুতে হবে। তুই লিখেছিস হাতের কাছে কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছিস না! তোদের ঐ রাজবাটির অন্দরের দারোয়ান শ্রীমান ছোট্টু সিং, তার জবানবন্দি তো নিসনি? খোঁজ নিয়ে দেখিস দেখি, লোকটা মাথায় পাগড়ী বাধে কিনা? আর কয় সেট্ পেটেন্ট দারোয়ানী লোহার নাল-বসানো নাগরা জুতো সে রাখে? তারিণী আর মহেশের উক্তি একান্ত পরস্পরবিরোধী! ওদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ সত্যি বলেনি। ঘড়ি ধরে দেখিস তো, তারিণীর ঘর থেকে অন্দরে যাওয়ার দরজাটার গোড়ায় পৌঁছতে কত সময় ঠিক লাগে! গোলমালের সময় ছোট্টু সিং কোথায় ছিল? শ্রীমান সুবোধ পরিপূর্ণ সজ্ঞানেই ছিলেন, যদি আমার কথা বিশ্বাস করিস।

মহেশের কথাগুলোও অবহেলা করলে চলবে না। বেশ ভাববার। টিউবওয়েল দেখেছিস কখনও? তাতে যখন জল পাম্প করেও জল বের হতে চায় না, তখন তার মধ্যে কিছু জল ঢেলে পাম্প করলেই জল উঠে আসে। তাকে বলে জল দিয়ে জল বের করা। এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবি না যে, সুবোধ জল ও দুধের পার্থক্য বোঝে না!

তবে হ্যাঁ, সবই শ্রমসাপেক্ষ। তোকে তো আগেই বলেছি, হত্যাটাই সমস্ত হত্যা-রহস্যের শেষ! তরুশাখা সমন্বিত বিষবৃক্ষ! যা কিছু রহস্য থাকে, সবই সেই হত্যার পূর্বে। সমস্ত রহস্যের পরে যবনিকাপাত হয় হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই। সেই জন্যই রহস্যের কিনারা করতে হলে তোকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমার যতদূর মনে হয়, সতীনাথের হত্যার রহস্যের মূল আছে সুহাসের হত্যার সঙ্গে মূলে জড়িয়ে জট পাকিয়ে। এখন গিঁটগুলো খুলতে হবে আমাদেরই। নৃসিংহ গ্রামে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার ঘুরে আয়। একটা ভাল সার্ভে করবি। চোখ খুলে রাখবি সর্বদা। পারিস তো দু-একদিনের ছুটি নিয়ে এদিকটা একবারে ঘুরে যাস। তুই তো জানিস, আমার কলমের চাইতে মুখটা বেশী সক্রিয়। তোর পত্রের আশায় রইলাম। ভালবাসা নিস, তোর 'ক'।

কিরীটীর চিঠিটা সুব্রত আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চার-পাঁচবার পড়ে ফেলল।

এই দীর্ঘ পাঁচদিনে অনেক কিছুই সুব্রত দেখেছে। ইতিমধ্যে ময়না-তদন্তের রিপোর্টে জানা গেছে, সতীনাথের মৃত্যু ঘটেছে তীরের ফলার সঙ্গে মাখিয়ে তীব্র কোন বিষ-প্রয়োগে। যে তীরটা সতীনাথের বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধেছিল, সেটার গঠনও আশ্চর্য রকমের। তীরটি লম্বায় মাত্র ইঞ্চি-চারেক, সরু একটা ছাতার শিকের মত, কঠিন ইস্পাতের তৈরী। তীরের অগ্রভাগে ১।০ ইঞ্চি পরিমাপের একটা ছুঁচলো চ্যাপটা ফলা আছে। তাতেই বোধ করি বিষ মাখানো ছিল। তীরটা বিকাশের কাছেই আছে। তীরটাকে হত্যার অন্যতম প্রমাণ হিসাবে রাখা হয়েছে। আজ পর্যন্ত সুব্রত অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারেনি, কি উপায়ে এবং কি প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই সরু ছোট্ট তীরটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তবে যেভাবেই তীরটা ছোঁড়া হোক না কেন, তীর নিক্ষেপের যন্ত্রটি যে অতীব শক্তিশালী তাতে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। কারণ তীরটার অংশ মৃতদেহের বুকের মধ্যে অনেকটা ঢুকেছিল। হত্যাপরাধে এখনও কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি বটে, তবে হত্যাপরাধকে কেন্দ্র করে রায়পুরে বেশ যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক লোকটা অত্যন্ত আমুদে ও মিশুকে। সতীনাথের হত্যার পর থেকে সেই যে তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, আজ পর্যন্ত তাঁকে

আর কেউ বের হতে দেখেনি। স্টেটের অতি আবশ্যকীয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন কাজে রাজাবাহাদুরের পরামর্শ নিতে হলে, সতীনাথের অভাবে আজকাল সুব্রতকে রাজাবাহাদুরেরই সঙ্গে দেখা করতে হয়। এবং সেই ধরনের কাজে ইতিমধ্যে দু-তিনবার সুব্রতর রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ যা হয়েছে, সেও খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।

সুব্রত নিজেই গায়ে পড়ে একটিবার নৃসিংহ গ্রাম মহালটা দেখে আসবার প্রস্তাব রাজাবাহাদুরের কাছে উত্থাপন করেছিল। রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক সম্মতিও দিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, আগামী পরশু সুব্রত সেখানে যাবে। আজকাল আর সুব্রতর হারাধনদের ওখানে নিয়মিত সন্ধ্যায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। প্রায়ই সুব্রত হাঁটতে হাঁটতে থানার দিকে যায়। তারপর সেখানে থানার সামনে খোলা মাঠের মধ্যে দুটো ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার পেতে, দুজনের মধ্যে সতীনাথের হত্যাসম্পর্কে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।

আজও সন্ধ্যার দিকে কিরীটীর চিঠিটা নিয়ে সুব্রত থানার দিকে অগ্রসর হল। ইদানীং সতীনাথের হত্যা-ব্যাপারের পর থেকে সুব্রতর যেন মনে হয়, সর্বদাই কে যেন তার পিছু পিছু ছায়ার মত তাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করে ফিরছে। কিন্তু কোনরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ আজ পর্যন্ত সে পায়নি। কতবার সে চলতে চলতে ফিরে তাকিয়েছে হঠাৎ, কিন্তু কেউ নেই। অথচ মনে হচ্ছিল একটু আগেও, যেন কারও সুস্পষ্ট পায়ের শব্দ সে শুনেছে। হয়ত এটা কিছুই নয়, তার সদাসন্দিগ্ধ মনের বিকারমাত্র। কিন্তু তথাপি মনের মধ্যে একটা সন্দেহের অস্বস্তিকর কালো ছায়া তাকে সর্বদা পীড়ন করছে। থানার সামনেই খোলা মাঠ, রুক্ষ। থানার একপাশে একটা অনেক কালের পাকুড়গাছ। প্রথম রাত্রে আজ চাঁদ উঠেছে, পাকুড়গাছের পাতার ওপরে সামান্য মলিন আলোর আভাস। ঝিরঝির করে শেষ ফাল্গুনের হাওয়া বয়ে যায়।

বিকাশ প্রতিদিনের মত, বোধ হয় হয়ত সুব্রতর প্রতীক্ষায়, ক্যাম্বিশের চেয়ারটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে একটা সিগারেট টানছিল। অদূরে সুব্রতকে আসতে দেখে, সোজা হয়ে বসে, আসুন সুব্রতবাবু! আজ যে এত দেরি?

সুব্রত ঠোঁটের ওপরে তর্জনীটা বসিয়ে বলে, বিকাশবাবু, আপনি বড় অসাবধানী। কতবার আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি, এখানে আমি সুব্রত রায় নয়, কল্যাণ রায়! মনে রাখবেন আমি শত্রুবেষ্টিত পুরীর মধ্যে বাস করছি, কখন কার কানে কি কথা যাবে, সর্বনাশ হবে।

বিকাশ হাসতে হাসতে জবাব দেয়, বসুন কল্যাণবাবু। কি করি বলুন, অভ্যাসের দোষ, মনে থাকে না, ভুলে যাই। তারপর বন্ধুর চিঠি পেলেন?

হ্যাঁ, এই নিন পড়ুন। সুব্রত বুকপকেট থেকে খামসমেত কিরীটীর চিঠিটা বের করে বিকাশের হাতে তুলে দেয়।

অন্ধকারে পড়া যাবে না, এই চৌবে, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়, বিকাশবাবু হাঁক দেয়।

একটু পরেই চৌবে একটা হ্যারিকেন বাতি নিয়ে এসে সামনে রাখে।

হ্যারিকেনের আলোয় তখুনি বিকাশ চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে ফেলে। তারপর চিঠিটা পুনরায় ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে সুব্রতর দিকে এগিয়ে দেয়।

সত্যি, এ কথাটা আমার একবারও মনে হয়নি যে সে রাত্রে ছোট্টু সিংয়ের একটা জবানবন্দি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, বিকাশ বলে।

আমি অবিশ্যি ছোট্টু সিংকে ডেকে দু'চারটে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু আপনার পক্ষে যতটা সম্ভব, আমার পক্ষে ততটা করা সম্ভব নয়। লোকের সন্দেহ জাগতে পারে, কেন আমি এত আগ্রহ দেখাচ্ছি!

করেছিলেন নাকি? কই এতদিন একথা তো আমায় বলেননি? বিকাশ বললে।

বলিনি তার কারণ, ছোট্টু সিংকে যেসব প্রশ্ন আমি করেছি, একান্ত মামুলী। সে বলে, সে নাকি সেই রাত্রে রাজাবাহাদুরের হুকুমে রাত্রি সাড়ে দশটার সময়েই অন্দর-মহলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাছাড়া আগের দিন থেকে তার শরীরটা সুস্থ ছিল না, তাই ঘরের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল, তারপর চিৎকার ও গোলমালের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে যায় এবং সব দেখে। তার আগে নাকি সে কিছুই টের পায়নি।

ছোট্টু সিংয়ের ঘরটা ঐ দরজা থেকে কত দূর?

তা প্রায় হাত দশ-বার দূরে তো হবেই। সুব্রত মৃদুকণ্ঠে বলে।

কিন্তু আপনার বন্ধুর চিঠি পড়ে তো মনে হয়, তিনি ঐ দারোয়ান ছোট্টু সিংকে যেন একটু সন্দেহ করছেন!

কেন? কিসে আপনি তা বুঝলেন?

প্রথম কথা ধরুন, সতীনাথের কাছে যে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, আমরা জানতে পেরেছি তার মাথায় ছিল পাগড়ী বাঁধা। দ্বিতীয়, মহেশ সামন্ত যে জুতোর শব্দ পেয়েছিল, তার ধারণা সেই জুতোর তলায় কোন নাল-বাঁধানো থাকলে যেমন শব্দ হয় শব্দটা তেমনি এবং আপনার বন্ধুও চিঠির মধ্যে ঐ কথা লিখেছেন। এখন খোঁজ নিতে হবে সত্যিই ছোট্টু সিংয়ের ক'জোড়া পেটেন্ট দারোয়ানী লোহার নাল-বসানো নাগরাই জুতো আছে।

তাতে কি?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে—ঐ ছোট্টু সিংয়ের উপরেই আপনার বন্ধুর সন্দেহটা

বেশী পড়েছে।

চিন্তিত হবেন না বিকাশবাবু। তাই যদি হয় তো যথাসময়ে পাকড়াও তাকে করা যাবে, এখন থেকে কেবল শুধু তার সকলপ্রকার গতিবিধির ওপরে আমাদের সদা সজাগ দৃষ্টি রাখলেই চলবে। এবং তাতে করে সত্যিই যদি তাকে গ্রেপ্তার করা আমাদের প্রয়োজন হয়, তখন বেগ পেতে হবে না।

মুখে সুব্রত বিকাশকে যাই বলুক না কেন, দিন-দুয়েক আগে ছোট্টু সিংয়ের সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা বলে মনে মনে সে যে বেশ একটু চিন্তিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই। কিন্তু বিকাশ পুলিসের লোক, তাকে সেকথা বললে এখুনি হয়ত সে বিশেষ রকম তৎপর হয়ে উঠবে, ফলে তার প্ল্যান হয়ত সব ভেস্তে যাবে। তাই সে ছোট্টু সিংয়ের ব্যাপারটা কতকটা যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল। সুব্রত যে একটু আগে বিকাশকে বলছিল ছোট্টু সিংকে সে জেরা করেছে, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

দিন দুয়েক আগে ছোট্টু সিংকে সুব্রত কয়েকটা প্রশ্ন সত্যিই করেছিল। স্টেট সংক্রান্ত কাজের নির্দেশ নিয়ে ছোট্টু সিং সেদিন বিকেলের দিকে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে সুব্রতর কাছে এসেছিল, কাজ হয়ে যাবার পর দু-চারটে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার ফাঁকে আচমকা সুব্রত প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিল। ছোট্টু সিং এ বাড়িতে মাত্র বছর পাঁচেক হল কাজ করছে, বয়েস চল্লিশের বেশী নয়। বেরিলীতে বাড়ি। রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের ও সতীনাথের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র। অন্দরমহলের পাহারাদারীর ভার ছোট্টু সিংয়ের ওপরই ন্যস্ত। লোকটা লম্বাচওড়া এবং গায়ে শক্তি রাখে প্রচুর। পরিধানে সর্বদাই প্রায়-ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত আট-হাতি একখানা ধুতি। গায়ে সাদা মের্জাই, মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী। পায়ে লোহার নাল-বসানো হিন্দুস্থানী নাগরা জুতো। হাতে পাঁচহাত প্রমাণ একখানা পিতলের পাত দিয়ে মোড়া তেল-চকচকে লাঠি। দাড়িগোঁফ একেবারে নিখুঁতভাবে কামানো। সামনের দুটো দাঁত, উপরের পাটির, সোনা দিয়ে বাঁধানো। কথায় কথায় ছোট্টু সিং বললে, কি বলব বাবু, আগাগোড়া ব্যাপারটা যে টেরই পেলাম না, নাহলে—

কেন, তুমি তো ভেতরেই থাকতে।

থাকতাম তো বাবু, কিন্তু সেদিন সিদ্দির নেশাটা বোধ হয় একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। বিছানার ওপরে সাঁঝ থেকেই কেমন ঝিম্ মেরে শুয়েছিলাম, অনেক হাল্লা চেঁচামেচি হতে তবে টের পেলাম।

বল কি! অত গোলমাল তুমি শুনতে পাওনি?

নেশা বড় বদ জিনিস বাবু, একেবারে অজ্ঞান করে দেয়। হুঁশ কি ছাই ছিল! কিন্তু একথা রাজাবাবু জানেন না, জানলে এখুনি আমার চাকরি চলে যাবে।

তাহলে তুমি সেরাত্রে দরজাটাও বন্ধ করেই রেখেছিলে, কি বল?

হ্যাঁ বাবু। দরোয়াজা তো সেই রাত্রি বারোটায় বন্ধ হয় সাধারণতঃ। তার আগে দরোয়াজা বন্ধ করার হুকুম নেই, তবে সেদিন রাজাবাবুর হুকুমেই রাত্রি দশটায় দরজা বন্ধ করা হয়েছিল। তাছাড়া ভারী বজ্জাত ও লহাড়ী বাবু, বলব কি বাবু, শালা মরেছে তাতে আমার এতটুকুও দুঃখ হয়নি, ওর জ্বালায় রাত্রে কতবার যে আমাকে দরোয়াজা খুলে দিতে হয়েছে, যখন-তখন ও অন্দরে রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেত।

রাত্রেও বুঝি তিনি প্রায়ই রাজবাড়ির মধ্যে যেতেন?

হাঁ বাবু, প্রায়ই। যত সলা-পরামর্শ রাজাবাবুর তা হত ঐ লহাড়ী বাবুর সঙ্গেই।

শুনেছি লাহিড়ীবাবু নাকি প্রায়ই রাত্রে রাজাবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন?

হাঁ বাবু। রাজাবাবু খুব ভাল দাবা খেলতে পারেন।

এরপর সুব্রত ছোট্টু সিংকে বিদায় দিয়েছিল সেদিনকার মত।

সুব্রতর মনে মনে খুবই ইচ্ছা ছিল সমগ্র রাজবাটীর অন্দরমহলটাও একবার ঘুরে দেখে। কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি আজ পর্যন্ত। এমন কোন একটা ছল-ছুতো ও ভেবে ভেবে আজও বের করতে পারেনি, যাতে করে ওর ইচ্ছেটা ও পূরণ করতে পারে।

কিন্তু নৃসিংহ গ্রামে যাবার আগে রাজবাড়ির ভিতর-মহলটা ও একটিবার দেখতে চায়। এবং নিজের চোখে দেখবার যখন কোন সুবিধাই নেই, বিকাশের উপরেই ওকে নির্ভর করতে হবে। সেই কথাটাই আজও বিকাশের কাছে উত্থাপন করবে, আগে হতেই ভেবে ঠিক করে এসেছিল।

ভৃত্য দু'গ্লাস সরবৎ ও কিছু ফল ডিসে করে সাজিয়ে নিয়ে এল। দুজনে কথাবার্তা বলতে বলতে সরবৎ পান করছে, এমন সময় রাজবাড়ির একজন কর্মচারী সাইকেল হাঁকিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বিকাশের হাতে একখানা খাম দিল, রাজাবাহাদুর পাঠিয়েছেন!

কি ব্যাপার সতীশ? বিকাশ ব্যগ্রভাবে প্রশ্নটা করতে করতেই খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে দিল। চিঠিটা পড়তে পড়তে বিকাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সুব্রত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কিসের চিঠি?

এখুনি আমাকে একবার উঠতে হবে মিঃ রায়। রাজাবাহাদুরকে কে বা কারা তাঁর নিজের শয়নকক্ষের ছাতের ওপরে ছুরি মেরে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

এঁ্যা! সেকি—সুব্রত চমকে ওঠে।

দেখুন দেখি কি ঝামেলা! বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বিকাশ বলে।

সতীশ স্তব্ধ হয়ে একপাশে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এবারে সে প্রশ্ন করলে, আমি যেতে পারি হুজুর?

হঁ্যা যাও, রাজাবাহাদুরকে বল গিয়ে এখুনি আমি আসছি।

উনি আহত হয়েছেন নাকি?

সে সম্পর্কে তো কিছুই লেখেননি। কেবল অনুরোধ জানিয়েছেন, এখুনি একবার যেতে।

সতীশ সাইকেলে উঠছিল, সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, অন্ধকারে ভাল করে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি স্যার। রাজবাহাদুর আপনাকেও যেতে বলেছিলেন রায়বাবু, কিন্তু আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে আমি দেখতে পেলাম না, চাকরও বলতে পারলে না, আপনি কোথায় গেছেন!

তুমি যাও সতীশ, আমিও বিকাশবাবুর সঙ্গেই আসছি।

সতীশ আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে পা-গাড়িতে চেপে রওনা হয়ে গেল।

॥ পনের ॥

আবার আততায়ীর আবির্ভাব

বিকাশ চটপট প্রস্তুত হয়ে নিল এবং দুজনে আর বিলম্ব না করে রাজবাড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

সুব্রত বিকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা যেন কেমন মনে হচ্ছে বিকাশবাবু! রাজবাড়ির অন্দরে অচেনা লোক এসে স্বয়ং রাজাবাহাদুরকে ছুরিকাঘাত করবার চেষ্টা করেছে!

আমিও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না কল্যাণবাবু।

চলুন দেখা যাক।

রাত্রি বোধ করি পৌনে নটা হবে, রাত্রির কালো আকাশটা ভরে অসংখ্য হীরার কুচির মত তারকাগুলো ঝিলমিল করছে।

ছোট শহর এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শোনা যায় কেবল।

www.boiRboi.blogspot.com

রাস্তার দু'পাশে কেরোসিনের বাতিগুলো টিমটিম করা জ্বলে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই, দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি এগিয়ে চলে বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই।

সুব্রতর মনে অনেক কথাই স্রোতের আবর্তের মত পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল। ব্যাপারটা সত্যিই কেমন যেন একটু গোলমেলে। কেউ রাজাবাহাদুরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল! তাও রাজবাড়িতে রাজাবাহাদুরের নিজ শয়নকক্ষের সামনের ছাতে! আজও কি তাহলে ছোট্টু সিং বেশী সিদ্ধির নেশা করেছে? আশ্চর্য! যা কিছু অঘটন ঘটছে, সবই রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে। এতগুলি লোকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে আততায়ী কেমন করেই বা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, এবং নির্বিঘ্নে তার কাজ হাসিল করে?

রহস্য ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে।

সহসা একসময় বিকাশ চলতে চলতে সুব্রতকে লক্ষ্য করে বলে, আপনাকে আজ কদিন থেকেই একটা কথা বলব বলব মনে করছিলাম কল্যাণবাবু, কিন্তু রোজই ভুলে যাই, শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে উঠছে না।

কি বলুন তো?

এর মধ্যে একদিন কিন্তু লাহিড়ীর বাড়িটা আমি সার্চ করে এসেছি।

তাই নাকি! কবে সার্চ করলেন?

সে যেদিন খুন হয় তার পরদিনই সকালে লাহিড়ীর বাড়িটা গিয়ে সার্চ করি।

সার্চ করে কিছু পেলেন?

না। তবে আপনি শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন, আমার সার্চ করবার পূর্বেই, কোন সহৃদয় ব্যক্তি সে বাড়িতে গিয়ে কিছু সার্চ করে এসেছেন মনে হল যেন আমার!

কি রকম? সুব্রত যেন কিছুই জানে না এইভাবে প্রশ্নটা করে।

ঘরের মধ্যে তার সব বাক্স-প্যাঁটরাগুলোই তালাভাঙা অবস্থায় পড়েছিল, তাই আমার কষ্টটা 'ন দেবায় ন ধর্মায়'ই হয়ে গেল।

বাক্স-প্যাঁটরাগুলো খুঁজে কিছুই পেলেন না?

না, কতকগুলো জামাকাপড়, নগদ কিছু টাকা ও খানকয়েক পুরাতন চিঠিপত্র, এবং তাতেই আমার ধারণা যে বাড়ির চাকর বামুন বাক্সগুলো ভাঙেনি। বাইরে থেকে কেউ সকলের অলক্ষ্যে, যখন লাহিড়ীর মৃতদেহটা নিয়ে আমরা সবাই এদিকে ব্যস্ত ছিলাম, সেই ফাঁকে তার কাজ হাসিল করে চলে গেছে।

সুব্রত কোন জবাব দেয় না, নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করে চলে।

কিছুক্ষণ বাদে একসময় প্রশ্ন করে, হ্যাঁ ভাল কথা, একটা জিনিস কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন বিকাশবাবু যে, এই পুরাতন রাজবাড়ির ছাদ দিয়ে এক অংশ হতে অন্য অংশে অনায়াসেই যাতায়াত করা যায় ?

কই না তো ! তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে ক্রমে এরা প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছে গেছে, দুজনে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলতে বলতে। রাজবাটির মধ্যে এসে প্রবেশ করল দুজনে। আজ সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল এবং স্বয়ং ছোট্টু সিং দরজার সামনে লাঠি নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। ওদের আসতে দেখে সে সেলাম জানাল।

অন্দরের আঙিনায় পা দিতেই ওদের কানে এল উন্মাদ নিশানাথের কণ্ঠস্বর, সাবধান, সাবধান, সাবধান ! That boy, that mischievous boy again started his old game !

সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারা। তারই মৃদু আলো আঙিনার ওপরে এসে যেন অপূর্ব একটা মৃদু আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। অতর্কিতেই সুব্রতর মনে পড়ে যায় মাত্র কয়েক দিনের আগেকার একটা বীভৎস দৃশ্য। ঐ তো ঐখানে সতীনাথ লাহিড়ীর বিষ-জর্জরিত মৃতদেহটা ধনুকের মত বেঁকে পড়ে ছিল। তার অশরীরী আত্মা হয়ত এখনও এখানে নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে, কে জানে !

সহসা আবার নিশানাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমায় তোমরা বোকা ঠাউরেছ বটে, অ্যাঁ ! ভাবছ এ আগুন নিভবে ? না, নিভবে না। কে ? ও বৌদি ! তোমার চোখে জল নেই কেন ? কেন কাঁদতে পার না ? কাঁদ, একটু কাঁদ বৌদি। কেমন করে এ পাপ সহ্য করে আছ আজও ? দেখছ না সব পুড়ে গেল !

রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার যেন গমগম করে ওঠে নিশানাথের কণ্ঠস্বরে।

চলুন মিঃ রায়, বিকাশবাবুর ডাকে সুব্রত নিজেকে যেন সামলে নিয়ে আবার পা বাড়াল।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দুজনে এসে উপরের দালানে দাঁড়াতেই সামনে রাজাবাহাদুরের খাসভৃত্য শম্ভুকে দেখা গেল, আসুন বাবু, রাজাবাহাদুর এই ঘরেই আছেন।

ওরা বুঝলে শম্ভু ওদের জন্যই বোধ হয় অপেক্ষা করছিল। সামনের ঘরটাই রাজাবাহাদুরের বসবার ঘর। শম্ভুর আহ্বানে দুজনে দরজার পর্দা তুলে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

ঘরটার মধ্যে একটা যেন মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা।

একটা বড় আরাম-কেদারায় সুবিনয় মল্লিক চোখ বুজে আড় হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হয়। তাঁর কোলের ওপর দুটি হাত জড়ো করা। বুকে ও পিঠে একটা পট্টি বাঁধা।

ওদের পায়ের শব্দে রাজাবাহাদুর চোখ মেলে তাকালেন।

কে ?

আমরা।

কল্যাণবাবু, বিকাশবাবু আসুন।

ব্যাপার কি রাজাবাহাদুর ?

বলছি, বসুন।

দুজনে রাজাবাহাদুরের সামনাসামনি দুটো চেয়ার অধিকার করে বসল।

একটুখানি থেমে রাজাবাহাদুর বললেন, এই দেখুন। এবারে আপনাদের আততায়ীর আক্রোশটা আমার উপরেই এসে পড়েছিল। কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না রাজাবাহাদুর ? বিকাশ প্রশ্ন করে।

আপনারা জানেন হয়ত, আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন সামনে একটা ছোট খোলা ছাদ আছে। সন্ধ্যার দিকে অনেক সময় আমি সেই ছাদে একা একা ঘুরে বেড়াই। আজও বেড়াচ্ছিলাম, রাত্রি তখন বোধ করি আটটার বেশী হবে না। হঠাৎ একটা পায়ের শব্দ, চোখ মেলে চেয়ে দেখবার আগেই, পিছন থেকে কে যেন আমায় ছোরা মারলে। কিন্তু অন্ধকারেই হোক বা আমার নড়াচড়ার জন্যই হোক, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছোরাটা বাঁ দিককার কাঁধের উপরে গিয়ে বিঁধে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদ্যুৎবেগে সরে যাই। আততায়ী ততক্ষণে একলাফে সিঁড়িতে গিয়ে পড়েছে—আমার নাগালের বাইরে। লোকটার পিছু পিছু ছুটে গেলাম বটে, কিন্তু ধরতে পারলাম না।

তখুনি চাকরবাকরদের ডাকলেন না কেন ? প্রশ্ন করে সুব্রত।

সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি নিজেই ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি পর্যন্ত আসি, কিন্তু পরমুহূর্তে লোকটা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তার আর কোন পাত্তাই পেলাম না। তারপরে অবিশ্যি চাকরদের ডেকে খোঁজ করলাম অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু সবই বৃথা। আততায়ী পালিয়েছে তখন।

কিন্তু সত্যি যদি কেউ এসে থাকে, তাকে পালাতে হলে পালাতে হবে সেই নীচ দিয়েই, আর তো অন্য কোন পথ নেই শুনেছি। বিকাশবাবু বললেন।

ছোট্টু সিংও কি কাউকে পালাতে দেখেনি ? প্রশ্ন করে সুব্রত।

না, ছোট্টু সিং তো সেই সন্ধ্যা থেকে নিচেই ছিল।

আশ্চর্য! সুব্রত মৃদুস্বরে বললে।

আপনার বাড়ির চাকরদের প্রতি আপনার খুব বিশ্বাস, না রাজাবাহাদুর? প্রশ্ন করলেন এবারে বিকাশবাবু।

হ্যাঁ ওদের কাউকেই সন্দেহ করতে পারি না দারোগাবাবু। একাদিক্রমে বহির্মহলে যারা অন্তত আট-দশ বছর চাকরি করে, তারাই পরে আমাদের অন্দরে স্থান পায়, এ বাড়ির এই নিয়ম বরাবর চলে আসছে বহুকাল থেকে।

তার মানে সন্দেহের বাইরে? সুব্রত বলে।

হ্যাঁ।

আঘাতটা কি খুব গুরুতর হয়েছে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

বোধ হয় না। ডাক্তারকেও ডাকতে পাঠিয়েছি, এখনও এসে পৌঁছায়নি, কোথায় নাকি বাইরে বেড়াতে গেছে। নিজেই শম্ভুকে দিয়ে ফার্স্ট এড্ নিয়েছি।

ঠিক এই সময় একপ্রকার হন্তদন্ত হয়েই ডাক্তার সোম এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে ডাক্তারীর কালো ব্যাগটা, ব্যাপার কি রাজাবাহাদুর? হঠাৎ এত জরুরী তলব! বাড়িতে ছিলাম না, এসেই শুনলাম, এখুনি ওষুধপত্র নিয়ে আসতে হবে!

এস ডাক্তার, মরতে মরতে বেঁচে গেছি। রাজাবাহাদুর কাঁধের ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগলেন।

অপেক্ষা করুন, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমি হাতটা ধুয়ে আসি। যা করবার আমিই করবো। ডাক্তার মৃদুস্বরে বললেন।

পাশের অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকে হাত ধুয়ে এসে ডাঃ সোম ব্যাণ্ডেজ খুলতে লাগলেন। স্ক্যাপুলার ঠিক মাঝামাঝি একটা দেড়ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষতচিহ্ন। খুব বেশী রক্তক্ষয় হয়েছে বলে মনে হয় না। গোটা-দুই স্টীচ দিয়ে চটপট ডাক্তার ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিল। টিটেনাস ইনজেকসনও দিতে ভুল হল না। রাজাবাহাদুর ডাঃ সোমকে সমগ্র ব্যাপার তখন খুলে বললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে রাজাবাহাদুর! ডাঃ সোম বলতে লাগলেন, একেবারে রাজঅন্তঃপুরের মধ্যে এরকম খুনজখম হতে শুরু করল! কার উপরে কখন বিপদ নেমে আসে—কেউ বলতে পারে না!

রাজাবাহাদুরও যেন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। মুখের ওপরে তাঁর নেমে এসেছে যেন একটা চিন্তার কালো ছায়া।

রাজাবাহাদুর, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি একবার আপনার শয়নকক্ষ ও

তার আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাই। বিকাশ বললে।

স্বচ্ছন্দে। যান না, ঘুরে আসুন। মৃদু ক্লান্ত স্বরে রাজাবাহাদুর বললেন।

আসুন কল্যাণবাবু, বিকাশ ডাকলে।

আমাকেও যেতে হবে?

আসুন না। একজোড়া চোখের চাইতে দু'জোড়া চোখ অনেক বেশীই দেখতে পায়, আসুন।

যান কল্যাণবাবু। ঘুরে দেখে আসুন। রাজাবাহাদুর বললেন।

আগে আগে বিকাশ, পশ্চাতে সুব্রত ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সামনেই একটা টানা বারান্দা, পর পর তিনটে ঘর, একটি রাজাবাহাদুরের বসবার ঘর, তার পরই তাঁর লাইব্রেরী-ঘর ও সর্বশেষটি তাঁর শয়নঘর। প্রত্যেকটি ঘরই বেশ প্রশস্ত। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে ও বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করা যায়।

শয়নঘরের পরেই ছোট একটি সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই সামনে খোলা ছাত। ছাতটিও বেশ প্রশস্ত।

ছাতের ওপরে উঠলে দেখা যায় বাড়ির পশ্চাৎ দিকটা। চমৎকার একটা ফুলের বাগান, বাগানের সীমানায় উঁচু প্রাচীর, প্রায় দু'মানুষ সমান। বাইরে থেকে কারও আসা একেবারেই সম্ভব নয়। এবং ছাতে আসবারও ভিতর-বাড়ি দিয়ে ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

ঐ ছাতের ওপরে দাঁড়ালেই পিছন দিকে তিনতলার ছাত দেখা যায়।

ছাতটি ভাল করে দেখে, দু'জনে আবার রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল। শয়নকক্ষের সামনের দিককার জানালাপথে অন্দর ও বাহিরের সংযোগস্থল প্রশস্ত আঙিনাটি চোখে পড়ে। জানালাগুলোর কোনটাতেই শিক দেওয়া নয়, খোলা।

এই জানালাপথেই সেদিন রাজাবাহাদুর বিষ-জর্জরিত সতীনাথকে দেখতে পান। সুব্রত ঘুরে ঘুরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শয়নকক্ষটি বেশ ভাল করে দেখতে লাগল।

ঘরে আসবাবপত্রের তেমন কোন বাহুল্য নেই।

একটি দামী শয্যা-বিছানো পালংক, ঘরের এক কোণে একটি মাঝারি গোছের আয়রন সেফ্। একটি আয়না-বসানো আলমারী, ছোট ছোট দুটি বইভর্তি ঘূর্ণায়মান বুক-শেলফ।

দেওয়ালের গায়ে একটি দোনলা বন্দুক ঝুলানো, একটি পাঁচ সেলের টর্চবাতি ও দেওয়ালের কোণে একটি ছাতা।

বিকাশ পাশের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একটু পরে সুব্রতও সেই ঘরে এসে প্রবেশ করে।

॥ ষোল ॥

দুঃখের হোমানল

এই ঘরটি অন্য দুটি ঘরের চাইতে আকারে একটু বড়ই হবে বলে মনে হয়। এবং অন্য দুটি ঘরের চাইতে এই ঘরটি যেন একটু বিশেষ রকম সাজানোগোছানো ও ফিটফাট।

মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছানো আগাগোড়া, চারটি দেওয়ালই ঢাকা পড়ে গেছে আলমারীতে। প্রত্যেকটি আলমারীতে একেবারে ঠাসা বই।

মধ্যখানে ছোট একটি গোলটেবিল, তার চতুষ্পার্শ্বে সোফা, কাউচ্ ও চেয়ার পাতা।

ওরা দুজনেই ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখছিল, হঠাৎ কার গলা শোনা গেল, অত্যন্ত স্পষ্ট, যেন কে ঠিক ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছে—অথচ তাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আশ্চর্য!

তুমি ভাব আমি কিছু বুঝি না বৌদি! তোমাদের ধারণা আমি একেবারে পাগল হয়ে গেছি! পাগল আমি হইনি, হয়েছ তোমরা। হয়েছিল দাদা।

ওরা দু'জনেই চমকে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

ব্যাপারটা দুজনের কেউই যেন ভাল করে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, এ আবার কি হেঁয়ালি! রহস্যের খাসমহলই বটে এই রায়পুরের রাজপ্রাসাদ।

একটু শুনেই তারা বুঝতে পারে সুস্পষ্ট এ নিশানাথেরই গলা। মনে হচ্ছে বুঝি দেয়াল ফুটো হয়ে কথাগুলো ওদের কানে আসছে।

তার তো যাওয়ার সময় হয়নি, নিশানাথের গলা আবার শোনা গেল, কিন্তু তবু তাকে যেতে হল। প্রয়োজনের তাগিদ। তবু তোমাদের কারও খেয়াল হয়নি। কিন্তু আমি জানতাম এ আগুন এত সহজে নিভবে না। আগুন খাণ্ডবদাহনের মত একে একে সব গ্রাস করবে।

ঠাকুরপো! একটু শান্ত হও। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। মেয়েলী মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল।

ঘুমোব! ঘুম আমার আসে না বৌদি। ঘুমালেই যত দুঃস্বপ্ন আমার দু'চোখের পাতার ওপরে এসে যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেয়। সংসারে অর্থই যত অনর্থের মূল। এর

চাইতে বড় শত্রু বুঝি মানুষের আর নেই। তাই তো এই অর্থের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম। ভাবছ হয়ত পাগল মানুষ, পাগলামির ঝোঁকেই এসব কথা বলছে, কিন্তু তাই যদি হয় তো পাগল সবাই, কে পাগল নয়! তুমি পাগল, আমি পাগল, বিনু পাগল, সবাই পাগল। আর পাগল না হলে কেউ অন্য একজনকে পাগল সাজিয়ে এমনি করে বন্দী করে রাখতে পারে?

সুব্রত পাথরের মতই যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছে। আশ্চর্য! কোথা থেকে আসছে এই কথাবার্তার আওয়াজ? পাশের ঘর নয়, সামনে বা পিছনে ঘর নেই, উপরে ও নীচে ঘর আছে কেবল।

তবে কি এই ঘরের উপরে বা নীচে এমন কোন ঘর আছে যেখান থেকে ঐ কথা-বার্তার আওয়াজ আসছে! কিন্তু তাই যদি হয়, এত স্পষ্ট শোনা যায় কি করে? এ কি রহস্য! এ কি বিস্ময়—চকিতে সুব্রতর মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায়!

রহস্যে-ঘেরা এ রাজবাড়ির এও হয়ত একটি রহস্য!

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দিকে চোখ বোলাতে থাকে।

কি দেখছেন চারিদিকে অমন করে চেয়ে মিঃ রায়? বিকাশ মৃদু কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সুব্রত মৃদু হেসে জবাব দেয়, দেখছি রায়পুরের রাজবাড়ির ঐ রহস্যময় দেওয়ালগুলো, ওরাও কথা বলে কিনা। তাছাড়া ছদ্মবেশের অনেক লেঠা, এবং হাতে সময়ও অল্প। তদন্তের ব্যাপারে এমনি তাড়াহুড়ো চলে না।

এবারে চলুন, ও ঘরে যাওয়া যাক। রাজাবাহাদুর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

হ্যাঁ চলুন।

ও ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ওরা রাজাবাহাদুরের বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করতেই, রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করলেন, দেখা হল দারোগাবাবু?

হ্যাঁ।

কিছু বুঝতে পারলেন?

না। রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। আজকের মত আমি বিদায় নেব রাজা-বাহাদুর। কাল পারি তো সকালের দিকে একবার আসব।

বেশ তো। একবার কেন, যতবার খুশি আসুন না। সব সময়ই আমার ঘরের দরজা আপনার জন্য খোলা থাকবে। কোন সংকোচই করবেন না। তারপর সহসা সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, কল্যাণবাবু, আপনি যাবেন না। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক জরুরী কথা আছে।

কল্যাণবাবু, তাহলে আপনি পরেই আসবেন, আমি আসি। নমস্কার।

বিকাশ নমস্কার জানিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ডাঃ সোম আগেই বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বসুন কল্যাণবাবু। রাজাবাহাদুর অদূরে একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন সুব্রতকে। একটু চুপ করে থেকে রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক বললেন, সংসারে আপনার কে কে আছেন মিঃ রায়?

সুব্রত মৃদু হেসে বললে, সেদিক দিয়ে আমি একেবারে ঝাড়া হাত পা। একমেবা-দ্বিতীয়ম্।

আপনার কয়েকদিনের কাজে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি কল্যাণবাবু। আপনি শুধু কর্মঠ ও পরিশ্রমীই নন—বুদ্ধিমানও, পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। আপনাকে আমি এখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস করি। তাই বলছি, আপনারা হয়ত জানেন না, এ সব কিছুর মূলে আছে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র এবং আমার বিরুদ্ধেই সে ষড়যন্ত্র চলেছে। দেখলেন তো আজ আমার জীবনের ওপরে attempt পর্যন্ত হয়ে গেল! একটু থেমে আবার বললেন, অবিশ্যি এতটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এবারে আমায় সাবধান হতে হবে। আততায়ীর জিঘাংসা কখন যে এর পর কোন্ পথ ধরে নেমে আসবে তাও বুঝতে পারছি না। তবে যদি বলেন প্রস্তুত থাকবার কথা, তা আমি থাকব। আমার হয়েছে কি জানেন, শাঁখের করাত, আগে পিছে দু'দিকেই কাটে। অর্থের মত এত বড় অভিশাপ বুঝি আর নেই। রাজাবাহাদুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

সুব্রত বিস্মিত খুব কম হয়নি। ঠিক এতখানি সে মুহূর্ত আগেও চিন্তা করতে পারত কিনা সন্দেহ। উচ্ছ্বাসের মুখে কাউকে বাধা দেওয়া উচিত নয় সুব্রত তা জানে, তাই কোন কথা না বলে চুপ করেই রইল।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক আবার বলতে লাগলেন, জানি না আপনি আমাদের রাজ-বাড়ির সেই ভয়াবহ হত্যা-মামলা সম্পর্কে জানেন কিনা। আমার ছোট ভাই সুহাসের হত্যার ব্যাপার খবরের কাগজে হয়তো পড়ে থাকবেন, তবু সব আসল ব্যাপার জানেন না। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে।

এত বড় লজ্জা! এত বড় অপমান! এ কলঙ্ক এ জীবনেও বুঝি যাবে না। বুঝতে পারেন কি, ভাইয়ের হত্যাব্যাপারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাই! উকিলের সওয়ালের জবাব দিচ্ছি। অনুমান করতে পারেন কি, দিনের পর দিন সে কি দুঃসহ মর্মপীড়া! পৃথিবীর সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমার বিমাতা পর্যন্ত ঘৃণায় আমার কাছ হতে দূরে সরে গেছেন। উত্তেজনায় রাজাবাহাদুর উঠে

দাঁড়ালেন, আমি ভুলতে পারি না—আমি ভুলতে পারি না সে-সব কথা। এই বুকের মাঝে দাগ কেটে বসে আছে।

কিন্তু সে যে মিথ্যা—সেও তো প্রমাণিত হয়ে গেছে রাজাবাহাদুর! শান্ত কণ্ঠে সুব্রত বলে।

রাজাবাহাদুর জবাবে মৃদু হাসলেন, প্রমাণ! হ্যাঁ, তা হয়েছে বইকি। কিন্তু বাইরের অপরিচিত আর দশজন লোকের কাছে তার মূল্য কতটুকু! আমার নির্দোষিতাটা আইনের চোখে প্রমাণিত হয়নি আজও। আদালত বলেছে প্লেগের বীজপ্রয়োগে তাকে হত্যা হয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমিও একজন নাকি ছিলাম। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা, কি ঘৃণা! সব চাইতে মজার ব্যাপার কি জানেন কল্যাণবাবু? এ সম্পত্তির পরে আমার এতটুকুও লোভ নেই, এর সর্বপ্রকার দাবিদাওয়া আমি হাসিমুখে ত্যাগ করতে রাজি আছি—এখনই, এই মুহূর্তে।

যে জিনিস চুকেবুকে গেছে, তাকে মনে করে কেন আবার দুঃখ পান! সুব্রতর কণ্ঠে অপূর্ব একটা সহানুভূতির সুর জেগে ওঠে।

কল্যাণবাবু, আপনাকে আমি একটা কথা বলব—

বলুন?

আমি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম চাই। আমার অবর্তমানে একমাত্র লাহিড়ীর প্রতি আমি বিশ্বাস রাখতে পারতাম। তার আকস্মিক মৃত্যু আমার পক্ষে যে কত বড় চরম আঘাত, তা কেউ জানে না, বুঝবেও না। তার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার যাবতীয় মনের বল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ তার অবর্তমানে আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। সামান্য কয়েকদিনের পরিচয়েই বুঝেছি আপনাকে সত্যিই বিশ্বাস করা যায়। আর একটা কথা, আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি, ঘরে বাইরে সর্বত্রই আমার শত্রু। ফলে আর কাউকেই যেন এখানে আজ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বেশ তো আপনি না হয় কিছুদিন গিয়ে কলকাতা থেকে ঘুরেই আসুন। এদিককার যা দেখাশোনার প্রয়োজন আমিই করব। কিছু ভাববেন না। তা কবে আপনি যেতে চান?

ভাবছি পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই যাব।

বেশ। তাহলে আমি নৃসিংহ গ্রামটা একবার ঘুরে আসি, আমি এলেই আপনি যাবেন। রাত্রি অনেক হল, অসুস্থ শরীর আপনার—এবারে বিশ্রাম নিন।

রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুব্রত সে রাত্রের মত উঠে দাঁড়াল।

* * *

রাত্রি বোধ করি সাড়ে এগারটা কি পৌনে বারোটা হবে।

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে রাজাবাহাদুরের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিল। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক সহসা যেন নিজেকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন।

আজকে যা ঘটল তাতে করে সুব্রতর অন্ততঃ একটা কথা মনে হচ্ছিল, আততায়ী যেই হোক না কেন, রাজবাড়ির মধ্যে গতিবিধি তার আছে এবং রাজবাড়ির সমস্ত গলিঘুঁজি তার চেনা। যার ফলে সে খুব সহজেই রাজাবাহাদুরকে আহত করে পালিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু পালাল সে কোন্ পথে? ছাদ দিয়ে তো পালাবার কোন পথ নেই, আর তাতেই মনে হয় গেছে সে রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষের ভিতর দিয়েই। প্রবেশও হয়ত ঐ পথ দিয়েই করেছিল সবার অলক্ষ্যে অতি গোপনে কোন একসময়ে। তারপর নিশানাথ! তাকে কি সত্যিই বন্দী করে রাখা হয়েছে? না নিশানাথের বিকৃত-মস্তিষ্কের উন্মাদ কল্পনা মাত্র। কিন্তু নিশানাথের স্বগত উক্তিগুলি! সামঞ্জস্যহীন বিকৃত উক্তি বলে তো একেবারে মনে হয় না? কথাগুলো যতই এলোমেলো হোক না কেন, মনে হয় না একেবারে অর্থহীন।

বাড়ির বারান্দার সামনে এসে সুব্রত চমকে ওঠে, অন্ধকারে বারান্দার ওপরে ইজিচেয়ারে কে যেন অস্পষ্ট ছায়ার মত শুয়ে, তার মুখে প্রজ্বলিত সিগারেটের লাল অগ্রভাগটি যেন কোন জন্তুর চোখের মত জ্বলছে অন্ধকারের বুকে।

সুব্রত আশ্চর্য হয়ে যায়। কে? কে তার বারান্দায় ইজিচেয়ারটার ওপর শুয়ে? এগিয়ে এসে সুব্রত বলতে যাচ্ছিল, কে!

কিন্তু তার আগেই প্রশ্ন, কে, কল্যাণ নাকি?

কে কিরীটী! সুব্রত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কখন এলি?

দিন তিনেক আগে, কিরীটী জবাব দেয়।

তিনদিন হল এসেছিস, তবে এ কদিন কোথায় ছিলি?

হারাধনের ওখানে আত্মগোপন করে।

সুব্রত পাশের একটা মোড়ার ওপরে উপবেশন করল, হঠাৎ যে?

হ্যাঁ, চলে এলাম। কারণ বুঝতে পারছি, আর খুব বেশী দেরি নেই, একটা কিছু আবার ঘটতে চলেছে।

আমারও তাই মনে হয়, তাছাড়া আজ ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছে। সুব্রত সংক্ষেপে আজ সন্ধ্যায় রাজাবাহাদুর-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে গেল।

কিরীটীকে সব শোনার পরও এতটুকু বিচলিত মনে হল না। ওর ভাব দেখে সুব্রতর

মনে হল সব কিছু শুনে যেন ও এতটুকুও আশ্চর্য হয়নি। আলস্যে একটা আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে কিরীটী বলে, থাক ওসব কথা এখন সুব্রত, রাত অনেক হল—তোর শ্রীমান থাকহরিকে দু'জনের মত রান্নার জন্য বলে দিয়েছিলাম, খোঁজ নে তো রান্না হল কিনা! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

সুব্রত উঠে গেল খোঁজ নেওয়ার জন্য। থাকহরি জানালে রান্না তৈরী বাবু।

তবে আর দেরি করিস নে, আমাদের খেতে দে, সুব্রত বললে।

আহারাদির পর ক্যাম্প খাটটার ওপর শয্যা বিছিয়ে, কিরীটী টান টান হয়ে শুয়ে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করলে।

তোর ব্যাপারটা কি মনে হয় কিরীটী? এতক্ষণে সুব্রত প্রশ্ন করল।

কোন্ ব্যাপারটা?

কেন আজকের রাজাবাহাদুরের ব্যাপারটা!

জিওমেট্রির অ্যাকসম্‌স্‌গুলোও তুই ভুলে গেছিস, things which are equal to the same thing, are equal to one another.

মানে?

মানে সেই শুরু হতে আজকের ঘটনাটি পর্যন্ত, যদি মনে মনে বিচার করবার চেষ্টা করিস তো মানে দেখবি সব একসূত্রে গাঁথা। রায়পুরের ছোট কুমার, সুহাস যাদের বা যার পরিকল্পনা মাফিক নিহত হয়েছে, সতীনাথ লাহিড়ীও তাদেরই প্ল্যান অনুযায়ী মৃত্যুবাণ খেয়েছে, কিন্তু তোদের রাজাবাহাদুরের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে খটকা লাগছে—হ্যাঁরে, হঠাৎ কিরীটী কথার মোড় ফিরিয়ে অন্য বিষয়ে চলে এল, বললে, রাজাবাহাদুরের শোবার ঘর ও নিশানাথ যে ঘরে থাকে, সে দুটো ঘরই কি একই তলায়? বাড়িটা তো সবসমেত তিনতলা লিখেছিলি! দোতলায় রাজাবাহাদুর থাকেন—নিশানাথও কি ঐ দোতলারই কোন ঘরে থাকেন, না তিনতলায় থাকেন?

তা তো ঠিক জানি না, তবে যতদূর অনুমানে মনে হয় নিশানাথের ঘর দোতলায় বা তিনতলায় নয়, দোতলা ও তিনতলার মাঝামাঝি কোথাও?

কিরীটী সুব্রতর কথায় হেসে ফেললে, মাঝামাঝি মানে? শূন্যে ঝুলছে নাকি?

তাই বলেই তো মনে হয়। বলে সুব্রত নিশানাথের কথাগুলো সুবিনয় মল্লিকের লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়েও কেমন স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল তা বললে। সুব্রতর শেষের কথাগুলো শুনে কিরীটী যেন হঠাৎ উঠে বসে চেয়ারটার ওপরে, বলে, তাই নাকি? কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল? তাহলে তো আর মনে কোন খটকাই নেই; রাজাবাহাদুরের আহত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এ দেখছি এখন তাহলে বোধ হয়

খুনীর আসল প্ল্যানটা ঠিক অন্যরকম ছিল। তা হ্যাঁরে, নৃসিংহ গ্রামে যাওয়া ঠিক তো? কিরীটী আবার অন্য কথায় ফিরে এল।

হ্যাঁ, পরশুই যাচ্ছি। আজও সে সম্পর্কে কথা হয়েছে।

হ্যাঁ, এবারে আর দেরী না করে নৃসিংহ গ্রামটা চটপট সারভে করে আয়। দু'একটা সূত্র হয়তো সেখানে কুড়িয়ে পেতে পারিস।

তোর কি মনে হয়, নৃসিংহ গ্রামের মধ্যে সত্যিই কোন সূত্র জট পাকিয়ে আছে?

ভুলে যাচ্ছিস কেন, এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের বীজ তো ওইখানেই ছিল সর্বপ্রথমে। ভেবে দেখ, শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ওইখানেই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হন। তারপর সুধীনের পিতা, তিনিও সেইখানেই নিহত হয়েছেন। দুটি ঘটনা সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে মাত্র ঘটেছে। আমি এখানে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি, তার কারণ আমি ভেবেছিলাম তোর বুঝি চাকরি ফুরলো, কেননা তোর আসল পরিচয় আর গোপন নেই। তুই ধরা পড়ে গেছিস।

সে কি!

কেন, এখনও তোর সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে নাকি? বৎস তুমি তো ধরা পড়েছই এবং তোমার ওপরে আসল হত্যাকারীর সদাসতর্ক দৃষ্টিও আছে জেনো।

কি করে বুঝলি?

তোমার মতে সকলের অজ্ঞাতে (?) যখন তুমি সতীনাথ ভবনে সৎকার্যে ব্যস্ত ছিলে, ছাতের ওপরে যে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তিনিই আমাদের এই রহস্যের আসল মেঘনাদ। এবং তার দৃষ্টি সর্বক্ষণই তোর ওপরে আছে। তাছাড়া তুই বোধ হয় জানিস না—তুই যে কারণে সতীনাথ-ভবনে আবির্ভূত হয়েছিলি ঠিক সেই একই কারণে সেই মহাত্মাও সেখানে গিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, একই সময়ে। তারপর মনে পড়ে, তোর ঘরে একদা কোন মহাত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তোর গোপন চিঠিপত্র হাতিয়ে চলে যায় সেদিন সে? ঐ একই ব্যক্তি—সেই দিনই তোর আসল পরিচয় তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে গেছে।

কথাগুলো নিঃশব্দে সুব্রত শুনে গেল। তারপর বললে, তাহলে?

চিন্তার কোন কারণ নেই। মহাপুরুষটি জানে না যে, তার পশ্চাতে একা সুব্রতই নয়, আরও একজন আছে যার চোখের দৃষ্টি এড়ানো তার পক্ষে শুধু কষ্টকরই নয়, দুঃসাধ্য। যে জিনিসটা সে হয়তো পরে তার বিবেচনা ও বুদ্ধির দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে, সেটা কিরীটী রায় তোকে এখানে পাঠাবার আগেই এমনটি হলে কি করতে হবে তা ভেবে রেখেছিল। এবং সেই মত সে কাজও করছে।

সিগার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল, কিরীটী আর একটা নতুন সিগারে অগ্নি-সংযোগ করল।

॥ সতের ॥

মামলার আরও কথা

কিরীটী ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করছিল।

আর সুব্রত ভাবছিল, ব্যাপার এখন যা বোঝা যাচ্ছে তাতে করে মনে হচ্ছে তার কাজের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। এখন সে কোন্ পথে যাবে? কোন্ পথে অগ্রসর হবে? কিরীটীর মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় বর্তমানে সে কোন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। এ সময় কোন প্রশ্ন করলে তার কাছ থেকেও কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

রাত্রি প্রায় দুটো হল, সুব্রতর দু'চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসছে, সে শয্যার উপরে টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল। শিয়রের ধারে খোলা জানালাপথে রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশির করে এসে, চোখে মুখে যেন একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়ে যায়।

সুব্রতর চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে।

কিরীটীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই, ক্যাম্প খাটের ওপরে কাত হয়ে শুয়ে সে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে টানতে লাগল।

বাইরে চৈত্রের রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। রাতের অন্ধকারে ক্রমশঃ অস্পষ্ট ভোরের আলো যেন ফুটে উঠছে। রাত্রিশেষের আবছা আলোয় পৃথিবী অস্পষ্ট, কেমন যেন অচেনা।

ঘুম আর হবে না এটা ঠিকই। একসময় কিরীটী ক্যাম্প খাটের উপর বাইরে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দার এক পাশে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে থাকহরি ঘুমাচ্ছে।

চায়ের পিপাসা পেয়েছে, এক কাপ চা হলে এখন মন্দ হত না। কিরীটী আপাদ-মস্তক চাদরাবৃত থাকহরির গায়ে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকলে, থাকহরি!

সামান্য ঠেলাতেই থাকহরির ঘুম ভেঙে যায় কিরীটীর ডাক না শুনেই।

ধড়ফড় করে থাকহরি উঠে বসে, য়্যাঁ!

এক কাপ চা খাওয়াতে পারো থাকহরি?

থাকহরি উঠে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

একটু পরেই সুব্রতর ঘুমটা ভেঙে গেল। চারদিকের অন্ধকার কেটে গিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন চেয়ে দেখলে ঘরে কিরীটী নেই।

বারান্দায় কিরীটী আপন মনে পায়চারি করছিল।

সুব্রত বাইরে এসে দাঁড়াল। সুব্রতর পায়ের শব্দে পায়চারি থামিয়ে কিরীটী ফিরে দাঁড়াল, ঘুম হল কল্যাণবাবু?

হ্যাঁ, কিন্তু এ কি! তুই কি সারাটা রাত্রি জেগেই কাটালি নাকি?

তা মানে ঘুম এল না, কি করি?

থাকহরি এক কাপ ধূমায়িত গরম চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। কিরীটী পরম আগ্রহ ভরে থাকহরির হাত থেকে গরম চায়ের কাপটা নিতে নিতে স্মিতভাবে বললে, বাঁচালে বাবা!

ও কি করে বুঝল যে তুই এত ভোরে চা পান করিস!

বুঝিয়ে দিয়েছি। চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে কিরীটী বললে, আঃ, বেশ চা-টি বানিয়েছ হে থাক! বেঁচেবর্তে থাক।

আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। সুব্রত কুয়োতলার দিকে চলে গেল।

বেলা তখন প্রায় সাতটা। ভোরের সোনালী রোদে চারিদিক যেন খুশীতে ঝলমল করছে। অকারণেই মনটা যেন আনন্দে ভরে ওঠে।

সুব্রত ও কিরীটীর মধ্যে কথাবার্তা চলছিল।

আমাকে এখানে আচমকা আসতে দেখে, নিশ্চয়ই তুই খুব অবাক হয়েছিস্ সুব্রত! কিন্তু না এসে আর আমার উপায় ছিল না। চারদিকেই ক্রমে জট পাকিয়ে উঠছে। তবে আমি আত্মগোপন করেই আপাততঃ থাকব, যাতে করে তোর কাজের কোন অসুবিধা না হয়। যদিচ তার একটা খুব কোন প্রয়োজন ছিল না বর্তমানে, তবু থাকব। একটু থেমে সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে কিরীটী বলতে থাকে, তুই যখন প্রথম এখানে আসিস আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে তখনও রূপ নেয়নি। পরে একটু একটু করে ঘটনাচক্র বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদেরও এখন ঠিক সেই ভাবে এগুতে হবে।

তুই এখানে আসার পর কি কোন নতুন সূত্র পেয়েছিস? সুব্রতই প্রশ্ন করে।

এখানে আসবার পর তো পেয়েছিই, তবে তোর চিঠিতেই আমি পেয়েছিলাম আগে।

আচ্ছা সতীনাথের হত্যাকারী কে বুঝতে পেরেছিস কি?

ঠিক কে তা এখনও বুঝতে না পারলেও, কার দ্বারা যে সেটা সম্ভব হতে পারে সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। এবং সেদিক দিয়ে যদি বিচার করিস তবে খুনী কে তা হয়ত কিছুটা বুঝতে পারবি।

কিরীটীর কথায় মনে হয় সুব্রত যেন একটু উদ্‌গ্রীবই হয়ে ওঠে, কিন্তু কোন কিছু বলে না। চুপ করেই থাকে।

কিন্তু সে কথা থাক, কিরীটী বলতে থাকে, আমাদের এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, তোকে তোর প্ল্যানমাফিক কালই নৃসিংহ গ্রামে যেতে হবে। এবং সেখানে গিয়ে যথাসম্ভব চটপট চারিদিক দেখেশুনে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোকে আবার ফিরে আসতে হবে। তুই ফিরে এলেই এখানকার তল্পিতল্পা আমরা গুটাবো। কলকাতায় এখনও আমাদের কিছু কাজ বাকি। তারপর যেতে হবে সেই সুদূর বোম্বাই। হ্যাঁ দেখ্‌, নৃসিংহ গ্রামের কাছারী বাড়ি ও তার আশপাশ খুব ভাল করে পরীক্ষা করবি, কেননা দু-দুটো খুন ঐ কাছারী বাড়িতেই হয়েছিল এবং সেখানকার পুরানো কর্মচারীরা কেউ বদলায়নি। সবাই আছে এখনও। যতদূর জেনেছি, নৃসিংহ গ্রামের কাছারী বাড়িতে শিবনারায়ণ বলে যে বৃদ্ধ নায়েবটি আছেন তিনি অনেক দিনের লোক, লোকটি শুনেছি অত্যন্ত সদাশয়ও, বয়স তাঁর বর্তমানে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে। লোকটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও তৎপর। বিবাহাদি করেননি। একটি চক্ষু (বাম) নাকি তাঁর কানা, পাথরের অক্ষিগোলক বসানো। স্থানীয় যে কয়েক ঘর সাঁওতাল ও বাউরী আছে রাজাবাহাদুরের, তারা শিবনারায়ণকে দেবতার মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এক কথায় শিবনারায়ণের তাদের প্রতি অখণ্ড প্রতাপ। রায়পুরের বর্তমান রাজাবাহাদুরের পিতা, রাজাবাহাদুর রণময় মল্লিক তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে রাজস্টেটের কয়েকজন পুরনো কর্মচারীকে, পিতার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে, কতকটা জেদাজেদি করেই কর্মচ্যুত করে নতুন কয়েকজন কর্মচারী বহাল করেন। তাদের মধ্যে শিবনারায়ণ চৌধুরী নৃসিংহ গ্রামের অন্যতম। তারপর থেকেই শিবনারায়ণ এঁদের স্টেটে চাকরি করছেন।

আর সতীনাথ লাহিড়ী? সুব্রত প্রশ্ন করে।

না, সতীনাথ সুবিনয় মল্লিকের নিযুক্ত লোক। তার পরেই কিরীটী বলে, আমিই নৃসিংহ গ্রামে যেতাম ছদ্মবেশে, কিন্তু শিবনারায়ণ আমাকে চিনে ফেলতে পারে, তাই সেখানে তোকেই যেতে হবে।

বলিস কি! শিবনারায়ণকে তুই চিনিস নাকি? সুব্রতর কণ্ঠে বিস্ময়।

চিনি, সে এক অতীত কাহিনী। সময়মত সে আর একদিন বলব। ঠিক পরিচয় না থাকলেও সে আমার নাম শুনেছে এবং আমিও তাকে ভাল করেই চিনি, তার

কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। মহাত্মাদের পরিচয় কি কখনও গোপন থাকে রে? তারা যে স্বরূপেই প্রকাশ। শিবনারায়ণের এক ছোট ভাই ছিল। নাম তার নরনারায়ণ। শিবনারায়ণের চাইতে সে প্রায় দশ-এগার বৎসরের ছোট। পরিচয়টা আমার তার সঙ্গেই, মানে নরনারায়ণের সঙ্গেই বেশী ছিল। তিনিও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন কিনা!

তার মানে?

তার মানে অতীতে একবার তার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

তাই নাকি! তা সে মহাত্মাটি এখন কোথায়? সুব্রত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

বর্তমানে তিনি বছর ছয়-সাত হল গত হয়েছেন। কোন একটি খুনের দায়ে নরনারায়ণ ধরা পড়েছিল। কোর্টে যখন বিচার চলছে, এমন সময় জেল ভেঙে প্রাচীর টপকিয়ে পালাতে গিয়ে প্রহরারত সেণ্ট্রীর বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। সাধারণত প্রহরীদের হাতের নিশানা অব্যর্থ হয় না, কিন্তু কি জানি, নরনারায়ণের বেলায় it was a success, বোধ হয় ঐভাবে তার মৃত্যু ছিল বলেই।

এসব কথা তো কই এতদিন তুই আমায় জানাসনি?

মনে ছিল না তাই। পুরাতন ডাইরীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, কয়েক দিন আগে সব জানতে পারলাম। তবে হ্যাঁ, কথাটা তাহলে তোকে খুলেই বলি স্পষ্ট করে। সেখানে গিয়ে একটা কথা কিন্তু সর্বদা মনে রাখিস। গোখরো সাপের চাইতেও সাংঘাতিক ঐ শিবনারায়ণ চৌধুরী লোকটা। খুব হিসাব করে পা ফেলবি। সামান্য এতটুকু ভুল হয়েছে কি, আর রক্ষা নেই—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-ছোবল দেবে সে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

সূত্র সন্ধান

যে-দিনের কথা বলছিলাম।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরের দিকেও আবার সুব্রত ও কিরীটীর মধ্যে সকালের আলোচনারই জের চলছিল। কিরীটী বলছিল, তোদের হারাধন—জগন্নাথের দাদু মনে হয় লোকটা অনেক কিছু জানে কিন্তু শোকে তাপে জর্জরিত হয়ে সে একেবারে নিজেকে এখন গুটিয়ে ফেলেছে। মাথায় হয়ত তার এখন সামান্য বিকৃতিও ঘটেছে, কিন্তু সেটা কিছুই নয়। এককালে লোকটা এদিকটায় নামকরা একজন আইনজীবী ছিল। তুই জানিস না এবং তোকে বলাও হয়নি, হারাধনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার বেশ পরিচয়ও হয়েছে। এখানে আসবার পর, দিন দুই গোপনে হারাধনের ওখানেই ছিলাম, সে কথা তো আগেই বলেছি। যাক্, প্রথমটায় সে ধরা দিতে চায় না, কিন্তু যে মুহূর্তে তার দুর্বলতায় আঘাত করেছি, সে নিজেকে একবারে সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে মেলে ধরেছে। তার সব চাইতে বড় দুর্বলতাটা টের পেতে আমার খুব বেশী সময় লাগেনি, মাত্র ঘণ্টা চার-পাঁচ লেগেছিল। কিরীটী বলতে থাকে, শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের পিতা ও হারাধন মল্লিকের পিতা ছিলেন সহোদর ভাই। কিন্তু হারাধনের পিতা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হারাধন সে কথাটা আজও ভুলতে পারেনি। একটা অদৃশ্য ক্ষতের মত এখনও তার মনের মধ্যে সেটা মাঝে মাঝে রক্তক্ষরণ করে আর বুকের ভিতরটা তার টনটন করে ওঠে। কথাপ্রসঙ্গে বুঝতে পেরে তার সেই ব্যথার জায়গাতেই আঘাত দিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে যা বলবার বলতে শুরু করে। টাকাপয়সার প্রয়োজন বা অভাব আজ আর তার নেই বটে, কিন্তু একদা যে অর্থ সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে হাত পিছলিয়ে নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল, তার শোকটা আজও মন থেকে তার মুছে যায়নি। হারাধনের যতটা নয়, তার চাইতেও ঢের বেশী আর একজন—অসম্ভব জেনেও সেই অর্থের আশা আজ পর্যন্ত ত্যাগ করে উঠতে পারল না।

কার কথা বলছিস?

কিরীটী অল্প একটু থেমে, সুব্রতর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলতে লাগল, তারপর শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের সেই উইল, যার আভাস সুধীনের মা সুহাসিনীর কাছ থেকে

সর্বপ্রথম আমরা জানতে পারি। ভেবেছিলাম এবং সুহাসিনীও বলেছিলেন যার অস্তিত্ব নাকি একমাত্র তাঁর শ্বশুর, এ দের স্টেটের নায়েবজী শ্রীনিবাস মজুমদার ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতেন না, কথাটা ভুল। আরও একজন জানতেন—ঐ হারাধন, সেই উইলের কথা জানতেন। কারণ সে উইল যখন লেখা হয় আইনজ্ঞ হিসাবে ও অন্যতম সাক্ষী হিসাবে শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মশাই হারাধনের সাহায্য নিয়েছিলেন। অথচ একথা স্বয়ং শ্রীনিবাস মজুমদার মশায়ও জানতেন না, যদিচ তিনি উক্ত উইলের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

সে উইলে কি লেখা ছিল জানতে পেরেছিস কিছু?

হ্যাঁ, সামান্য। হারাধন বিশদ ভাবে খুলে আমাকে সব কিছু বলেননি বটে; তবু যতটুকু জেনেছি সেও আমার অনুমান মাত্র। হারাধনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় কেবলমাত্র বলেছিলেন, যা চুকেবুকে গেছে অনেকদিন এবং যার অস্তিত্বই এ জগতে কোনদিন প্রকাশ পেল না, আজ আবার সেই ভুলে যাওয়া পুরনো কাহিনীর জের টেনে এনে, নতুন করে অমঙ্গলের বীজ আমি বপন করতে চাই না রায় মশাই। সে উইল কোন দিন আত্মপ্রকাশ করে, এ বিধাতারই বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল না, নচেৎ সব হয়েও এমনি করে ভণ্ডুলই সেটা হয়ে গেল কেন? তাছাড়া নিয়তি যেখানে বাদ সেধেছে, মানুষের পুরুষকার সেখানে ব্যর্থ হবেই, ইত্যাদি। এরপর আমিও দ্বিতীয় অনুরোধ তাকে করিনি। কেননা শুধুমাত্র সুহাসিনীর কথা আদালত মেনে নিতে চাইত না, বিশেষ করে তিনি আবার যখন আসামীর মা। সেক্ষেত্রে হারাধনের সাক্ষীর একটা মূল্য আছে। সেই মূল্যটুকুই আমাদের যথেষ্ট বর্তমান রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে। তার বেশী হারাধনের কাছে আমি আশাও রাখি না। এই সব কারণেই তোকে বলেছিলাম চিঠিতে হারাধনের প্রতি নজর রাখতে।

কিরীটীকে আজ যেন বলার নেশায় পেয়েছে, সে আবার বলে চলে, সতীনাথ লাহিড়ীর মৃত্যু—এটাও খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ সুহাসের মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপারে, সতীনাথ ছিল খুনীর দক্ষিণ হস্ত এবং সমস্ত ব্যাপারটাই সুপরিকল্পিত চমৎকার একটা ষড়যন্ত্র। কোথাও তার এতটুকু গলদও খুনী বা চক্রান্তকারীরা রাখতে চায়নি। অবিশ্যি তোকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সুহাসের নৃশংস হত্যার ব্যাপারের আসল মেঘনাদ বা পরিকল্পনাকারী, সেবার যেমন প্রমাণের অভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গিয়েছিল, এবারও প্রমাণ যোগালেও তেমনিই হয়ত থেকে যাবে। কারণ সে কেবল যুগিয়েছে পরিকল্পনাটুকু। অর্থাৎ, কেমন করে কি উপায়ে সুহাসকে এ পৃথিবী থেকে সকলের সন্দেহ বাঁচিয়ে সরিয়ে ফেলতে পারা যাবে! চতুর-চূড়ামণি সে। কিন্তু এত করেও

সে ফাঁকি দিতে পারেনি দুজনের চোখ—আমার ও আর একজনের। অথচ দুর্ভাগ্য এমন সেই দ্বিতীয়জন পারলেও আমি পারব না তাঁকে ফাঁসাতে এই তদন্তের ব্যাপারে, সেইটাই আমার সব চাইতে বড় দুঃখ থেকে যাবে হয়ত চিরদিন।

তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিলেই তো হয়! সুব্রত উৎসুক কণ্ঠে বলে।

তা আজ আর সম্ভব নয়। সেইখানেই তো সব চাইতে বড় মুশকিল।

সম্ভব নয় কেন?

এমন সময়ে ঘরের বাইরে বিকাশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কল্যাণবাবু আছেন নাকি?

কে, বিকাশবাবু নাকি! আসুন, আসুন।

বিকাশ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দিনের আলো একটু একটু করে নিভে আসছিল, দিনশেষের ঘনায়মান ম্লান স্বল্পালোকে ঘরখানিও আবছা হয়ে আসছে।

থাকহরি, একটা বাতি দিয়ে যা! সুব্রত চিৎকার করে বলে।

যাই বাবু, পাশের ঘর থেকে থাকহরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বসুন বিকাশবাবু, সুব্রত আহ্বান জানালে।

বিকাশবাবু ঘরের আবছা অন্ধকারে কিরীটীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল।

আমার বন্ধু কিরীটী রায়, আর ইনি এখানকার থানা-ইন্‌চার্জ বিকাশ সান্যাল। সুব্রত পরিচয় করিয়ে দেয়।

কে, কিরীটীবাবু? নমস্কার নমস্কার। কবে এলেন? আজই বোধ হয়! আনন্দ ও শ্রদ্ধা যেন বিকাশের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে একসঙ্গে।

কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ, নমস্কার মিঃ সান্যাল।

থাকহরি একটা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল।

কিরীটীবাবু, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি, সাক্ষাৎ আলাপের সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত আমার হয়নি যদিও।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল মাত্র।

যা হোক, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ওদের কথাবার্তা আবার জমে ওঠে।

কিরীটী আবার একসময় বলতে থাকে, সুব্রত, তুই এখানে আসবার পর, আমাকে আরও দু-একবার একাই জাস্টিস মৈত্রর বাড়ি যেতে হয়। এবং এ-কথা হয়ত তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, মামলার সময় একদিন, মামলার জেরায় প্রকাশ পায়, সুহাস যেদিন ৩১শে ডিসেম্বর রায়পুরে রওনা হয়, সেদিন নাকি সুধীন সুহাসকে একটা অ্যানটিটিটেনাস

ইন্‌জেকশন দিয়েছিল। জবানবন্দিতে সুধীন বলেছিল, আগের দিন নাকি কলেজে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে, ব্যাটের আঘাত লেগে, সুহাসের ডান পায়ে হাঁটুর কাছে অনেকটা কেটে যায়। তাছাড়া একবার সুহাস টিটেনাস রোগে ভুগেছে, তাই সাবধানের জন্যও টিটেনাস রোগের প্রতিষেধক হিসাবে, সুধীন সুহাসকে একটা অ্যানটিটিটেনাস ইন্‌জেকশন দেওয়ার সময় নাকি হঠাৎ মালতী দেবী ও সুবিনয় মল্লিক এসে ঘরে প্রবেশ করেন। মালতী দেবীই প্রশ্ন করেন, ও কিসের ইন্‌জেকশন আবার নিচ্ছিস! তাতে সুহাস কোন জবাব দেয় না। পরে মামলার সময় আদালতে ঐ কথা উঠলে, সুধীনকে জিজ্ঞাসা করায় সুধীন জবাব দেয়, হ্যাঁ, তাকে সে একটা অ্যানটিটিটেনাস ইন্‌জেকশন দিয়েছিল বটে ৩১শে ডিসেম্বর। কিন্তু পরে এমন কোন কথাই প্রমাণ হয়নি যে সুহাস তার আগের দিন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আহত হয়েছে! ঐদিন সুহাসের সঙ্গে খেলার মাঠে যারা ছিল তারাও কেউ জানে না, সুহাস কোনরকম আঘাত পেয়েছিল কিনা। এমন কি স্বয়ং মালতী দেবী পর্যন্ত সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারেননি। বিপক্ষের উকিলের মতে, সত্যিই যদি সুহাসকে প্লেগের বীজাণু ইন্‌জেক্ট করে মারা হয়ে থাকে, তাহলে সুধীনই নাকি ঐ সময় সেটা সুহাসের শরীরে অ্যানটিটিটেনাসের সঙ্গে ইনজেক্ট করেছিল।

সর্বনাশ! এ তো আমি জানতাম না। বিকাশ বলে।

কেন, ঐটাই তো সুধীনের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ! সুব্রত বললে।

এবং ঐ ব্যাপারটাই ভাল করে যাচাই করবার জন্যই আমি জাস্টিস মৈত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সুধীন তার জবানবন্দিতে যা বলেছে, সেটাও তার বিরুদ্ধেই গেছে। সে বলেছে, সেদিনই সন্ধ্যায় সুহাসের কাছে ও জেনেছিল, সুহাস ক্রিকেট খেলতে গিয়ে নাকি আহত হয়েছে এবং তখুনি সে তাকে অ্যানটিটিটেনাস ইন্‌জেকশন দিতে চায়, তাতে নাকি সুহাস আপত্তি করে। কিন্তু পরের দিন স্বেচ্ছায় সুধীন একটা অ্যানটিটিটেনাস সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তাকে অনেকটা জোর করে ইন্‌জেকশন দেয়। আগের দিন সন্ধ্যায় খেলার মাঠ হতে ফেরবার পথেই নাকি সুহাস হসপিটালে গিয়েছিল গাড়ি করে। অথচ ড্রাইভার সে-কথা অস্বীকার করে, সে বলে, সুহাস সোজা নাকি বাড়িতেই চলে আসে। কথায় বলে 'দশচক্রে ভগবান ভূত'—এর বেলাতেও হয়ত তাই হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এবং জাস্টিস মৈত্রেরও বিশ্বাস, ড্রাইভার এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেছে। প্রমাণ করতে হলে অবিশ্যি আমাদের প্রমাণ করতে হবে, সত্যিই সে ৩১শে ডিসেম্বর সুহাসকে অ্যানটিটিটেনাস ছাড়া অন্য কিছু ইন্‌জেকশন দেয়নি! আমার নিজের এখানে আসবার অন্যতম কারণও তাই। জেরা করবার সময় আদালত একজনকে কয়েকটি অতি আবশ্যকীয় প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে, সেটা আমি এখন জিজ্ঞাসা করতে

চাই। আসলে মৃত পাবলিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর গগন মুখার্জীর মৃত্যুতে মামলাটা সব আদ্যপান্ত ওলটপালট হয়ে গেছে। সাজানো দাবার ছক্ উল্টে দিয়ে আবার নতুন করে ছক সাজানো হয়েছিল। ফলে নির্দোষীর হল সাজা, আর দোষী পেল মুক্তি।

কিন্তু সেটা কি এখন আবার সম্ভব হবে? বিকাশ প্রশ্ন করে।

কেন হবে না? বর্তমানের এই রাজবাড়ির হত্যা-রহস্যের তদন্ত-ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে সেই শুরু হতে জবানবন্দি শুরু করে, ধীরে ধীরে আমাদের ফিরে যেতে হবে বর্তমান রহস্যের মূলে, সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো কাহিনীতে; এবং সেটাই আমার বর্তমানের উদ্দেশ্য।

কিরীটী আবার একটু থেমে বলে, পৃথিবীতে যত প্রকার অন্যায় ও পাপানুষ্ঠান দেখা যায় সেগুলোর মূলে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সবই প্রায় মানুষের কোন-না-কোন বিকৃত কল্পনার দ্বারা গড়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা থেকেই যেমন জন্ম নেয় শ্রেষ্ঠ কাব্য, কবিতা ও সাহিত্য, তেমনি কল্পনা থেকেই আবার জন্ম নেয় যত প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ ও অন্যায়। কেউ পাপ করে অর্থের লোভে, কেউ প্রতিহিংসায়, কেউ বা আবার বিকৃত আনন্দানুভূতির জন্য। শেষোক্ত ধরনকেই আমরা বলি 'অ্যাবনরম্যাল'। রায়পুরের হত্যারহস্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তার মূলে ১নং হচ্ছে অর্থের লোভ; ২নং খুনের নেশা। এবং যে বা যারা খুন করেছে, সেই খুনীর পক্ষে সেই নেশা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খুনী এখন তার নিজের যুক্তির বাইরে। ৩নং এ পৃথিবীতে অনেক সময় দেখা গেছে, আমরা আমাদের কোন বিশেষ কাজের দ্বারা কারও ভাল করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মন্দ বা খারাপটাই করি। এবং সেটা যে সময় সময় মানুষের জীবনে কত বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়, তা ভাবলেও হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে কি হয়েছে জানিস, ঐ যে কথায় বলে না, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তার হেলে গরু কিনে—এও হয়েছে কতকটা তাই!

সুব্রত অবাক বিস্ময়েই কিরীটীর আজকের কথাগুলো শুনছিল, এ-কথা অবিশ্যি ও ভাল ভাবেই জানে, মাঝে মাঝে কিরীটী এমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই চলে যায়। সেই সময় সামান্য একটু বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বললেই হয়ত সব বোঝা যায়, কিন্তু নিজেকে কেমন যেন একটা রহস্যের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে অস্পষ্ট করে তুলতে সে যেন একটা অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে। এবং সে ক্রমে এমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেষটায় মনে হয়, সে বুঝি বা যা খুশি আবোলতাবোল বকে যাচ্ছে। সুব্রত দু-একবার ইতিপূর্বে কিরীটীকে সে-কথা বলেছেও, কিরীটী তার স্বভাবসুলভ মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলেছে, যখন কোন রহস্য নিয়ে কারবার করছ, তখন নিজেও রহস্যময় হয়ে ওঠা চাই এবং তা যদি হতে পার,

তাহলেই সেই রহস্যটাকে উপভোগ করতে পারবে। কখনও ভুলে যেও না যে, তুমি একজন রহস্যভেদী। তুমি বুদ্ধিমান, বুদ্ধির খেলায় অবতীর্ণ হয়েছ; সাধারণের চাইতে তুমি অনেক ওপরে। এ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, এ বুদ্ধির প্রতিযোগিতা।

॥ দুই ॥

নৃসিংহ গ্রাম

পরের দিন প্রত্যুষেই সুব্রত সাইকেলে চেপে নৃসিংহ গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল। কিরীটী এ কটা দিন আর সুব্রতর ওখানে একা একা থাকবে না এবং সেটা ভালও দেখায় না; অনেকেরই হয়ত সন্দেহের উদ্রেক করবে, তাই বিকাশের ওখানে গিয়েই উঠল। ঠিক হল সুব্রত নৃসিংহ গ্রাম থেকে ফিরে এলে, অবস্থা বিবেচনা করে যা হোক তখন একটা ব্যবস্থা করলেই হবে'খন। রায়পুর থেকে নৃসিংহ গ্রাম প্রায় আটত্রিশ-উনচল্লিশ মাইলের কিছু বেশী হবে। যানবাহনের মধ্যে এক গরুর গাড়ি, প্রায় দু-তিনদিনেরও বেশী পথ; তাছাড়া রায়পুর থেকে ট্রেনে চেপে দুটো স্টেশন পরে ছোট একটা স্টেশনে নেমে মাইল চোদ্দ-পনের ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া যায়। শেষোক্ত উপায়েই বেশীর ভাগ সকলে নৃসিংহ গ্রামে যাতায়াত করে। বিশেষ করে রায়পুরের রাজবাড়ির লোকেরা। গরুর গাড়ি যাতায়াতের জন্য যে পথটা আছে, সেটা একটা অপরিসর কাঁচা রাস্তা, মাইল পনের-ষোল গেলেই ঘন শালবন। প্রায় পাঁচ-ছ মাইল লম্বা শালবন পেরুলেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল; জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু একটা রাস্তা চলে গেছে। রাজাবাহাদুর যখন নৃসিংহ গ্রামে যান, মোটরে চেপে ঐ রাস্তা দিয়েই যান। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে পাঁচ-ছ মাইল রাস্তা, ঐ রাস্তাটা যেমন বিপদসংকুল তেমনি দুর্গম।

জঙ্গল পার হলে, মাইল পনের-ষোল গিয়ে এদের—মানে রায়পুর স্টেটের একটা ছোটখাটো শালকাঠের কারখানা আছে। সেখানে শালবন থেকে গাছ কেটে এনে কাঠ চেরাই ইত্যাদি হয়। তারপর সেখান থেকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে দূরবর্তী রেল স্টেশনে চালান দেওয়া হয়। কাঠের কারখানা থেকে নৃসিংহ গ্রামটির দূরত্ব প্রায় মাইল খানেক হবে। স্টেটের যতগুলো মহাল আছে, তার মধ্যে নৃসিংহ গ্রামই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

জায়গাটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে মাইল দুয়েকের বেশী হবে না। চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়। ছোট একটি পাহাড়ী নদী আছে, তার উৎস ওরই একটি পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসা ঝর্ণা।

আর আছে পাহাড়ের উপরে ছোট একটি গুহার মধ্যে পাথরের তৈরী একটি নৃসিংহ দেবের মূর্তি। সেই জন্যই জায়গাটির নাম নৃসিংহ গ্রাম হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ধারণা যে নৃসিংহদেবের মূর্তিটি নাকি অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতি শনিবার সেখানে সকলে পুজো দিয়ে আসে। তাছাড়া চৈত্র-পূর্ণিমাতে খুব ধুমধাম করে একবার পূজা হয়। সে-সময় সেখানে ছোটখাটো একটা মেলাও বসে। স্থানীয় অধিবাসীরা বেশীর ভাগই সাঁওতাল ও বাউরী। দু-চারঘর পাহাড়ীও আছে। বেশীর ভাগ লোকই স্টেটের শালকাঠের কারখানায় কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে। সামান্য চাষ-আবাদও আছে। স্থানটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। সেইজন্যই হয়ত সুদূর অতীতে কোন একসময় রাজাদের কোন পূর্বপুরুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার ইচ্ছায় প্রকাণ্ড একটি প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। বহুদূর থেকে প্রাসাদের চুড়া দেখা যায়। প্রাসাদটি মুসলমান আমলের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন দেয়। শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের পিতাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার মাস নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদে এসে কাটিয়ে যেতেন। শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের সময় হতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম শুরু হয়। তারপর শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের ও সুধীনের পিতার মৃত্যুর পর আর বিশেষ কেউ একটা নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদে এসে দু-একদিনের বেশী কাটায়নি। প্রাসাদেরই এক অংশে এখন কাছারী বাড়ি করা হয়েছে।

এখানকার নায়েব বা ম্যানেজার শিবনারায়ণ চৌধুরী নিজের ইচ্ছায় যতটা করেন সেই মতই সব হয়। শিবনারায়ণের কোন কাজের সমালোচনা রাজাবাহাদুর স্বয়ংও কোন-দিন করেন না।

সুব্রত কতকটা ইচ্ছা করেই ট্রেনে না গিয়ে সাইকেলে চেপে রওনা হয়েছিল। আটত্রিশ-ঊনচল্লিশ মাইল পথ এমন বিশেষ কিছুই নয়। তাছাড়া যেতে যেতে চারপাশ ভাল করে দেখতে দেখতেও যাওয়া যাবে। আসবার সময় রাজবাড়ি থেকে বন্দুক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সুব্রত মৃদু হেসে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। সঙ্গে এনেছে একটা সাত সেলের হানটিং টর্চ; একটি দোফলা বড় ছুরি, একটা দড়ির মই ও সামান্য টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিসপত্র। প্রথম দিকে বেশ একটু বেগের সঙ্গেই সাইকেল চালিয়ে সুব্রত বেলা প্রায় গোটা দশেকের মধ্যেই জঙ্গলের মাঝামাঝি পৌঁছে গেল।

বেশ ঘন জঙ্গল। দিনের বেলাতেও বড় বড় পত্রবহুল বৃক্ষ সূর্যের আলোকে প্রবেশা-ধিকার দেয় না। আগে নাকি এই বনে বাঘও দেখা যেত, এখনও যে একেবারে নেই তা নয়, ক্বচিৎ কখনও দু-একটা দেখা যায়। হাতী আছে, আর আছে বন্য বরাহ ও হরিণ।

বনের মধ্য দিয়ে যে পথটি চলে গেছে, অতিকষ্টে সে পথ দিয়ে একটা টুরার মোটর

গাড়ি যেতে পারে। পথটিকে পায়ে চলা পথ বলাই উচিত।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা বড় গাছের তলায় বসে সুব্রত সঙ্গে করে টিফিন-ক্যারিয়ারে ভর্তি করে যে লুচি-তরকারী এনেছিল তার সদ্ব্যবহার করলে।

আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সুব্রত আবার রওনা হল। জঙ্গল পেরিয়ে শালবনে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা প্রায় তিনটে হয়ে গেল। সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। শালবনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সুব্রত সাইকেল চালিয়ে চলে। চৈত্রের ঝরা পাতায় চারদিক ঢেকে গেছে; মধ্যাহ্নের মন্থর বাতাসে ঝরা পাতাগুলি উড়ে উড়ে মর্মর-ধ্বনি তোলে, উদাস-করুণ চৈত্ররাগিনী যেন।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ভেসে আসে মাঝে মাঝে ঘড়িয়ালের উদাস মন্থর ডাক।

হেথা হোথা বুনো কবুতরের মৃদু গুঞ্জন। শালবনের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ কুটজ কুসুমের মন-ভোলানো শোভা। ফিকে বেগুনি ও ধূলোট সাদা রংয়ের অজস্র ফুল ধরেছে তাতে গুচ্ছে গুচ্ছে।

বাতাসে তীব্র একটা কটু গন্ধ ভাসিয়ে আনে। রঙিন মধুলোভী প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে। সুব্রতর কেমন যেন নেশা লাগে। সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে চলে সে।

সূর্য যখন পশ্চিমে একেবারে হেলে পড়েছে, চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার বিষণ্ণ বিধুর ছায়া, সুব্রত এসে নৃসিংহ গ্রামে প্রবেশ করল। কোথায় একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়।

শিবনারায়ণকে আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, প্রাসাদের সামনে প্রশস্ত চত্বরে এসে সুব্রত পা-গাড়ি হতে নামল।

অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে কে একজন দীর্ঘ অস্পষ্ট ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত তাকেই প্রশ্ন করল, নায়েব চৌধুরী মশায় কোথায় বলতে পারেন?

ছায়ামূর্তি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলে, আমারই নাম শিবনারায়ণ চৌধুরী, মহাশয়ের নামটি কি জানতে পারি কি? কোথা হতে আগমন হচ্ছে?

কল্যাণ রায়, রায়পুর থেকে আসছি।

ও, আপনিই কল্যাণ রায়! আসুন, নমস্কার। শিবনারায়ণের কণ্ঠস্বর আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। তারপরই চিৎকার করেন, ওরে দুঃখীরাম সুখন—আলো জ্বালিসনি এখনও? আসুন কল্যাণবাবু, ভেতরে আসুন, আপনারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। পা-গাড়ি ওখানেই থাক, ওরাই তুলে রাখবে'খন।

॥ তিন ॥

শিবনারায়ণ!

ক্লান্তপদে বারান্দা অতিক্রম করে সুব্রত মস্তবড় একটি হলঘরে প্রবেশ করে নায়েব শিব-নারায়ণের পেছনে পেছনে।

সিলিং থেকে একটি বেলোয়ারী চোদ্দ বাতির ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তারই মধ্যে গোটা দুই বাতি জ্বলছে। এবং দুই বাতির আলোতেই ঘরে আলোর কমতি নেই। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে খাট পাতা, তার উপরে ধবধবে পরিষ্কার ফরাস পাতা। একধারে খানকয়েক চেয়ার ও আরাম-কেদারাও আছে। দু'পাশে দুটি বড় বড় কাঠের আলমারি ও র‍্যাক। র‍্যাকে মোটা খেরো-বাঁধানো সব খাতা সাজানো। সুব্রত ফরাসের ওপরে বসে পড়ল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল সে।

আগাগোড়াই সাইকেলে এলেন বুঝি? শিবনারায়ণ প্রশ্ন করলেন।

সুব্রত এতক্ষণে ভাল করে ঘরের আলোয় শিবনারায়ণের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকাল। লম্বা, অত্যন্ত বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের অনুপাতে শরীর এখনও এত মজবুত যে মনে হয়, শরীর যেন বয়েসকে প্রতারণা করে ঠেকিয়ে রেখেছে, কোনমতেই কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

বাঁ চোখের স্থির দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায়, অক্ষিগোলকটি পাথরের তৈরী, কৃত্রিম।

খুব পরিশ্রান্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই কল্যাণবাবু, চা আনতে বলি! না হাত-মুখ ধুয়েই একেবারে চা পান করবেন?

আগে তো এখন এক কাপ হোক, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে না হয় আবার হবে।

বেশ। হাসতে হাসতে শিবনারায়ণ তখুনি ভৃত্যকে চা আনতে আদেশ করলেন। তারপর আবার একসময় সুব্রতর দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মাছ-মাংস চলে তো?

তা চলে। সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

ফাউলের ব্যবস্থা করেছি। আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, দুবেলাই হবিষ্যান্ন করি, তবে অতিথি-অভ্যাগতদের কখনও বঞ্চিত করি না।

জায়গাটায় আমি বিশেষ করে বেড়াতেই এসেছি চৌধুরী মশাই।

তা বেড়াবার মতই জায়গা বটে, চারদিকের দৃশ্য খুবই মনোরম। আমি তো একুশটা বছর এখানেই কাটালাম কল্যাণবাবু। জায়গাটা সত্যি বড় ভাল লাগে। একটু পরেই

চাঁদ উঠবে। প্রাসাদের ছাদের ওপরে দাঁড়ালে আশপাশের পাহাড়গুলো চমৎকার দেখায়।

* * *

আহারাদির পর দোতলায় যে ঘরটিতে সুব্রতর শয়ন ও থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, চৌধুরী নিজে সঙ্গে করে সুব্রতকে সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

উপরের তলায় প্রায় খানপাঁচেক ঘর, তারই একটি ঘর চৌধুরী নিজে ব্যবহার করেন। এবং অন্য একটিতে অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়। বাকি ঘর-গুলো প্রায় বন্ধই থাকে। তিনতলায় খান-দুই ঘর আছে, রাজাবাহাদুর এলে তখন সেই ঘর দুটিই অধিকার করেন। একতলা হতে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সর্বপ্রথম যে ঘরটি, চৌধুরী সেটি ব্যবহার করেন। লম্বাগোছের একটি বারান্দা, সেই বারান্দাতেই ঘরগুলি পর পর। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি প্রশস্ত ছাদ। চারিপাশে তার উঁচু প্রাচীর দেওয়া। ছাদের দক্ষিণ দিকে বহুদিনকার পুরাতন একটি শাখাপ্রশাখাবহুল সুবৃহৎ বটবৃক্ষ। অনেকগুলো ডালপালা পত্রসমেত ছাদের ওপরে এসে নুয়ে পড়েছে। বারান্দার শেষ প্রান্তে ঠিক ছাদের সামনেই যে ঘরটি সেইটিতেই সুব্রতর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সুব্রত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করছিল, তথাপি নতুন জায়গায় ঘুম কোনদিনই সহজে তার আসতে চায় না। বাড়ির পিছন দিকে মুখ করে যে খোলা জানলাটা, সুব্রত তার সামনে এসে দাঁড়াল। কাঠের কারবারের জন্য এদের গোটাতিনেক হাতী আছে, খোলা জানালাপথে সেই হাতীশালা দেখা যায়।

বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলো, ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিচ্ছে।

রাত্রি কটা হবে? হাতঘড়ির দিকে সুব্রত তাকিয়ে দেখলে, রাত্রি প্রায় বারোটা। ঠিক এমনি সময় কাছারীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করলে। চারিদিক নিষুতি রাতের স্তব্ধতায় যেন থমথম করছে।

সুব্রত আনমনে শিবনারায়ণ চৌধুরীর কথাই ভাবছিল। একটিমাত্র চক্ষুও যে তার কতখানি সজাগ, প্রথম দর্শনেই সুব্রতর তা বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয়নি।

আচমকা এমন সময় একটা অতি সুস্পষ্ট করুণ কান্নার ধ্বনি সুব্রতর কানে এসে বাজল।

সুব্রত চমকে ওঠে, কে কাঁদে? না তার শোনবার ভুল? না, শোনবার ভুল নয়! ঐ তো কে গুমরে গুমরে কাঁদছে! সুব্রতর শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে ওঠে। কে কাঁদে? এই নিশীথ রাত্রির নির্জনতায় কে অমন করে গুমরে গুমরে কাঁদে! কেন কাঁদে!···ভাল করে কান পেতে শুনেও যেন ও বুঝে উঠতে পারে না, কোথা থেকে সে কান্নার শব্দ আসছে! সুব্রত ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ায়।

খাঁ খাঁ করছে বারান্দাটা, চাঁদের ম্লান আলো এসে বারান্দার ওপরে লুটিয়ে পড়ে যেন ঘুমিয়ে আছে। কোথাও এতটুকুও সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই।

কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বড় করুণ। পা টিপে টিপে সুব্রত বারান্দা দিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। এ বাড়ির কিছুই তো সুব্রত জানে না, কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে, কেমন করেই বা তা ও টের পাবে! সুব্রত স্থাণুর মতই সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একান্ত অসহায়ভাবে কান্নার শব্দ শোনে। নানাপ্রকারের এলোমেলো চিন্তা মনের কোণায় এসে উঁকিঝুঁকি দেয়। এই বাড়িরই কোন এক ঘরে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ও সুধীনের হতভাগ্য পিতা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন একদা। এ হয়ত তাঁদেরই অদেহী অতৃপ্ত আত্মার করুণ বিলাপধ্বনি। হয়ত এমনি করেই আজও তাঁরা এই প্রায়-পরিত্যক্ত প্রাসাদের ঘরে ঘরে কেঁদে কেঁদে ফেরে মুক্তির জন্য। এখনও হয়ত যে ঘরে রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে অসহায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তার ধূলিমলিন মেঝের ওপরে রক্তধারা শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে।

অন্ধকারে ছাতের কার্নিশে বোধহয় একটা ইঁদুর সরসর করে হেঁটে যায়। ছাদের ওপাশে বটবৃক্ষের পাতায় পাতায় নিশীথ হাওয়ার মর্মরধ্বনি জাগায়। কোথায় একটা রাতজাগা পাখী উ-উ করে একটা বিশ্রী শব্দ করে ডেকেই আবার থেমে যায়। সুব্রতর সর্বাঙ্গ যেন সহসা সিরসির করে কেঁপে উঠে।

এ যেন এক অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী। অন্ধকারে স্তব্ধ নির্জনতায় প্রেতাত্মার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে আনে। চারিদিকে এর মৃত্যুর হাওয়া। বিষাক্ত মৃত্যুবিষ ছড়িয়ে আছে এর প্রতি ধূলিকণায়। অদেহী আত্মারা এর ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন। কিরীটী বলেছে, রায়পুরের রাজবংশে যে মৃত্যুবীজ সংক্রামিত হয়েছে, সে বীজ প্রথম রোপিত হয়েছিল এই প্রাসাদেরই কোন কক্ষে।

কিসের যেন একটা সম্মোহন সুব্রতকে অদৃশ্য তন্তুর মত চারপাশ হতে জড়িয়ে ফেলছে। কার পায়ের শব্দ না? হ্যাঁ, ঐ তো পায়ের শব্দ! কে যেন কোথায় অত্যন্ত অস্থির পদে কেবলই হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর বেড়াচ্ছে। কান্নার ধ্বনি আর শোনা যায় না। থেমে গেছে সেই কান্নার ধ্বনি। যে কাঁদছিল সে হয়ত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পায়ের শব্দটা—সেটা তো এখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!

* * *

শিবনারায়ণের ডাকে যখন সুব্রতর ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সকাল সাড়ে আটটা হবে। খোলা জানালাপথে অজস্র রোদ এসে ঘরের মধ্যে যেন আলোর বন্যা জাগিয়ে তুলেছে।

খুব ঘুমিয়েছে সুব্রত। এত বেলা হয়ে গেছে! গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন আর নেই।

সকালের প্রসন্ন সূর্যালোকে চারিদিক যেন শান্ত স্নিগ্ধ।

সামনেই দাঁড়িয়ে শিবনারায়ণ চৌধুরী। কিছুক্ষণ আগে হয়ত প্রাতঃস্নান শেষ করেছেন। মাথার বড় বড় বাবরী চুল অত্যন্ত পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরিধানে ধব্‌ধবে একখানি সাদা ধুতি। গায়ে বেনিয়ান। পায়ে বিদ্যাসাগরী শুঁড়তোলা চটিজুতো। প্রসন্ন হাসিতে মুখখানি যেন ঝলমল করছে।

ঘুম ভাঙল কল্যাণবাবু? রাতে বুঝি ভাল ঘুম হয়নি?

না, বেশ ঘুম হয়েছিল। অনেকটা পথ সাইকেল হাঁকিয়ে একটু বেশী পরিশ্রান্তই হয়েছিলাম কিনা। আপনার তো দেখছি স্নান পর্যন্ত হয়ে গেছে!

হ্যাঁ, দিনে আমি তিনবার স্নান করি—তা কি গ্রীষ্ম, কি শীত। আমাকে এখুনি একবার কাঠের কারখানায় যেতে হবে। কয়েক হাজার মণ কাঠের চালান আজকালের মধ্যেই যাবে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে—ফিরতে আমার বিকেল হবে, আজকের দিনটা আপনি বিশ্রাম নিন। কাল সকাল পর্যন্ত আমি এদিককার কাজ সেরে ফেলতে পারব, তখন কাগজপত্র দেখাব, কি বলেন?

বেশ তো। ব্যস্ততার কি এমন আছে! সুব্রত বলে।

না। তবে আপনি এলেন, একা একা থাকবেন—যদি ইচ্ছে করেন, আমার সঙ্গে কারখানাতেও যেতে পারেন।

সুব্রত বুঝলে এ মস্ত সুযোগ। চৌধুরীর অবর্তমানে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে বাড়ির চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিতে। সুব্রত বলে, না, এখনও ক্লান্তিটা কাটেনি, আজকের দিনটাও বিশ্রাম নেব ভাবছি। আপনি কাজে যান চৌধুরী মশাই। ঘুমিয়েই আজকের দিনটা আমি কাটিয়ে দিতে পারব। ঘুমের আশ এখনও আমার ভাল করে মেটেনি।

বেশ, তবে আমি যাই। দুঃখীরাম ও সুখন রইল, তারাই আপনার সব দেখাশোনা করবে'খন। কোন কষ্ট হবে না।

চৌধুরী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুব্রত আবার শয্যার ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। অনেকটা সময় হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে। যথাসম্ভব এর মধ্যেই একটা মোটামুটি দেখাশোনা করে নিতে হবে। পুরনো আমলের বাড়ি, তাছাড়া দুঃখীরামও অনেক দিনকার লোক। গত রাত্রে কয়েকবার সাধারণভাবে দেখে লোকটাকে নেহাত খারাপ বলে মনে হয়নি। মনে হয় যেন লোকটা একটু সরল প্রকৃতির ও বোকা-বোকাই।

॥ চার ॥

পুরাতন প্রাসাদ

বাবু!

কে? সুব্রত চোখ চেয়ে দেখলে দুঃখীরাম কখন একসময় ঘরে এসে প্রবেশ করেছে।

চা আনব বাবু?

চা? আচ্ছা নিয়ে এস।

দুঃখীরাম ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। এবং একটু পরেই ধূমায়িত চা-ভর্তি একটি কাপ হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

দুঃখীরাম!

আজ্ঞে?

তুমি বুঝি অনেকদিন এখানে কাজ করছ?

আজ্ঞে তা প্রায় পনের-ষোল বৎসর তো হবেই।

তোমার বাড়ি কোথায় দুঃখী?

ঢাকা জিলায় বাবু।

তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তোমাদের ছোট কুমারকে দেখেছ?

তা আর দেখিনি! আহা বড় সদাশয় লোক ছিলেন তিনি! এমন করে বেঘোরে প্রাণটা গেল! দুঃখীরামের চোখ দুটি ছলছল করে এল, প্রায়ই তো তিনি এখানে এসে এক মাস দু মাস থাকতেন। আমাদের সকলকে তিনি কি স্নেহটাই করতেন বাবু। অমন হাসিখুশি, আত্মভোলা লোক আর আমি দেখিনি। তিনিও এসে এই ঘরেই থাকতেন, বলতেন এই ঘরেই তো আমার ঠাকুরদামশাই খুন হয়েছিলেন!

হ্যাঁ, শুনেছি বটে, শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মশাই এই বাড়িতেই খুন হয়েছিলেন—তা এই ঘরেই নাকি?

হ্যাঁ বাবু, শুনেছি এই ঘরেই। আমাদের সুধীনবাবুর বাবাও তো এই ঘরেই খুন হন। তিনিও লোক বড় ভাল ছিলেন বাবু।

সুব্রত স্তম্ভিত হয়ে যায়, তাহলে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পর পর দু'বার এই কক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল! কি বিচিত্র ঘটনা-সংযোগ! সেও এসে এই ঘরেই আজ আস্তানা নিয়েছে। হত্যাকারীর রক্ততৃষ্ণা কি মিটেছে? না আবার সে-রক্ততৃষ্ণায় তারও প্রাণ নিতে রাত্রির অন্ধকারে আবির্ভূত হবে কোন একসময়! বিচিত্র একটা শিহরণ সুব্রত

তার রক্তের মধ্যে অনুভব করে যেন, মনে হয়, সে আসবে! নিশ্চয়ই আবার সে এই ঘরে আবির্ভূত হবে! যখন চারিদিক নিঝুম হয়ে যাবে, ঘন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বিশ্ব-চরাচর অবলুপ্ত হয়ে যাবে: তখন সে আসবে এই ঘরে। আসুক—তাই তো চায় সুব্রত।

সুব্রত সোজা হয়ে বসে, আজ এখানে হাটবার না দুঃখীরাম!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাছ পাওয়া যায় এখানে?

আজ্ঞে না, তবে মাংস পাওয়া যায়, ভাল হরিণের মাংস।

হরিণের মাংস! চমৎকার হবে, তাই নিয়ে এস। শুধু মাংসের ঝোল আর ভাত রেঁধো এবেলা। হ্যাঁ শোন, আমাকে আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যেও।

যে আজ্ঞে বাবু।

দুঃখীরাম চলে গেল।

* * *

অনেকক্ষণ থেকে সুব্রত একা একা সমস্ত বাড়িটার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িটার বয়েস অনেক হয়েছে, ভাঙন ধরেছে এর চারপাশে, অথচ সংস্কারের কোন প্রচেষ্টাই নেই, দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমেই সুব্রত তিনতলাটা দেখে এল। প্রকাণ্ড ছাদ, ছাদের এক কোণে পাশাপাশি নাতিপ্রশস্ত দুটি ঘর, কিন্তু দুটি ঘরেই দরজার বাইরে থেকে ভারী হব্‌সের তালা লাগানো।

দোতলায় সর্বসমেত পাঁচখানা ঘর, একটি চৌধুরী ব্যবহার করেন, সেটারও বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানো, এবং সুব্রত যেটি অধিকার করেছে সেটি ছাড়া বাকি তিনটিতে কেবল শিকল-তোলা বাইরে থেকে, কোন তালা লাগানো নেই। সুব্রত দেখল ঘর তিনটি খালিই পড়ে আছে। দুটি ঘরেই একটি করে আলমারি ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় আসবাব নেই। নীচে আটটি ঘর। সেটি দুটি মহলে বিভক্ত; অন্দর ও সদর। সদর মহলেই কাছারী বাড়ি। জন দু-তিন কর্মচারী, দারোয়ান, ভৃত্য সব সদর মহলেই থাকে। অন্দর মহলে একমাত্র পাকের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘর ব্যবহার হয় না। নীচের অন্দর মহলে কোণের দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র ঘর ছাড়া বাকিগুলোতে কোন তালা দেওয়া নেই। অন্যান্য তালাবন্ধ ঘরগুলোর মত সুব্রত ঐ ঘরের তালাটা ধরেও নাড়তে গিয়ে একটু যেন বিস্মিত হল। ঐ ঘরের তালাটা বেশ পরিষ্কার, এতে প্রায়ই মানুষের হাতের ছোঁয়া পড়ে—তা দেখলে বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না।

সুব্রত দরজার কপাট দুটো ঠেলতেই সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল, তালা লাগানো থাকা সত্ত্বেও। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। কিছু দেখবার উপায় নেই। সুব্রত উপরে

নিজের ঘরে গিয়ে হান্টিং টর্চটা নিয়ে এল। টর্চের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলতে নজরে পড়ল, ঘরের মধ্যে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। কিন্তু আশ্চর্য হল যখন দেখলে সেই ঘরের ধুলোর ওপরে অনেকগুলো পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ। পায়ের ছাপ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই সুব্রতর নজরে পড়ে না। তালাটা খোলা যায় না। ভারী মোটা জার্মাণ তালা। সুব্রত টর্চ আনবার সময়ই তালাচাবি খোলবার যন্ত্রগুলো নিয়ে এসেছিল এবং কিছুক্ষণ চেষ্টা করতেই তালাটা খুলে গেল। ছোট্ট একটা ঘর। এবং ঘরটা একেবারে খালি, কেবলমাত্র একটা গা-আলমারি দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে গা-আলমারির কপাটটা খুলে ফেলে। আলমারিটা শূন্য, তার মধ্যে কিছু নেই। কতকগুলো আরশুলা এদিক ওদিক ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গেল। ঘরের কোন কোণায় একটা ছুঁচো চিক্‌চিক্‌ করে ডেকে উঠল। একটা বিশ্রী ধুলোর গন্ধ। মেঝেতে ধুলো জমে আছে। তার ওপর অসংখ্য পদচিহ্ন। কোনটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে, কোনটা বাইরের দিকে চলে গেছে। সুব্রত টর্চের আলো ফেলে ধুলোর ওপরে পদচিহ্নগুলো দেখতে লাগল। সবই একই ধরনের এবং একই আকারের পদচিহ্ন বলেই যেন মন হয়। সুব্রত আবার ঘরের চতুষ্পার্শ্বে আলো ফেলে দেখলে—না, কিছু নেই। এঘরে যে দীর্ঘকাল ধরে কোন লোক বাস করে না, তাতে কোন ভুলই নেই, অথচ ঘরের মেঝের ধুলোতে পদচিহ্ন ছড়ানো। একটিমাত্র দরজা ছাড়া ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় জানালা পর্যন্ত নেই। এই অপরিসর আলোবাতাসহীন অন্ধকার ঘরটা কিসের জন্য ব্যবহার হত তাই বা কে বলতে পারে! এবং এখন বর্তমানে কেউ না এঘরে বাস করলেও ঘরের মেঝেতে পদচিহ্ন।

সুব্রত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বেলা প্রায় এগারটা। আর দেরি করা উচিত নয়। এখনি হয়ত দুঃখীরাম হাট থেকে ফিরে আসবে। সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে তালার মুখটা কোনমতে টিপে লাগিয়ে রাখল মাত্র। সামান্য টানলেই যাতে করে খুলে যায় এবং তখুনি জানাজানি হয়ে যাবে—তাতে করে মনে হয় কেউ নিশ্চয়ই তালাই ভেঙে রেখে গেছে। কিন্তু উত্তেজনার বশে তালা ভাঙার মুহূর্তে সুব্রতর একটিবারও সে কথাটা মনে হয়নি। কিন্তু এখন আর উপায়ই বা কি! সুব্রত উপরে নিজের ঘরে চলে এল। একটু পরেই সে বুঝতে পারলে দুঃখীরামের গলার স্বরে, যে দুঃখীরাম হাট সেরে ফিরে এসেছে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুব্রত প্রাসাদের আশপাশ চারিদিক ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আবার বের হয়ে পড়ল। কাছারী বাড়ির পিছন দিকে টিনের ও খোলার শেড্‌ তোলা অনেকগুলো চালাঘরের মত; সেগুলোর মধ্যে নানা সাইজের কাঠ ও তক্তা সাজানো, বাম দিকে একটি প্রশস্ত চত্বর। চত্বরের একদিকে হাতি ও ঘোড়া-

শালা। দুটি ঘোড়া ও তিনটি হাতী আস্তাবলে আছে—এখন মাত্র একটি ঘোড়াই রয়েছে; অন্যটিতে চেপে চৌধুরী কারখানায় গেছে। একজন মাহুত ও চারজন সহিস, তারা সপরিবারেই আস্তাবলের পাশের চালাঘরে থাকে। কাছারি বাড়ির ডানদিকে একটি ফুলের বাগান।

ছোট একটা চালাঘর, সপরিবারে মালি সেখানে থাকে। পিছন দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে, অনুর্বর রুক্ষ মাঠ, মাঠের মধ্য দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ। আরও দূরে দেখা যায় পাশাপশি দুটি পাহাড়। প্রাসাদ ছেড়ে ঐ পথেই এগিয়ে গেলে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কিছু সাঁওতালদের বাস। তাদের প্রত্যেকেই প্রায় এদের কাঠের কারখানায় কাজ করে। ঘুরে ঘুরে সুব্রত অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, পিপাসাও পেয়েছে খুব; মনে হয় এক কাপ চা পেলে নেহাৎ মন্দ হত না। সূর্য আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে। মাঠের একপাশে একটা বাঁশঝাড়। সেই ঝোপের মধ্য হতে শ্রান্ত ঘুঘু ও হরিয়ালের একটানা কূজনধ্বনি প্রান্তরের তপ্ত হাওয়ায় ভাসিয়ে আনে।

উদাস বিধুর চৈত্র-মধ্যাহ্নের নীল আকাশটা যেন সূর্যালোকে আরও উজ্জ্বল নীল দেখায়। ওই দূরে অনন্ত নীলিমার মহাশূন্যে কালির বিন্দুর মত কয়েকটা চিল উড়ছে।

সুব্রত আবার কাছারী বাড়িতে ফিরে এল।

দুঃখীরামকে ডেকে চা আনতে বললে।

॥ পাঁচ ॥

কে কাঁদে নিশিরাতে

ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার যেন কালো একটা ওড়না টেনে দেয় পৃথিবীর বুকে।

সুব্রত চুপচাপ একাকী তার ঘরের সামনে খোলা ছাদটার ওপরে একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে গা ঢেলে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

অন্ধকারে ছাদের ওপরে নুয়ে পড়া বটবৃক্ষের পাতাগুলো ছোট ছোট হাতের মত যেন দুলে দুলে কি এক অজ্ঞাত ইশারা করছে।

আর কিছুক্ষণ পরে ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হবে, এ বাড়ির আশেপাশে সব অদেহী প্রেতাত্মারা ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। তাদের দেখা যাবে না, অথচ তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাবে। তাদের নিঃশ্বাসে বইবে মৃত্যুর হাওয়া।

জুতোর শব্দ শোনা গেল বারান্দায়, সুব্রত সজাগ হয়ে উঠে বসে। শিবনারায়ণ

চৌধুরী আসছেন নিশ্চয়ই। পরক্ষণেই চৌধুরী এসে ছাদে প্রবেশ করলেন, কল্যাণবাবু আছেন নাকি ?

হ্যাঁ, আসুন চৌধুরী মশাই। কখন ফিরলেন কারখানা থেকে ?

এই তো কিছুক্ষণ হল ফিরে স্নানাদি করলাম। তারপর সারাটা দিন একা একা কাটাতে হল, খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই !

না, কষ্ট আর তেমন কি, নির্জনতা আমার ভালই লাগে। আপনার ওদিককার কাজ কত দূর হল ?

সবই প্রায় হয়ে গেছে, এখন চালানটা তৈরী করে গাড়িতে চাপিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা করে দিতে পারলেই, ব্যস। আজ সারাটা রাত্রি ধরে গাড়িতে বোঝাই হবে, ভোর-বেলা আমি গিয়ে রওনা করে দিয়ে আসব মাত্র।

* * * *

রাত্রে আহারাদির পর সুব্রত এসে শয্যায় শুলো বটে, কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম যেন কিছুতেই আসতে চায় না। আর কেন যেন ঘুরে ঘুরে কেবলই ছাদের দিকে খোলা জানালাটার ওপরে গিয়ে চোখের দৃষ্টি পড়ে। অন্ধকারে বাতাসে ছাদের উপরে নুয়ে পড়া বটবৃক্ষের পাতার কাঁপুনির শব্দ একটানা শোনা যায়। কেমন যেন একটু তন্দ্রামত এসেছিল, সহসা এমন সময় আবার গত রাত্রের সেই করুণ কান্নার শব্দ রাতের স্তব্ধতাকে মর্মরিত করে তোলে। সুব্রত ধড়ফড় করে শয্যার ওপরে উঠে বসে। কাঁদছে ! কে যেন কাঁদছে গুমরে গুমরে ! গত রাত্রের মতই সুব্রত ঘরের দরজা খুলে বাইরে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সেই কান্নার শব্দ। সুব্রত বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কান্নার শব্দ যেন সুব্রতকে সম্মোহিত করে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে।

সিঁড়িটা অন্ধকার। সুব্রত আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে টর্চটা নিয়ে আসে। সিঁড়ির স্তূপীকৃত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে যেন পাতালপুরীর মৃত্যুগুহা হতে কোন এক অশরীরী কান্নার শব্দ ওপর দিকে ঠেলে উঠে আসছে। সুব্রত টর্চের বোতাম টিপল, মুহূর্তে স্তূপীকৃত অন্ধকার সরে গিয়ে সমগ্র সিঁড়িপথটি আলোকিত হয়ে ওঠে। সিঁড়ি বেয়ে সুব্রত নীচে চলে আসে। কান্নার শব্দটা এখনও কানে এসে বাজছে।

প্রথমে সুব্রত সদর মহলটা দেখলে। না, কিছু নেই সন্দেহজনক। অতঃপর অন্দর মহলে গিয়ে সুব্রত প্রবেশ করে। এবারে কান্নার শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। চলতে চলতে সুব্রত দ্বিপ্রহরে যে ঘরটার তালা ভেঙেছিল, সেটার বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তালাটায় হাত দিতেই তালাটা খুলে গেল, বুঝলে

এখনও তালা ভাঙার ব্যাপারটা কেউ টের পায়নি এ বাড়িতে। মনে হচ্ছিল কান্নার শব্দটা যেন সেই ঘর থেকেই আসছিল। নিঃশব্দে সুব্রত অন্ধকার ঘরটার মধ্যে পদার্পণ করলে। হ্যাঁ, আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবারে কান্নার শব্দটা। মনে হয় কে বুঝি ঐ ঘরেরই ধূলিমলিন মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

চাপা গলায় সুব্রত প্রশ্ন করলে, কে কাঁদছ ?

মুহূর্তে কান্নার শব্দ থেমে গেল। সুব্রত কিছুক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। না, আর কোন শব্দ নেই। যেই কাঁদুক, এখন আর কাঁদছে না।

সুব্রত আবার চাপা গলায় প্রশ্ন করে, কে ? কে কাঁদছিলে ? কথা বলছ না কেন ? জবাব দাও ?

সহসা এমন সময় গত রাত্রের মত কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অস্থির পদে কে যেন আশেপাশেই কোথায় পায়চারি করছে আর করছে।

সুব্রত এবারে টর্চের বোতাম টিপে টর্চটা জ্বালল। কেউ কোথাও নেই, খাঁ খাঁ করছে শূন্য ঘরটা। অন্ধকারে এতক্ষণ যারা ঘরের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সব যেন হঠাৎ আলো দেখে পালিয়ে গেছে, বাড়িটা কি ভৌতিক বাড়ি! এ কি সব আশ্চর্য ব্যাপার! খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে পায়ের কাছ দিয়ে একটা বড় ইঁদুর চলে গেল ঘরের কোণে। সুব্রত তার উপরে আলো ফেললে। হঠাৎ আলোয় ইঁদুরটা যেন একটু হক্‌-চকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই এক লাফে কপাট-খোলা দেওয়াল-আলমারিটার মধ্যে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য! ইঁদুরটা কোথায় গেল! সুব্রত আলমারিটার সামনে আরও এগিয়ে গেল। না, ইঁদুরটা নেই তো! অতবড় ইঁদুরটা! আলো ফেলে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুব্রত আলমারিটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। আলমারিটায় সর্বসমেত তিনটি তাক। সর্বনিম্নের তাকে লাফিয়ে উঠেই ইঁদুরটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, সর্বনিম্ন তাকের ডানদিককার দেয়ালে একটা বড় ফোকর। এতক্ষণে সুব্রত বুঝলে ঐ ফোকরের মধ্য দিয়েই ইঁদুরটা অদৃশ্য হয়েছে। এমন সময় আবার সেই কান্নার শব্দ এবং যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে কানে আসে এবারে।

নিজের অজ্ঞাতেই সুব্রত এবারে ফোকরটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হ্যাঁ, ঠিক। এতক্ষণে চকিতে ওর মনে একটা সম্ভাবনা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে যায়। অশরীরীর কান্না নয়; কোন জীবন্ত হতভাগ্যেরই বুকভাঙা কান্না। সুব্রত ফোকরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে, চারপাশে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। নিশ্চয়ই এই

ঘরের নীচে কোন চোরা কুঠুরী আছে, এবং সেই চোরা কুঠুরীর অন্ধকার অতল গহ্বর থেকেই আসছে সেই কান্নার শব্দ। কিন্তু সেই চোরা কুঠুরীতে প্রবেশের পথ কোথায়? কোথায় সেই অদৃশ্য সংকেত? সুব্রত আলমারিটা আবার ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করে উৎকণ্ঠিত ভাবে চারপাশে টিপে টিপে হাত বুলিয়ে, টোকা মেরে, ধাক্কা দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কোন অদৃশ্য সংকেতই তার চোখ পড়ে না। আলমারির কপাটের গায়ে, সেখানেও কিছু নেই। আলমারির কপাট দুটো খোলে আর বন্ধ করে। দু'তিনবার খুলে আর বন্ধ করতে করতে চতুর্থ বার একটু জোরে কপাট দুটো বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরসর করে একটা ভারী শব্দ ওর কানে আসে। পরক্ষণেই তার চোখের সামনে যে বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটে যায়, তাতে ও ভূত দেখার মতই চমকে দু'পা নিজের অজ্ঞাতেই পিছিয়ে যায়। আলমারির মধ্যস্থিত পশ্চাতের দেওয়াল ও সেলফ্‌গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। তার জায়গায় একটা কালো গহ্বর হাঁ করে মুখব্যাদান করে যেন ওকে গ্রাস করতে চাইছে।

॥ ছয় ॥

আবার বিষের তীর

কিরীটী কতকটা ইচ্ছা করেই বিকাশের ওখানে এসে উঠেছিল। যে কাজের জন্যে ও রায়পুরে এসেছে অজ্ঞাত-বেশ পরে, ও জানত বিকাশের ওখানে থাকলেও তার বিশেষ সুবিধাই হবে। এবং কখন কি ঘটে তার সঙ্গে ওর বিকাশের মারফত একটা যোগসূত্র রাখাও সহজ হবে। তার জন্য ওর আত্মপ্রকাশ করবার কোন প্রয়োজনই হবে না। তাছাড়া বিকাশের ওখানে থাকলে কেউ ওকে সন্দেহও করতে পারবে না। এবং সবার চাইতে বেশী সুবিধা হচ্ছে, ওর প্রয়োজনমত সর্বদাই বিকাশের সাহায্যে পাবে ও যে কোন সংবাদের লেনদেন করতে পারবে।

বিকাশও কিরীটী সুব্রতর অনুপস্থিতিতে ওর বাসায় উঠে আসায় বিশেষ সুখীই হয়েছিল, এবং কিরীটীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় রায়পুর হত্যা-মামলায়ও বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছিল ক্রমে। কিরীটীর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, অদ্ভুত বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ওকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু দুদিন আগে সুব্রতর বাসায় কিরীটীকে যে কথার নেশায় পেয়েছিল এখন যেন তার তিল মাত্রও তার ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। শামুকের মত হঠাৎ যেন কিরীটী নিজেকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে।

দিনরাত কিরীটী ঘরে বসে বসে আপন মনে চোখ বুজে হয় কিছু ভাবে, না হয় একটা কালো মোটা নোটবইতে খস্‌খস্‌ করে কি সব লিখে চলে।

সন্ধ্যাবেলা থানার সামনে মাঠের মধ্যে দুজনে যখন মধ্যে মধ্যে ইজিচেয়ার পেতে বসে, তখনও বেশীর ভাগ সময়ই কিরীটী আজেবাজে গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। মামলার ধার দিয়েও কিরীটী যায় না।

রাত্রি তখন প্রায় গোটা এগার সাড়ে এগার হবে, হঠাৎ একটা তীব্র আলোর রশ্মি এসে, বিকাশ ও কিরীটী আহারাদির পর যেখানে গাছের তলে অন্ধকারে চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিল, সেখানে পড়ল।

দেখুন তো বিকাশবাবু, সাইকেলে করে এত রাত্রে কে এল? কিরীটী বললে।

সত্যিই একটা সাইকেল এসে ওদের অল্পদূরে থামল, এবং সাইকেল আরোহী নীচে লাফিয়ে পড়ল।

কে? বিকাশ প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে, আমি সতীশ স্যার! সতীশ এগিয়ে আসে।

কি সংবাদ, এত রাত্রে?

আজ্ঞে! খুব জোরে অনেকটা পথ সাইকেল চালিয়ে এসে সতীশ বেশ হাঁপিয়ে গিয়েছিল, টেনে টেনে বলে, আজ্ঞে, রাজাবাহাদুর পাঠিয়ে দিলেন, রাজাবাহাদুরের খুড়ো মশাই নিশানাথবাবুকে তার শোবার ঘরের মধ্যে কারা যেন বুকে তীর মেরে, আমাদের লাহিড়ী মশাইয়ের মতই খুন করে রেখে গেছে। এক নিশ্বাসে সতীশ কথাগুলো বলে শেষ করে।

সংবাদটা শুনে বিকাশ হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, অ্যাঁ, কি বললে সতীশ! আবার…আ…বা…র খুন!

আজ্ঞে।

তারপর একটু থেমে সতীশ বললে, আপনি একবার তাড়াতাড়ি চলুন স্যার। রাজা-বাহাদুর বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

আচ্ছা তুমি এগোও, বল আমি এখুনি আসছি।

সতীশ চলে গেল।

বিকাশবাবু? কিরীটী ডাকলে মৃদু স্বরে।

বলুন?

আমিও আপনার সঙ্গে যাব রাজপ্রাসাদে।

অ্যাঁ, সে কি করে হতে পারে ?

শুনুন। আপনি আমার পরিচয় দেবেন সি. আই. ডি.-র ইন্সপেক্টার বলে। বলবেন, এই কেসেরই তদন্ত করতে উপরওয়ালারা আমাকে আপনার সাহায্যে পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে। ইন্সপেক্টার অর্জুন রায় বলে আমার পরিচয় দেবেন।

ঠিক আছে। চলুন! আপনি হয়ত অকুস্থানে গেলে, নিজের চোখে পরীক্ষা করলে, অনেক কিছুই দেখতে পাবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, বিকাশ কিরীটীর এ প্রস্তাবে যেন হাতে স্বর্গ পেল। কিরীটী সঙ্গে থাকা, শুধু বলই নয়, একটা ভরসাও।

কিরীটীকে ঐ বেশেই গমনোদ্যত দেখে বিকাশই হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে, আপনি কি এই বেশেই যাবেন ?

হ্যাঁ, সাধারণ ড্রেসেও অনেক সময় সি. আই. ডি.-র লোকদের ঘুরতে হয়। তাছাড়া আরও একটা কথা, আমার অর্জুন রায় পরিচয় একমাত্র রাজাবাহাদুর ছাড়া আর কাউকেই দেবেন না। তাঁকেই শুধু আড়ালে ডেকে চুপিচুপি বলে দেবেন। এত বড় সুযোগ সহজে মেলে না। তারপরই যেন কতকটা অস্ফুট কণ্ঠে কিরীটী বলতে থাকে, আমি জানতাম, নিশানাথের দিনও ঘনিয়ে এসেছে; তবে তা এত শীঘ্র তা ভাবিনি! ভেবেছিলাম, বিকৃতমস্তিষ্ক বলে হয়ত কিছুদিন সে রেহাই পাবে, কিন্তু এখন দেখছি আমারই হিসাবে ভুল হয়েছিল।

বিকাশ কিরীটীর অর্ধস্ফুট স্বগতোক্তিগুলি ভাল করে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে, কি বলছেন!

কিরীটী মৃদু স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয়, না, ও কিছু না। ভাবছিলাম জীবিত অবস্থায় নিশানাথের সঙ্গে একটিবার দেখা করতে পারলে তদন্তের আমাদের অনেক সুবিধা হত, কিন্তু যেমনটি চাওয়া যায় সব সময় তো তেমনটি আর হুবহু হয় না। হাতের কাছে যেটুকু পাওয়া গেল তারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাক। এখন উঠুন, আর দেরি নয়।

সামান্য চেহারার অদলবদল করে নিল কিরীটী দ্রুত হস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে। তারপর দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে।

নিঃশব্দে দুজনে পথ অতিবাহিত করে চলেছে, কারও মুখেই কোন কথা নেই। হঠাৎ একসময় বিকাশ ডাকে, কিরীটীবাবু!

উঁহু, কিরীটী নয়, বলুন অর্জুনবাবু! খুব সাবধান! কিরীটী নামটা অত্যন্ত পরিচিত। যদিও সামান্য চেহারার অদলবদল করে নিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই।

না, আর ভুল হবে না, চলুন।

হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন বিকাশবাবু?

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় খুনী এখনও আশেপাশেই কোথাও আছে গা ঢাকা দিয়ে?

কিরীটী হো-হো করে হেসে ওঠে, কেমন করে বলি বলুন তো। আমি তো আর গণক ঠাকুর নই!

কিন্তু অনেক সময় শুনেছি, খুনীরা খুন করবার পর অবস্থা বোঝবার জন্য অকুস্থানের আশেপাশেই কোথায়ও আত্মগোপন করে থাকে।

বুঝেছি, আপনি কি বলতে চান বিকাশবাবু। কিন্তু সময় না হওয়া পর্যন্ত খুনীকে ধরা যায় না; তাহলে সব কেঁচে যায়। খুনী যদি এখন ওইখানে থাকেও তবু জানবেন এখনও তাকে ধরবার মাহেন্দ্রক্ষণটি আসেনি। ভয় নেই! লগ্ন এলেই বরকে পিঁড়িতে বসাব এনে। কিরীটী রায় লগ্ন বয়ে যেতে দেয় না কখনও। কিরীটী স্মিতভাবে বললে।

কিরীটী আবার বলতে থাকে, তাছাড়া ভেবে দেখুন, খুনীকে ধরে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রহস্যের সব উত্তেজনা বা আনন্দের সমাপ্তি ঘটল। চিন্তা করে দেখুন তো, খুনী কে আপনি জানতে পেরেছেন, এবং জেনেও না জানার ভান করে আছেন, খুনীকে সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে চলে-ফিরে বেড়াবার জন্য। সে পরম নিশ্চিন্তে আছে। একবারও সে ভাবছে না যে, একজনের চোখে সে ধরা পড়ে গেছে। একজনের সদাসতর্ক দৃষ্টি সর্বক্ষণ তার পিছু পিছু ফিরছে ছায়ার মত। তারপরই যেই সময় এল, প্রমাণগুলো সব আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ুন আপনি খুনীর উপরে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে প্রায় প্রাসাদের বড় গেটটার সামনে এসে গেছে ততক্ষণ।

গেটের বাইরে ছোট্টু সিং পাগড়ী মাথায়, লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, সেলাম দিল। গেটের বড় আলোটা জেলে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে ছোট্টু সিং-এর আপাদমস্তক কিরীটী দেখে নিলে একবার। সুব্রতর চিঠির বর্ণনা তার মনে ছিল, ছোট্টু সিংকে চিনতে এতটুকুও তার কষ্ট হয়নি। ছোট্টু সিং-এর পাশেই সুবোধ মণ্ডলও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা কারও দিকে দৃষ্টিপাত না করে গেট অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। খাজাঞ্চী ঘরের সামনে মহেশ সামন্ত ও আর একজন দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব কথাবার্তা বলছিল, ওদের এগিয়ে আসতে দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিরীটী চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, এরা?

প্রথমটি জানি না, দ্বিতীয়টি মহেশ সামন্ত।

ও, এরাই তারা! আর গেটের সামনে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, একজন তো ছোট্টু সিং, দ্বিতীয়টি?

সুবোধ মণ্ডল।

ও, যিনি জেগেই ঘুমোন!

দু-চার বার আসা-যাওয়া করতে করতে বিকাশের রাজবাড়ির অন্দরমহলটা বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিল, সোজা সে কিরীটীকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

সেদিনকার মত আজও রাজাবাহাদুরের খাস ভৃত্য শম্ভু সিঁড়ির মাথায়ই দাঁড়িয়ে ছিল, বোধ করি ওদেরই অপেক্ষায়।

রাজাবাহাদুর কোথায়?

আজ্ঞে তাঁর বসবার ঘরে।

অস্থির ভাবে রাজাবাহাদুর পায়চারি করছিলেন, ওদের পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, আসুন বিকাশবাবু! পরক্ষণেই কিরীটীর প্রতি নজর পড়তে ভ্রূকুটা ঈষৎ কুঁচকে থেমে গেলেন।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা কিন্তু এড়ায়নি। সে মৃদু হেসে একটু এগিয়ে এসে বললে, আমার নাম অর্জুন রায়।

বিকাশই এবার বাকি পরিচয়টুকু শেষ করে দিল, আমারই ভুল হয়েছে রাজাবাহাদুর, ইনি সি. আই. ডি.-র ইন্সপেক্টার মিঃ অর্জুন রায়, লাহিড়ীর কেসের তদন্তে সাহায্য করবার জন্য হেড কোয়ার্টার থেকে এখানে এসেছেন আজ দিন দুই হল, আর ইনি মহামান্য রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত সুবিনয় মল্লিক, রায়পুর স্টেট।

এরপর উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানাল। কিন্তু কিরীটী লক্ষ্য করলে তথাপি যেন রাজাবাহাদুরের মুখ হতে সম্পূর্ণ বিরক্তির ভাবটা যায়নি। কিরীটী সেদিকে আর বেশী নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করল না। এবং বর্তমান কেস সম্পর্কে যে তার বিশেষ একটা কিছু উৎসাহ আছে সে ভাবও প্রকাশ করতে চাইলে না। মুখের উপরে একটা প্রশান্ত নির্লিপ্ততার ভাব টেনে এনে নিঃশব্দে একপাশে সরে রইল।

বিকাশের প্রশ্নেরই জবাবে সুবিনয় মল্লিক বলেন, মৃতদেহ নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে চান দারোগা সাহেব?

নিশ্চয়ই!

তবে যে ঘরে মৃতদেহ আছে সেই ঘরেই সকলকে যেতে হয়, কেননা যে ঘরে খুড়োমশাই থাকতেন, সেই ঘরেই তিনি নিহত হয়েছেন।

বেশ, তবে তাই চলুন। মিথ্যে আর দেরী করে লাভ কি, বিকাশ বললে।

একটু অপেক্ষা করুন রাজাবাহাদুর। কিরীটী গমনোদ্যত সুবিনয় মল্লিক ও বিকাশকে বাধা দিল।

ওরা দুজনেই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়ায়। দুজনের চোখেই সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

মৃতদেহ দেখার জন্য তাড়াহুড়োর কিছুই নেই, কারণ যিনি মারা গেছেন, তিনি যখন নিঃসন্দেহেই মারা গেছেন, তখন আগে সমস্ত ব্যাপারটা একবার শুনতে পারলে ভাল হত। তারপর রাজাবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, একটুও কিছু বাদ না দিয়ে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক যা বললেন সংক্ষেপে তা এই, বিকাশবাবুর মুখেই হয়ত শুনে থাকবেন, আমার কাকা নিশানাথ মল্লিক শোলপুর স্টেটের আর্টিস্ট ছিলেন, কিছু-দিন হল মাথার সামান্য গোলমাল হওয়ায় স্টেটের চাকরি ছাড়িয়ে আমি তাঁকে এক প্রকার জোরজবরদস্তি করে রায়পুর নিয়ে আসি। রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকরা ছিলেন তিন ভাই। বড় শ্রীকণ্ঠ, মেজ সুধাকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ বাণীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের পিতা রত্নেশ্বর মল্লিক, কোন কারণে মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের উপর বিরূপ হয়ে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ মল্লিককেই দিয়ে যান। মধ্যম ও কনিষ্ঠের জন্য সামান্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান মাত্র। সুধাকণ্ঠ ছিলেন অত্যন্ত আত্মাভিমানী, পিতার ব্যবহারে বোধ হয় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাঁর একমাত্র মাতৃহারা পুত্র হারাধনকে নিয়ে ভাগলপুর চলে যান। এবং সেখানে যাবার কয়েক বৎসর পর হারাধন যেবারে এণ্ট্রান্স পাস দেন সেবারে মারা যান। তখন হারাধন মোক্তারী পাস করে কিছুকাল ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করেন, তারপর রায়পুরে এসে প্র্যাকটিস ও বসবাস শুরু করেন। এদিকে রত্নেশ্বরের মৃত্যুর দু মাস পরেই কনিষ্ঠ বাণীকণ্ঠও তাঁর স্ত্রী, একমাত্র পুত্র নিশানাথকে রেখে মারা যান। নিশানাথ আর্ট স্কুল থেকে পাস করে কিছুকাল পরে শোলপুরে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। আমার এখানে এসেছিলেন মাস পাঁচেক মাত্র। আমি যেদিন হঠাৎ আততায়ীর হাতে আহত হই, সেদিন থেকে কাকার পাগলামিটা ক্রমশঃই বেড়ে ওঠে, এবং সর্বদা তাঁকে দেখাশুনা করছিলেন আমার বিমাতা। আজ দ্বিপ্রহর থেকে, চুপচাপই ছিলেন অন্যান্য দিনের চেয়ে। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত মা কাকার কাছেই ছিলেন। রাত্রি নটার পর মা কাকার খাবার আনতে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা যায়, আমি এই ঘরে বসেই সংবাদপত্র পড়ছিলাম, আমিও চিৎকার শুনে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি আমার বিমাতাও ততক্ষণে সেই কক্ষে গিয়ে হাজির হয়েছেন। কাকা জানালার নীচে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাড়াতাড়ি কাকাকে গিয়ে ধরতেই, দেখলাম বুকের কাছের জামা ও মেঝেতে রক্ত। এবং বাঁদিকের বুকে বিঁধে

আছে একটা তীর। ঠিক যেমনটি বিঁধে ছিল লাহিড়ীর বুকে। বুঝলাম হতভাগ্য লাহিড়ীর মতই তাঁরও মৃত্যু ঘটেছে এবং তাতে কোন অদৃশ্য আততায়ীরই হাত আছে। তখুনি আপনার কাছে লোক পাঠাই।

এবারে কিরীটী প্রশ্ন করে, চিৎকার শোনবার পর আপনি যখন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন, আপনার কাকা তখনও বেঁচে ছিলেন, না তার আগেই মারা গেছেন?

আমি গিয়ে আর তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখিনি।

আপনার এ ঘর থেকে সেই ঘরে যেতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয় রাজাবাহাদুর?

তা মিনিট পাঁচ-ছয় তো হবেই।

চিৎকার শুনেই আপনি ছুটে গিয়েছিলেন বললেন না? একটুও দেরি করেননি?

হ্যাঁ।

আপনার এ ঘর থেকে সে ঘরে কোন চিৎকার শব্দ হলে অনায়াসেই তবে শোনা যায় বলুন?

নিশ্চয়ই!

আর কে কে সেই চিৎকার শুনতে পেয়েছিল জানেন?

বোধ হয় অনেকেই শুনেছিল, কেননা আমরা মানে আমি ও আমার বিমাতা সে ঘরে গিয়ে ঢোকবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির অন্যান্য চাকরবাকরেরাও ছুটে এসেছিল।

রাজাবাহাদুর, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি রাণীমাকে, মানে আপনার বিমাতাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

বিশেষ কি প্রয়োজনীয়?

হ্যাঁ। তা না হলে অযথা তাঁকে আমি কষ্ট দিতাম না।

বেশ, তাঁকে ডাকাচ্ছি।

॥ সাত ॥

রাণীমা

রাজাবাহাদুর একজন ভৃত্যকে রাণীমাকে ডাকতে পাঠালেন। একটু পরেই রাণীমা মালতী দেবী ধীর মন্থর পদে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। কিরীটী চোখ তুলে মালতী দেবীর দিকে তাকাল।

মালতী দেবী সত্যিই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী, বয়েস এখনও চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, ছোটখাটো গড়ন, অত্যন্ত শীর্ণ। মুখখানি যেন শিল্পীর পটে আঁকা ছবির মত নিখুঁত। পরিধানে একটি দুধ-গরদ থান, নিরাভরণা। কিন্তু একটা জিনিস, মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সহিষ্ণু।

মা, আপনাকে আমার প্রয়োজনের তাগিদে বিরক্ত করতে হল বলে আমি একান্ত দুঃখিত, কিরীটী বলে, বেশীক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না মা। দু-চারটে প্রশ্ন শুধু আমি করতে চাই, আশা করি ছেলের অপরাধ নেবেন না।

বলুন। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে মালতী দেবী বললেন।

এবারে কিরীটী ঘরের মধ্যে উপস্থিত বিকাশ ও রাজাবাহাদুরের দিকে তাকাল। অনুগ্রহ করে, কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, আপনারা যদি দু-চার মিনিটের জন্য একটু বাইরে যান।

জবাবে বিকাশই রাজাবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন রাজাবাহাদুর।

দুজনে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দরজাটি ভেজিয়ে দিল। তারপর মালতী দেবীর দিকে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে বললে, মা, কয়েকটি কথার আমি আপনার কাছে জবাব চাই।

আপনি কথা বলতে পারেন স্বচ্ছন্দে। কেননা এ ঘরটি এমনভাবে তৈরী যে, চিৎকার করে কথা বললেও এ ঘরের বাইরে শব্দ যায় না। এই ঘরের দেওয়ালগুলো সকল শব্দকেই শুষে নেয়। আবার এর পাশের ঘরটি এমনভাবে তৈরী যে, আশেপাশের দুটি ঘর ও ঠিক তার নীচের ঘরের সমস্ত শব্দ যত আস্তেই হোক না কেন অনায়াসেই শোনা যাবে। ঘর দুটি এভাবে আমার স্বামীই তাঁর জীবিত অবস্থায় জার্মান ইন্‌জিনীয়ার দিয়ে প্ল্যান করে তৈরী করিয়েছিলেন।

আশ্চর্য তো! কিন্তু এইভাবে দুটি ঘর তৈরী করার কারণ?

কারণ এই ঘরটিতে বসে তিনি স্টেট সংক্রান্ত সকল শলাপরামর্শ গোপনে করতেন, আর পাশের ঘরটিতে তিনি শয়ন করতেন বলে, যাতে করে সামান্যতম শব্দও শুনতে পান। তাই ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন।

আপনার স্বামী অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কথা থাক। নিশানাথবাবুর চিৎকার শুনেই আপনি তাঁর ঘরে ছুটে যান, কেমন তাই না?

একটু ইতস্ততঃ করে মালতী দেবী মৃদুকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ।

আপনি কোন্ ঘরে তখন ছিলেন?

রন্ধনশালার দিকে। আমি ওঁর খাবার সাজাচ্ছিলাম, আমার হাতে ছাড়া ঠাকুরপো

আর কারও হাতে খেতে চাইতেন না ইদানীং।

কেন ?

তাঁর কেমন একটা ধারণা হয়তো ছিল, তাঁকে এরা বিষ খাইয়ে মারতে চায়।

কেন, এরকম ধারণার কোন কারণ ঘটেছিল কি ?

এবারও যেন বেশ একটু ইতস্ততঃ করেই মালতী দেবী জবাব দিলেন, না, আমার মনে হয় ইদানীং তাঁর মাথার একটু দোষ হয়েছিল তাই হয়ত ঐ সব আবোলতাবোল ভাবতেন। কে এমন এ বাড়িতে আছে বলুন, যে তাকে বিষ খাইয়ে মারতে চাইবে। ঐ সব তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা।

সত্যিই আপনার তাই বলেই মনে হয় রাণীমা ?

হ্যাঁ।

শুনেছি রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকই তাঁকে মাথা খারাপ হওয়ার পর আগ্রহ করে রায়পুরে নিয়ে আসেন।

হ্যাঁ, বিনয় ওকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত, আমার দুই দেবরের মধ্যে একমাত্র উনিই এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ছিলেন। ওদের আর এক কাকা যিনি এখানেই আছেন, তিনি এদের সঙ্গে কখনও কথা পর্যন্ত বলেন না। শুনেছি পথেঘাটে দেখা হলেও চোখ ফিরিয়ে নেন।

কিন্তু আমি তো শুনেছি হারাধন মল্লিক লোকটি ভাল।

তা হতে পারে।

আচ্ছা মা, আপনি চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে নিশানাথবাবুকে জীবিত দেখেছিলেন, না মৃত দেখেছিলেন ?

মালতী দেবী চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না।

বলুন—

আমি···না, তাঁকে আমি জীবিত দেখিনি, আমি যখন ঘরে গেছি, তাঁর দেহে তখন আর প্রাণ ছিল না। প্রথম দিকে একটু ইতস্ততঃ করে শেষের দিকে কতকটা যেন অস্বাভাবিক জোর দিয়েই মালতী দেবী কথাগুলো বলে গেলেন।

কিরীটী অল্পক্ষণ কি যেন একটু চিন্তা করলে, তারপর সমস্ত সংকোচকে এক পাশে ঠেলে ফেলে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, মা, আমার মুখের দিকে তাকান তো। আমি আপনার সন্তানের মত। কোন লজ্জা বা সংকোচ করবেন না। কয়েকটা পুরানো কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। জানি কথাগুলো আপনার ভাল লাগবে না শুনতে, হয়ত বা ব্যথা পাবেন, কিন্তু আমারও না জিজ্ঞাসা করলে চলবে না। একান্ত

নিরুপায় আমি।

মালতী দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন। যে চোখের দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, সে চোখের দৃষ্টিতে কোন সংকোচের বালাই ছিল না।

কিরীটী দৃঢ় স্বরে বলতে লাগল, শুনুন মা, এ রায়বাড়িতে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব এক সূত্রে বাঁধা এবং তার কিনারা না করতে পারলে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকবে। তাই গোড়া থেকেই আমি শুরু করতে চাই।

মনে পড়ে আপনার মা আপনার ছেলে সুহাসের মৃত্যুর আগে, যেদিন তাকে নিয়ে আপনারা কলকাতা থেকে রায়পুরে আসছেন, সেদিন সকালের দিকে হঠাৎ একসময় আপনি ও সুবিনয়বাবু সুহাসের ঘরে ঢুকে দেখতে পান, ডাঃ সুধীন চৌধুরী সুহাসকে একটা ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন। কোর্টে আপনি মামলার সময় ঐ কথাই বলেছিলেন মনে পড়ে কি মা, আপনি নিশ্চয়ই ভোলেননি। মামলার সময় জেরার মুখে বলেছিলেন, আপনি সুহাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিসের আবার ইন্‌জেকশন সে দিচ্ছে, তার জবাবে নাকি সুহাস কিছু বলেননি।

হ্যাঁ, মৃদু ক্ষীণ স্বরে মালতী দেবী জবাব দেন।

আপনার ছেলের ঐ জবাবেই আপনি সেদিন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি?

মালতী দেবী কিরীটীর প্রশ্নের কোনই জবাব দিলেন না, খোলা জানালাপথে অন্ধকারে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেক কথাই রাণীমার বুকের মধ্যে যেন বরফের মত জমাট বেঁধে আছে। তাঁর একমাত্র পুত্র সুহাস! তাঁর জীবনের একটি মাত্র স্বপ্ন। তাও আজ বিফল হয়ে গেছে, শুধু স্মৃতিভারে আজও তিনি এইখানে পড়ে আছেন। কবে তিনি স্মৃতিমুক্ত হবেন।

মা! কিরীটী মৃদু স্নেহসিক্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল, যে গেছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু সন্তান, বিশেষ করে একটি মাত্র সন্তানকে হারানোর যে কী দুঃসহ ব্যথা তা আপনি মর্মে মর্মেই জেনেছেন। অগাধ ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হয়েও আপনি আজ কাঙালিনী। মা হয়ে মায়ের ব্যথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। আপনি জানেন নিশ্চয়ই এ-কথা যে, আর যারই পক্ষে সম্ভব হোক, সুধীনের পক্ষে সুহাসকে খুন করা একেবারেই অসম্ভব।

অতীতকে আর টেনে আনবেন না। মালতী দেবী বললেন।

আমার নাম অর্জুন। আমি আপনার সন্তানের মত, অর্জুন বলেই আমাকে ডাকবেন। এবং তুমি বলেই সম্বোধন করবেন মা।

যা চুকেবুকে গেছে, তা আর কেন?

আমাদের সকলের উপরে এমন একজন আছেন জানবেন তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়ায় না, তাঁকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। আমাদের বিচারে সব শেষ হয়ে গেলেও, তাঁর বিচার এখনও বাকি আছে। সত্যিকারের দোষী যে, একদিন তাকে মাথা পেতে দণ্ড নিতেই হবে।

কিন্তু—

একবার ভেবে দেখুন মা, সুধীনের মার কথা, তারও তো ঐ একটি মাত্রই সন্তান!

না না, আমি কিছু জানি না! আমি কিছু জানি না! সহসা মালতী দেবী দু-হাতের পাতা চোখে ঢেকে রুদ্ধ আবেগে কেঁদে ফেললেন।

মা, আমার সত্যিকারের পরিচয় আপনি জানেন না, জানলে বুঝতেন মিথ্যা আশা এ জীবনে আমি কাউকে দিইনি। বলেছি সুধীনের মাকে সুধীন আবার তার মার বুকে ফিরে যাবেই। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, সুধীন আদালতে বিচারের সময় অনেক কথার যে জবাব দিতে অস্বীকার জানিয়েছিল, সে কেবল আপনাকেই বাঁচাতে। পাছে আপনাকে গিয়ে প্রত্যহ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, এবং আপনার মাথা নীচু হয়, সেই ভয়ে এবং আপনার ছেলে মৃত সুহাসের প্রতি অসীম স্নেহের বশেই সে সব কিছুই প্রায় অস্বীকার করে বা না জানার ভান করে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মেরেছিল। একবার ভেবে দেখুন তো, এ কত বড় ত্যাগ স্বীকার! আর আপনি?…তার এত বড় ত্যাগের কি প্রতিদান দিয়েছেন!

কে? কে তুমি?…কি চাও? ভীতচকিত কণ্ঠে মালতী দেবী প্রশ্ন করেন হঠাৎ।

আমি,—কিরীটী মৃদু হাসলে। পরিচয়টা আজ আমার তোলাই থাক মা। সময় হলেই সব জানতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি যেতে পারেন মা। আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

কিন্তু,—মালতী দেবী ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

আমার যতটুকু আপনার কাছে জানবার ছিল জেনেছি, আপনি এবারে যেতে পারেন মা।

কতকটা যেন একপ্রকার টলতে টলতেই মালতী দেবী দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

কিরীটী তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিজ হাতে দরজা খুলে রাস্তা করে দিল। মালতী দেবী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

পাশের ঘরে একটা সোফার উপরে বিকাশ বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, আর সুবিনয় মল্লিক অস্থির পদে ঘরময় পায়চারি করছিলেন।

বিকাশবাবু!

কিরীটীর ডাকে বিকাশ ধড়ফড় করে উঠে বসে, অ্যাঁ!

চলুন রাজাবাহাদুর, এবারে মৃতদেহটা দেখে আসা যাক।

আগে আগে রাজাবাহাদুর, পিছনে কিরীটী ও বিকাশ অগ্রসর হল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় এসে অন্য একটা ঘোরানো সিঁড়িপথে, দোতলা ও একতলার মাঝামাঝি একটি বদ্ধ ঘরের দরজার সামনে এসে সকলে দাঁড়াল। ঘরের দরজার শিকল তোলা ছিল, রাজাবাহাদুরই শিকল খুলে দরজা দুটো ঠেলে আহ্বান জানালেন, আসুন—এই ঘর।

সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। মাঝারি গোছের ঘরখানি।

আসবাবপত্র তেমন বিশেষ কিছুই নেই, একটি পালঙ্ক, তার উপরে শয্যা বিছানো। একটি ছোট শ্বেতপাথরের টি'পয়। ঘরের কোণে একটি মাঝারি সাইজের কাচের আয়না বসানো আলমারি, একটি বুক-সেল্‌ফ ও একটিমাত্র ক্যাম্বিশের আরাম-কেদারা।

ঘরের মধ্যে একটি দরজা ও দুটি জানালা। দুটি জানালাই খোলা। একটি খোলা জানালার সামনে উপুড় হয়ে একপাশে কাত হয়ে ধনুকের মত বেঁকে নিশানাথের মৃতদেহটা পড়ে আছে, হাত ও পায়ের আঙুলগুলো দুমড়ে বেঁকে গেছে। মুখে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণার চিহ্ন তখনও সুস্পষ্ট।

কিরীটী সোজা সেই খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল; সামনেই অন্দর ও সদরের সংযোগস্থল সেই আঙিনা চোখে পড়ে। কিরীটী আশেপাশে বাইরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সহসা তার ভ্রূ দুটো যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সরল হয়ে আসে চোখের দৃষ্টিটা, যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সমস্ত সমাধানই যেন মুহূর্তে তার চোখের সামনে অন্ধকারে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত প্রকটিত হয়ে ওঠে। চোখ ফিরিয়ে সে মৃতদেহের প্রতি আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। লাহিড়ীর মৃত্যু-ব্যাপার ঠিক সুব্রতর চিঠিতে যেমনটি সে লিখেছিল, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই একটি তীর নিশানাথের বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে। হত্যাপদ্ধতি যখন দু-ক্ষেত্রে অবিকল এক—একই গৃহে এবং রাত্রের অন্ধকারে তখন কিরীটীর বুঝতে বাকি থাকে না, লাহিড়ী ও নিশানাথের হত্যাকারী একই লোক। নিশানাথ সম্পর্কে সুব্রতর অনেকগুলো কথা চিঠির অক্ষরে ওর মনের পাতায় যেন ছায়াছবির মত একটার পর একটা ভেসে যায়।

মৃতদেহ দেখা হয়ে গেছে বিকাশবাবু, ওপরে রাজাবাহাদুরের বসবার ঘরে চেয়ারের ওপরে আমার সিগার কেসটা ভুলে ফেলে এসেছি, যদি অনুগ্রহ করে নিয়ে আসেন। হঠাৎ কিরীটী বলল।

বিকাশ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই বেশ অনুচ্চ-কণ্ঠে কিরীটী বললে, রাজাবাহাদুর, একটা কথা, আপনার কাকা নিশানাথ মল্লিক ও আপনার ম্যানেজার সতীনাথের হত্যাকারী কে সত্যিই কি আপনি জানবার জন্য আগ্রহী ?

সুবিনয় যেন কিরীটীর কথায় প্রথমটা হঠাৎ একটু চমকে ওঠেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এ-কথার মানে কি অর্জুনবাবু ? আপনি কি বলতে চান ?

আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনও হতে পারে ঐ দুটি হত্যারহস্যের মূল খুঁজে বের করতে গেলে হয়ত যাকে বলে আমাদের কেঁচো খুড়তে খুঁড়তে গোখুরো সাপ গর্ত থেকে বের হয়ে আসা—ভাবছি, সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে সাপের সে ছোবল সামলাবার মত সকলেই নীলকণ্ঠ কিনা !

ইনস্‌পেক্টার, আপনি ভুলে যাবেন না কার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি কথা বলছেন ! তাছাড়া আমি আপনার পরিহাসেরও পাত্র নই। খুনের তদন্ত করতে এসেছেন তাই করুন, এবং যদি তদন্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, আমি এবারে আপনাদের যেতে বলব, কারণ রাত্রি অনেক হয়েছে। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। রাজাবাহাদুর যেন একটু রুক্ষ গলায় ঐ কথাগুলো বললেন।

বিকাশ এসে কক্ষে প্রবেশ করল, হাতে তার কিরীটীর স্বর্ণ-নির্মিত সিগার কেসটি।

বিকাশের হাত হতে সিগার কেসটি নিয়ে কিরীটী একটি সিগারে অগ্নিসংযোগ করে, খানিকটা ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে বললে, চলুন বিকাশবাবু, রাত্রি অনেক হল। এই ঘরে একটা তালা দিয়ে চাবিটা নিয়ে চলুন, সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করবেন। আচ্ছা আসি তাহলে, নমস্কার রাজাবাহাদুর।

দুজনে উঠে দাঁড়াল।

॥ আট ॥

জবানবন্দির জের

রাস্তায় চলতে চলতে কিরীটী কিছু কিছু বাদ দিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বিকাশকে বলে গেল। বললে, রায়পুর হত্যারহস্য যতটুকু জট পাকাবার তা পাকিয়েছে বিকাশবাবু, এবারে সেই জট আমাদের একটি একটি করে খুলতে হবে। রায়পুরের রাজপরিবারের পুরাতন ইতিহাস, মনে হচ্ছে সে যেন একখানি উপন্যাস। যার কিছুটা আজ আপনিরাজাবাহাদুরের

মুখেই শুনলেন, বাকিটা আমি যা খোঁজ করে জেনেছি তা এই—আপনি শুনলেন, শ্রীকণ্ঠ মল্লিকরা ছিলেন তিন ভাই, জ্যেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ, মধ্যম সুধাকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ বাণীকণ্ঠ। এঁদেরই পিতা ছিলেন রাজা রত্নেশ্বর মল্লিক। রত্নেশ্বরের পিতার আমলে একটা খুনের মামলায় এঁদের সম্পত্তি প্রায় যায়-যায় হয়েছিল, সেই সময় যিনি তাঁর প্রাণ দিয়ে সকল অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এঁদের পূর্বপুরুষকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই তিনিই হচ্ছেন এঁদের পূর্বতন নায়েবজী শ্রীনিবাস মজুমদারের পিতামহ। রত্নেশ্বরের পিতা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তাই হয়ত এর প্রতিদানে নৃসিংহ গ্রাম মহালটির অর্ধাংশ মজুমদার বংশকে লেখাপড়া করে দিয়ে যান। পরে অবিশ্যি আবার শোনা যায় রত্নেশ্বর সে অংশটুকু কিনে নেন নামমাত্র মূল্য দিয়ে, বলতে পারেন কতকটা মজুমদার মশাইকে বিক্রি করতে বাধ্য করেছিলেন রত্নেশ্বর এবং অর্থের লোভে পিতার ঋণ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। হয়ত মল্লিক বংশের ধ্বংসের মৃত্যুবীজ সেই দিনই সবার অলক্ষ্যে রোপিত হয়েছিল বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দেশে এবং ক্রমে একদিন সেই বিষই এদের পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সত্যি কি মিথ্যা জানি না, হারাধন মল্লিক বলেন রত্নেশ্বরই নাকি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে দুধের সঙ্গে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে জন্ম নিলেন রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকণ্ঠ মল্লিক। তিনি দুই পুরুষ আগেকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর সে মনস্কামনা পূর্ণ হবার আগেই নিজ বংশের বিষের ক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে তিনি মৃত্যুকে বরণ করলেন। সংক্রামক ব্যাধির মতই পাপের বিষ তখন এদের বংশকে বিষাক্ত করে ফেলেছে, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে তখন এরা ছুটে চলেছে নিষ্ঠুর নিয়তির এক অলঙ্ঘ্য নির্দেশে। রায়পুর রাজবংশের এক করুণ অধ্যায়ের শুরু হয়ে গিয়েছে।

আপনার কি মনে হয় কিরীটীবাবু, শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের হত্যা, সুধীনের পিতার হত্যা, সতীনাথের হত্যা, নিশানাথের হত্যা সব একই সূত্রে গাঁথা? প্রশ্ন করে বিকাশবাবু।

এখনও সেটা বুঝতে পারেননি বিকাশবাবু? সব এক সূত্রে গাঁথা—একই উদ্দেশ্যে একের পর একে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে—রাজপরিবারের লোকেদের এবং অন্য যারা খুন হয়েছে বাইরের তারাও সেই বিষচক্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে এবং যদি ঐ একের পর এক হত্যার মূল অনুসন্ধান করেন তো দেখতে পাবেন সবেরই মূলে রয়েছে এক মোটিভ বা উদ্দেশ্য, সব একই—অর্থম্ অনর্থম্। কিন্তু যাক সে কথা। আমি শুধু সূত্রগুলো এখান থেকে ওখান থেকে একত্রে এক জায়গায় জড়ো করছি। সময় এলে ঐ সূত্রগুলো আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি বোধ হয় জানেন না বিকাশবাবু, একটি অভাগিনী মায়ের কাতর মিনতিই আমাকে এই রায়পুর হত্যারহস্যের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে।

অবিশ্যি আইনের দিক থেকে যার ওপরে আগেই যবনিকা পড়েছে।

আপনি কি সত্যিই মনে করেন, ডাঃ সুধীন চৌধুরীকে আবার খালাস করে আনতে পারা যেতে পারে?

মনে করি না বিকাশবাবু, সে বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চিত। কিন্তু তাহলেও বলতে দ্বিধা নেই প্রথমে যখন এ কেসটা কতকটা ঝোঁকের মাথায়ই আমি হাতে নিই, তখন সব দিক ততটা ভাল করে বিবেচনা করে উঠতে পারিনি, কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে সুধীনকে মুক্ত করতে পারি তো আর একজনকে তার জায়গাতে যেতে হবেই। হয়ত একটা ভূমিকম্পও উঠবে, ফলে অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে ওরা থানার কাছে এসে পড়েছিল; কিরীটী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, রাত্রি প্রায় আড়াইটে। এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাল-পরশু নাগাদই বোধ হয় আমি চলে যাব। কাল সকালে একবার হারাধন মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আপনিও আমার সঙ্গে থাকবেন কিন্তু। তারপর কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বললে নিম্নকণ্ঠে—তারপর বাকি থাকল একজন—

কার কথা বলছেন?

বলব পরে। কিন্তু হারাধন লোকটার কথাই ভাবি, অমন নির্লোভ, সত্যাশ্রয়ী লোক আজকালকার যুগে বড় বিরল মিঃ সান্যাল। হ্যাঁ ভাল কথা, হারাধনের নাতি জগন্নাথের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

সুব্রতবাবু ওর খুব প্রশংসা করেন। বলেন অমন ছেলে নাকি হয় না, একেবারে দাদু-অন্ত প্রাণ।

হ্যাঁ। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

ঐদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে কিরীটী বলে, তারিণী চক্রবর্তী, মহেশ সামন্ত ও সুবোধ মণ্ডলকে কাল বিকেলের দিকে একবার এদিকে ডাকিয়ে আনতে পারেন? তাদের আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ তো। নিশ্চয়ই আনাব।

* * *

পরের দিন বেলা গোটা নয়েকের সময় কিরীটী ও বিকাশকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে হারাধন সানন্দে ওদের আহ্বান জানালেন, আসুন, আসুন। চা আনতে বলি?

তা মন্দ কি!

হারাধনের ব্যাপার দেখে মনে হল যে, যেন এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওদেরই পথপানে চেয়ে ছিলেন। হারাধন চিৎকার করে ভৃত্যকে চা আনতে আদেশ দিলেন।

গত রাত্রের সব সংবাদ শুনেছেন বোধ হয় মল্লিক মশাই, কিরীটী মৃদুস্বরে বলে।

হ্যাঁ। শেষকালে নিশাও গেল। সব যাবে একে একে, এ আমি জানতাম কিরীটী-বাবু। নিশা আমার চাইতে বছর আটেকের ছোট। শোলপুরে চাকরি করবার সময় মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিত। কিন্তু ইদানীং এখানে আসবার পর অনেক সময় ভেবেছি যদি একবার দেখা হয়! তা আর হল না। শেষের দিকে হারাধনের কণ্ঠস্বর অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে যায় যেন।

মল্লিক মশায়! কিরীটী কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ডাকে।

অ্যাঁ! কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ, আপনি কি সত্যি সত্যিই ভেবেছিলেন, নিশানাথও খুন হবেন?

নিশ্চয়ই, এ-কথা তো আমি হাজার বার বলেছি, সেইদিন থেকে, যখনই শুনেছি এই বৃদ্ধ বয়েসে সে রূপালী চক্রের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে। কেউ থাকবে না, বুঝলেন কিরীটীবাবু, কেউ থাকবে না। রাজা রত্নেশ্বরের বংশে কেউ বাতি দিতে থাকবে না। বিধাতার অভিশাপ।

জগন্নাথ চায়ের ট্রেতে করে তিন পেয়ালা গরম চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, জগন্নাথের মুখখানা যেন বেশ গম্ভীর। কিরীটী হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে চায়ের কাপ একটা তুলে নিতে নিতে মৃদুস্বরে বললে, জগন্নাথবাবু, আপনার দাদুকে নিয়ে আজ বা কাল হোক যে কোন একসময় সময় করে রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে আসবেন। তাদের আজকের এতবড় দুঃসময়ে সব ভুলে যাওয়াই ভাল। দূরসম্পর্কীয় হলেও, আপনারাই এখন তাঁর একমাত্র আত্মীয় অবশিষ্ট রইলেন তো।

না না, জগন্নাথ প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠে, ওবাড়ির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই আর নেই। রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব ধুয়ে মুছে গেছে।

তা কি আর সত্যিই হয় জগন্নাথবাবু? এ কি জলের দাগ যে এত সহজে মুছে যাবে? এ যে রক্তের সম্পর্ক, কিরীটী বলতে থাকে, জানেন তো ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, blood is thicker than water! ঝগড়া মিটিয়ে ফেলুন। অতীতে কে একজন ভুল করেছিলেন বলেই যে, সেই ভুলের জের টেনে বেড়াতে হবে আজও বংশ-পরম্পরায় তার কি মানে আছে?

রক্তের দাগ বলেই তো মুছে ফেলবার নয় কিরীটীবাবু! জগন্নাথ জবাব দেয়।

কিন্তু—

কিরীটীকে বাধা দিয়ে জগন্নাথ মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, বড়লোক আত্মীয় সাপের চেয়েও সাংঘাতিক কিরীটীবাবু! আপনি ধারণাও করতে পারবেন না, গরীব আত্মীয়দের ওরা কত হীন চোখে দেখে; দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেলেই ওরা ভাবে যে হাত পাততে গেছি আমরা ওদের কাছে। আরও একটা কথা হচ্ছে, ওদের ঐ ধনগরিমার দৃষ্টি দিয়ে ওরা আমাদের মনে করে যেন কৃতার্থ করে দিচ্ছে, কিছুতেই সেটা যেন আমি সহ্য করতে পারি না, গায়ে যেন ছুঁচ বেঁধায়—তাছাড়া যে প্রাসাদে আমাদের সমান অধিকার একদিন ছিল, সেখানে আজ মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে পারবো না। না—মরে গেলেও না···উত্তেজনায় জগন্নাথ যেন হাঁপাতে থাকে।

কিরীটীও আর কিছু বলল না।

সন্ধ্যার দিকে মহেশ সামন্ত ও সুবোধ মণ্ডল এল থানায়। তারিণী চক্রবর্তী ছিল না, আগের দিন কোন এক মহলের কাজে গেছে।

প্রথমেই কিরীটী সুবোধকে ডাকলে, বসুন মণ্ডল মশাই।

আজ্ঞে স্যার! গরীব দাসানুদাস হই আমরা আপনাদের, আপনাদের সামনে উপবেশন করব, একি একটা লেহ্য কথা হল স্যার? কি আজ্ঞা হয় বলুন।

মণ্ডলের কথার বাঁধুনীতে কিরীটী না হেসে আর থাকতে পারলে না। বলে, মহাশয় বুঝি বৈষ্ণব? মাছ, মাংসও বুঝি চলে না? কিন্তু গলায় কণ্ঠি কই?

এ দাসের স্যার সত্যি কথা বলতে কি, কোন ধর্মের প্রতি আস্থাও যেমন নেই, অনাস্থাও তেমন নেই, বোঝেনই তো স্যার রাজবাড়ির বাজার-সরকার আমি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা সংসার-ধর্ম করেছেন, না এখনও বাজার-সরকারী করে সময় করে উঠতে পারেননি?

আজ্ঞে স্যার সে দুঃখের কথা আর বলবেন না, তিন তিনটি সংসার করেছিলাম, কিন্তু একটি কাশীবাসিনী, দ্বিতীয়া পিত্রালয়বাসিনী, কনিষ্ঠা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন।

কেন চতুর্থী?

রামঃ আর রুচি নেই স্যার।

আহা, আপনি তো তা হলে দেখতে পাচ্ছি রীতিমত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি!

হেঁ হেঁ, কি যে বলেন স্যার, আমরা হলাম আপনাদের দাসানুদাস, কীট হতেও কীট।

তা দেখুন মণ্ডল মশাই, আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই, ঠিক ঠিক যেন জবাব পাই, বিনয়ে বিগলিত হয়ে যেন আবার সব না গোলমাল করে ফেলে অযথা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলেন। তবে হ্যাঁ, গরীব লোক আপনি সে কথা আমি ভুলবো না।

তা মনে রাখবেন বইকি স্যার, এ অধীন তো আপনাদের পাঁচজনের দয়াতেই বেঁচে-

বর্তে আছে, তা কি আজ্ঞা হচ্ছে!

আপনাদের ম্যানেজার সতীনাথ লাহিড়ী মশাই যে রাত্রে খুন হন সেই রাত্রির কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?

সহসা যেন কিরীটীর কথায় মণ্ডলের মুখখানি কেমন পাংশুবর্ণ ভাব ধারণ করে, কিন্তু মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তা…তা…আছে বইকি স্যার।

আচ্ছা মণ্ডল মশাই, দারোগাবাবুর কাছে সে রাত্রে আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছিলেন, সতীনাথ লাহিড়ী মরবার আগে যে চিৎকার করে উঠেছিলেন, সেই চিৎকার শুনেই আপনি ঘর থেকে বের হয়ে যান। অথচ তারিণী খুড়োর পাশের ঘরে থেকেও আপনি জানতে পারেননি, কখন তারিণী চক্রবর্তী ঘর থেকে বের হয়ে যান! আপনি তখন জেগেই ছিলেন, কেমন তাই না?

না, বোধ হয় তো আমি ঘুমিয়েই ছিলাম।

বেশ ভাল করে মনে করে দেখুন, মনে হচ্ছে যেন আমার, বোধ হয় কেন— নিশ্চয়ই আপনি জেগেই ছিলেন, মোটেই ঘুমোননি!

আজ্ঞে স্যার, তা কি করে হয়! ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে থাকা কি করে সম্ভব, বলুন?

সম্ভব এই জন্য যে চিৎকারটা আপনি বেশ পরিষ্কারই শুনতে পেয়েছিলেন। ঘুমিয়ে থাকলে কি কেউ চিৎকার শুনতে পায়? এবং শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন বলেই এটাও জানেন, আপনার তারিণী খুড়ো কখন ঘর থেকে বের হয়ে যান। বুঝলেন মণ্ডল মশাই, একে বলে আইনের 'লজিক'। ঠিক আপনি বুঝতে পারবেন না, কারণ 'লজিক' তো আর আপনি পড়েননি। যাহোক, আমাদের 'লজিকে' বলে চিৎকারটা যখন শুনেছেন, এবং জেগে না থাকলে যখন চিৎকার শোনা যায় না, তখন আপনি কি করে ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। অতএব জেগেই ছিলেন। কেমন, প্রমাণ হল তো! বেশ, এবারে বলুন তো, শুধু যে আপনার তারিণী খুড়োকেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে শুনেছিলেন তা নয়, আরও কাউকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতেও শুনেছিলেন, যার পায়ের জুতোর তলায় লোহার নাল বসানো ছিল!

সুবোধ বোকার মত ফ্যালফ্যাল্ করে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কি যে জবাব দেবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

মণ্ডল মশাই, আপনি যে একজন নিরীহ গোবেচারী গোছের লোক, তা আমি জানি। কারও সাতেও নেই আপনি, কারও পাঁচেও নেই। অথচ কেমন বিশ্রীভাবে আপনি এই খুনের মামলায় জড়িয়ে যাচ্ছেন, তা যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতেন তাহলে হয়ত ভুলেও বলতেন না যে আপনি সে রাত্রে বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলেন। তাছাড়া

এ-কথা কে না বোঝে, খুনের মামলায় জড়িয়ে যাওয়া কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। চাই কি 'যোগ-সাজস' আছে প্রমাণ হয়ে গেলে সারাটা জীবন কাষ্ঠখানি ঘুরিয়ে সরিষা হতে বিশুদ্ধ সরিষার তৈলও উৎপাদন করতে হতে পারে। এবং সেও আর চারটিখানি কথা নয়, কি বলুন!

স্যার, একটা বিড়ি পান করতে পারি? গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে।

আহা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! সে কি কথা, ম্যাচ আছে, না দেব?

কিরীটী লক্ষ্য করে দেখলে বিড়ি ধরাচ্ছে বটে সুবোধ, কিন্তু কি এক গভীর উত্তেজনায় হাত দুটো তার ঠকঠক করে কাঁপছে।

মণ্ডল মশাই, এবারে বোধ হয় আপনি বসতে পারবেন, ঐ চেয়ারটায় বসুন। তারপর আপনার আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই বলছি শুনুন। যদি কোথাও কোন ভুল হয় দয়া করে শুধরে দেবেন। সেইদিন রাত্রে মানে যেদিন আপনাদের ভূতপূর্ব ম্যানেজার লাহিড়ী মশাই খুন হন, সেদিন এই রাত্রি দশটা কি পৌনে দশটার সময়, প্রথমে আপনি একটা শব্দ শুনতে পান, ঠিক যেন জুতো পায়ে দিয়ে কেউ বারান্দা দিয়ে হেঁটে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে। জুতোর শব্দ ঠিক অনেকটা আপনাদের ছোট্টু সিংয়ের লোহার নাল বসানো নাগরাই জুতোর শব্দের মত। কিন্তু কিছু আপনি মনে করেননি, তার কারণ আপনি ভেবেছিলেন, ছোট্টু সিং-ই বাইরে যাচ্ছে। তারপর অনেকক্ষণ আপনি কান পেতে অপেক্ষা করেছেন, কারণ আপনি জানতেন, রাত্রে মানে ঠিক সন্ধ্যার পর হতে ঐ দরজার প্রহরা ছেড়ে ছোট্টু সিংয়ের বাইরে কোথাও যাওয়ার হুকুম নেই; এবং যদি সে হুকুম না মেনে দরজা ছেড়ে মুহূর্তের জন্যও কোথাও যায় ও সে কথা যদি ম্যানেজার বাবু জানতে পারেন, তাহলে তার চাকরি তো যাবেই জমানো মাইনেটাও কাটা যাবে। এখানে হপ্তায় দুবার হাট করে রাজবাড়ির সাতদিনের মত অনেক কিছু জিনিস কিনে-কেটে আপনি আনেন; কিন্তু ম্যানেজারবাবু আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না বলে, তিনি ছোট্টু সিংকে আপনার সঙ্গে যেতে আদেশ দেন। কাজে কাজেই ছোট্টু সিংয়ের ওপরে আপনার সন্তুষ্ট না থাকা খুবই স্বাভাবিক। এবং আপনি সর্বদা চেষ্টা করছিলেন কি করে ছোট্টু সিংকে জব্দ করা যেতে পারে। কি, আমি কিছু মিথ্যে কথা বলছি? বলুন?

আজ্ঞে···আ···আপনি···

সত্যি কথাই বলছি, এই তো!···বেশ, শুনে সুখী হলাম। যাক্, আপনি ফিরতি শব্দ শোনার জন্য তাই জেগেই ছিলেন। কারণ জুতোর শব্দ শুনে প্রথম হতেই আপনি সন্দেহ করেছিলেন, সে ছোট্টু সিংয়েরই পায়ের শব্দ, এবং সে কাউকে না জানিয়ে দরজা অরক্ষিত

রেখে কোথাও যাচ্ছে। কেমন, তাই না?

আ...আপনি কে?

সুবোধবাবু! সহসা কিরীটীর এতক্ষণের পরিহাস-তরল কণ্ঠ যেন যাদুমন্ত্রে কঠিন হয়ে ওঠে।

সুবোধ মণ্ডল ভীষণ রকম চমকে উঠে, কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

ময়াল সাপের গল্প শুনেছেন কখনও মণ্ডল মশাই! আপনি ময়াল সাপের খপ্পরে পড়েছেন। কিন্তু কোন ভয় নেই আপনার। আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু সে কেবল একটি শর্তে...আপনি সব কথা আমার কাছে এই মুহূর্তেই অকপটে আগাগোড়া খুলে বলবেন তবেই, নচেৎ—

আজ্ঞে! মণ্ডলের গলার স্বর কাঁপতে কাঁপতে থেমে যায়।

বলুন, লোকটা যখন আবার ফিরে আসে, আধঘণ্টা পরে, তখন শব্দ শুনেই আপনি বাইরে এসে তাকে দেখতে পান কিনা!

হ্যাঁ—কিন্তু তাকে আমি চিনতে পারিনি। অন্ধকারে তাকে আমি ভাল করে দেখতে পাইনি।

সত্যি কথা বলছেন?

আজ্ঞে মা কালীর দিব্যি!

তারিণী খুড়ো যখন ঘর হতে বের হয়ে যান চিৎকার শুনে, তাও আপনি জানেন, কেমন না?

হ্যাঁ।

আপনি চিৎকার শুনে বের হননি কেন?

খুড়োকে যেতে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম।

দরজা বন্ধ ছিল না?

আজ্ঞে না, খোলাই ছিল। খুড়ো দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে যেতে দেখেছি।

মহেশ সামন্ত সে বুঝি তারিণীর পরেই যায়?

হ্যাঁ, ঠিক খুড়োর পিছু পিছুই গেছে।

আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন মণ্ডল মশাই। আপনার কোন ভয় নেই। আমাকে আজ আপনি যা বললেন, ঘুণাক্ষরেও কেউ তা জানতে পারবে না। এবং জানতে পারলেও, আপনি যাতে বিপদে না পড়েন সে ব্যবস্থা আমি করব, কথা দিচ্ছি।

আপনি!

আমি কে, তাই জানতে চান তো? এবং কি করে আমি এসব জানলাম, না?

আজ্ঞে!

এইটুকুই শুধু জানুন, জানাটাই আমার কাজ। গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করি বলেই আমার আর এক পরিচয় রহস্যভেদী!

সুবোধ মণ্ডল চলে যাবার পর, আরও আধঘণ্টা পর কিরীটী মহেশকে বসিয়ে রেখে, অবশেষে বিকাশকে ডেকে মহেশকে ছেড়ে দিতে বললে। তার আর জবানবন্দি নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

॥ সাত ॥

পাতালঘরের বন্দী

সুব্রত প্রথমটা চমকেই উঠেছিল, কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিতে সুব্রতর বেশী সময় লাগল না। খোলা আলমারীর মধ্যস্থিত আবিষ্কৃত সেই গুপ্তপথের দিকে সুব্রত আরও একটু এগিয়ে গেল এবং হাতের জোরাল হান্টিং টর্চের আলো ফেললে। সামনে দেখতে পায় ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। একবার মাত্র সুব্রত ইতস্ততঃ করলে, তারপরই এগিয়ে গেল সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপটির পরে। অন্ধকার। নিকষ কালো অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়। সুব্রত আবার হাতের টর্চবাতি জ্বালল। দশ-বারটা সিঁড়ি অতিক্রম করতেই সমতলভূমি পায়ে ঠেকল। কোন ভিজে স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন ধূলিমলিন ঘরের মেঝেতে যে ও পা দিয়েছে তা বুঝতে ওর কষ্ট হল না।

সুব্রত হাতের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। অত্যন্ত নীচু ছাত, দাঁড়ালে সামান্য চার-পাঁচ ইঞ্চির জন্য মাথা ছাতে ঠেকে না, অল্পপরিসর একখানি ঘর, সামনেই একটা দরজা। হঠাৎ সেটা খুলে গেল। সামনে ও কে! ভূত না মানুষ! জীবিত না মৃত! ওকি পৃথিবীর কেউ, না অন্ধকার পাতাল গহ্বরের কোন বায়ুভূত প্রেতাত্মা তাকে ভয় দেখাবার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! সুব্রত বেশ ভাল করে চোখ দুটো একবার রগড়ে নিল।

আগন্তুক মাঝারি গোছের লম্বা। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল, কাঁচা-পাকা রুক্ষ দাড়ি। খালি গা। পরনে ধূলিমলিন একখানি শতছিন্ন ধুতি। একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ তার গা থেকে বের হচ্ছে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। দু'পায়ে মোটা লোহার শিকলের সঙ্গে লোহার বেড়ি আটকানো।

লোকটার চোখে সুব্রতর টর্চের আলো পড়তেই চোখ দুটো সে একবার বুজিয়েই

আবার খুলে ফেললে। এবং পরক্ষণেই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আচমকা ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠল। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই হাসির প্রতিধ্বনি যেন কি এক ভৌতিক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে ওঠে। সুব্রত থমকে যেতেই হঠাৎ টর্চের বোতাম থেকে হাতের আঙুল সরে গিয়ে দপ করে আলোটা নিভে যায়। কিন্তু আলো জালবার আগেই সুব্রতর নজরে পড়ে খোলা দরজাপথে অন্ধকারে অতি ক্ষীণ একটা প্রদীপ-শিখা। ওপাশের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি পিলসুজের ওপরে পিতলের প্রদীপ জ্বলছে। নিশ্ছিদ্র আঁধারে যেন ঐ সামান্য প্রদীপের আলো অস্ফুট প্রাণস্পন্দনের মত করুণ ও অসহায় মনে হয়।

লোকটা হঠাৎ কথা বলে ওঠে, কে তুই, এখানে কি চাস্ ?

তুমি কে ?

আমি !...ভুলে গেছি, মনে নেই তো, মনে আর পড়ে না, আমি কে। সে কি আজকের কথা! হ্যাঁ, আজ ঠিক ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হয়ে প্রথম দিন। দিন আমি গুনছি। ওই দেখ না দেওয়ালের গায়ে, এক এক মাস শেষ হয়েছে, আর হাতের আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে, সেই দেওয়ালের গায়ে একটা কালো দাগ কেটেছি। দেখ তো! দেখ তো! গুণে দেখ না! হিসাবে আমার ভুল নেই। ঠিক ছাব্বিশ বছর একদিন হল, রক্ত। বলতে বলতে হঠাৎ লোকটা থেমে যায় তারপর ঝন্ঝন্ করে শিকলের শব্দ তুলে কুলুঙ্গির কাছে এগিয়ে গিয়ে পিলসুজ থেকে প্রদীপটা তুলে নিয়ে, সুব্রতর একেবারে কাছ ঘেঁষে এগিয়ে আসে, এবং প্রদীপটা সুব্রতর মুখের সামনে তুলে ধরে মৃদু সাবধানী কণ্ঠে বলে, ভয় পেলে ? ভয় কি! ওরা আমায় পাগল সাজিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস কর—সত্যি সত্যি আমি পাগল নই। তুমি আমার খোকা—খোকনকে দেখেছ ? সমুদ্রের মত নীল, কাঁচের মত চক্চকে দুটো চোখ! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথাভর্তি চুল! সবে তখন হাঁটতে শিখেছে। টলে টলে হাঁটত, আর নিজেই আধো-আধো স্বরে বলত, হাঁটি হাঁটি পা পা! খোকন হাতে দেখে যা! আমার খোকন! না তুমি দেখনি। কেমন করে তুমি দেখবে তাকে ? তোমার চোখের দৃষ্টিই বলছে আমার খোকনকে তুমি দেখনি।

এ তো পাগলের প্রলাপোক্তি নয়! এ যেন কোন মর্মপীড়িতের বুকভাঙা কান্না! মর্মান্তিক কার যেন এ বিলাপধ্বনি!

আবারও বলতে থাকে, চিনলে না তো আমায়, চিনলে না তো! চিনবেই বা কেমন করে! ছাব্বিশ বছর আগে যে মরে গেছে তাকে কি আজ আর চেনা যায়! না তাকে কেউ চিনতে পারে! তারপরই হঠাৎ কেমন যেন ভয়চকিত কণ্ঠে বলে ওঠে, পালাও,

এখুনি পালাও। সে দেখলে আর তোমার রক্ষা থাকবে না। সে বড় নিষ্ঠুর। আমাকে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না। কথা বললেই একটা সরু চামড়ার চাবুক আছে, তাই দিয়ে সপাং সপাং করে আমায় মারে। দেখবে? দেখ, দেখ···লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়।

সুব্রত লোকটার পিঠের ওপরে টর্চের আলো ফেলে চমকে ওঠে, পিঠের ওপরে অজস্র বেত্রাঘাতের নির্মম চিহ্ন। কেটে কেটে চামড়ার ওপরে দাগ বসে গেছে। লোকটা প্রদীপ হাতে আবার ফিরে দাঁড়ায়—প্রদীপের আলোয় সুব্রত স্পষ্ট দেখতে পায়, চকচক্ করছে লোকটার হু'চোখের কোলে অশ্রু।

আমি কিন্তু কাঁদি না। দোষ অবিশ্যি আমারই। আমারই বোঝা উচিত ছিল। হুধের মধ্যে লুকিয়ে দিল বিষ। তীব্র বিষ! স্বেচ্ছায় তীব্র বিষ পান করেছি। প্রথমেই বুঝতে পারিনি, বুঝতে যখন পারলাম, তখন এখানে আমি বন্দী। দেখাতে পার—আমার খোকনকে একটিবার দেখাতে পার—বলতে পার কেমন দেখতে হয়েছে আজ সে!

কি জবাব দেবে সুব্রত বুঝতে পারে না।

সহসা তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল। চকিতে সুব্রত পিছন দিকে তাকাল। কণ্ঠস্বর যে তার বিশেষ পরিচিত। কিন্তু সুব্রতর বিস্মিত কণ্ঠে কোন স্বর বের হবার আগেই আচমকা একটা ঠাণ্ডা জলীয় বাষ্পের মত ওর চোখেমুখে অজস্র কণায় এসে যেন একটা ঝাপ্‌টা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা টলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর জ্ঞানহীন দেহটা হাঁটু হুমড়ে ভেঙে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

আগন্তুক বললে, কল্যাণবাবু! ভাবছ তোমায় আমি চিনতে পারিনি, তাই না?

আগন্তুক পকেট থেকে অতঃপর একটা শক্ত সরু সিল্ক কর্ড বের করে জ্ঞানহীন ভূলুণ্ঠিত সুব্রতর হাত পা বাঁধবার জন্য এগিয়ে এল।

এক মিনিট বন্ধু, অত তাড়াতাড়ি নয়!

আগন্তুক চকিতে হু'পা পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়াল। মাত্র হাত পাঁচেক পশ্চাতে যে দাঁড়িয়ে তার হাতে একটি ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল। এবং সেই ভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্রটির চোং ওরই দিকে উদ্যত।

প্রথম ব্যক্তির বিস্মিত ভাবটা কেটে যেতেই বলে ওঠে, এ কি! তুমি!

হ্যাঁ, আমি। কল্যাণবাবুকে বাঁধবার আগে, আমাদের মধ্যে পরস্পরের একটা মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নয় কি বন্ধু!

তার মানে?

মানে অতি সহজ! অত্যন্ত প্রাঞ্জল! আমি ভেবেছিলাম এই খেলায় সঙ্গী বুঝি

মাত্র আমিই একা। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমার ভুল। কিন্তু ভুল বোঝবার পর, সে ভুলকে আর যেই বাড়তে দিক, শিবনারায়ণ চৌধুরী কখনও বাড়তে দেয় না। যার ওপরে বিশ্বাস রেখে আমি আমার সবকিছু,এমন কি জীবন পর্যন্ত জামিন রেখেছিলাম, আজ যখন দেখতে পাচ্ছি তার কোন মূল্যই নেই, তখন কেন আর এ মিথ্যা প্রহসনের বোঝা টেনে বেড়াই !

প্রথম ব্যক্তি যেন বোবা।

আজ এইখানে, এই অন্ধকূপের মধ্যেই রাত্রির অন্ধকারে তার শেষ মীমাংসা হয়ে যাক। দ্বিতীয় আগন্তুক বললে।

কিসের মীমাংসা তুমি আমার সঙ্গে করতে চাও শিবনারায়ণ ?

এখনও কি বুঝতে পারনি ?

হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে একসময় পাগলটা ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ওঠে। দুজনেই চম্‌কে ওঠে। শিবনারায়ণ সামান্য একটু চমকে বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তেই প্রথম ব্যক্তি বাঘের মত শিবনারায়ণের ওপরে লাফিয়ে পড়ে। জড়াজড়ি করে দুজনেই মাটিতে গিয়ে পড়ল। এবং ধস্তাধস্তি শুরু হল। এদিকে ঐ সময় পাগল হাতের সামনে কুলুঙ্গির ওপরে রক্ষিত পিলসুজটা তুলে নিয়ে প্রথমে শিবনারায়ণের মাথায় প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করলে; শিবনারায়ণের চিৎকার মেলাতে না মেলাতেই পাগল অন্য লোকটির মাথায়ও প্রচণ্ড আঘাত হানল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা আর্ত চিৎকার করে জ্ঞানহীন শিবনারায়ণের পাশেই সংজ্ঞাহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দুজনের মাথা ফেটেই রক্ত ধূলিমলিন মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়েছে। পাগল আবার খিকখিক করে হেসে ওঠে, এতদিনে হত্যার রক্ততর্পণ হল বুঝি !

কিন্তু আর দেরি নয়। এই তো সুযোগ ! পাগল শিবনারায়ণের দেহের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওর জামার পকেট ও কটিবাস হাতড়াতে থাকে। কটিবন্ধেই চাবির তোড়াটা গোঁজা ছিল। তাড়াতাড়ি সেই চাবি দিয়ে, পায়ের বেড়ী খুলে ফেলল। আঃ, মুক্তি ! মুক্তি !

এতক্ষণে সুব্রতর জ্ঞানও একটু একটু করে ফিরে আসছে, সুব্রত পাশ ফিরে শুল।

পাগল সুব্রতর দেহ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল, উঠুন ! শুনছেন কল্যাণবাবু উঠুন।

সুব্রত অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকাল। চোখে তখনও ঘোর লেগে আছে একটা।

শুনছেন ! উঠুন শীগগির। পালাতে হবে।

* * *

আধ ঘণ্টা পরে। তারা দুজনে তখনও রক্তাক্ত জ্ঞানহীন অবস্থায় অন্ধকার অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে।

গুপ্তদ্বার বন্ধ করে সুব্রত ও পাগল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

রাতটা শেষ হয়ে এল। পূব-গগনে প্রথম আলোর ইশারা।

॥ আট ॥

ঘটনার সংঘাত

সুব্রত বুঝতে পেরেছিল আর এখানে একটি মুহূর্তও থাকা নিরাপদ নয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নৃসিংহ গ্রাম থেকে তাকে পালাতে হবে এবং কিরীটীকে গিয়ে সব কথা জানাতে হবে। সুব্রত আস্তাবলে যেখানে ঘোড়া দুটো বাঁধা থাকে সেখানে গেল। সহিসকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে, যত শীঘ্র সম্ভব ঘোড়ার জিন চড়াতে বলে, সুব্রত আবার প্রাসাদে ফিরে এল। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ত দিনের আলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

এদিকে সেই বন্দীকে আগেই বসিয়ে রেখে গিয়েছিল উপরের ঘরে। যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সুব্রত, সেখানে এসে দেখলে সে নেই। গেল কোথায়, সুব্রত তাড়াতাড়ি এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে লাগল। উপরের সমস্ত ঘরগুলোই ও দেখলে, কোথাও সে নেই। নীচের সিঁড়ি দিয়ে নামছে, দেখলে লোকটা উঠে আসছে। সুব্রতকে দেখে সে বললে, কই, খোকনকে কোথাও পেলাম না তো ?

আমি জানি, আপনার খোকন কোথায় আছে। চলুন আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি। আর দেরি হলে বিপদে পড়ব আমরা।

কিন্তু কোথায় যাব ?

যেখানে আপনার খোকন আছে।

না, আমি কোথাও যাব না। তুমি জান না, খোকন আমার এখানেই আছে।

শুনুন, আপনার খোকন এখানে নেই। আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন ?

ঘোড়ায় ? হ্যাঁ। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়েছি যে।

তবে শীগগির আসুন আমার সঙ্গে। আপনার খোকন আমার কাছে আছে।

খোকন তাহলে তোমার কাছেই আছে ? ঠিক বলছ ? মিথ্যো কথা বলছ না তো ?

না, চলুন।

*   *   *   *

সুব্রত অবাক হয়ে গিয়েছিল পাগলের অশ্বচালনা দেখে। অতি দক্ষ অশ্বারোহী। পৃথিবীর বুক থেকে অন্ধকারের পর্দাটা উঠে যাচ্ছে ; ভোরের প্রথম সোনালী আলো পদ্মের পাপড়ির মত একটি একটি করে যেন দলগুলো মেলে ধরেছে।

প্রায় দুপুর নাগাদ ওরা জঙ্গলের মধ্যে এসে পৌঁছল। ছায়াশীতল একটা বড় গাছের নীচে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ; আসবার সময় তাড়াতাড়িতে কোন রকম আহার্যবস্তুই সংগ্রহ করে আনা হয়নি। সুব্রত কেবল ফ্লাস্কটা ভর্তি করে জল এনেছিল। তাই দুজনে পান করে কিছুটা তৃষ্ণা মেটাল।

ঐ জায়গাটা থেকে রায়পুর মাত্র মাইল পাঁচ-ছয়েকের পথ। সুব্রত মনে মনে আগেই ঠিক করে রেখেছিল, সন্ধ্যা হওয়ার পরই ওরা ওখান থেকে রওনা হবে, যাতে করে ওদের শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যায়, তাহলে কেউ ওদের পথে দেখলেও চিনতে পারবে না। চাঁদ উঠবে সেই মাঝরাত্রে। নৃসিংহ গ্রাম থেকে রওনা হবার পর থেকেই লোকটা যেন কেমন নিঝুম হয়ে গিয়েছিল, আর একটি কথাও বলেনি। আপন মনে নিঃশব্দে সুব্রতর পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। ফ্লাস্ক থেকে জলপান করে লোকটা গাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। দীর্ঘদিন ধরে ঘরের মধ্যে অচল অবস্থায় বন্দী থাকবার পর আজ এতটা গুরু পরিশ্রম করে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। শীঘ্রই ঐ অবস্থায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। সুব্রতর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে কেবলই পাক খেয়ে ফিরছিল। যাকে ও অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল, লোকটা কে? কি এর পরিচয়? নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন উত্তর পায়নি। অবিশ্যি একটা সন্দেহ ওর মনের কোণে মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু—তাহলে! সেটা কি আগাগোড়াই একটা সাজানো ব্যাপার! আর তাই যদি হয়, তবে লোকটাকে এই ভাবে দীর্ঘকাল ধরে প্রাণে না মেরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দী করে রাখবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তারপর গুপ্তকক্ষের মধ্যে অকস্মাৎ সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি এক যুবকের আবির্ভাব। এ শুধু অভাবনীয়ই নয়, বিস্ময়করও বটে। ঐ যুবক রাজাদের স্টেটের অংশীদার, এবং বোঝা যাচ্ছে সে আগাগোড়াই সুব্রতর পরিচয় জানত, এবং তার প্রতি সে নজর রেখেছিল। সারাটা রাস্তা সুব্রত অশ্বচালনা করতে করতে যুবকের কথাই ভেবেছে। সতীনাথ লাহিড়ী যে রাত্রে নিহত হন, সে রাত্রে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে কাগজপত্র হাতড়াবার পর, ফিরে আসবার সময়, ছাদের উপরে যে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখেছিল, এবং যার চলাটা তার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল কিন্তু তখন বুঝে উঠতে পারেনি, এবারে সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে, সে আর কেউ নয়,

এই যুবকই! তবে কি শেষ পর্যন্ত এই এক রাত্রে তার ঘরে গিয়ে ঢুকে বাক্স-প্যাঁটরা সব হাতিয়ে এসেছিল! এতদিন তবে এই কি সর্বক্ষণ তাকে অলক্ষ্যে ছায়ার মত পিছু পিছু অনুসরণ করে ফিরছিল! আশ্চর্য! একবারও সুব্রত ওকে কিন্তু সন্দেহ করেনি এতটুকু। প্রথম থেকেই লাহিড়ীকে নিয়ে ও এত ব্যস্ত ছিল যে ঐ যুবকের দিকে নজর দেবার ফুরসুৎও পায়নি। তারপর শিবনারায়ণ চৌধুরী! এই সব কারণেই হয়ত কিরীটী ওকে বার বার নৃসিংহ গ্রামে একটিবার ঘুরে যাওয়ার জন্য লিখছিল। যুবক ও শিবনারায়ণ দুজনেই রীতিমত আহত হয়েছে। সুব্রত সেখান থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে সেই গুপ্তকক্ষে দরজা বন্ধ করে, সেই ঘরের বাইরে তালা দিয়ে এসেছে। সেই গুপ্তকক্ষ থেকে বের হবার আর কোন গুপ্তপথ আছে কিনা তাই বা কে জানে! ওদের যখন আবার জ্ঞান ফিরে আসবে, তখন হয়ত আবার এক নতুন নাটকের শুরু হবে সেই প্রায়-অন্ধকার গুপ্তকক্ষের মধ্যে, কারণ আসবার সময় সেই কক্ষের একটি মাত্র প্রদীপ কেবল সে রেখে এসেছে। এবং ওদের সঙ্গে যে টর্চ ও পিস্তল ছিল, সেগুলো নিয়ে আসতে ভোলেনি।

দুটো রাত্রি মাত্র সুব্রত নৃসিংহ গ্রামে ছিল, এর মধ্যে রায়পুরেই বা আবার কি ঘটল তাই বা কে জানে! এখন ফিরে যাওয়ার পর ঘটনার স্রোত কোনদিকে বইবে, তাই বা কে জানে! সমগ্র ঘটনাটি বর্তমানে এমন একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পর পর অনেকগুলো সমস্যা এসে যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করছে।

* * *

রাত্রি তখন প্রায় আটটা হবে, সুব্রত বরাবর লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়া দুটো সঙ্গে আনেনি; বনের শেষ সীমানায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে। শিক্ষিত অশ্ব, ছাড়া পেয়ে আবার উল্টো পথে নৃসিংহ গ্রামের দিকে চলতে শুরু করেছে, ওরা দেখে এসেছে। সুব্রত জানে যথাসময়েই ফিরে যাবে তারা নৃসিংহ গ্রামের আস্তাবলে।

থাকহরি বারান্দাতেই বসে ছিল। সুব্রতকে দেখে সানন্দে উঠে দাঁড়ায়।

সুব্রত বললে, চট্‌পট্ করে আমাদের স্নানের জল দে বাথরুমে থাকহরি। আর বেশ কড়া করে দু পেয়ালা চা তৈরী করে আন দেখি।

থাকহরি ফ্যালফ্যাল করে তার মনিবের সঙ্গে যে লোকটা এসেছে, অদ্ভুত বেশভূষা ও দাড়ি গোঁফ, একমাথা রুক্ষ চুলের দিকে চেয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এ লোকটা কোথা থেকে এল আবার? কাকে আবার সঙ্গে করে বাবু নিয়ে এলেন! কিন্তু মুখ ফুটে বলতে কিছু সাহস পেলে না।

ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

লোকটাকে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে সুব্রত ধোপদুরস্ত একপ্রস্থ জামাকাপড় পরিয়ে দেবার পর তার চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। লোকটা কিন্তু সুব্রতকে কোন বাধা দিল না। থাকহরিকে দিয়ে সুব্রত থানায় কিরীটীর কাছে একটা সংবাদ পাঠিয়ে দিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় কিরীটী ও বিকাশ এসে হাজির হল। লোকটা তখন সুব্রতর ঘরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সুব্রত ধীরে ধীরে নৃসিংহ গ্রামের সমগ্র ঘটনা একটুও না বাদ দিয়ে ওদের কাছে বলে গেল।

সমস্ত শুনে কিরীটী বললে, কাল সকালেই আমি ওকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব। বিকেলের দিকে প্রায় ছটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে, তাতেই তুই কলকাতায় চলে যাবি। এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে। রায়পুর রহস্যের ওপরে এবারে আমরা যবনিকা-পাত করব।

এই লোকটা কে কিরীটীবাবু? বিকাশ প্রশ্ন করে।

আমার মনে হচ্ছে খুব সম্ভবতঃ সুরেন চৌধুরী—ডাঃ সুধীন চৌধুরীর বাপ। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

সে কি! তাহলে উনি যে অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন বলে আমরা জানি সেটা তবে সত্যি কথা নয়!

না। যদিও আসল খুনী, মানে যে সুরেন চৌধুরীকে এ পৃথিবী থেকে সরাতে চেয়েছিল, সে জানত সুরেন চৌধুরীকে হত্যা করাই হয়েছে, কিন্তু মাঝখান থেকে বোধহয় আর একটি অদৃশ্য হাত সব ওলটপালট করে দেয়।

তাহলে যে সুরেন চৌধুরীকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সে আজও জানে না উনি বেঁচেই আছেন?

খুব সম্ভবতঃ না।

॥ নয় ॥

পাতালঘরে

মিনিটে মিনিটে ঘণ্টা কেটে গেল।

প্রথমে জ্ঞান ফিরে আসে যুবকের। ধুলোবালি রক্তে বীভৎস চেহারা। প্রদীপের আলোয় আবছা আবছা অন্ধকার পাতাল ঘরটা থমথম করছে!

প্রদীপের সামান্য তেল ফুরিয়ে এল, আর বেশীক্ষণ জ্বলবে না। এখুনি নিভে যাবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘরটা ডুবে যাবে।

মাথার মধ্যে এখনও ঝিম্‌ঝিম্ করছে। স্মৃতিশক্তি ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। যুবক একবার উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। এলিয়ে পড়ে।

শিবনারায়ণেরও জ্ঞান ফিরে এল। অস্পষ্ট যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে শিবনারায়ণও নড়েচড়ে ওঠেন।

আরও আধ ঘণ্টা পরে।

প্রদীপের আলো প্রায় নিভু-নিভু তখন, ঘরের মধ্যে যেন একটা ভৌতিক আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা।

যুবকের কোমরে যে তীক্ষ্ণ ছোরাটা গোঁজা ছিল সেটা সে টেনে বের করে।

রক্তাক্ত মুখের ওপরে মাথার চুলগুলো এসে পড়েছে।

চোখে মুখে একটা দানবীয় জিঘাংসা।

শিবনারায়ণ!

অস্পষ্ট প্রদীপের আলোয় যুবকের হস্তধৃত ধারাল ছোরাটা যেন মৃত্যুক্ষুধায় হিলহিল করছে। ঐদিকে দৃষ্টি পড়ায় শিবনারায়ণ যেন বারেক শিউরে ওঠেন; চোখে মুখে একটা আতঙ্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিবনারায়ণ!

তুমি কি আমায় খুন করতে চাও?

যদি বলি তাই?

কিন্তু কেন? কেন তুমি আমায় খুন করবে?

খুন তোমাকে আমার করতেই হবে। যুবক এগিয়ে আসে।

শিবনারায়ণ এক পা দু পা করে দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে যায়।

কোথায় পালাবে আজ তুমি শিবনারায়ণ! এই অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে কতটুকু জায়গা তুমি পাবে পালাবার? তোমাকে খুন করব। হ্যাঁ, খুন করব। এই তীক্ষ্ণ ছোরাটার সবটুকুই তোমার বুকে বসিয়ে দেব। ফিন্‌কি দিয়ে তাজা লাল রক্ত বের হয়ে আসবে। প্রাণভয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় তুমি চিৎকার করে উঠবে। কেউ সে চিৎকার শুনতে পাবে না। কেউ জানতে পারবে না। দীর্ঘকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেমন সুরেন চৌধুরী বন্দী হয়েছিল, কেউ জানতে পারেনি, তেমনি তোমার মৃতদেহও এই ধুলিমলিন অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে পড়ে থাকবে।

কেন—কেন তুমি আমাকে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে? আমি তো তোমার কোন

ক্ষতি করিনি ?

মরতে যেন তুমি ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে শিবনারায়ণ ?

ভয় ! না ঠিক তা না।

তবে ? ভয় কি শিবনারায়ণ ! শুধু যে তোমাকেই মরতে হচ্ছে তা নয়। মরতে আমাকেও হবে। তবে দুদিন আগে আর পরে এই যা। তাছাড়া ভেবে দেখ, ফাঁসীর দড়িতে ঝুলে অসহনীয় শ্বাসকষ্ট পেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চাইতে তোমার এ মৃত্যু ঢের ভাল নয় কি ?

ঐ সময় যুবকের সামান্য অসতর্কতায় শিবনারায়ণ যুবকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শয়তান !

অতর্কিত আক্রমণে যুবক মেঝের উপর পড়ে যায়।

অসীম শক্তি শিবনারায়ণের দেহে—শিবনারায়ণ যুবকের উপরে চেপে বসে দু'হাতে প্রাণপণ শক্তিতে যুবকের গলাটা চেপে ধরে। জোরে, আরও জোরে চাপ দেয়। যুবকের চোখ দুটো কি এক অস্বাভাবিক আতঙ্কে যেন অক্ষিকোটর হতে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

গোঁ গোঁ একটা অস্পষ্ট শব্দ যুবকের গলা দিয়ে বের হয়ে আসে। ক্রমে যুবকের দেহটা শিথিল হয়ে আসে। জোরে—আরও জোরে শিবনারায়ণ যুবকের গলায় দশ আঙুলের চাপ দেয়।

তারপরই শিবনারায়ণ পাগলের মত হেসে ওঠে।

প্রদীপটা শেষবারের মত দপ্‌ করে একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। অন্ধকার ! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার !

চোখের দৃষ্টি বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

শিবনারায়ণ হাসছে, পাগলের মতই হাসছে অন্ধকারে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.! অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে সেই উচ্চহাসির শব্দ যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে করতালি দিয়ে দিয়ে ফিরছে দেওয়ালে দেওয়ালে।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ঘর হতে বেরুতে হবে। অন্ধকারে শিবনারায়ণ হাতড়ে হাতড়ে পাতালঘর থেকে বাইরে বের হবার রাস্তা খুঁজতে শুরু করে এবারে।

এ কি, অন্ধকারে কি শিবনারায়ণ পথ হারিয়ে ফেলল !

অন্ধকারের গোলকধাঁধা !

শিবনারায়ণ পাগলের মতই ঘোরে ঘরের ভিতর।

কিন্তু না। পথ কই! আলো! একটু আলো!

পাগলের মতই শিবনারায়ণ অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, কে আছ, বাঁচাও! ওগো কে আছ, বাঁচাও!

না, এই তো দরজা! কিন্তু এ কি! এ যে বাইরে থেকে বন্ধ!

উন্মাদের মত শিবনারায়ণ বন্ধ দরজার উপরে কিল চড় লাথি বসাতে থাকে।

শক্ত সেগুন কাঠের দরজা।

কি হবে! তবে কি তাকে এই অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে তিল তিল করে মরতে হবে!

মৃত্যু! কে শুনতে পাবে তার চিৎকার!

সুরেন! সুরেন! কোথায় তুমি! আমাকে বাঁচাও ভাই!

ছাব্বিশ বছর এই পাতালঘরে তোমাকে আমি বন্দী করে রেখেছি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তোমার বুকভাঙা কান্না শুনেছি। এখন বুঝতে পারছি কি যন্ত্রণা তুমি এই ছাব্বিশ বছর ধরে পলে পলে সহ্য করেছ! ক্ষমা কর ভাই, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে বেরুতে দাও—যা চাও তুমি তাই দেব—সুরেন, সুরেন—

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

শিবনারায়ণ একবার কাঁদে একবার হাসে।

একটা অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ আওয়াজ না! যুবকের মৃতদেহ কি আবার প্রাণ পেল! সুরেন! সুরেন! বেঁচে আছ কি?…কথা বল! সাড়া দাও! অনেক টাকা তোমাকে দেব আমি! রাজা করে দেব—ও কে!…রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিক!

ঘুরছে! শিবনারায়ণ পাগলের মতই অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে ঘুরছে! হঠাৎ একসময় যুবকের হিমশীতল মৃতদেহের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

কে? কে?

যুবকের ঠাণ্ডা অসাড় দেহটার ওপরে শিবনারায়ণ হাত বুলায়।

সুরেন! আমার অনেক টাকা! রাজাবাহাদুর আমাকে অনেক টাকা দিয়েছে! সিন্দুক ভর্তি টাকা আমার! এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট—একশ, হাজার দশ বিশ পঁচিশ!

* * *

দিন দুই বাদে বিকাশ দলবল নিয়ে সুব্রতর নির্দেশমত পাতালঘরে যখন প্রবেশ করল শিবনারায়ণ তখনও টাকার অঙ্ক গুনে চলেছে। মৃতদেহটা ফুলে পচে উঠেছে, একটা উৎকট দুর্গন্ধে ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

॥ দশ ॥

কিরীটীর বিশ্লেষণ

জাস্টিস্ মৈত্র অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন সকাল বেলা যখন কিরীটীর ভৃত্য জংলী এসে একটা ছাতা একটা পুলিন্দা ও দশ-বার পৃষ্ঠাব্যাপী একটা খামে-আঁটা চিঠি তাঁর হাতে দিল।

এসব কি ?

আজ্ঞে, বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

তোর বাবু কোথায় ?

আজ্ঞে, তিনি ও সুব্রতবাবু গতকাল সন্ধ্যার গাড়িতে পুরী বেড়াতে গেছেন।

কবে ফিরবেন ?

দিন পনের বাদে বোধ হয়।

জংলী চলে গেলে জাস্টিস্ মৈত্র প্রথমেই পুলিন্দাটা খুলে ফেললেন। তার মধ্যে দুখানা চিঠি, একটি পাঁচ সেলের টর্চবাতি, কতকগুলো ক্যাশমেমো, ইনভয়েস্ দুটি, সতীনাথ লাহিড়ীর একটি হিসাবের খাতা। একজোড়া লোহার নাল-বসানো দারোয়ানী প্যাটার্ণের নাগরাই জুতো।

জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে জাস্টিস্ মৈত্র কিরীটীর চিঠিটায় মনঃসংযোগ করলেন।

প্রিয় জাস্টিস্ মৈত্র,

আপনি আমার রহস্য-উদ্ঘাটনের কাহিনীগুলো শুনতে খুব ভালবাসেন জানি চিরদিন। তাই আজ আপনাকে একটা চমৎকার কাহিনী শোনাব। এবং আমার কাহিনী শেষ হলে, তার সব কিছু ভাল-মন্দ বিচারের ভার আপনার হাতে আমি তুলে দিতে চাই, কারণ ধর্মাধিকরণের আসনে আপনি বসে আছেন, আপনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। নিরপেক্ষ বিচার আপনার কাছেই পাব। ভাগ্যবিড়ম্বনায় ও দশচক্রে একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন, তাঁর প্রতি সুবিচার করবেন। পুলিসের কর্তৃপক্ষ এ কাহিনীর বিন্দুবিসর্গও জানে না ; একটিমাত্র পুলিসের লোক ছাড়া, কিন্তু সেও আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আপনার নির্দেশ ব্যতীত সে কোন কিছুই করবে না। আপনাদের বিচারে প্রমাণিত হয়েছে, রায়পুরের ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের হত্যাপরাধী ডাঃ সুধীন

চৌধুরী। এবং তার শাস্তিভোগ করছে সে আজ কারাগারের লৌহশৃঙ্খল পরে। এতটুকুও সে প্রতিবাদ জানায়নি। আপনি আজও জানেন না—একজনকে বাঁচাতে গিয়ে, সমস্ত অপরাধের গ্লানি সে নীরবে মাথা পেতে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

গোড়া থেকে শুরু না করলে হয়ত আপনি বুঝতে পারবেন না। তাই এই কাহিনী আমি গোড়া হতেই শুরু করব।

এদেরই, মানে রায়পুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাজা রত্নেশ্বর মল্লিক, তাঁর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক, মধ্যম সুধাকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ বাণীকণ্ঠ মল্লিক। শ্রীকণ্ঠ সুধাকণ্ঠের চেয়ে ন' বৎসরের বড়, আর সুধাকণ্ঠর চেয়ে বাণীকণ্ঠ সাত বৎসরের ছোট। রত্নেশ্বরের একমাত্র মেয়ে কাত্যায়নী দেবী। কাত্যায়নীর একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুরেন চৌধুরীর স্ত্রী হচ্ছেন সুহাসিনী দেবী, তাঁরই একমাত্র ছেলে ডাঃ সুধীন চৌধুরী যে সুহাসের হত্যাপরাধে অপরাধী বর্তমানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদে কারারুদ্ধ। রাজা রত্নেশ্বরের পিতা যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মশাই ছিলেন সেকালের একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জমিদার। নৃসিংহ গ্রামের কোন একটি প্রজাকে যজ্ঞেশ্বর একদা স্টেট-সংক্রান্ত কোন একটি মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলেন, কিন্তু প্রজাটি রাজী না হওয়ায়, তাকে যজ্ঞেশ্বর হত্যা করান। যজ্ঞেশ্বরের নায়েব ছিলেন শ্রীদীনতারণ মজুমদার মহাশয়। দীনতারণ যজ্ঞেশ্বরকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, হত্যাপরাধের সমস্ত দোষ স্বীয় স্কন্ধে নিয়ে দীনতারণ হাসিমুখে ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দিলেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাতৃহারা একমাত্র সন্তান শ্রীনিবাস মজুমদারকে যজ্ঞেশ্বরের হাতে দিয়ে যান। যজ্ঞেশ্বর নিজের সন্তানের মতই শ্রীনিবাসকে মানুষ করে পরবর্তীকালে স্টেটে নায়েবীতে বহাল করেন। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রত্নেশ্বর কিন্তু শ্রীনিবাসকে স্বচক্ষে দেখতে পারেননি কোনদিনই। শ্রীনিবাসের প্রতি একটা প্রচণ্ড হিংসা তাঁকে সর্বদা পীড়ন করত। যজ্ঞেশ্বর একথা জানতে পেরে মৃত্যুর পূর্বে একটা উইল করে রায়পুর স্টেটের সর্বাপেক্ষা লাভবান জমিদারী নৃসিংহ গ্রামের অর্ধেক অংশ মজুমদার বংশকে লিখে দিয়ে যান। যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর পর রত্নেশ্বর পিতার ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং নামমাত্র মূল্যে কৌশল করে আবার তিনি নৃসিংহ গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে নিজের ভোগদখলে নিয়ে এলেন। এমন কথাও শোনা যায় যে রত্নেশ্বর নাকি বিষপ্রয়োগে পিতা যজ্ঞেশ্বরকে হত্যা করেন। সত্য-মিথ্যা জানি না।

রায়পুরের মর্মন্তুদ হত্যা-নাটকের বীজ সেইদিন রায়পুর বংশের রক্তে সংক্রামিত হয়। এবং সেই বিষ বংশপরম্পরায় এই বংশের রক্তধারায় সংক্রামিত হতে থাকে। রত্নেশ্বর লোকটা ছিলেন অত্যন্ত সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর। এবং তাঁর ছেলেদের মধ্যে একমাত্র শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ব্যতীত সুধাকণ্ঠ ও বাণীকণ্ঠ ছিলেন ঠিক পিতারই সমধর্মী। রাজা রত্নেশ্বর

দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। একবার সুধাকণ্ঠ ও বাণীকণ্ঠ বিষপ্রয়োগে তাঁদের পিতা রত্নেশ্বরকে হত্যার চেষ্টা করেন। রত্নেশ্বর সে কথা জানতে পেরে এক উইল করেন। সেই উইলে সুধাকণ্ঠ ও বাণীকণ্ঠর জন্য সামান্য মাত্র মাসোহারার ব্যবস্থা করে সমস্ত সম্পত্তি শ্রীকণ্ঠকেই দিয়ে যান। রত্নেশ্বরের মৃত্যুর পর যখন সে কথা প্রকাশ পেল, সুধাকণ্ঠ তার একমাত্র মাতৃহারা পুত্র হারাধনকে নিয়ে রায়পুর ছেড়ে ভাগলপুরে চলে গেলেন।

হারাধন ভাগলপুর থেকে এণ্ট্রান্স পাস করবার পর সুধাকণ্ঠ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। হারাধন লোকটা অত্যন্ত সরল ও নির্লোভী। অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি রায়পুরের রাজবংশের কাছে কোনদিন হাত পাতেননি। নিজের চেষ্টায় মোক্তারী পাস করে সেখানেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। এবং কিছুকাল পরে প্রবাসী বাঙালীর একটি মেয়েকে বিবাহ করে সংসার পাতেন। পরে আবার ভাগলপুর থেকে রায়পুর ফিরে এসে প্র্যাকটিস্ শুরু করলেন। এককালে প্রচুর অর্থ উপায় করেছেন তিনি। রায়পুরে থাকলেও, তিনি রাজবাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি। তার একটিমাত্র ছেলেকে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করিয়ে নিয়ে এলেন। ছেলের পশার বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় অতর্কিতে ছেলে মারা গেল। হারাধন তাঁর একমাত্র পৌত্র জগন্নাথকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। হারাধনের ছেলে ঠিক পিতার আদর্শেই গড়ে উঠেছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ হল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। জগন্নাথের কথা পরে বলব। রত্নেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র বাণীকণ্ঠ পিতার মৃত্যুর দু মাস পরেই তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র নিশানাথকে রেখে মারা যান। নিশানাথ রায়পুরেই থাকেন এবং পরে আর্ট স্কুল থেকে পাস করে শোলপুর স্টেটের চিত্রকরের চাকরি নিয়ে চলে যান। নিশানাথ অবিবাহিত। মাস পাঁচেক হল তাঁর মস্তিষ্কের সামান্য বিকৃতি হওয়ায় রায়পুরের বর্তমান রাজাবাহাদুর তাঁকে রায়পুরে নিয়ে এসে রাখেন। শ্রীকণ্ঠ মল্লিক ছিলেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। দুই পুরুষের পাপ ও অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে তিনি নিহত হওয়ার দিন দশেক পূর্বে হারাধনের সঙ্গে যুক্তি করে একটি উইল করেন। এই উইলই হল কাল। যে পাপ ঐ বংশে ঢুকেছিল সেই পাপ স্খালন করতে গিয়েই তিনি যে মহাভুল করলেন, সেই ভুলেরই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চলেছে একটির পর একটি নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে। উইলের মধ্যে প্রধান সাক্ষী ছিলেন, নায়েবজী শ্রীনিবাস মজুমদার ও হারাধন মল্লিক, শ্রীকণ্ঠের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীকণ্ঠের কোন পুত্রাদি না হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে রসময়কে দত্তক গ্রহণ করেন। জীবনে শ্রীকণ্ঠ তিনটি ভুল করেছিলেন, ১নং উইল করা, ২নং রসময়কে দত্তক গ্রহণ করা। রসময়ের পিতা ছিল একজন প্রচণ্ড নেশাখোর, স্বার্থান্বেষী ও নীচ-প্রকৃতির লোক। রসময় তাঁর জন্মদাতার সব গুণগুলোই পেয়েছিলেন এবং দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে শিশুকালটা

অতিবাহিত করে; পরবর্তীকালে অগাধ প্রাচুর্যের মধ্যে এসে যতটুকু তার মধ্যে সদ্‌প্রবৃত্তি অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। শ্রীকণ্ঠ গোপনে একটা উইল করেছিলেন, তাঁর স্টেটের সমুদয় সম্পত্তি সমান ভাগে নিম্নলিখিতদের মধ্যে ভাগ হবে—হারাধনের পুত্র হৃদয়নাথ মল্লিক, নিশানাথ মল্লিক, সহোদরা কাত্যায়নী দেবীর পুত্র সুরেন চৌধুরী ও দত্তকপুত্র রসময় মল্লিক। তাঁর অবর্তমানে রসময় ও শ্রীনিবাস মজুমদারই স্টেট-সংক্রান্ত সকল কিছু দেখাশুনা করবেন। স্টেটের কোন অংশীদারই কারও অংশ বিক্রয় করতে পারবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর উইলের ব্যাপারটা যে গোপন থাকেনি তিনি জানতে পারেননি এবং তারই আকস্মিক পরিণতি হচ্ছে তাঁর মৃত্যু—মৃত্যু ঠিক বলব না—তাঁকে নিহত হতে হল। উইল করবার দিন পাঁচেক বাদে শ্রীকণ্ঠ নৃসিংহ গ্রাম মহালটি পরিদর্শন করতে যান। সঙ্গে যায় তাঁর দত্তকপুত্র রসময় মল্লিক। নৃসিংহ গ্রামে পৌঁছবার পর পিতাপুত্রের মধ্যে সামান্য কারণে প্রচণ্ড একটা কলহ বাধে। সেই কলহের সময়ই শ্রীকণ্ঠ রাগতভাবে তাঁর উইলের কথা পুত্রকে জানিয়ে দেন। জীবনে এই তৃতীয় ভুলটি তিনি করলেন। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, শ্রীকণ্ঠ মল্লিক তাঁর শয়নকক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছেন। এদিকে শ্রীনিবাস প্রভুর নিষ্ঠুর হত্যাসংবাদ যখন পেলেন, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জোর তদন্ত হয়েও শ্রীকণ্ঠের মৃত্যুরহস্যের কোন মীমাংসা হল না। এদিকে সিন্দুক খুলে দেখা গেল, শ্রীকণ্ঠের কোন উইলই নেই। ফলে রসময় মল্লিকই হলেন রায়পুরের সর্বময় কর্তা।

নতুন নাটক শুরু হল।

রসময় মল্লিকের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষ আগেই গতাসু হয়েছিলেন, তাঁর ছেলে সুবিনয় এবং দ্বিতীয় পক্ষে মালতী দেবীর সন্তান সুহাস। সুবিনয় ও সুহাসের মধ্যে বয়সের পার্থক্য প্রায় আট বৎসর। এদিকে শ্রীকণ্ঠের মৃত্যুর পর যখন তাঁর সিন্দুকে কোন উইল পাওয়া গেল না, শ্রীনিবাস বা হারাধন কেউই কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, কারণ উইলটি আইনসিদ্ধ করা তখনও হয়নি। ঠিক ছিল শ্রীকণ্ঠ নৃসিংহ গ্রাম হতে প্রত্যাবর্তন করলে, উইলটি পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হবে আদালতে গিয়ে রেজেস্ট্রি করে। উইলের ব্যাপারটা গোপনই রয়ে গেল। নায়েবজী শ্রীনিবাস মজুমদারের এক জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভাই ছিল, তাঁরই সঙ্গে রত্নেশ্বর তাঁর একমাত্র কন্যা কাত্যায়নীর বিবাহ দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বরের প্রবল ইচ্ছে ছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গেই কাত্যায়নীর বিবাহ দেন, কিন্তু শ্রীনিবাস স্টেটের নায়েব ছিলেন বলে এবং একই সংসারে শ্রীনিবাস ও কাত্যায়নী ভাই-বোনের মত প্রতিপালিত হওয়ায় রত্নেশ্বরের স্ত্রী ঐ বিবাহ ঘটাতে দেননি। অগত্যা শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতার সঙ্গেই কাত্যায়নীর বিবাহ হয়। শ্রীনিবাসের মৃত্যুশয্যায় কাত্যায়নী

দেবী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুকালে শ্রীনিবাসই কাত্যায়নীর নিকট শ্রীকণ্ঠের উইলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যাই হোক শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পর রসময় কি ভেবে জানি না সুধীনের পিতা তরুণ উকিল সুরেন্দ্র চৌধুরীকে স্টেটের নায়েবীতে বহাল করলেন। সুবিনয় কিন্তু পিতার এই কাজে এতটুকুও খুশী হলেন না। ফলে মাস ছয় না যেতে-যেতেই লোকে জানল সুরেন চৌধুরী নৃসিংহ গ্রাম মহাল পরিদর্শন করতে গিয়ে যে কক্ষে শ্রীকণ্ঠ মল্লিক নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন, সেই কক্ষেই নৃশংসভাবে কোন এক অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুরেনের স্ত্রী সুহাসিনী তিন বৎসরের শিশুপুত্র সুধীনকে বুকে নিয়ে রায়পুর ত্যাগ করে তাঁর ভাইয়ের গৃহে চলে এলেন। সুরেনের মৃত্যুর (?) কয়েক মাস আগে তাঁর মা কাত্যায়নীর ৺কাশীপ্রাপ্তি হয়েছিল। হতভাগ্য সুহাসের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই হল মোটামুটি ইতিহাস। আগাগোড়া ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল। এবারে আমি বর্তমান অধ্যায়ে আসব, সুহাসের মৃত্যুর ব্যাপারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শোনা যায় রসময়েরও নাকি আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। একদিন আহারাদির পর হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করেন, ডাক্তার-বদ্যি এল, কিন্তু কোন ফল হল না, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনি মারা (?) গেলেন। এবারে সুবিনয় মল্লিক হলেন রায়পুরের রাজাবাহাদুর। কিন্তু রসময় উইল করে গিয়েছিলেন, সমগ্র সম্পত্তি সমান দু'ভাগে সুবিনয় ও সুহাসে বর্তাবে। পিতা রসময়ের মৃত্যুর পরই সুবিনয় স্টেটের কিছু অদলবদল করলেন।

নতুন খাজাঞ্চী এল তারিণী চক্রবর্তী ও তার কিছুকাল পরে স্টেটের ম্যানেজার হয়ে এলেন অধুনা মৃত সতীনাথ লাহিড়ী। এইভাবে তৃতীয় অঙ্ক শুরু হল। সুবিনয় চেষ্টা করছিলেন, কি ভাবে সুহাসকে চিরদিনের মত তাঁর পথ থেকে সরিয়ে সমস্ত সম্পত্তি একা ভোগ করবেন। ষড়যন্ত্র শুরু হল। সুবিনয়ের পরামর্শ ছাড়াও সহায় হলেন ডাক্তার কালীপদ মুখার্জী, খাজাঞ্চী তারিণী চক্রবর্তী, ম্যানেজার সতীনাথ লাহিড়ী ও নৃসিংহ গ্রামের নায়েব শিবনারায়ণ চৌধুরী। এবারে রাণীমা মালতী দেবী আমাকে যে পত্রটি দিয়েছিলেন, যা মামলার অন্যতম evidence হিসাবে আপনাকে পাঠালাম, সেটা পড়ুন। তারপর আবার আমার চিঠি পড়বেন।

॥ এগার ॥

রাণীমার স্বীকৃতি

রায়পুর

ইনস্‌পেক্টারবাবু,

আপনি হয়ত অবাক হবেন কে আপনাকে এই চিঠি লিখছে ; তাই প্রথমেই পরিচয়টা দিয়ে নিই, আমি রায়পুরের ছোট কুমার হতভাগ্য সুহাসের জননী মালতী। আপনি সে-রাত্রে চলে যাওয়ার পর আমি অনেক ভেবেছি, শেষটায় সব আপনাকে জানানোই মনস্থ করে, এই পত্র আপনাকে লিখতে বসেছি। সুহাস আজ মৃত। কোনদিনই আর সে এ অভাগিনীকে 'মা' বলে ডাকবে না। সুহাসের অকালমৃত্যুতে সংসার আমার কাছে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি! আপনি ঠিকই বলেছিলেন, একজন নির্দোষ যদি আমারই জন্য শাস্তি পায়, ভগবানের বিচারে আমি রেহাই পাব না। আপনি কে এবং আপনার সত্য পরিচয় যে কি তা আমি জানি না। তবে আপনার সঙ্গে সে-রাত্রে কথাবার্তা বলে এইটুকুই বুঝেছি, আপনি যেই হোন, আপনার কাছে কিছু চাপা থাকবে না। সবই একদিন আপনি বুঝতে পারবেন। যাক্‌গে ওসব কথা, যা বলতে আজ কলম ধরেছি তাই বলি। সুবিনয় ও সুহাস আমার কাছে পৃথক নয়। তাছাড়া আমার স্বামীও জানতেন সুবিনয় আমার পেটে না হলেও, সুহাসের চাইতে তাকে আমি কম ভালবাসি না। বরং সুহাসের চাইতে তাকে আমি বেশীই স্নেহ করতাম চিরদিন, এবং হয়ত—হয়ত এখনও করি। বুঝতে পারেন কি, সেই এতখানি স্নেহের প্রতিদানে সুবিনয়ই যখন সুহাসের প্রাণ নেবার ষড়যন্ত্র করছিল, কত বড় আঘাত আমি পেয়েছিলাম! আমি প্রথম সে-কথা টের পাই সুহাসের মৃত্যুর মাস ছয়েক পূর্বে। ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি। সুহাসের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, তার চোখের গোলমাল হওয়াতে চক্ষুচিকিৎসকের নির্দেশমত তাকে চশমা নিতে হয়। চশমাটা যেদিন সতীনাথ কলকাতা থেকে তৈরী করে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে বসে বসে সুহাস গল্প করছিল। ওর দাদা এনে চশমাটা ওর হাতে দিল। চশমাটা ছিল রিমলেস। চোখে দেবার পর দেখা গেল চশমাটা একটু ঢিলে হচ্ছে। সুবিনয় পাশেই দাঁড়িয়ে তখন। চশমাটা ঠিক বসছে না দেখে ও বলে, ও কিছু না, ঠিক করে দিচ্ছি। বলতে বলতে এগিয়ে এসে সুহাসের নাকের উপরে বসানো চশমাটা বেশ জোরে টিপে দিল, সুহাসের নাকের দু'পাশ টিপুনির চোটে কেটে গেছিল, সে উঃ করে ওঠে! সেই দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে

সুহাস অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমে জানা যায় সুহাসের টিটেনাস হয়েছে। রায়পুরে ভাল অ্যাণ্টিটিটেনাস সিরাম পাওয়া যাবে না বলে সতীনাথ কলকাতায় যায় এবং প্রত্যহ সেখান হতে সিরাম অ্যামপুল পাঠাতে থাকে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, সেই অ্যামপুলগুলোর কোনটারই মধ্যে সিরাম থাকত না, থাকত স্রেফ জল। ফলে অসুখের কোন উন্নতিই হয় না। তখন আমি সুধীনকে সব কথা লিখে জানাই গোপনে এবং সুধীনই এখানে এসে সুহাসকে একপ্রকার জোর করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। সুহাসের সেবার টিটেনাস হওয়ায় সুধীন নিজে ও অন্যান্য ডাক্তাররা বেশ একটু আশ্চর্যই হয়েছিল। শরীরের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, কেমন করে টিটেনাস রোগ হল! হায়, তখন কি জানি যে চশমার যে ছুটো প্লেটের মত অংশ নাকের ওপরে চেপে বসে, তাতে টিটেনাস ব্যাসিলী লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল! পরে জানতে পারি সুহাসের শরীরে প্লেগের বীজ ইনজেক্ট করার জন্যই সুহাস অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভাবছেন নিশ্চয়ই সে কথাটা কি করে জানলাম, না? সুহাসের মৃত্যুর আগে এবারে অসুখের সময় হঠাৎ একদিন সুবিনয় ও কালীপদ মুখার্জীর মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল গোপনে, তখন তাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে কয়েকটা কথা আমার কানে আসে। সুবিনয় ডাঃ মুখার্জীকে বলছিল, মরিয়া না মরে অরি! সেবারে চশমার প্লেটে টিটেনাস বীজ মাখিয়ে দিলেন, কত চেষ্টা হল, সব ভেস্তে গেল! তার জবাবে ডাঃ মুখার্জী বলেন, এবারে আর বাছাধনকে বাঁচতে হবে না, এবারে একেবারে মোক্ষম মৃত্যুবাণ ছেড়েছি। আমার টাকাটার কথা ভুলবেন না কিন্তু রাজাবাহাদুর! তাদের কথা শুনে শরীর যেন আমার পাথরের মত জমে গেল। কানের মধ্যে তখন আমার ভোঁ ভোঁ করছে। ভাবতে পারেন আমার তখন কি অবস্থা! যার হাতে নিশ্চিত বিশ্বাসে তুলে দিয়েছি আমার একমাত্র পুত্রের জীবনমরণের সমস্ত ভার সেই কিনা চিকিৎসকের ছদ্মবেশে বিষপ্রয়োগ করেছে! সেইদিনই আমি একপ্রকার জোর করেই কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করলাম এবং সুধীনকে গোপনে আমাদের কলকাতার বাসায় সেইদিনই দেখা করবার জন্য তার করে দিলাম। আমরা কলকাতায় যেদিন পৌঁছই সেইদিনই বিকেলের দিকে সুধীন আমাদের বাসায় আসে। তাকে ডেকে গোপনে সব কথা খুলে বলি। পরদিন আমি আর সুধীন অন্য ডাক্তার আনবার কথা বলি। প্রথমে সুবিনয় একেবারেই রাজী হয় না, তখন আমি ও সুধীন একপ্রকার জেদাজেদি করে ডাঃ সেনগুপ্তকে ডেকে আনাই। তার পরের ঘটনা তো সবই আপনারা জানেন। ব্লাড-কালচারের রিপোর্ট পৌঁছবার আগেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আরও একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমবার সুহাসকে টিটেনাস রোগ থেকে ভাল করবার পর, সুহাসের অনুরোধেই আমি সুধীনকে

দশ হাজার টাকা ধার হিসাবে দিয়েছিলাম, তার ওষুধ সাপ্লাইয়ের ব্যবসার জন্য। কিন্তু স্বধীন সে টাকা নিল বটে, তবে কারবারে আমাকে অংশীদার করে নেয়। আজ বলতে লজ্জা নেই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর স্টেটের একটি পয়সার ওপরেও আমার কোন অধিকার ছিল না। সুহাস যখন আমার কাছে এসে সুধীনকে টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়, আমি চারদিকে অন্ধকার দেখি। আমি জানতাম, কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও সুবিনয় দশ হাজার তো দূরে থাক, একটি কপর্দকও দেবে না আমাকে। আমি তখন একপ্রকার নিরুপায় হয়েই শেষটায় সুবিনয়ের ঘরে ঢুকে, তার আয়রন সেফ খুলে ঐ দশ হাজার টাকা চুরি করে সুহাসকে দিই, সুধীনকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য সুবিনয় কথাটা জেনে ফেলে। শেষটায় আমার সুহাস ও সুবিনয়ের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তি হয়, ওই দশ হাজার টাকা সুহাসের ভাগ থেকে কাটা যাবে, এবং তাহলেই সুবিনয় এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবে না। যদি মামলার সময় সুধীনের ব্যাঙ্কের মজুত টাকার কথা ওঠে, তখন পাছে সমস্ত কথাই আদালতে প্রকাশ পায়, আমার চুরির কথা লোকে জানতে পারে, সেই ভয়ে আমি একদিন গোপনে কারাগারে সুধীনের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানাই এ-কথা কাউকে না বলতে। সুধীন আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সব দোষ মাথা পেতে নেয়, একটি কথাও ও সম্পর্কে আদালতে প্রকাশ করেনি। সেদিন সে আমায় বলেছিল, মামীমা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সুহাসের মা আপনি—ফাঁসী যেতে হয় যাব তবু কাউকে এ-কথা বলব না। আপনাকে আদালতে টেনে আনব না। এ কথা আগে বলে আপনি ভালই করলেন, নচেৎ এসব কথা তো আমার জানা ছিল না।

সে তার কথা রেখেছে। হাতে আমার কোন প্রমাণ নেই বটে, তবে আমি জানি সুহাসের হত্যা-ষড়যন্ত্রের মধ্যে সুবিনয় এবং কালীপদ মুখার্জী, ডাঃ অমিয় সোম, তারিণী চক্রবর্তী সবাই লিপ্ত আছে। আপনি হয়ত ভাবছেন, এসব কথা এতদিন জানা সত্ত্বেও কোর্টে যখন মামলা চলছিল, সেই সময় সব কথা প্রকাশ করে দিইনি কেন? তার কারণ আমি দেখেছিলাম সুহাস তো আর ফিরে আসবেই না এবং সুবিনয়ও যদি যায় আমার স্বামীর শেষের অনুরোধ—তাও রক্ষা হয় না। তাছাড়া মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর শোধ তোলা যায় না। একজন তো গেছেই, আর একজনকেই বা কেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিই! সেও তো আমার স্বামীরই সন্তান। আমার বুকের দুধ সে পান না করলেও, অকাতরেই তাকে আমি আমার মায়ের স্নেহ দিতে কার্পণ্য করিনি কোনদিন। আমার চোখে সুহাস ও তার মধ্যে কোন পার্থক্যই তো ছিল না। সে আমাকে 'মা' বলে না স্বীকার করলেও, তাকে আমি সন্তান বলেই জানি। সে যে সুহাসের সঙ্গে একই বুকের তলায় বড় হয়ে উঠেছে।

সুধীনের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছিল, প্রতি মুহূর্তেই তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি যদি সব স্বীকার করতাম, তাহলে সুবিনয়ের ফাঁসী হত সুনিশ্চিত। তাতে করে, আমার মৃত স্বামীর মুখে ও তাদের এত বড় বংশে চুনকালি পড়ত। এই বংশের দিকে চেয়ে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। শেষ পর্যন্ত আমার মৃত স্বামীর কথা ভেবেই আমি চুপ করে রইলাম। মুখ খুললাম না। সুধীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের কথা শুনে অবধি নিরন্তর আমি অনুশোচনায় ও বিবেকের দংশনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, তারপর ঠাকুরপো-(নিশানাথ)-কেও যখন সুবিনয় হত্যা করলে এবং তারই তদন্তে এসে আপনি আর একজন অভাগিনী জননীর মর্মদাহের কথা আমায় শোনালেন, আর স্থির থাকতে পারলাম না।

সুহাসের মৃত্যুর পর অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা আমার মনে পড়েছিল, সুহাসের তখন বছর ছয়েক বয়স। সুবিনয়ের বছর চোদ্দ হবে। ধনুর্বাণ খেলার ছলে, খেলার তীরের সঙ্গে কুঁচফলের বিষ মাথিয়ে সুবিনয় সুহাসকে মারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গরুর গায়ে বেঁধে এবং সেই বিষে গরুটা মরে। গরুটার মৃত্যুর পর, সেই তীর পরীক্ষা করে পশুর ডাক্তার সেই কথাবলেছিল—কিন্তুতীরের ফলায় কোথা হতে যে কুঁচফলের বিষ এসেছিল, সেকথা সেদিন আমরা কেউ তলিয়ে ভেবে দেখিনি। তাহলেই ভেবে দেখুন, সেই ছোটবেলা হতেই সুবিনয়ের সুহাসের প্রতি একটা জাতক্রোধ ছিল। অথচ শুনে আশ্চর্য হবেন, সুহাস দাদা বলতে যেন অজ্ঞান ছিল। দাদাকে সে দেবতার মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। আমার চাইতেও বোধ করি সে তার দাদাকে বেশী ভালবাসত। আপনি আমাকে সে-রাত্রে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার, চিৎকার শুনে আমি ঠাকুরপোর ঘরে ছুটে গিয়ে তাকে জীবিত দেখেছিলাম কিনা? হ্যাঁ, সেদিন আমি স্বীকার করিনি, আজ করছি অকুণ্ঠে, ঠাকুরপো তখনও বেঁচে ছিলেন এবং মরবার সময় তিনি শেষ কথা বলে যান, সুবিনয়—বিনু! সেই আমায় শেষটায় মারলে!…এমন সময় সুবিনয় সেই ঘরে এসে প্রবেশ করে হন্তদন্ত হয়ে।

আমি ঠিক রান্নাঘর থেকে ঠাকুরপোর চিৎকার শুনিনি, তাঁর ঘরে ঢুকছিলাম, এমন সময় শুনি। আমার মনে হয় সতীনাথকে সুবিনয়ই মেরেছে কিন্তু কেমন করে তা জানি না। আমার ধারণা মাত্র। হয়ত নাও হতে পারে। সতীনাথের মৃত্যুতে আমি এতটুকুও দুঃখিত নই বরং খুশীই হয়েছি। এই বংশের ঐ শনি। সুবিনয়ের ঐ ছিল ডান হাত, তবে ইদানীং দেখতাম, দুজনের মধ্যে তত সম্প্রীতি ছিল না, প্রায়ই কথা-কাটাকাটি হত। আমার যতটুকু জানাবার ছিল সবই আপনাকে জানালাম। এতদিন পরে আমার

স্বীকারোক্তি দিয়ে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম জানি না। সুধীনকে ছাড়িয়ে আনতে যদি পারেন তবেই হয়ত এ পাপের আমার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। অহর্নিশি এই বিষযন্ত্রণা হতে মুক্তি পাব। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

মালতী দেবী

॥ বার ॥

কিরীটীর চিঠি

মালতী দেবীর পত্রখানা পড়ে শেষ করে, জাস্টিস্ মৈত্র আবার কিরীটীর পত্রটি পড়তে লাগলেন।

মালতী দেবীর চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লে এ হত্যা-মামলার অনেক কিছুই দিনের আলোর মত আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বেচারী মালতী দেবী! এখন বোধ-হয় বুঝতে পারছেন, ডাঃ সুধীনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মোট অঙ্কটা কোথা হতে সংগৃহীত হয়েছিল এবং কেনই বা সে ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করেছিল? ধনুর্বাণ খেলার ছলে সুবিনয় যখন সুহাসকে মারবার চেষ্টা করেন তীরের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে, নিশানাথ সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি পাগলামির ঝোঁকে বলতেন—That child of the past. Again he started his old game! সতীনাথের হত্যার দিন আরও তিনি বলেছিলেন একটা কথা, পাগলের প্রলাপোক্তি বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, একটি দশ-এগারো বছরের কিশোর বালক—but the seed of the villainy was already in his heart! ধনুর্বাণ খেলার ছলে খেলার তীরের সঙ্গে কুঁচফলের বিষ মাখিয়ে তারই একজন খেলার সাথীকে মারতে গিয়েছিল, কিন্তু সব উল্টে গেল—বিষ মাখানো তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গরুকে মেরে ফেললে। মালতী দেবীর চিঠি হতেও প্রমাণিত হয়, সেই কিশোর বালকটি কে। আর কেউ নয়—ঐ সুবিনয় মল্লিক! পাছে এ-কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই সুবিনয়ের বিচারে নিশানাথের পৃথিবী হতে অপসারণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তীরে এসে তরী ডোবানো যায় না, নিশানাথকে তাই মৃত্যুবাণ বুক পেতে নিতে হল। নির্মম ভাগ্যচক্র!

মালতী দেবীর চিঠিতেও বুঝতে পেরেছেন এবং আমিও বলছি, সতীনাথ লাহিড়ীকেও 'মৃত্যুবাণ' বুক পেতে নিতে হয়েছে এইজন্য যে সতীনাথ ছিল সুবিনয়ের সকল দুষ্কর্মের সাথী। তার হাতে অনেক প্রমাণই ছিল—এদের মিলিত পাপানুষ্ঠানের। সতীনাথের

বেঁচে থাকাটা তাই আর সম্ভবপর হল না।

কিন্তু সে-সব কথা যাক। আসুন, আবার আমরা অতীতের ভুলে-যাওয়া-ঘটনার মধ্যে ফিরে যাই। আমরা জানি, শ্রীকণ্ঠ মল্লিক নৃসিংহ গ্রামের কাছারী বাড়িতে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন!

কে সেই অদৃশ্য আততায়ী? আর কেনই বা তিনি এমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন? রাজা যজ্ঞেশ্বরের হত্যাকারী তাঁরই পুত্র রত্নেশ্বর। এবং রত্নেশ্বরকে বিষপ্রয়োগে হত্যার প্রচেষ্টা করেন তাঁরই মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র সুধাকণ্ঠ ও বাণীকণ্ঠ মল্লিক। অবিশ্যি এটা আমার অনুমান মাত্র। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস দেখুন! রসময় যে মুহূর্তে তাঁর পিতার কাছ থেকে ঝগড়ার সময় শুনল, তার বাপের নতুন উইল অনুযায়ী তিনি রায়পুরের একচ্ছত্র অধীশ্বর হতে পারবেন না, একটি অংশের মাত্র অধিকারী; তখুনি তিনি আর কালবিলম্ব না করে বাপকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলেন। হয়ত কিছু আগে বা পরে ঐ সময়েই অর্থের লোভে দাগী আসামী পলাতক শিবনারায়ণ রসময়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল। সুহাসের হত্যা-মামলা যখন আপনার কোর্টে চলতে থাকে তখনই সাক্ষীর কাঠগড়ায় একদিন শিবনারায়ণকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তার মুখটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে। আমার যেন কেমন একটা দোষ আছে, বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন মুখ একবার দেখলেই মনের ক্যামেরার লেন্স দিয়ে সেটা আমি ধরে রাখি মনের মধ্যে। শিবনারায়ণের ছবিও মনের মধ্যে আমার ঠিক তেমনিই গেঁথে গিয়েছিল। লালবাজার ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের অ্যালবামে খুঁজলে শিবনারায়ণের ছবি দেখতে পাবেন, আমি সেটা ইতিমধ্যে মিলিয়ে নিয়েছি। তার আসল নাম পণ্ডিত চৌধুরী। বহুকাল আগে নোট জালের সাধু (?) প্রচেষ্টার মোকদ্দমায় সে একবার বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে কোনমতে সেই মামলা থেকে রেহাই পেয়ে সুবিনয় মল্লিককে কেমন করে যে জয় করল বলতে পারব না। তবে অনুমান করছি হয়ত সুবিনয় মল্লিকই তাঁর যোগ্য সহচরটিকে খুঁজে নিয়েছিলেন বা শিবনারায়ণ নিয়েছিল খুঁজে। আরও একটা কথা—একবার তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে বাঁধতে পারিনি সেবার। সে গল্প আর একদিন আপনাকে বলব।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি আগাগোড়াই বলে আসছি, রায়পুরের এই বিরাট হত্যার ব্যাপারের মূলে হচ্ছে অর্থম অনর্থম! সুবিনয় মল্লিককে আপনি সাজা দিতে পারবেন কি না জানি না। তবে এই বিরাট হত্যাযজ্ঞের অন্যতম প্রধান হোতা হচ্ছেন তিনিই—প্রথমে তাঁর পিতা রসময়কে হত্যা করানো শিবনারায়ণের সাহায্যে, এবং তারপরে ডাঃ সুধীন চৌধুরীর পিতা সুরেন চৌধুরীকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু কথায় বলে না শয়তানেরও বাপ আছে। শিবনারায়ণ সুবিনয়ের উপর আর এক চাল চাললে। সুরেন চৌধুরীকে হত্যা না করে তাকে নৃসিংহ গ্রামের পুরাতন প্রাসাদের এক গুপ্তকক্ষে গুম করে রাখে। এবং তার বদলে তৃতীয় একজন ব্যক্তিকে, যে শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের হত্যার সময় শিবনারায়ণকে সাহায্য করেছিল, তাকে হত্যা করে এক ঢিলে দুই পাখী মারল।

হত্যা করার পর মৃতদেহটিকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল যে তাকে আর চেনবারও কোন উপায় ছিল না। এমন কি দেহ হতে মস্তকটিকে একেবারে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়ায়, কেউ চিনতেই পারেনি আসলে নিহত ব্যক্তি সুরেন চৌধুরীই কিনা। অবিশ্যি তৎসত্ত্বেও একমাত্র যিনি চিনতে পারতেন তিনি সুধীনের মা, সুহাসিনী দেবী। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদে তখনকার তাঁর মনের অবস্থা এমন ছিল যে, সে সময় সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখবার মত কোন ক্ষমতাই তাঁর তখন থাকতে পারে না। তিনি মৃতদেহ দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং জ্ঞান হবার পূর্বেই মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। লোক জানল সুরেন চৌধুরীই নিহত হয়েছেন।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কেন শিবনারায়ণ সুরেন চৌধুরীকে হত্যা না করে গুম করে রেখেছিল, দীর্ঘকাল ধরে কিসের আশায়। আগেই বলেছি শিবনারায়ণ কী চরিত্রের লোক। দুটি কারণে শিবনারায়ণ সুরেন চৌধুরীকে গুম করে রেখেছিল হত্যা না করে। প্রথমতঃ সত্যিই যদি কোনদিন কোন কারণে তার কীর্তিকলাপ অন্যের চক্ষে ধরা পড়েও, সে অনায়াসেই গুপ্তকক্ষ থেকে সুরেনকে এনে সাফাই গাইতে পারবে। এবং দ্বিতীয়তঃ সুরেন চৌধুরী তার হাতে থাকলে, সেই সঙ্গে সুবিনয় মল্লিকও তার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, এবং সহজেই ইচ্ছামত সুবিনয়কে দোহন করতে পারা যাবে। কখনও দোহন করতে করতে যদি সুবিনয় কোনদিন কোন কারণে বেঁকে বসেন, তাহলে সে-মুহূর্তে শিবনারায়ণ অনায়াসেই তার 'গুপ্ত বাণ' (সুরেন চৌধুরী যে আসলে নিহত হননি) সুবিনয়ের প্রতি প্রয়োগ করতে পারবে। ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি বড় অদ্ভুত, না! এখন কথা হচ্ছে, এই গোপন ব্যাপার আর কেউ জানত কিনা। হ্যাঁ জানত, একজন জানত। সে আমাদের হারাধনের পৌত্র জগন্নাথ মল্লিক। চমকে উঠছেন, না? সত্যি চমকাবারই কথা।

তাহলে এবার আমাদের নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আসা যাক। আগেই বলেছি, এই চিঠির মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, নির্লোভ হারাধনের পৌত্র জগন্নাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যে রক্ত পিতামহ সুধাকণ্ঠের শরীরে ছিল, সেই রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে জগন্নাথের শরীরের প্রতি শিরা ও ধমনীতে। এবং জগন্নাথ সেই দূষিত রক্তের ডাকেই

সাড়া দিয়েছে। হয়তো বলবেন, হারাধন ও জগন্নাথের পিতার শরীরেও তো সেই রক্ত-ধারাই প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু তারা তো সে রক্তের ডাকে সাড়া দেননি! এবং তাঁদেরই ছেলে জগন্নাথ তবে কেন এ পথে এল? তার জবাবে আমি বলব, অনেক বংশে, কেউ পাগল থাকলে, পরবর্তী পুরুষে অনেক সময় সেই পাগলামি আবার ফিরে যেমন আসে, এবং হয়ত মাঝখানে দু-একটা পুরুষ বাদ যায়—এর বেলাতেও হয়ত তাই হয়েছে। জেনেটিকস-এ তাই বলে। যা হোক, যে লোভ হারাধন বা তাঁর ছেলেকে বিচলিত করতে পারেনি, সেই লোভের আগুনেই জগন্নাথ তার হাত দুটি পোড়াল। জগন্নাথকে প্রথম আমি কবে কেমন করে সন্দেহ করি, জানেন? রায়পুরে গিয়ে হারাধনের ওখানে যখন দুদিন কাটাই সেই সময়ে। লেখাপড়ায় জগন্নাথ ছেলেটি অত্যন্ত চৌকশ। হারাধনের মুখেই একদিন শুনেছিলাম, ছোটবেলা থেকেই একবার পড়বার বই পেলে জগন্নাথ আর কিছুই চাইত না। সেই জগন্নাথ হঠাৎ এম. এ. পড়তে পড়তে পড়াশুনা একদম ছেড়ে দিয়ে তার দাদুর অসুখের অজুহাত নিয়ে রায়পুরে এসে বসল। আর একটা জিনিস, জগন্নাথের সঙ্গে রায়পুরের স্টেট-সংক্রান্ত কোন কথাবার্তা বললেই বোঝা যায়, কি প্রচণ্ড একটা ঘৃণা সে পোষণ করে রায়পুর স্টেট ও তৎসংক্রান্ত লোকদের ওপরে।

জগন্নাথ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ যুবক। মানুষের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হয় তা অনেক কারণে হয়, তার মধ্যে অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে প্রথমতঃ কোন কারণবশতঃ হয়ত আপনাকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আপনি নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির, আমার সমকক্ষ একেবারেই নন—আপনার প্রতি সহজেই আমার একটা ঘৃণা জন্মাবে। দ্বিতীয়তঃ আমি আপনার সমকক্ষ নই, আমার সকল প্রকার ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের বাইরে আপনি, অথচ সর্বদা আমি অনুভব করছি, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য, সেটা নিছক ভাগ্যদোষে হয়েছে। আপনি আমার চাইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নন—তথাপি আপনার নাগাল পাবার আমার উপায় নেই। এবং এই যে ব্যর্থতা সর্বদা আমায় পীড়ন করছে, এই ব্যর্থতা হতেই ক্রমে আপনার প্রতি আমার একটা ঘৃণার ভাব আসতে পারে এবং তখন কেবল এই কথাটাই আমি ভাবব, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদিচ কোন পার্থক্যই হওয়া উচিত নয়, তথাপি আপনি আমার নাগালের বাইরে। এ অবিচার, এ অন্যায়। এই ধরনের ঘৃণা হতে অনেক সময় মানুষ ঘৃণার ব্যক্তিকে খুন পর্যন্ত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। জগন্নাথের অন্তরে এই দ্বিতীয়োক্ত ঘৃণাই প্রবল হয়ে উঠেছিল, রায়পুরের রাজবাটীর সকলের বিরুদ্ধে।

হারাধনের মুখেই আমি শুনেছি, বর্তমানে হারাধনের যে সঙ্গতি আছে, তাতে সহজ-ভাবে জগন্নাথের জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু জগন্নাথের মনে ছিল আরও উচ্চাশা।

আমি আরও জানতে পেরেছি, ভাগ্যক্রমে নয়ই—বরং বলা চলতে পারে একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে, মৃত ছোট কুমার সুহাসের সঙ্গে একই কলেজে একই শ্রেণীতে জগন্নাথ পড়ত। লেখাপড়ায় সুহাসের চাইতে জগন্নাথ অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। অথচ সুহাসের পক্ষে যে প্রাচুর্যতা সম্ভবপর ছিল, জগন্নাথের পক্ষে সেটা ছিল দুঃসাধ্য। কারণ হারাধনের এত পয়সা নেই যে জগন্নাথকে সুহাসের মত সমানভাবে মানুষ করেন। সুহাসের বিলাত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জগন্নাথ হারাধনের কাছে সে প্রস্তাব করায়, হারাধন স্পষ্টই তার অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে দেন। কোন একদিন গল্পের ছলে হারাধন জগন্নাথকে শ্রীকণ্ঠের উইলের কথা বলেছিলেন। সেই গল্প শোনার পর হতেই হয়ত জগন্নাথের অবচেতন মনে একটা প্রবল ঘৃণা জন্ম নেয়। এবং হয়ত মনে হয়েছে তার সৌভাগ্যক্রমে আজ যে বস্তুটা পেয়ে সুহাস ভাগ্যবান, দুর্ভাগ্যক্রমে তা হতে বঞ্চিত হয়ে জগন্নাথ নিজে ব্যর্থ ও ভাগ্যহীন। এবং ক্রমে যত দিন যেতে থাকে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেটা জগন্নাথের মনে আরও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সেই অবিমিশ্র ঘৃণার ছিদ্রপথেই জগন্নাথের দেহে শনি প্রবেশ করে। যে অর্থের সম্ভাবনা তার হাতে এসেও ফসকে গেছে দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই অর্থকে করায়ত্ত করবার জন্য সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। গোপনে সে নৃসিংহ গ্রামে গিয়ে সেখানকার পুরাতন ভৃত্য দুঃখীরামকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হাত করে।

সুরেন চৌধুরী যে নৃসিংহ গ্রামের কাছারী-বাড়ির গুপ্তকক্ষে শিবনারায়ণের হাতে বন্দী হয়ে আছে সে সংবাদ দুঃখীরাম অর্থের বিনিময়ে জগন্নাথকে সরবরাহ করে। ধূর্ত জগন্নাথ তখন আর এক চাল চালে। সুবিনয় মল্লিককে সেই সংবাদ দিয়ে তাকে ব্ল্যাক-মেল করতে মনস্থ করে। এবং তার পূর্বে সেই সংবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার জন্যই জগন্নাথ নৃসিংহ গ্রামে গিয়ে হাজির হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নির্দেশমত সুব্রত তখন নৃসিংহ গ্রামে উপস্থিত এবং সেও তখন সুরেনের অস্তিত্ব গুপ্তকক্ষে টের পেয়েছে।

জগন্নাথকে গুপ্তকক্ষের দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে দুঃখীরাম বিদায় নেয়। সুব্রত গুপ্তকক্ষে উপস্থিত। জগন্নাথকে নৃসিংহ গ্রামে কাছারী-বাড়ির গুপ্তকক্ষে দেখে সুব্রত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে শিবনারায়ণও সেই কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। ভেবে দেখুন নাটকের কত বড় ক্লাইমেক্স্!

কূটচক্রী শিবনারায়ণ জগন্নাথকে অমনি আকস্মিকভাবে পাতালঘরে আবির্ভূত হতে দেখে কি ভেবেছিল তা সেই জানে, তবে সুব্রতর জবানীতে সেই মুহূর্তে শিবনারায়ণের কথা শুনে এইটেই মনে হয় যে, ব্যাপারটা শিবনারায়ণেরও ধারণার অতীত ছিল।

ধূর্ত শিবনারায়ণ সহসা ঐ মুহূর্তে জগন্নাথকে দেখে হয়ত ভেবেছিল, জগন্নাথ সুবিনয়েরই নিযুক্ত চর। এবং ঐ সময়কার শিবনারায়ণের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, জগন্নাথের আসল পরিচও যেমন সে জানত না, তেমনি জগন্নাথের ঐ ভাবে ঐ ঘরের মধ্যে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যটাও বুঝে উঠতে পারেনি। চোরের মন বোঁচকার দিকেই থাকে সর্বদা। এতে আশ্চর্য হবার তেমন কিছুই নেই। ব্ল্যাকমেল করে দীর্ঘকাল ধরে শিবনারায়ণ যে সুবিনয়ের কাছ হতে কত টাকা নিয়েছে কে বলতে পারে। এতদিন সে নিশ্চিন্তই ছিল, কিন্তু হঠাৎ জগন্নাথকে দেখে তার মনে হয়েছিল হয়ত তার দিন ফুরিয়েছে।

জগন্নাথ ঠিক কেন ঐ রাত্রে পাতালঘরে গিয়ে প্রবেশ করে তা সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও, একটা মীমাংসায় হয়ত অনায়াসেই আমরা আসতে পারি। সেটা হচ্ছে এই, জগন্নাথ নিশ্চয়ই জানত না, সুব্রত পাতালঘরের সন্ধান পেয়েছে ইতিপূর্বে এবং সেখানে সুরেন চৌধুরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এবং এও হয়ত সে কারণেই জানত না, ঠিক ঐ রাত্রে ঐ সময় শিবনারায়ণ ও সুব্রত পাতালঘরেই আছে। আমার ধারণা, অবিশ্যি ভুলও হতে পারে, জগন্নাথ ঐ রাত্রে দুঃখীরামের সাহায্যে পাতালঘরে প্রবেশ করেছিল, সবার অলক্ষ্যে সুরেন চৌধুরীকে পাতালঘর থেকে সরিয়ে অন্যত্র কোথাও নিয়ে যাবার জন্য। এবং একবার সুরেন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে পারলে তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের প্ল্যান-মাফিক কাজ করতে পারবে।

আমার ধারণা, এই বিচিত্র হত্যা-নাটকের চতুর্থ অঙ্কই হচ্ছে শ্রীমান জগন্নাথের প্ল্যান বা পরিকল্পনা। আপনি হয়ত জানেন, আমরা অনেক সময় আমাদের সৎপ্রণোদিত কাজের মধ্য দিয়েও অন্যের সর্বনাশ ডেকে আনি। এক্ষেত্রে রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকও তাই করেছিলেন। পূর্বপুরুষের, বিশেষ করে জন্মদাতা পিতার অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি পরবর্তী জীবনে যে শেষ উইলটি করেছিলেন, যার ফলে এতগুলো নির্মম হত্যা একটার পর একটা হয়ে গেল, সেই উইলই হল কাল।

রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিক যদি হত্যার কিছুদিন পূর্বে দ্বিতীয় উইলটি না করতেন, হারাধনের পৌত্র জগন্নাথকে এভাবে রায়পুরের মাকড়সার জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হত না। আমার অনুমান মাত্র, কারণ জগন্নাথ আর ইহজগতে নেই। নির্মম নিয়তির অমোঘ বিধানে সে তার দুর্নিবার লোভের উপযুক্ত মাসুলই কড়ায়-গণ্ডায় বোধ হয় শোধ করে গেছে। নাহলে একবার ভেবে দেখুন, কী তার অভাব ছিল! তার পিতামহ হারাধন মল্লিক যা রেখে যেতেন মৃত্যুর পর, জগন্নাথের বাকি জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দেই কেটে যেত।

কোন আর্থিক অভাবই তার হত না কোনদিন। তাছাড়া তার ভাগ্যে যদি রায়পুরের সম্পত্তি-লাভ থাকতই তবে মৃত্যুর পূর্বে রত্নেশ্বর ওভাবে তাঁর পুত্রদের বঞ্চিত করে যাবেনই বা কেন। যে ধনে তার সহজ দাবি ছিল, সে ধন হতে কেন সে বঞ্চিত হবে। তাই মনে হয় এ বিধাতার অভিশাপ ছাড়া আর কি! তাই সন্তুষ্ট সে হতে পারল না, এবং মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে গেল। পিতামহের স্নেহের নীড় থেকে ছুটে গেল আলোকশিখা-লোভী পতঙ্গের মত; হতভাগ্য ছুটে গেল কোথায়—না নৃসিংহ গ্রামের পাতালঘরে! ভেবে দেখুন লোভের কি নির্মম প্রায়শ্চিত্ত! কী করুণ মৃত্যু!

অভিশপ্ত এই রায়পুর স্টেট ও তার বিশাল ধনসম্ভার। রাজা রত্নেশ্বর, রাজা রসময়, রাজা শ্রীকণ্ঠ, সুহাস মল্লিক, নিশানাথ মল্লিক, সতীনাথ লাহিড়ী, জগন্নাথ মল্লিক একের পর এক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন এবং শিবনারায়ণ আজ বদ্ধ উন্মাদ। রাজা সুবিনয় ধর্মাধিকরণের বিচারের অপেক্ষায়।

সত্যি এ ধরনের জটিল ও নৃশংস হত্যার মামলায় ইতিপূর্বে আমি হাত দিইনি জাস্টিস মৈত্র!

জগন্নাথ পরিকল্পনা করেছিল হয়ত সুরেন চৌধুরীকে পাতালঘর থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে রেখে কৌশলে ভীতিপ্রদর্শন করে একই সঙ্গে রাজা সুবিনয় মল্লিক ও শিবনারায়ণের নিকট থেকে অর্থশোষণ করবে। একেবারে সাদা কথায় যাকে বলে black-mailing! এবং হয়ত অর্থশোষণ করাই তার ইচ্ছা ছিল, কেননা জগন্নাথ জানত সুবিনয়ের নিকট থেকে সম্পত্তির ভাগ পাওয়া সুদূরপরাহত। যে নিজের ভাইকেও, যাকে শিশুকাল হতে দেখে আসছে, ঐ সম্পত্তির জন্য অকাতরে খুন করতে পারে—আর যাই সে দিক সম্পত্তির ভাগ নিশ্চয়ই দেবে না! জগন্নাথের প্রয়োজন যখন অর্থের, তখন যে উপায়েই হোক অর্থ পেলেই হল—তা সে সম্পত্তি-প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই হোক বা অন্য কোন পথে অর্থপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েই হোক।

এখন কথা হচ্ছে, জগন্নাথের হঠাৎ কেন সন্দেহ হয় যে সুরেন চৌধুরী আজও মরেননি—বেঁচে আছেন এবং হয়ত নৃসিংহ গ্রামের পুরাতন প্রাসাদেই কোথায়ও-না-কোথায়ও আছেন। আমার ধারণা, জগন্নাথ কোনক্রমে ব্যাপারটা নৃসিংহ গ্রামের কাছারীর শিবনারায়ণের ভৃত্য দুঃখীরামকে হাত করেই জেনেছিল তাকে টাকা খাইয়ে। এবং যখন সে-কথা সে জানতে পারল তখন তার মত বুদ্ধিমান ছেলে সহজেই অনুমান করতে পেরেছে, কেন শিবনারায়ণ সুরেন চৌধুরীকে গুম করে রেখেছে ঐ নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদের কোন এক গুপ্তকক্ষে। আরও বিশদভাবে ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হলে, এবারে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আবার আমাকে নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ফিরে যেতে হয়।

॥ তের ॥

কিরীটীর ডাইরী

সুব্রতর ইচ্ছা এখানে আমার ডাইরীর কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে দেখুন; তাই সে আমার ডাইরী থেকে খুব যত্ন সহকারে নকল করে দিয়েছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী…

কলকাতা শহরে শীতটা কি এবার কিছুতেই যাবে না নাকি! ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, এ সময়টা কলকাতায় তেমন শীত থাকে না। কেবল একটা কোমল ঠাণ্ডার আমেজ থাকে মাত্র। শেষ রাত্রের দিকে গায়ে চাদরটা টেনে দিতে বেশ আরাম লাগে। গতকাল সুরেন চৌধুরীকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। দীর্ঘকাল ধরে অন্ধকার পাতালঘরের মধ্যে একাকী বন্দী থেকে থেকে ভদ্রলোকের মাথার একটু গোলমাল হয়েছে যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। মাথা খারাপের আর দোষ কি! ঐভাবে ছাব্বিশ বছর আমাকেও যদি কেউ আটকে রাখত তবে আমিও নির্ঘাত পাগল হয়েই যেতাম। সুব্রতকে সুহাসিনী দেবীর কাছে পাঠিয়েছি। বলেছি, কোন কথাই যেন সে আগে সুহাসিনী দেবীকে না বলে। কে জানে, এত বড় আনন্দ তিনি সহ্য যদি না করতে পারেন!

১৪ই ফেব্রুয়ারী…

কথাগুলো আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

রাত্রি নটা।

সুহাসিনী দেবী ধীর শান্ত পদে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, আমাকে আপনি ডেকেছেন মিঃ রায়?

বসুন মা। আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা আছে। সেদিন রাত্রে আচমকা যখন আপনি আমার এখানে এসে আপনার একমাত্র ছেলেকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করলেন, তখন আপনার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে কেমন যেন আমার একটা ধারণা হয়েছিল, বোধহয় সত্যিই আপনার পুত্র নির্দোষ!

তবে কি—

ভয় নেই মা। সত্যিই আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনার হয়ত মনে থাকতে পারে, সে রাত্রে বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে আপনাকে আমি কোন আশ্বাসই দিইনি,

কেবলমাত্র এইটুকু বলেছিলাম সত্যিই যদি আপনার ছেলে নির্দোষ হয়, তবে যেমন করেই হোক তাকে আমি মুক্ত করে আনব। এবং তা যদি না পারি তাহলে জানবেন, সে কাজ স্বয়ং কিরীটীরও সাধ্যাতীত ছিল। যা হোক, প্রমাণ পেয়েছি আপনার ছেলে সত্যিই নির্দোষ। কেবল তার স্বকীয় মূর্খতার জন্যই এ দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হল।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন, সত্যি! সত্যি বলছ বাবা সে নির্দোষ! তাকে তুমি বাঁচাতে পারবে তাহলে?

সে যে নির্দোষ সেটা আমি প্রমাণ করব, তবে আসলে তার মুক্তি দিতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা তাঁর একদিন বিচার করেছিলেন। যাঁদের হাতে আইনের ক্ষমতা দেওয়া আছে একমাত্র তাঁরাই। তবে সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।

ভদ্রমহিলার দুটি চক্ষু দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, বাবা, কি বলে যে তোমায় আশীর্বাদ করব জানি না। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

কিন্তু মা, যেজন্য আজ রাত্রে এখানে আপনাকে কষ্ট করে আসতে বলেছি, সে কথা এখনও আমার বলা হয়নি। সত্যিই এতকাল পরে ভগবান আপনার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু অভাবনীয়কে সহ্য করবার মত, অচিন্তনীয় আনন্দকে সহ্য করবার মত সাহস ও ক্ষমতা এখন আপনার চাই। এমন একটি মুহূর্ত আজ এতদিন পরে আপনার জীবনে এসেছে, যেটা আপনার কল্পনারও অতীত ছিল।

তুমি যে কী বলছ বাবা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

মা, তবে শুনুন, এতক্ষণ আপনাকে বৃথা স্তোকবাক্য দিয়ে এসেছি। আমার অক্ষমতার জন্য সত্যিই আমি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন কিনা জানি না, আপনার ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না। সে গতকাল আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, লজ্জায় ঘৃণায়, জেলের মধ্যেই।

অ্যাঁ, সে কি!

বসুন মা। ব্যস্ত হবেন না। এখনও সে বেঁচে আছে।

তবে—

তবে জন্ম-মৃত্যুর কথা তো কেউই বলতে পারে না। কিন্তু তার এ অবস্থার জন্য দায়ী কতকটা আপনিই।

তার এ অবস্থার জন্য দায়ী আমি!

হ্যাঁ। কেন আপনি এতদিন তার সঙ্গে একটিবারও দেখা করেননি? কেন? চুপ করে রইলেন কেন, বলুন? আপনি তাকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করতে পারেননি এই জন্যই না? আপনার অজ্ঞাতে সে সুহাসদের ওখানে গিয়েছিল এবং সুহাসের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা করেছিল এই জন্যই না? আপনি না মা! সন্তানের এ সামান্য অপরাধটুকুও ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি?

না না, সেজন্য নয়। কোন্ মুখ নিয়ে আবার আমি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব? চিরজীবনের জন্য কারাগারের অন্তরালে দিন কাটাতে চলেছে, মা হয়ে কেমন করে তার সে ব্যথাকাতর মুখখানি দেখব, শুধু এইজন্য তার সঙ্গে আমি দেখা করিনি। মা হয়ে সন্তানকে চিরবিদায় দিতে পারিনি। কিন্তু সেও আমায় বুঝল না। ঠিক আছে আমি যাব, তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব।

সুব্রত নিয়ে এস ওঁকে।

সুব্রতর সঙ্গে সঙ্গে সুরেন চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

সুরেন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যেন তিনি ভূত দেখবার মতই চমকে ওঠেন, কে! কে! তুমি কে!

সুহাসিনী, আমায় চিনতে পারছ না? আমি সুরেন!

তুমি! তুমি—বংশপত্রের মত সুহাসিনী কাঁপছেন।

আমি মরিনি সুহাস! বেঁচে আছি।

বসুন মা, সোফাটার ওপরে বসুন।

একি আমি স্বপ্ন দেখছি! সুহাসিনী ধপ্ করে সামনের সোফার ওপরে বসে চোখ বুজলেন।

আরও আধ ঘণ্টা পরে।

মা, এত বড় আনন্দটাকে আপনি হঠাৎ যদি সহ্য করতে না পারেন, তাই আপনার ছেলে সম্পর্কে একটা মিথ্যা কথা বলে আপনাকে আঘাত দিয়েছিলাম। আপনার পুত্র সম্পূর্ণ সুস্থ। সন্তানের অপরাধ নেবেন না মা।

নাটক যদি এখানেই শেষ হত!

বাইরে কার মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল, কে!

রাণী মালতী দেবী নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

রাণীমা! আসুন, আমি আহ্বান জানালাম, বসুন!

রাণীমা নির্দেশমত সোফার ওপরে উপবেশন করলেন।

লক্ষ্য করেছিলাম, রাণীমা ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সুহাসিনী দেবী মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। সুহাসিনী দেবীর মনের মধ্যে তখনও আলোড়ন চলছে।

মা, এদিকে ফিরে তাকান। মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। এঁকে আপনি চেনেন কি না জানি না, হয়তো চেনেন, ইনিই মৃত সুহাসের জননী রায়পুরের রাণীমা মালতী

দেবী। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ এঁরই একমাত্র পুত্রহন্তারূপে আপনার একমাত্র পুত্র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত। অথচ যাদের কেন্দ্র করে এত বড় নির্মম ঘটনাটা গড়ে উঠল, তাদের সৌহার্দ্য ও প্রীতি অতুলনীয়। তাদের মধ্যে একজন আজ মৃত। সেইজন্যই আমার আজ অনুরোধ আপনারা পরস্পর পরস্পরের দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে আপনাদের পুত্রের পরস্পরের ভালবাসার স্মৃতিকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখুন।

ইনি কে কিরীটীবাবু? মালতী দেবী সুরেন্দ্র চৌধুরীকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন।

এঁর পরিচয় আপনাকে দেওয়া হয়নি রাণীমা, ইনি ডাঃ সুধীন চৌধুরীর পিতা সুরেন্দ্র চৌধুরী।

সে কি! তবে যে শুনেছিলাম—

হ্যাঁ। লোকে এতকাল তাই জানত বটে। ইনি আজও জীবিতই আছেন। এঁকে নৃসিংহ গ্রামের পাতালঘরে গুম করে রাখা হয়েছিল।

মালতী দেবীর দু চোখের কোণ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু নেমে এল।

আর আমার কোন দুঃখ রইল না কিরীটীবাবু। গরীব বাপের অনেকগুলো সন্তানের মধ্যে আমি একজন। রূপ ছিল বলেই রাজবাড়িতে আমি স্থান পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দুঃখের বুঝি আমার অবসান হল। কিন্তু বিধাতা যার কপালে সুখ লেখেননি, তাকে সুখী কেউ করতে পারে না। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে কিরীটীবাবু, 'বেটে দিলেও চটে যায়',—আমার কপালেও ঠিক তাই হল। সুখের চন্দন প্রলেপ আমার কপাল থেকে শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেল। কিন্তু সে কথা থাক। আমার সুহাস যে নিজের জীবন দিয়ে তার পিতা-প্রপিতামহের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল এবং সমস্ত অন্যায়ের মীমাংসা এমনি করে দিয়ে গেল, আজকের আমার এত বড় দুঃখেও সেইটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হয়ে রইল। বলতে বলতে সুহাস-জননী এগিয়ে এসে সুহাসিনীর হাত দুটি চেপে ধরলেন, সত্যিই এতদিনে আমার মুক্তি মিলল দিদি। তোমার স্বামীকে তুমি ফিরে পেয়েছ। তোমার ছেলেও তোমার বুকে ফিরে আসুক। আমার উপরে এবং আমার মৃত স্বামীর উপরে আর কোন ক্ষোভ রেখো না। বল রায়পুরের রাজগোষ্ঠীর সকল অপরাধই তুমি ক্ষমা করলে!

নীরবে সুহাস-জননী মালতী দেবীকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

তাঁর কণ্ঠে ভাষা ছিল না। শুধু চোখে ছিল নীরব অশ্রু। বুকের সমস্ত অকথিত ভাষাই আজ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

এরপর মালতী দেবী আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিরীটীবাবু, রাত্রি অনেক হল, আমাকে আপনি কেন ডেকেছিলেন, তা তো কই বললেন না?

এইজন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম রাণীমা।

তাহলে এবার আমি যাই।

মালতী দেবী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন, রাণীর মতই মাথা উঁচু করে, মর্যাদার গৌরবে।

॥ চোদ্দ ॥

বিশ্লেষণ

জাস্টিস্ মৈত্র আবার কিরীটীর চিঠিতে মন দিলেন। একপাশে কিরীটীর ডাইরীর অনুলিপিগুলো সরিয়ে রেখে।

কিরীটী লিখেছে:

আবার ফিরে যাওয়া যাক রায়পুর রহস্যের মধ্যে। মালতী দেবী নিজেই বলেছেন জানতে পারলেন গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। তবু রূপ ছিল বলে রাজবাড়িতে বিয়ে হল তাঁর। কিন্তু ভাগ্যদেবতা পরিহাস করলেন তাঁর সঙ্গে—রাণীর মুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন বটে কিন্তু সে মুকুট দুঃখের কণ্টকে কণ্টকিত। তবু বলব বোধহয় মালতী রাণীর একটা সহজাত গরিমা নিয়েই জন্মেছিলেন। ভেবে দেখুন শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই আভিজাত্য বোধই তাঁকে দিয়ে সব কিছু স্বীকার করাল এবং মালতী দেবী যদি নিজ হতে আমার সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে না ধরতেন তবে হয়ত রায়পুরের রহস্য এত শীঘ্র উদঘাটন করা আমার পক্ষেও সম্ভব হত না। তাঁকে আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না। সে রাত্রে আমার বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার পর আর তিনি রাজবাড়িতে ফিরে যাননি। কোথায় গেছেন কেউ তা জানে না। তবে যতদূর মনে হয় তিনি কোন তীর্থস্থানেই জীবনের বাকি কটা দিন কাটাতে চলে গেছেন হয়ত। তাঁর জীবনের শেষের দিন কটি শান্তিতে কাটুক এই প্রার্থনাই জানাই সেই সর্বনিয়ন্তার কাছে। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে আরও একবার রহস্য বিশ্লেষণে ফিরে যাই।

আগেই বলেছি শ্রীকণ্ঠ মল্লিক মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন নৃসিংহ গ্রামে যান, তাঁর ছেলে রসময়ও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাপ ও ছেলেতে বনিবনা আদপেই ছিল না কোন দিন। তার কারণও হয়ত রসময়ের শরীরে যে অতি সাধারণ রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল তার দুষ্ট প্রভাব। এবং রসময় যে মুহূর্তে শুনলেন শ্রীকণ্ঠ নতুন উইল করেছেন তিনি হয়ত ভেবেছিলেন তাঁর তখন পিতা শ্রীকণ্ঠকে হত্যা করা ছাড়া হয়ত

আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই শিবনারায়ণের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত করে শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে হত্যা করা হল।

এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সম্পত্তির লোভেই রসময় তাঁর দত্তক পিতা শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সত্যিকারের পিতা ও পুত্রের মধ্যে রক্তের যোগাযোগে যে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসা গড়ে ওঠে তার কিছুই তো ছিল না রসময় ও শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের মধ্যে, এবং সেটা না থাকাটাই স্বাভাবিক। অবশেষে সম্পত্তি পাবার পর এবং ঐ সুবিপুল সম্পত্তি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যেও এসে পাছে আবার নাগালের বাইরে চলে যায় এই ভয়েই হয়ত তাঁকে শেষ মুহূর্তে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলেছিল। রসময় যদি নিজ হাতে তাঁর পিতাকে হত্যা করতেন দুষ্কর্মের কোন সাক্ষী না রেখে, তবে হয়ত বর্তমান হত্যা-মামলা অন্যপথে প্রবাহিত হত; কিন্তু তা হল না। অত বড় গর্হিত ও দুষ্কর্ম একাকী সাঙ্গ করবার মত মনোবল রসময়ের হয়ত ছিল না বলেই তাঁর দুষ্কর্মের সঙ্গী হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিবনারায়ণকে। এবং এসব ক্ষেত্রে যা হয়, শিবনারায়ণই অবশেষে ভূত হয়ে রসময়ের কাঁধে চেপে বসল; রক্ত চোষার মতই শিবনারায়ণ রসময়ের রক্ত চুষে নিতে লাগল দিনের পর দিন। এবং স্বভাবতঃই ক্রমশঃ রসময় রক্তহীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

এমন সময় রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সুধীনের পিতা হতভাগ্য নির্বিরোধ সুরেন চৌধুরী।

শ্রীকণ্ঠের দ্বিতীয় উইল রসময় শ্রীকণ্ঠকে হত্যার পূর্বেই সরিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে শ্রীকণ্ঠ দ্বিতীয়বার উইল করেছেন এ কথা রসময় জানতে পারলেন কি করে? ব্যাপারটা তো আগাগোড়াই অত্যন্ত গোপন করা হয়েছিল সকলেই তা জানে। তবে?

দেখুন নিয়তির কি অলঙ্ঘ্য আদেশ! নিয়তি কি নির্মম!

উইল করবার পর শ্রীকণ্ঠ যখন তাঁর স্ত্রীর কাছে সেই কথা একদিন বলেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ রসময় সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন, এবং সব কথা তিনি জানতে পারেন।

এ কথাটা রসময় তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে সখেদের সঙ্গে নাকি তাঁর স্ত্রী মালতী দেবীকে বলেছিলেন।

মালতী দেবীই পরে সেকথা আমাকে বলেন। এই ব্যাপারের আগে পর্যন্ত মালতী দেবীও শ্রীকণ্ঠের দ্বিতীয় উইল সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। আগেই বলেছি হত্যার বিষ রায়বংশের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই বিষের নেশাতেই রসময় শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে হত্যা করেন এবং সুবিনয় আবার তাঁর পিতা রসময়কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। কারণ শ্রীকণ্ঠের দ্বিতীয় উইলের কথা তিনি শুনেছিলেন। যদিও সুবিনয়ের সেই উইলটির

অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তাঁর হয়ত ভয় হয়েছিল তাঁর পিতা না আবার বিমাতার প্ররোচনায় নতুন করে কখনও কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন এক উইল করেন। পিতা রসময়ের চাইতে পুত্র সুবিনয় আর এক ধাপ উপরে যান। শ্রীকণ্ঠকে হত্যা করবার পর রসময় সুরেন চৌধুরীকেও ইহসংসার থেকে সরাতে মনস্থ করেন। আপদের শেষ না রাখাই ভাল হয়ত এই নীতিই তাঁর ছিল। চিরদিনের মত সরিয়ে ফেলবার জন্যই সাদরে চাকুরি দিয়ে রসময় সুরেনকে নৃসিংহ গ্রামে দেওয়ানজীর পদে এনে নিযুক্ত করলেন। এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হল। এবং এবারেও শিবনারায়ণকেই সুরেনকে হত্যা করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। শিবনারায়ণ হয়ত এবারে দেখলে বার বার এইভাবে টাকার লোভে হত্যা করবার মধ্যে প্রচুর বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাই সে এবারে রসময়ের উপরেও এক হাত নিল।

সুরেনকে হত্যা না করে তাঁকে গুম করে ফেললে এবং শ্রীকণ্ঠকে হত্যা করবার সময় যে কর্মচারীটি তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল তাকেই হত্যা করে হত্যার পর চেহারার বিকৃতি ঘটিয়ে সুরেনের মৃতদেহ বলে চালিয়ে দিল। এবং সুরেনের মৃত্যু (?) রটনার সঙ্গে সঙ্গে শিবনারায়ণ আবির্ভূত হল রঙ্গমঞ্চে এবারে। এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, এবার প্রকাশ্যে রসময়ের সাহায্যে নৃসিংহ গ্রামে নায়েবীর গদীতে উপবেশন করে তার আসল খেলা শুরু করল।

শিবনারায়ণ সুরেনকে একেবারে হত্যা না করে কেন গুম করে রাখলে তা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

শিবনারায়ণের সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা করতে পারতাম তবে হয়ত এই ব্যাপারের একটা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা তো হয়ে উঠল না, তাই বর্তমানে হত্যা-রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে যে explanationটা মনে মনে আমি দাঁড় করিয়েছি সেটাই এবার আলোচনা করব। ইচ্ছে হলে আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন, না হলে ভুলেও যেতে পারেন, কারণ বর্তমান মূল ঘটনার মীমাংসার ব্যাপারে উক্ত ঘটনাটা একেবারে বাদ দিলেও হতভাগ্য সুধীন চৌধুরীর মুক্তির কোন বাধা থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

আমার মনে হয় শিবনারায়ণের কাছে অর্থটাই ছিল সব চাইতে বড় জিনিস, তার পূর্ববর্তী জীবনকে পর্যালোচনা করলেও সেই কথাটা বেশী করে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই মনে হবে।

শিবনারায়ণ লোকটা ছিল যেমন প্রচণ্ড নৃশংস তেমনি ভয়ঙ্কর অর্থপিশাচ, অথচ সুবিনয়ের চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধি রাখত সে।

রসময়ের সহকারী রূপে সে শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি, এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্যই সে নিজহাতে শ্রীকণ্ঠ মল্লিককে হত্যা না করে অন্যের দ্বারা হত্যা করিয়েছিল। তারপর রসময় যখন সুরেনকে আবার হত্যা করবার জন্য মনস্থ করলে, তখনও সে রসময়কে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করেনি বিন্দুমাত্রও। শিবনারায়ণ ইতিমধ্যে সুবিনয়ের সঙ্গেও বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। সে দেখলে রসময়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে, ভবিষ্যতে গদীতে বসবে সুবিনয় মল্লিক, সুবিনয়কে হাতে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে সুবিনয়কেও অনায়াসেই দোহন করা চলতে পারে। তাই হয়ত সে সুরেনকে প্রাণে না একেবারে মেরে গুম করে ফেলবার মনস্থ করলে, অবিশ্যি আগেই বলে নিয়েছি এটা আমার একটা অনুমান মাত্র।

সুরেন চৌধুরীকে হত্যার অভিনয় করে এক ঢিলে চতুর-চূড়ামণি শিবনারায়ণ দুই পাখী মারল। এখানে একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, গুপ্তকক্ষের সংবাদ শিবনারায়ণ কেমন করে পেল? এক্ষেত্রেও আমার মনে হয়, প্রথমে হয়ত সে সুরেনকে অন্য কোথাও লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দী করে রেখেছিল, পরে নৃসিংহ গ্রামে নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গুপ্তকক্ষের সন্ধান পায় কোন উপায়ে ও সেখানে সুরেনকে এনে বন্দী করে রাখে।

শিবনারায়ণ শ্রীকণ্ঠকে নিজহাতে হত্যা না করলেও, হত্যার সাহায্য সে করেছিল, হত্যার সাহায্যকারী হিসাবে সে অপরাধী এবং murder or abattement of murder বস্তুতঃ অপরাধটা একই শ্রেণীর। দণ্ড মকুব হয় না। শ্রীকণ্ঠর হত্যার ব্যাপারে রসময়ই একমাত্র সাক্ষী বেঁচে তখনও, প্রধান সাক্ষীকে তো আগেই সে শেষ করে ফেলেছিল। যা হোক নির্বিঘ্নে রসময়কে পৃথিবী হতে সরানো হল বিষপ্রয়োগে। হতভাগ্য সুবিনয় নিজের অজান্তেই শিবনারায়ণের মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিলেন।

এতদিনে সুবিনয়ের পীত বিষের ক্রিয়া শুরু হল।

আবার একটা কথা এসে পড়ছে, সুবিনয় কি জানতেন সুরেন চৌধুরী আসলে নিহত হননি? আমার কিন্তু মনে হয়, হ্যাঁ, তিনি এ-কথা বোধহয় জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু জানতে পারলে কি হবে, তাঁর তখন সাপের ছুঁচো গেলবার মত অবস্থা অনেকটা। এবং সম্ভবতঃ দুটি কারণে সুবিনয় মুখ খুলতে পারেননি। প্রথমতঃ এতদিন পরে যদি লোক জানতে পারে আসলে সুরেন চৌধুরী মরেননি তাহলে মল্লিকবংশের সম্মান গৌরব সব ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই রহস্যের উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বংশের অনেক কলঙ্ক-কাহিনীই আর চাপা থাকবে না। এবং এ কথাও সেই সঙ্গে প্রমাণিত হবে রসময়ই শ্রীকণ্ঠ ও সুরেনের হত্যার উদ্যোক্তা। কাজেই বেচারাকে চুপ করে বিষ হজম করতে হয়েছে।

জাস্টিস্ মৈত্র যেন অবাক হয়ে যান। একটা কঠিন রহস্যের গোলকধাঁধায় যেন কিরীটী তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে। সত্যি, এ রহস্যের কিনারা কোথায়! ভাবেন কেমন করেই বা কিরীটী কঠিন রায়পুর হত্যারহস্যের মীমাংসায় গিয়ে পৌঁছল! কোন্ পথ ধরে! অদ্ভুত বিচার-বিশ্লেষণ-শক্তি লোকটার!

দীর্ঘদিন ধরে বিচারালয়ে বাদী ও বিবাদী পক্ষের জেরায় ও জবানবন্দি নিয়ে এতগুলো লোকে সম্মিলিত বিচারশক্তি দিয়ে যে অপরাধের মীমাংসায় পৌঁছনো গেল, অলক্ষ্যে যে তার মধ্যে এত বড় গলদ থেকে গেল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, ব্যাপারটা শুধু আশ্চর্যই নয় অভুতপূর্বও যেন।

ডাঃ সুধীন চৌধুরী সুহাস মল্লিকের হত্যাকারী নয়!

সত্যি মানুষের সাধারণ বিচারবুদ্ধির বাইরেও যে কত অমীমাংসিত জিনিস থেকে যায়, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে!

প্রমাণ। প্রমাণই আমাদের বিচারের সব চাইতে বড় কথা।

মন যেখানে বলছে সেটা সত্যি নয়, ভুল, মিথ্যা—সেখানেও তো নিছক আমাদের মনগড়া কতকগুলো প্রমাণের দোহাই দিয়েই কত সময় আমরা আমাদের বিচারের মীমাংসা করে নিই।

বিবেক বলে কি তবে কিছুই নেই! মানুষের মন হল মিথ্যা আর সামান্য প্রমাণই হল সত্যি!

জাস্টিস্ মৈত্র আবার কিরীটীর চিঠিতে মনঃসংযোগ করেন।

রসময়ের রক্তের সঙ্গেই রায়-গোষ্ঠীতে এসেছিল বেনোজল। এবারে আবার সেই বেনোজলের স্রোতে ফিরে আসা যাক।

রসময়ের মৃত্যুর পর সুবিনয় মল্লিক গদীতে আসীন হলেন।

কিন্তু যে অর্থের লালসায় তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতাকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি, এবার সেই লালসার মুখে বাধা হল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই হতভাগ্য সুহাস। সুহাস অন্ধের মত তার দাদাকে যতই ভালবাসুক না কেন, সুবিনয়ের মনে সুহাসকে জন্য এতটুকু স্নেহও হয়ত কোথায়ও ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সুবিনয় সুহাসকে সম্পত্তির ভাগীদার হিসাবে দেখে এসেছে। ক্রমে সেটাই প্রবল হিংসায় পরিণত হয়। এবারে সুবিনয় সুযোগের সন্ধানে ফিরতে লাগলেন; কি করে সকলের সন্দেহ বাঁচিয়ে সুহাসকে তাঁর পথ হতে সরাবে ঐ চিন্তাই হল তাঁর আসল চিন্তা। ঐভাবেই সুহাসের হত্যারহস্যের হল গোড়াপত্তন। অতীত থেকে আমরাও এবারে ফিরে যাব বর্তমান রায়পুর হত্যা-মীমাংসায়।

॥ পনের ॥

মীমাংসা

কিরীটীর চিঠি,—

রসময়ের মৃত্যুর পর সুবিনয় অল্পদিনের মধ্যেই জমিদারী সেরেস্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটান।

প্রথমেই আনলেন তিনি সতীনাথ লাহিড়ীকে, তারপর হাত করলেন তারিণী চক্রবর্তীকে। এবং সর্বশেষে আমাদের ডাঃ কালীপদ মুখার্জীকে।

কালীপদ মুখার্জী একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসাবে বহু অর্থও তিনি জমিয়েছেন। তথাপি কেন যে তিনি অর্থের লোভে নৃশংস হত্যার মধ্যে তাঁর চিকিৎসা বিদ্যাকে জড়িয়ে নিজেকে এবং এত বড় সম্মান ও গৌরবের বস্তু চিকিৎসা শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করলেন, তার সদুত্তর একমাত্র হয়ত তিনিই দিতে পারেন। বিচারের চোখে আজ তিনি কলঙ্কমুক্ত হলেও, মানুষ হিসাবে আমরা কেউ তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না। সুহাসের হত্যাপরাধে যদি কারও মৃত্যুদণ্ড হয়, তবে সর্বাগ্রে তাঁরই হওয়া উচিত। কিন্তু যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম ঃ টাকার লোভে ডাঃ কালীপদ মুখার্জী এসে সুবিনয়ের সঙ্গে হাত মেলালেন। প্রথমে 'টিটেনাস্' রোগের বীজাণু প্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা যখন ঘটনাচক্রে ব্যর্থ হল, শয়তান ডাক্তার তখন সুহাসের শরীরে প্লেগের জীবাণু ইনজেক্ট করে হত্যা করবার মনস্থ করলেন। মুখার্জী তাঁর সহকারী ও রিসার্চ-স্টুডেণ্ট ডাঃ অমর ঘোষকে বম্বেতে পাঠালেন 'প্লেগ' কালচার নিয়ে আসতে।

ডাঃ অমর ঘোষ তাঁর যে জবানবন্দি আমার কাছে দিয়েছেন তা পাঠিয়ে দিলাম।

আমি ডাঃ অমর ঘোষ স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিচ্ছি। ডাঃ মুখার্জীর অনুরোধে আমি বোম্বে প্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি নাকি প্লেগ ব্যাসিলি সম্পর্কে কি একটা জটিল রিসার্চ করছেন এবং তাঁর এক টিউব প্লেগ কালচার চাই। তিনি এও আমাকে বলেন, প্লেগ কালচার নিয়ে যে তিনি কোন রিসার্চ করছেন এ-কথা একান্তভাবে গোপন রাখতে চান। কারণ তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট সম্পূর্ণ হওয়ার আগে একথা কেউ জানুক এ তাঁর মোটেই অভিপ্রেত নয়।

রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্ণেল মেনন তাঁর বিশেষ পরিচিত এবং তাঁকে বললে সুবিধা হতে পারে, তথাপি তিনি তাঁকেও সেকথা বলতে চান না। আমি যদি কোন

উপায়ে গোপনে একটি প্লেগ কালচার টিউব বম্বে থেকে নিয়ে আসতে পারি সকলের অজ্ঞাতে তাহলে তিনি বিশেষ বাধিত হন। শুধু যে তাঁর কথাতেই আমি রাজী হয়েছিলাম তা নয়, ঐ সময় আমার অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। অর্থের কোন সুরাহাই যখন করে উঠতে পারছি না, তখন একদিন হঠাৎ ডাঃ মুখার্জী আমাকে ডেকে বলেন, যদি কোন উপায়ে বম্বে থেকে একটি প্লেগ কালচার টিউব আমি এনে দিতে পারি, তিনি আমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। এবং ব্যবস্থা সব তিনিই করে দেবেন। অর্থপ্রাপ্তির আশু কোন উপায় আর না দেখে, শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাবেই আমি সম্মত হই এবং কৃষ্ণ-মেননের কাছে তাঁর লিখিত পরিচিতিপত্র নিয়ে আমি বম্বেতে রওনা হই।

সেখানে গিয়ে দিন-দশেকের মধ্যেই যে কি উপায়ে আমি একটি প্লেগ কালচার টিউব হস্তগত করি সে-কথা আর বলব না, তবে এইটুকু বলছি, একটি টিউব সংগ্রহ করে সেই রাত্রেই বম্বে মেলে আমি রওনা হই। কলকাতায় পৌঁছেই টিউবটা আমি ডাঃ মুখার্জীকে দিই, তিনিও আমায় পাঁচ হাজার টাকা নগদ হাতে হাতে তখুনি দিয়ে দেন। তবে এ-কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি, যদি আগে ঘুণাক্ষরেও আমি জানতে পারতাম কিসের জন্য ডাঃ মুখার্জী আমাকে দিয়ে প্লেগ কালচার টিউব সংগ্রহ করেছিলেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এই হীন কাজে হাত দিতাম না। পরে যখন আসল ব্যাপার জানতে পারলাম, তখন আমার অনুশোচনার আর অবধি পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তখন নিজের মাথা বাঁচাতে সবই গোপন করে যেতে হল। পরে নিরন্তর সেই কথাটাই আমার মনে হয়েছে, ডাঃ সুধীন চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশেই দায়ী আমি হয়ত। আজ তাই কিরীটীবাবুর অনুরোধে সব কথা লিখেই দিলাম। এর জন্য যে কোন শাস্তিই আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি, তবু নির্দোষ ডাঃ চৌধুরী কলঙ্কমুক্ত হোন এই চাই। আজ যদি তিনি মুক্তি পান তবে হয়ত এই মহাপাপের যার সঙ্গে পরোক্ষে আমি ভাগ্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছি তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্তও আমার করা হবে। ইতি

ডাঃ অমর ঘোষ।

ডাঃ অমর ঘোষের স্বীকৃতি পড়লেন তো, নিশ্চয়ই কাগজে দেখে থাকবেন গত পরশু অর্থাৎ ঐ বিবৃতি দেবার দুদিন পরেই তিনি সুইসাইড করেছেন হাই ডোজে মরফিন নিয়ে। যাক্ এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, কেমন করে কি উপায়ে প্লেগ ব্যাসিলি সংগৃহীত হয়েছিল! ডাঃ অমর ঘোষের সাহায্যে 'প্লেগ কালচার' সংগ্রহ করে ডাঃ মুখার্জী সেই বিষ সুহাসের শরীরে প্রবেশ করালেন। কিন্তু দুঃখ এই, ডাঃ ঘোষের স্বীকৃতির পরও ডাঃ মুখার্জীকে আমরা ধরতে পারব না, কারণ যে পরিচিতিপত্র তিনি কর্ণেল মেননকে দিয়েছিলেন সেটার অস্তিত্ব আজ ইহজগতে আর নেই। সম্ভবতঃ বহু অর্থের বিনিময়ে

কর্ণেল মেনন সেটা ভস্মীভূত করেছেন এবং আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সেই পরিচিতিপত্র সম্পর্কে কর্ণেল মেনন তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, কোন পত্রই নাকি তিনি ডাঃ মুখার্জীর কাছ হতে পাননি, কেবলমাত্র ডাঃ ঘোষের মৌখিক অনুরোধেই তিনি ডাঃ ঘোষকে ইনস্টিটিউটে কাজ করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। ডাঃ ঘোষ কর্ণেল মেননের কাছে এসে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ডাঃ মুখার্জী তাঁকে প্লেগ ইন্স্টিটিউটে কয়েকদিন কাজ করবার জন্য পাঠিয়েছেন। এবং কর্ণেল মেনন নাকি তাঁর বন্ধু। ডাঃ মুখার্জীর মৌখিক অনুরোধ রক্ষা করেই ডাঃ অমর ঘোষকে ইনস্টিটিউটে প্রবেশাধিকার দেন এবং রায়পুর হত্যা-মামলার জবানবন্দি দিতে গিয়ে বিচারালয়ে কর্ণেল মেনন সেই কথাই বলে এসেছেন। তিনি সেদিনও যে কথা বলেছিলেন, আজও তাই বলছেন, এর বেশী তাঁর বলবার মত কিছুই নেই। এর পর আর কর্ণেল মেননকে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিনি। কারণ জানতাম, কর্ণেল মেননের মত একজন সম্মানী সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আর যাই করুন না কেন, যে ভুল একবার করে ফেলেছেন এবং যে ভুলের আজ সংশোধন করতে গেলে তাঁর এতদিনকার সম্মান প্রতিপত্তি সব ধুলায় লুণ্ঠিত হবে—সেই ভয়েই আজ তাঁকে এমনি করে সর্ব ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাতেই হবে। তাছাড়া অর্থের লোভকে কাটিয়ে ওঠবার মত মানসিক বলও তাঁর নেই। বিদ্যা তাঁকে ডিগ্রী দিলেও বিদ্যার গৌরব দেয়নি। কর্ণেল মেননের কথা এখানেই থাক।

যাহোক, তাহলে এখন আমরা ধরে নিতে পারি অনায়াসেই যে নির্বিবাদে ডাঃ ঘোষের মারফতই বম্বে থেকে এক টিউব প্লেগ কালচার ডাঃ মুখার্জীর হাতে পৌছেছিল।

এবার আসা যাক—the black man with the black umbrella-র রহস্যে। আমার মনে হয় আদালতে বিচারের সময় এই pointটাতে আপনারা তেমন গুরুত্ব দেননি। সুহাস মল্লিক যেদিন শিয়ালদহ স্টেশনে অসুস্থ হয় কালো লোকটির ছাতার খোঁচা (?) খেয়ে এবং আমার মতে যে সময় হতভাগ্য সুহাসের দেহে 'প্লেগ বীজাণু' inject করা হয়, সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়নি। অর্থাৎ সেই অচেনা কালো ছত্রধারী লোকটির movementটা যেভাবে ঠিক অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, আদালতে সেভাবে করা হয়নি। যদিও ঐ ছত্রধারী লোকটিকে কেবলমাত্র সুহাসের হত্যা-ব্যাপারে একটা যন্ত্র হিসাবেই কাজে লাগানো হয়েছিল এবং যদিও আসলে উক্ত লোকটি এই দুর্ঘটনায় সামান্য একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র, তথাপি লোকটিকে অন্ততঃ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করাও আপনাদের খুবই উচিত ছিল না কি? তর্কের খাতিরেও নিশ্চয়ই এখন সে কথা অস্বীকার করতে পারবেন না, কি বলেন? কিন্তু যাক

সে কথা। যা ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠেনি, এখন আর সেটার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের হত্যা-মামলার সেই রহস্যময় কালো লোকটিকে আর ইহজগতে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না।

তবে সেই লোকটি যে কালো ছাতাটি ব্যবহার করেছিল সেটা আমি উদ্ধার করেছি, সেটা আপনাকে পাঠানো হল, পরীক্ষা করে দেখবেন।

এই ছাতার ব্যাপারেও হত্যাকারী তার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে।

ছাতার একটি শিকের সঙ্গে দেখবেন চমৎকারভাবে দেখতে অবিকল প্রায় একটি ছোট হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের মত একটা যন্ত্র লাগানো আছে। ঐ সিরিঞ্জের মত যন্ত্রের ভিতরেই ছিল সংগুপ্ত প্লেগের জীবাণু।

ওর মেকানিজম এত সূক্ষ্ম ও চমৎকার যে যন্ত্রটির শেষে ছোট যে রবারের ক্যাপটি আছে, ওতে চাপ পড়লেই যন্ত্রটি থেকে ভিতরকার তরল পদার্থ প্রেসারে বের হয়ে সিরিঞ্জের মত যন্ত্রের অগ্রভাগের সঙ্গে যুক্ত নিডল্-পথে বের হয়ে আসবে। যন্ত্রের সিরিঞ্জের মত অংশের নিডল্‌টির খুব সামান্য অংশই ছাতার শিকের অগ্রভাগ দিয়ে বের হয়ে আছে। ছাতাটি খুলে ভাল করে না পরীক্ষা করে দেখা পর্যন্ত, এসব কিছুই কারও নজরে পড়তে পারে না।

সত্যি ঐ অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী আমাদের চোখে যেই হোক না কেন, I take my hats off! সংবাদপত্রে রায়পুরের হত্যা-সংক্রান্ত ঘটনাবলী পড়তে পড়তে ঐ ছাতার কথা শোনা অবধি আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল। কেন যেন আমার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ঐ ছাতার মধ্যে কোন একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। আসলে সুহাসের হত্যার ব্যাপারে ছাতাটি প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ঐ কালো লোকটি। রায়পুরের প্রাসাদে যে রাত্রে সুবিনয়ের কাকা শ্রীযুক্ত নিশানাথ নিহত হন সেই রাত্রে তদন্তে গিয়ে সুবিনয়ের কক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই যে দুটি অন্যের দৃষ্টিতে ও বিচারে অতি সাধারণ (?) বস্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে হচ্ছে ১নং ঐ ছাতাটি এবং ২নং দেওয়ালে ঝোলানো একটি পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চ।

আপনি হয়ত এখনই প্রশ্ন করবেন, সর্বাগ্রে কেন ঐ দুটি বস্তুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল!

তার জবাবে বলব, রায়পুরের ধনশালী ও শৌখীন রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে আর যাই লোকে আশা করুক না কেন, আলমারির মাথায় তুলে রাখা সামান্য পুরাতন একটি ছাতা দেখবার আশা নিশ্চয়ই কেউ করে না বা করতে পারে না। তাই

আলমারির মাথায় রাখা ঐ ছাতাটি আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। এবং যে বাড়ির ঘরে ঘরে ডায়নামোর সাহায্যে সারা রাত্রি আলো জ্বালাবার সুব্যবস্থা আছে এবং যার কোনদিনই শিকারের কোন বাতিক বা 'হবি' নেই তার ঘরে হঠাৎ পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চের বা কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে—তাই দেওয়ালে ঝোলানো পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চটাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চিরদিনই কোন ব্যাপারে মনে যখন আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহের ছায়াপাত হয়, সে ব্যাপারের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে নিজের মনকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সন্তুষ্ট করতে পারি, আমি স্থির থাকতে পারি না। সে যাই হোক, মনের সন্দেহের নিরবসানের জন্যই পরের দিন সর্বপ্রথম বিকাশের সাহায্যে উক্ত বস্তু দুটি আমি রায়পুরের রাজবাটি থেকে সবার অলক্ষ্যে সংগ্রহ করে আনি। এবং আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সেটাও সহজেই প্রমাণিত হয়ে যায়। কি করে ছাতা আর টর্চটি সংগ্রহ করেছি, সে-কথা আর নাই বা বললাম। সাদা কথায় শুনিয়ে রাখি, জিনিস দুটি চুরি করিয়ে এনেছি এবং ঐ ছাতা ও টর্চের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পরই আর কালো লোকটির সন্ধানের প্রচেষ্টা ত্যাগ করি। ছাতাটি পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন কি উপায়ে হতভাগ্য সুহাসের দেহে প্লেগ বীজাণু প্রবেশ করানো হয়েছিল।

এবারে আসা যাক পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চটির কথায়। টর্চটি পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন টর্চের আকার হলেও আসলে ওটি টর্চ নয়। টর্চের যেখানে আলোর বাল্‌ব লাগানো থাকে সেখানে দেখুন—একটি গোলাকার ছিদ্রপথ আছে। এবং বাতির পিছনকার ক্যাপটি খুলুন, দেখবেন ভিতরে একটি এক বিঘত পরিমাণ সরু পেনসিলের মত ইস্পাতের নল বসানো আছে। ঐ জিনিসটির খোলের মধ্যে তিনটি ড্রাই সেল ভরা যায়। এবং টর্চের বোতাম টিপলেই, সেলের কারেণ্টে আলো জ্বালার পরিবর্তে ঐ সরু নলের ভিতর থেকে প্রচণ্ড গতিতে একটি সরু ইস্পাতের তৈরী তীর বের হয়ে মুখের ছিদ্রপথ দিয়ে ছুটে সামনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই বলছিলাম, আসলে দেখতে বস্তুটি পাঁচ সেলের একটি হান্টিং টর্চের মত হলেও, তীর নিক্ষেপের ওটি একটি চমৎকার যন্ত্রবিশেষ। এবং ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই সতীনাথ লাহিড়ী ও নিশানাথ মল্লিককে হত্যা করা হয়েছে। ঐ ছাতা ও টর্চের উদ্যোক্তা ও পরিকল্পনাকারী হচ্ছে স্বয়ং সতীনাথ লাহিড়ী। হতভাগ্য তার নিজের মৃত্যুবাণ নিজ হাতেই তৈরী করে দিয়েছিল! সতীনাথের সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছি সতীনাথ ছিল একজন মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্র। সৎপথে তার বুদ্ধিকে পরিচালিত করতে পারলে আজ দেশের অনেক উপকারই তার দ্বারা হত। কিন্তু যে বুদ্ধি ভগবান তার মস্তিষ্কে দিয়েছিলেন, তার অপব্যবহারই তার অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রতিভার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটালো।

সতীনাথের জীবনকথা সংগ্রহ করে আমি যতটুকু জেনেছি তা এই—ছোটবেলা হতেই নাকি সতীনাথের সায়েন্সের দিকে প্রবল একটা ঝোঁক ছিল। নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রায় সময়ই সে নাড়াচাড়া করত। লাহিড়ী একটা ছোটখাটো ইলেকৃট্রিক কারখানা করে চেতলা অঞ্চলে কাজ করত। একবার মধ্যরাত্রে ঐ কারখানার সামনে হঠাৎ সুবিনয়ের গাড়ি ইলেকৃট্রিক সংক্রান্ত ব্যাপারে বিগড়ে যায়। সতীনাথ গাড়ি মেরামত করে দেয়। সেই সূত্রেই সুবিনয়ের সঙ্গে আলাপ সতীনাথের। বলাই বাহুল্য, সতীনাথ ঐ সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়েই সুবিনয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে দুজনের মধ্যে গভীর আলাপ জমে ওঠে। সতীনাথ কারখানায় তালা লাগিয়ে দিয়ে একেবারে সুবিনয়ের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়। সুহাসকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছিলেন সুবিনয় অনেকদিন ধরে। সতীনাথকে পেয়ে ভেবেছিলেন সতীনাথের সাহায্যে কাজ হাসিল করে নেবেন। অর্থাৎ তার মাথায় সাদা কথায় কাঁঠাল ভাঙবেন। কিন্তু সতীনাথ যে অত নিরীহ বোকা নয়, সে-কথা বুঝতে হয়ত সুবিনয়ের খুব বেশী দেরি হয়নি। তাই সতীনাথের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটা ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে। সতীনাথের ঘর থেকে সুব্রত যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করেছিল সেগুলিই তার প্রমাণ দেবে নিঃসংশয়ে। সতীনাথ কিন্তু ওর আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আসল নাম শ্রীপতি লাহিড়ী। যা হোক, সুহাসের হত্যার ব্যাপারে সতীনাথের তৈরী অস্ত্র ও ডাঃ মুখার্জীর সংগৃহীত প্লেগ বীজাণু কাজে লাগানো হয়।

সতীনাথই যে ছাতা ও টর্চের পরিকল্পনাকারী সেটা তার ঘরের ভিতরকার জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ফ্ল্যাট্ ফাইলের ভিতরকার কয়েকটি ডকুমেণ্ট ও প্ল্যান থেকে আমি পরে জানতে পারি।

শেষটায় অর্থের নেশায় সতীনাথ নিশ্চয় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাই হয়ত এত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যুর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সুবিনয়ের কাছে।

তাছাড়া সুহাসের হত্যার ব্যাপারে সতীনাথ মস্ত বড় প্রমাণ, তার বেঁচে থাকাটাও সেদিক থেকে সুহাসের হত্যাকারীর পক্ষে নিরাপদ নয় এতটুকু। কাজেই তাকে সরতে হল।

এবং বেচারী নিজের হাতের মৃত্যুবাণ নিজের বুক পেতে নিয়ে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

সতীনাথকে যখন হত্যা করা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে বোধ হয় নিশানাথ সে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিলেন, তাই তাঁকেও হত্যা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল হত্যাকারীর পক্ষে একই কারণে। কুক্ষণে হতভাগ্য নিশানাথ বলে ফেলেছিলেন সকলের সামনে, black man with

that big torch! তারপর তাঁর সেই কথা, that mischeivous boy again started his old game! কাজেই হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল এর পরও যদি নিশানাথ বেঁচে থাকেন, তাঁকে পাগল বলে রটনা করলেও সর্বনাশ ঘটতে হয়ত দেরি হবে না। মানুষের মন! তাছাড়া আরও একটা কথা এর মধ্যে আছে, কোন মানুষকে যখন সর্বনাশের নেশায় পায়, ধাপের পর ধাপ সে নেমেই চলে অন্ধকারের অতল গহ্বরে, যতক্ষণ না সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস নেয়। নিশানাথ বর্ণিত সেই ওল্ড গেমের কথা রাণীর চিঠি ও জবানবন্দির মধ্যেই পাবেন। তাই আর পুনরুক্তি করলাম না।

যাহোক, সতীনাথের হত্যার কথাটা একবার ভেবে দেখুন: মহেশ সামন্ত, তারিণী চক্রবর্তী ও সুবোধ মণ্ডলের জবানবন্দি হতে কতকগুলো ব্যাপার অতি পরিষ্কার ভাবেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিশেষ করে সুবোধ মণ্ডলের জবানবন্দি—যা এই কাগজের সঙ্গেই আলাদা ভাবে আমি পাঠালাম পড়ে দেখবেন। যে রাত্রে সতীনাথ অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হয় সে রাত্রে হত্যার কিছুক্ষণ পূর্বেও সতীনাথ তার বাসাতেই ছিল। সতীনাথের বাড়ির ভৃত্যদের জবানবন্দি হতে জানা যায়, পাগড়ী বাঁধা এক দারোয়ান (?) গিয়ে সতীনাথকে একখানা চিঠি দিয়ে আসে। এবং ঐ চিঠি পাওয়ার পরই সতীনাথ বাসা হতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এবং যাওয়ার সময় ভৃত্যকে বলে যায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সে আবার ফিরে আসছে। ভৃত্য বংশীর প্রথম দিকের জবানবন্দি যদি সত্যি বলে ধরে নিই, তাহলে বাসা হতে বের হয়ে আসবার ঘণ্টা দুই পূর্বে কোন একসময় দারোয়ান-বেশী কোন এক ব্যক্তি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল সতীনাথের কাছে।

সতীনাথের ভৃত্য বংশী গোলমাল শুনেই রাজবাড়িতে ছুটে আসে। রাজবাড়ি ও সতীনাথের বাসার দূরত্ব এমন কিছু নয়, যাতে করে বাসা থেকে বের হয়ে আসবার পর রাজবাড়িতে পৌঁছতে সতীনাথের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। তাইতেই মনে হয় আমার সতীনাথ চিঠি পেয়েই নিশ্চয়ই রাজবাড়ির দিকে যায়নি, আগে অন্য কোথায়ও গিয়েছিল, পরে রাজবাড়িতে যায়। এবং তা যদি হয় তো আমার অনুমান মৃত্যুর পূর্বে সতীনাথের রাজবাড়ির বাইরে অন্য কোন জায়গায় হত্যাকারীর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা বা কথাবার্তা হয়েছিল এবং সেই সময়ই সতীনাথের পকেট থেকে চিঠিটি খোয়া যায়। কিন্তু ভৃত্য বংশীর কথায়ও আমি তেমন আশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। কারণ প্রথমে একবার সে বলেছে—এই ঘণ্টা দুইও হবে না কে একটা লোক বাবুর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, আবার পরমুহূর্তেই জেরায় বলেছে লোকটা বের হয়ে আসবার মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই বংশী গোলমাল শুনে ছুটে আসে।

এখন কথাটা হচ্ছে বংশীর জবানবন্দির মধ্যে কোন্ কথাটা সত্যি ! প্রথম না দ্বিতীয় ! আমি বলব, দ্বিতীয় নয়, প্রথম্ কথাটাই। তার কারণ ১নং মৃত সতীনাথের পায়ে যে জুতো ছিল তার মধ্যে নরম লাল রংয়ের এঁটেল মাটি লেগে ছিল। যেটা পরের দিন ময়নাঘরে, ময়নাতদন্তের সময় সুব্রত উপস্থিত হয়ে দেখতে পায়। ২নং সতীনাথের বাসা থেকে রাজবাড়ির রাস্তায় কোথাও ঐ সময় কোন লাল রঙের এঁটেল মাটির অস্তিত্বই ছিল না। ৩নং যে নাগরা জুতোটা পাঠিয়েছি তার সোলেও লাল এঁটেল মাটি দেখতে পাবেন। নদীর ধারে লাল রঙের এঁটেল মাটি একমাত্র ঐ শহরে আছে আমি দেখেছি। তাতে করে আমার মনে হয় বংশী প্রথমটাই সত্যি বলেছিল। ঐ রাত্রে মৃত্যুর পূর্বে সতীনাথের হত্যাকারীর সঙ্গে নদীর ধারে দেখা হয়েছিল এবং কথাবার্তাও হয়েছিল নিশ্চয়ই, এই আমার বিশ্বাস। এবং প্রায় একই সঙ্গে দুজনে অল্পক্ষণ আগে-পিছে রাজবাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। খুব সম্ভব অন্দরমহলের আঙিনায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হত্যাকারী সতীনাথকে অতর্কিতে সামনের দিক থেকে তারই তৈরী 'মৃত্যুবাণ' নিক্ষেপ করে হত্যা করে। এবং হত্যা করেই সতীনাথের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই হত্যাকারী বাড়ির মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে। তারপর সময় বুঝে আবার অকুস্থানে আবির্ভূত হয়। হত্যার দিন রাত্রে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল। সেই আলোতেই নিশানাথ তাঁর শয়নকক্ষের খোলা জানলাপথে ঘটনাচক্রে সমগ্র ব্যাপারটি হয়ত দেখতে পান। সতীনাথের প্রতি 'মৃত্যুবাণ' নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মারাত্মক ঐ টর্চ যন্ত্রটিরই সাহায্যে, এবং নিশানাথ সে ব্যাপার দেখে ফেলেছিলেন বলেই বলেছিলেন—black man with that big torch ! এবং আগেই বলেছি ঐ স্বগত উক্তিই হল তাঁর মৃত্যুর কারণ।

নিশানাথ ছাড়াও আর একজন ঐ নৃশংস হত্যা-ব্যাপারের সাক্ষী থাকতে পারত, সারারাত্রি ঘুরে যে ওই দরজায় পাহারায় নিযুক্ত থাকত, দারোয়ান ছোট্টু সিং। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দারোয়ান ছোট্টু সিং সে-রাত্রে জীবিত থেকেও মরেই ছিল, প্রচন্ড সিদ্ধির নেশার প্রভাবে। ছোট্টু সিংয়ের জবানবন্দী হতেই সে কথা আমাদের জানতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ছোট্টু সিং যে তার জবানবন্দিতে বলেছে, তার প্রচণ্ড সিদ্ধির নেশার কথাটা কেউই জানতেন না, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। ছোট্টু সিংয়ের ধারণা যদিও তাই, আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। হত্যাকারীর পরামর্শ মতই তার সঙ্গী মানে নেশার সাথী তারিণী চক্রবর্তীই বেশী পরিমাণে ছোট্টু সিংকে সিদ্ধি সেবন করিয়েছিল সে-রাত্রে সম্ভবতঃ। কারণ ছোট্টু সিং ও তারিণী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একসঙ্গে সিদ্ধির সরবত পান করত। তবে একটা ব্যাপার হতে পারে সরবত খাবার সময় ছোট্টু সিং ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, সরবত পানের নেশার ঝোঁকে ঠিক কতটা পরিমাণে সিদ্ধি

সে সরবতের সঙ্গে গলাধঃকরণ করছে। আশ্চর্য হবেন না, ব্যাপারটা আগাগোড়াই প্ল্যান-মাফিক ঘটেছে গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত। হত্যাকারী যখন সতীনাথের কাছে দারোয়ানের বেশে চিঠি নিয়ে যায়, তখন তার জুতোর শব্দ সুবোধ মণ্ডল শুনতে পেয়েছিল, ওকথা তার জবানবন্দিতেই প্রকাশ। এবং একমাত্র সুবোধ মণ্ডলই নয়, তারিণী চক্রবর্তীও শুনতে পেয়েছিল, তবে তারিণী জানত আসলে লোকটি কে, আর সুবোধ মণ্ডল ভেবেছিল লোকটা ছোট্টু সিং, এই যা প্রভেদ। হত্যাকারী দারোয়ানের বেশ নিয়েছিল এই জন্য যে কেউ তাকে দেখে ফেললেও যাতে ছোট্টু সিং ছাড়া অন্য কেউ না ভাবে। আসলে ব্যাপারটা যাই হোক, সতীনাথের হত্যার সময় একমাত্র নিশানাথ ছাড়া আর দ্বিতীয় সাক্ষী কেউ ছিল না। এবং বর্তমানে নিশানাথ যখন মৃত তখন সামান্য ঐ নাগরা জুতো, টর্চ ও অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দির সাহায্যে হত্যাকারীকে ফাঁসানো যাবে না। সে আজ আমাদের সকলেরই নাগালের বাইরে। সতীনাথের হত্যাকারীর ঐ একটি মাত্র অপরাধই তো নয়, নিশানাথেরও হত্যাকারী সে। এবং সতীনাথ নিশানাথকে একই প্রক্রিয়ায় ঐ মারাত্মক টর্চ যন্ত্রটির সাহায্যে বিষাক্ত মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে সে। সতীনাথের জন্য দুঃখ নেই। লোভীর চরম পুরস্কারই মিলেছে। দুঃখ হতভাগ্য নিরীহ অবিবেচক নিশানাথের জন্য। অবিবেচক এইজন্য বললাম, স্নেহে ও মমতায় যদি সে অন্ধ না হত, তবে সেই child of the past কোনদিনই পরবর্তীকালে তার old game আবার শুরু করতে পারত না হয়ত। এবং সুহাসের মৃত্যু হতে পর পর এত-গুলো হত্যাকাণ্ড ঘটত না।

এখন আসা যাক সে-রাত্রে কিভাবে নিশানাথকে হত্যা করা হয়েছিল—নিশানাথের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষের জানলাপথে। কারণ নিশানাথের মৃত্যুর পর মৃতদেহের position, যা এই মামলার প্রসিডিংস থেকে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কথাটার মধ্যে সন্দেহ রাখবার মত কিছুই নেই।

মৃত্যুর পূর্বে বিষজর্জরিত নিশানাথ যে স্বল্পকাল বেঁচেছিলেন তার মধ্যেই তাঁর শেষ মৃত্যু-চীৎকার শুনে মালতী দেবী ছুটে তাঁর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এবং ঠিক পূর্বমুহূর্তে অস্পষ্ট কণ্ঠে যে শেষ কথাটি মৃত্যুপথযাত্রী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি হত্যা-কারীরই ডাকনামটি। মালতী দেবীর নিজস্ব জবানবন্দিতেই সে-কথা স্বীকার করেছেন দেখতে পাবেন।

নিশানাথ ও সতীনাথের হত্যার ব্যাপার শেষ করবার পূর্বে আর একটি কথা যা আপনার জানা প্রয়োজন, সতীনাথই তার অমোঘ মৃত্যুবাণ নিক্ষেপের যন্ত্রের পরিকল্পনা-কারী এবং যন্ত্রটি ব্যবহারের পূর্বে তাকে অনেকবার এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে হয়েছিল

ও তার জন্য হয়ত অনেক ড্রাইসেলের প্রয়োজন হয়েছে তার, সে-সবের প্রমাণ তার নিজের বাক্সেই ছিল—ইন্‌ভয়েসগুলো।

॥ ষোল ॥

পূর্ব ঘটনার অনুস্মৃতি

এখন বোধ হয় আপনার আর বুঝতে কোনই কষ্ট হচ্ছে না, কিভাবে সুহাস, সতীনাথ ও নিশানাথকে হত্যা করা হয়। এবং সেই অদ্ভুত হত্যারহস্যটির পরিকল্পনাকারী সতীনাথের মতই আর একটি শক্তিশালী মস্তিষ্ক হতে। অর্থাৎ the real brain behind আমাদের সুবিখ্যাত প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ কালীপদ মুখার্জী, এম্. ডি.। যিনি আজও বহাল তবিয়তে সমাজের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন, এবং আমরা অনেকেই আজও যাঁকে স্বচ্ছন্দে ডেকে এনে তাঁরই হাতে আমাদের প্রিয়জনদের জীবনরক্ষাকল্পে চিকিৎসার সকল দায়িত্ব নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তুলে দিচ্ছি। সুহাসের হত্যাব্যাপারে সত্যিকারের যে-ই অপরাধী হোক না কেন, তাকেও হয়ত ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু ডাঃ কালীপদ মুখার্জী? নৈব চ নৈব চ!…

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকই সতীনাথ ও নিশানাথের হত্যাকারী। আর সুহাসের হত্যাকারী আসলে সাঁওতাল প্রজাটি হলেও পরিকল্পনাকারী রাজাবাহাদুর ও ডাঃ মুখার্জী ও যন্ত্র-আবিষ্কর্তা সতীনাথ।

চশমার সঙ্গে টিটেনাস রোগের বীজাণু প্রয়োগে সুহাসকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতেই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করা হল প্লেগের বীজাণু ইনজেক্ট করে।

এখন কথা হচ্ছে সুহাসের হত্যাব্যাপারে নিরীহ ডাঃ সুধীন চৌধুরীকে কেন জড়ানো হল! তার দুটি কারণ ছিল। অবিশ্যি এটাও আমার অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাঃ সুধীন যে নির্দোষ, প্রমাণ আমাকে করতে হবে বলেই আমার এ শ্রমস্বীকার সে তো আপনি জানেন। সেই কথাতেই এবারে আমি ফিরে আসছি। একেবারে গোড়া হতেই শুরু করব। ধরুন এ হত্যার ব্যাপারে সুধীনের বিরুদ্ধে যে প্রমাণকে আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছেন, সেটাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক। রায়পুরে যাত্রার দিন সকালে সুধীন সুহাসকে যে ইনজেকশন দিয়েছিল, সেটা অ্যান্টি-টিটেনাস্ ছাড়া আর কিছু ছিল কিনা?

কিন্তু তারও আগে আলোচনা করব, সত্যিই যদি সুধীনই সুহাসের হত্যাকারী হয়

তাহলে সেক্ষেত্রে সুধীনের সুহাসকে হত্যার কি 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? বলবেন, প্রতিশোধ ! তার পিতার নৃশংস হত্যারপ্রতিশোধ ! কিন্তু আমি বলব—absurd ! Simply absurd ! সুধীনের পিতা যখন নিহত হন, কতটুকু শিশু ছিল সুধীন ! তারপর একদিন বয়স হলে মার মুখে সব কিছু সে শুনলে, তখন তার মার পক্ষে যে প্রতি-হিংসা বা বিদ্বেষ থাকা সম্ভব, সেটা সুধীনের পক্ষে গড়ে ওঠা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া ঘটনাচক্রে যাদের প্রতি গড়ে ওঠা উচিত ছিল একটি পরিপূর্ণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ, সেখানে গড়ে উঠল একটা মধুর প্রীতির বন্ধন এবং সেটা একান্ত অজান্তেই। সুহাসের সঙ্গে ভাল-বাসাটা গাঢ় হয়ে ওঠবার পর যেদিন প্রথম সুধীন জানতে পারলে সুহাসের আসল পরিচয়, তখন তার মনে আর যাই হোক হিংসা বা ক্রোধ জাগতে পারে না। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা, যদি ধরেই নিই অর্থের লোভে সুধীন সুহাসকে হত্যা করেছে, তাও অসম্ভব, কারণ সে ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় উইল সম্পর্কে কিছু জানত না। এবং শুধু তাই নয়, অর্থের প্রতি যদি তার লোভই থাকবে, তাহলে সুহাস যখন তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল তখন মালতী দেবীকে সে তার ব্যবসার অংশীদার করত না।

তৃতীয়তঃ সুহাসকে সুধীনের যদি খুন করবারই মতলব থাকত, তাহলে প্রথমবার যখন সে 'টিটেনাস' রোগে আক্রান্ত হয়, তখন তাকে নিজে কলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করত না। এই তিনটি কারণেই আমার মনে হয় সুধীনকে আমরা অনায়াসেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। এবং তাই যদি হয় তাহলে সুধীনকে যে হত্যাকারী ইচ্ছা করেই কোন গভীর উদ্দেশ্যে সুহাসের হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়েছিল সেটা প্রমাণ হয়ে যায় না কি ? তাই বলছিলাম হত্যাকারী দুটি কারণে সুধীনকে হত্যা-মামলার সঙ্গে জড়িয়েছিল। যেহেতু (১) হত্যাকারী উইলের ব্যাপার জানত, এবং (২) জানত নিশ্চয়ই উইলের দ্বারা সুধীন লাভবান হবে—তাই মনে হয়, ঐ 'অ্যান্‌টিটিটেনাস' ইন্‌জেকশান দেওয়ার সুযোগে হত্যাকারী সুধীনের বিরুদ্ধে মস্ত বড় একটা প্রমাণ হাতে পেয়েছিল, যার দ্বারা অনায়াসেই হত্যার সমস্ত অপরাধ তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সমস্ত সন্দেহের বাইরে চলে যেতে পেরেছিল আইনের চোখে ধুলো দিয়ে। আগেই বলেছি সুধীন নিজের বোকামিতেই অনেকটা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। সুহাসের মৃত্যুর ঠিক কয়েকদিন আগে সুধীন বেনারসে চলে গেল, আবার মাঝখানে এসে মৃত্যুর সময়টা বেনারসে চলে গেছিল। এতে করে স্বভাবতই লোকের মনে সুধীনের প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে। তাছাড়া স্টেশনেও সে উপস্থিত ছিল। 'হিমোসাইটোমিটার' যন্ত্রটার কোন একটা ভাল রকম

explanationও সে দিতে পারল না। যদিও এক্ষেত্রে ডাঃ মিত্রের জবানবন্দির সত্যতাও আমি মেনে নিতে রাজী নই। আমার মতে মিঃ হালদারের ঐ সম্পর্কে explanationটাই সত্যি। ডাঃ মিত্র সত্য গোপন করেছিলেন। সুহাসের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সম্পর্কেও সকল সন্দেহের নিরসন হয়ে যায় মালতী দেবীর statement থেকেই। এবং এ কথাও সেই সঙ্গে প্রমাণ হয় মালতী দেবীকে বাঁচাতে গিয়েই এবং সুহাসের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবশেই ডাঃ সুধীন চৌধুরী অনেক ব্যাপার ইচ্ছে করেই চেপে গেছে আদালতে বিচারের সময় জেরার মুখে। তারপর সুহাসের কলকাতায় আগমন সংবাদ—সে-ও কেমন করে সুধীন চৌধুরী পায় তারও প্রমাণ পেয়েছেন মালতী দেবীর চিঠির জবানবন্দিতেই। তিনিই আগের বারের মত ডাঃ সুধীনকে সুহাসের অসুস্থতার সংবাদ দিয়েছিলেন। সুহাসের অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় পৌঁছবার পর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েই ডাঃ সুধীন তার এক বন্ধুর বিয়েতে, বন্ধুর একান্ত অনুরোধ না এড়াতে পেরেই কয়েকদিনের জন্য বেনারসে চলে যেতে বাধ্য হয় তার অনিচ্ছাতেই। এখন কথা হচ্ছে আদালতে জেরার সময় সুধীন চৌধুরী কেমন করে সুহাসের কলকাতায় আসবার সংবাদ পান সেটা জানাতে কেন অস্বীকার করে! তার কারণ মালতী দেবী অনুরোধ করেছিলেন, সুহাস যেন কাউকে কথাটা না বলে। ব্যাপারটা আগাগোড়া এখানে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বোধ হলেও, সুধীন মালতী দেবীকে expose করেনি। ডাঃ সুধীনের আদালতের সমগ্র ব্যাপারটা study করে আমার ধারণা হয়েছে, লোকটা যেন একটু eccontric প্রকৃতির ছিল। আর কিছুই নয়। নইলে নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ জেনেও সে চুপ করে ছিল কেন? সুধীন বন্ধুর বিবাহে বেনারসে গেছিল বলেই, ঠিক সুহাসের মৃত্যুর সময়টাতে কলকাতায় উপস্থিত থাকতে পারেনি। যদিও তার এই অনুপস্থিতি লোকের মনে সন্দেহেরই উদ্রেক করে। এবং সুধীন আদালতে বেনারসে কেন গেছিল সে সম্পর্কেও কোন জবাব দেয়নি যা সে অনায়াসেই পারত। তারপর রায়পুর যাওয়ার দিন সুধীন যে সুহাসকে 'অ্যান্টি-টিটেনাস' ছাড়া অন্য কিছু injection দেয়নি তার প্রমাণও মালতী দেবীর statement-য়েই পাবেন। মালতী দেবী সুধীনের প্রতি এতটুকু সন্দেহযুক্তা থাকলে সুধীনকেও বাঁচতে দিতেন না। এবং শুধু তাই নয়, সুধীন যে সুহাসের হিতাকাঙ্ক্ষী সে কথাও মালতী দেবীর চাইতে কেউ বেশী জানতেন না। তবু যে কেন আদালতে বিচারের সময় মালতী দেবী সব কথা গোপন করে গেলেন, তারও জবাব মালতী দেবীর চিঠির মধ্যে পাই।

মোটামুটি তাহলে আপনাকে রায়পুরের সমগ্র হত্যা-মামলাটির একটা মীমাংসা করে দিলাম। এবং এখন বোধ হয় আপনার আর বুঝতে কষ্ট হবে না, হতভাগ্য রায়পুরের

ছোট কুমার সুহাস মল্লিকের হত্যার পরিকল্পনাকারী স্বয়ং রাজাবাহাদুর—নিহত সুহাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিনয় মল্লিক।

পরিকল্পনাকারী ডাঃ কালীপদ মুখার্জী ও হত্যার যন্ত্রের উদ্ভাবনকারী সতীনাথ লাহিড়ী। আসলে উপরিউক্ত তিনজনকেই সুহাসের হত্যাকারী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবং এক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল অর্থলাভ। অর্থম্ অনর্থম্। নিশানাথ ও সতীনাথের হত্যাকারী স্বয়ং সুবিনয় মল্লিক। উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে নিশানাথ ছিলেন সতীনাথের হত্যার সাক্ষী এবং সতীনাথ ছিল সুহাসের হত্যার সঙ্গী ও পরিকল্পনাকারী। এই হত্যামামলা-সংক্রান্ত সব কিছুই আপনার গোচরীভূক্ত করলাম, সেই সঙ্গে এদের জবানবন্দি, যা আমি সংগ্রহ করেছি ও অন্যান্য evidenceগুলোও আপনার কাছে পাঠালাম। ধর্মাধিকরণের হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতা হতে কিছুদিনের জন্য চলে যাচ্ছি, অদূরভবিষ্যতে এই মামলার ফলাফল দূর হতে দেখবার বুকভরা আশা নিয়ে। আশা করি নিরাশ হব না। নমস্কার।

ভবদীয়
কিরীটী রায়

॥ সতের ॥

শেষ কথা

মানুষের চিন্তার বাইরেও যে কত বিস্ময় থাকে দিন-দুই পরে জাস্টিস্ মৈত্র একখানা খোলা চিঠি হাতে করে সেই কথাই ভাবছিলেন। কিরীটীর দীর্ঘ চিঠিটা পাওয়ার পর হতেই এ দুটো দিন কেবল তিনি ভেবেছেন, কোন্ পথে এবার তিনি তাঁর কাজ শুরু করবেন।

যে সত্য আজ কঠোর উলঙ্গভাবে তাঁর চোখের সামনে এসে প্রকট হয়েছে, তাকে কেমন করে তিনি গ্রহণ করবেন।

কিন্তু তাঁর সকল চিন্তা ও ভাবনার মীমাংসা যে এইভাবে এসে তাঁকে মুক্তি দেবে, চিঠিখানা খুলে পড়বার আগের মুহূর্তেও তিনি ভাবতে পারেননি। এমনই হয়। নিয়তি!

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

নির্ভাবনায় আমার এই চিঠিখানা আপনি পড়তে পারেন। এই চিঠি যখন আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই। সুহাসকে আমিই

হত্যা করিয়েছি। হঁ্যা। হত্যা করিয়েছি এইজন্য যে এই পৃথিবীতে আমার তার মত শত্রু আর ছিল না। শুধু এ জন্মেই নয়, আগের জন্মেও তাকে আমি হত্যা করেছি এবং পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে তাহলে পরজন্মেও তাকে আমি হত্যা করব। এই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমার কাকা নিশানাথ, তাঁকে আমি হয়তো হত্যা করতাম না, কিন্তু তাঁর অহেতুক কৌতুহল ও বাচালতাই তাঁকে হত্যা করতে আমায় বাধ্য করিয়েছিল। সতীনাথ—তাকেও আমি হত্যা করেছি, কারণ তার অর্থলিপ্সা। আমার চাইতেও সে বেশী অর্থলোভী ছিল। আর একটা কথা, যে উইল নিয়ে এত কাণ্ড, সে উইলটা আমি পেয়েছি খুঁজে এতদিনে, সুধীনের পিতা সেই উইল অনুসারে রায়পুর স্টেটের এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী। উইলটা আমিই সঙ্গে নিয়ে গেলাম। কারণ আমার সকল প্রচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল এবং আমার ভোগে যখন সম্পত্তি এলই না, তখন যাতে সেটা নিয়ে আর কোন উপদ্রব না ঘটে সেইজন্যই উইলটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম। Adieu !

বিনীত

সুবিনয় মল্লিক

www.boiRboi.blogspot.com

রাত্রি যখন গভীর হয়

www.boirboi.blogspot.com

॥ এক ॥

নতুন ম্যানেজার

ডিসেম্বরের শেষের শীতের রাত্রি।

কুয়াশার ধূসর ওড়নার আড়ালে আকাশে যেটুকু চাঁদের আলো ছিল তাও যেন চাপা পড়ে গেছে।

মিনিট কয়েক হল মাত্র এক্সপ্রেস ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল।

গাড়ির পিছনকার লাল আলোটা এতক্ষণ যা দেখাচ্ছিল একটা রক্তের গোলার মত, এখন সেটাও কুয়াশার অস্বচ্ছতায় হারিয়ে গেছে।

স্টেশনের ইলেকট্রিক বাতিগুলো কুয়াশার আবরণ যেন ভেদ করে উঠতে পারছে না।

ধানবাদ স্টেশনের লাল কাঁকর-ঢালা চওড়া প্ল্যাটফর্মটা জনশূন্য।

একটু আগে ট্রেনটা থামার জন্য যে সামান্য চঞ্চলতা জেগেছিল এখন তার লেশমাত্রও নেই।

একটা থমথম করা স্তব্ধতা চারিদিকে যেন।

জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ জাগিয়ে দুইজন ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একজন বেশ লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার, পরিধানে কালো রংয়ের দামী সার্জের সুট। তার উপর একটা লং কোট চাপানো। মাথায় পশমের নাইট্‌ ক্যাপ্‌, কান পর্যন্ত ঢাকা।

অন্যজন অনেকটা খাটো। পরনে ধুতি, গায়ে মাথায় একটা শাল জড়ানো। মুখে একটা জ্বলন্ত বিড়ি।

চা-ভেণ্ডার তার চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে এল, বাবু, গরম চা? গরম চা?…

না, প্রথম ব্যক্তি বললে।

গলার স্বরটা বেশ ভারী ও মোটা।

চা-ভেণ্ডার চলে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে ফিরে প্রথম ব্যক্তি প্রশ্ন করলে, সুশান্তবাবু যেন খুন হলেন কবে?

গত ২৮শে জুন রাত্রে।

আজ পর্যন্ত তাহলে তাঁর মৃত্যুর কোন কারণই খুঁজে পাননি?

না, খুনীকে খুঁজতেও তো কসুর করলাম না। আমাদের কুলী গ্যাং, কর্মচারীরা, মায় পুলিস অফিসাররা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রান হয়ে গেছেন।

আশ্চর্য!

তা আশ্চর্য বৈকি! পর পর তিনজন ম্যানেজার এমনি করে কোয়ার্টারের মধ্যে খুন হলেন। আমরা তো ভেবেছিলাম, এরপর কেউ আর এখানে কাজ নিয়ে আসতেই চাইবেন না। হাজার হোক একটা প্যানিক (ভীতি) তো—বলে লোকটি ঘন ঘন প্রায়-শেষ বিড়িটায় টান দিতে লাগল।

শঙ্কর সেন মৃদু হেসে বললেন, আমি লয়াবাদে একটা কলিয়ারীতে মোটা মাইনের চাকরি করছিলাম। তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি—ঐ যে ভয়ের কথা কি বললেন—আমাদের বড়বাবুর মুখে এখানকার ঐ ভয়ের ব্যাপারটা শুনে চার মাসের ছুটি নিয়ে এই চাকরিতে এসে জয়েন করেছি।

কিন্তু—

ভয় নেই, পছন্দ হলে থেকে যাব।

আপনার খুব সাহস আছে দেখছি শঙ্করবাবু!

শুধু আমিই নয়—শঙ্কর সেন বলতে লাগলেন, আমার এক কলেজ-ফ্রেণ্ডকেও লিখেছি আসতে। বর্তমানে সে শখের গোয়েন্দাগিরি করে। যেমন দুর্দান্ত সাহস, তেমন চুলচেরা বুদ্ধি। কেননা আমার ধারণা এইভাবে পর পর আপনাদের ম্যানেজার নিহত হওয়ার পিছনে ভৌতিক কিছু নেই, আছে কোন শয়তানের কারসাজী।

বলেন কি স্যার? আমার কিন্তু ধারণা এটা অন্য কিছু।

অন্য কিছু মানে? শংকর সেন বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

যে জমিটায় ওঁরা অর্থাৎ আমাদের কর্তারা কলিয়ারী শুরু করতে ইচ্ছা করেছেন, ওটা একটা অভিশপ্ত জায়গা। ওখানকার আশেপাশের গ্রামের সাঁওতালদের কাছে শুনেছি ওই জায়গাটা নাকি বহুকাল আগে একটা ডাকাতের আড্ডাখানা ছিল, সেই সময় বহু লোক এখানে খুন হয়েছে। সেই সব হতভাগ্যদের অদেহী অভিশপ্ত আত্মা আজও ওখানে দিবারাত্রি নাকি ঘুরে বেড়ায়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, কতদিন রাত্রে বিশ্রী কান্না ও গোলমালের শব্দে আমারও ঘুম ভেঙে গেছে। আবছা চাঁদের আলোয় মনে হয়েছে যেন হালকা আবছা কারা মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অল্ বোগাস্! দাঁতে দাঁত চেপে শঙ্কর সেন বললে।

আমি জানি স্যার, ইংরাজি শিক্ষা পেয়ে আপনারা আজ এসব হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। মরণই আমাদের শেষ নয়। মরণের ওপারে একটা জগৎ আছে এবং সে জগতের যারা বাসিন্দা তাদেরও প্রাণে এই মাটির পৃথিবীর লোকদের মতই দয়া, মায়া, ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা, হিংসা প্রভৃতি অনুভূতিগুলো আছে এবং মাটির পৃথিবী ছেড়ে গেলেও এখানকার মায়া সহজে তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

একটানা কথাগুলো বলে বিমলবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলেন।

কই, আপনার বাসের আর কত দেরি?

এই তো, আর মিনিট কুড়ি বাকি।

চলুন, রেস্টুরেণ্ট থেকে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

আজ্ঞে চায়ে আমার নেশা নেই।

তাই নাকি? বেশ, বেশ। কিন্তু এই শীতে চা-বিনে থাকেন কি করে?

আজ্ঞে, গরীব মানুষ।

দুজন এসে কেলনারের রেস্টুরেণ্টে ঢুকল এবং চায়ের অর্ডার দিয়ে দুজনে দুখানা চেয়ার দখল করে বসল।

আপনি আপনার যে বন্ধুটির কথা বলছিলেন তাঁর বুঝি গোয়েন্দাগিরিতে খুব হুজুগ আছে?

হ্যাঁ, হুজুগই বটে। শঙ্করবাবু হাসতে লাগল।

হুঁ। ওই এক-একজনের স্বভাব। নেই কাজ তো খই ভাজ! তা বড়লোক বুঝি? টাকাকড়ির অভাব নেই, বসে বসে আজগুবী সব খেয়াল মেটান!

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল।

আসুন না বিমলবাবু, কেতলি থেকে কাপে দুধ চিনি মিশিয়ে র চা ঢালতে ঢালতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বললে, বড্ড ঠাণ্ডা, গরম গরম এক কাপ চা মন্দ লাগবে না!

আচ্ছা দিন, বিমলবাবু বলে, আপনার request মানে অনুরোধ।

শঙ্কর বিমলবাবুকে এক কাপ চা ঢেলে দিল। চায়ের কাপে বেশ আরাম করে চুমুক দিতে দিতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিমলবাবু শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তা আপনার সে বন্ধুটির নাম কী?

নাম কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়! কোন্ কিরীটী রায়? বর্মার বিখ্যাত দস্যু 'কালো ভ্রমর' প্রভৃতির যিনি রহস্য ভেদ করেছিলেন?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের নাম হয়েছে বটে। কবে আসবেন তিনি ?

আজই তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু এল না তো দেখছি। কাল হয়ত আসবে।

এমন সময় বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

বাস এসে গেছে।

বাস মানে একটা কম্পার্টমেণ্ট এঞ্জিন টেনে নিয়ে যায়।

চা পান শেষ করে দাম চুকিয়ে দিয়ে দুজনে বাসে এসে উঠে বসল।

অল্পক্ষণ বাদেই বাস ছেড়ে দিল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কুয়াশার আবরণের নীচে যেন কুঁকড়ে জমাট বেঁধে আছে।

খোলা জানালাপথে শীতের হিমশীতল হাওয়া হু-হু করে এসে যেন সর্বাঙ্গ অসাড় করে দিয়ে যায়। এতগুলো গরম জামাতেও যেন মানতে চায় না। দুজনে পাশাপাশি বসে চুপচাপ।

কাতরাসগড় ও তেঁতুলিয়া হল্টের মাঝামাঝি হচ্ছে ওদের গন্তব্য স্থান।

কাতরাসগড় স্টেশনে নেমে সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় বেশ খানিকটা পথ।

রাত্রি প্রায় তিনটের সময় গাড়ি এসে কাতরাসগড় স্টেশনে থামল।

অদূরে স্টেশন ঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা উঁকি দিচ্ছে।

একটা সাঁওতাল কুলি এদের অপেক্ষায় বসে ছিল।

তার মাথায় সুটকেস ও বিছানাটা চাপিয়ে একটা বেবী পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে ওরা রওনা হয়ে পড়ল।

নিঝুম নিস্তব্ধ কনকনে শীতের রাত্রি।

আগে বিমলবাবু এগিয়ে চলেছে, হাতে তাঁর আলো, চলার তালে দুলছে।

আলোর একঘেয়ে সোঁ সোঁ আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধ প্রান্তরে মৌনতা ভঙ্গ করছে। মাঝে মাঝে এক-একটা দমকা হাওয়া হু-হু করে বয়ে যায়।

মাঝখানে শঙ্কর। সবার পিছনে মোটঘাট মাথায় নিয়ে সাঁওতালটা।

একপ্রকার ঝোঁকের মাথায়ই শঙ্কর এই কাজে এগিয়ে এসেছে। চিরদিন বেপরোয়া জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। এ দুনিয়ায় ভয়ডর বলে কোন কিছু কোন প্রকার বিপদ-আপদ তাকে পিছনটান দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি। সংসারে একমাত্র বুড়ী পিসিমা। আপনার বলতে আর কেউ নেই। কেই বা বাধা দেবে ?

বিমলবাবুর মুখ থেকেই শোনে কলিয়ারীর ইতিহাসটা শঙ্কর। বছর-দুই আগে কাতরাসগড় ও তেঁতুলিয়ার মাঝামাঝি একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে পূর্ববঙ্গের এক ধনী-

পুত্র কলিয়ারী করবার ইচ্ছায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু এক মাস যেতে-না-যেতেই ম্যানেজার রামহরিবাবু একান্ত আশ্চর্যভাবে তাঁর কোয়ার্টারে একরাত্রে নিহত হন। দ্বিতীয় ম্যানেজার বিনয়বাবু কিছুদিন বাদে কাজে বহাল হন। দিন পনের যেতে-না-যেতে তিনিও নিহত হন। তারপর এলেন সুশান্তবাবু, তাঁরও ঐ একই ভাবে মৃত্যু ঘটল। পুলিস ও অন্যান্য সবাই শত চেষ্টাতেও কে বা কারা যে এঁদের এমন করে খুন করে গেল তার সন্ধান করতে পারলে না। তিন-তিনবারই একটি কুলি বা কর্মচারী নিহত হয়নি, তিনবারই ম্যানেজার নিহত হল। মৃত্যুও ভয়ঙ্কর। কে যেন ভীষণভাবে গলা টিপে হতভাগ্য ম্যানেজারের মৃত্যু ঘটিয়েছে, গলার দু'পাশে দুটি মোটা দাগ এবং গলার পিছন দিকে চারটি কালো কালো গোল ছিদ্র।

শঙ্কর যেখানে কাজ করছিল সেখানকার বড়বাবুর কাছে ব্যাপারটা শুনে একান্ত কৌতূহলবশেই নিজে অ্যাপ্লিকেশন করে কাজটা সে নিয়েছে চার মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে।

এখানে রওনা হবার আগের দিন কিরীটীকে একটা চিঠিতে আগাগোড়া সকল ব্যাপার জানিয়ে আসবার জন্য লিখে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু এই নিষুতি রাতে নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে চলতে চলতে মনটা কেমন উন্মনা হয়ে যায়, কে জানে এমনি করে নিশ্চিত মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাল করল কি মন্দ করল!

অদূরে একটা কুকুর নৈশ স্তব্ধতাকে সজাগ করে ডেকে উঠল।

ওরা এগিয়ে চলে।

॥ দুই ॥

ভয়ঙ্কর চারটি কালো ছিদ্র

শঙ্কর সেন কিরীটীর কলেজের বন্ধু, একই কলেজ থেকে ওরা বি. এস্-সি. পাস করেছিল।

রসায়নে এম. এস্-সি. পাস করে শঙ্কর মামার বন্ধুর কলিয়ারীতে কাজ নিয়ে চলে যায়। সেও দীর্ঘ পাঁচ বছরের কথা। কিরীটী তার আগেই রহস্যভেদের জালে পাক খেতে খেতে এগিয়ে গেছে অনেকটা। বছর-দুই আগে কলকাতায় দুজনের একবার ইস্টারের ছুটিতে দেখা হয়েছিল।

তারপর কেউ কারও সংবাদ পায়নি। হঠাৎ শঙ্করের চিঠি পেয়ে কিরীটী বেশ খুশীই হল।

জংলীকে ডেকে সব গোছগাছ করতে বলে দিল।

পরের দিন তুফান মেলে যাবে সব ঠিক, এমন সময় সুব্রত এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

একতলার ঘরে জংলীকে সব গোছগাছ করতে দেখে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি জংলী?

বাবু কাতরাসগড় চলেছেন।

হঠাৎ?

কী জানি বাবু! আপনাদের কয় বন্ধুর কি মাথার ঠিক আছে? বর্মা, লঙ্কা, হিল্লী-দিল্লীতে আপনারা লাফালাফি করতেই আছেন।

সুব্রত হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিল। সুব্রতর পায়ের শব্দে মুদিত চোখেই বললে:

কিবা প্রয়োজনে
এ অকিঞ্চনে
করিলে স্মরণ?

সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দিল:

আসি নাই সন্ধি হেতু,
ফাটাফাটি রক্তারক্তি
খুনোখুনি,
যাহা হয় কিছু!
পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি;
জংলীরে সাথে লয়ে
কোথায় চলেছ;
দিয়ে অভাগা আমারে ফাঁকি?

কিরীটী বললে:

করিয়াছি মন
সুদূর কাতরাসগড়
বারেক আসিব ঘুরি।

নে নে, থামা বাবা তোর কবিতা। সত্যি, হঠাৎ কাতরাসগড় চলেছিস কেন?

কিরীটী সোফার ওপরে সোজা হয়ে বসে, হাতের প্রায়-নিভন্ত সিগারটা অ্যাসট্রেতে ফেলে বললে, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড।

অর্থাৎ ?

শোন্। কাতরাসগড় ও তেঁতুলিয়া হল্টের মাঝামাঝি একটা কোল্‌ফিল্ড আছে। সেটার মালিক পূর্ববঙ্গের কোন এক যুবক জমিদার-নন্দন।

তারপর ?

কলিয়ারী স্টার্ট করা হয়েছে; অর্থাৎ তোমার কলিয়ারীর গোড়াপত্তন আরম্ভ করা হয়েছে মাস দুই হল।

থামছিস কেন, বল না—

কিন্তু মাস দুয়ের মধ্যে তিন-তিনটে ম্যানেজার খুন হয়েছেন।

তার মানে!

আরে সেই মানেই তো solve করতে হবে।

বুঝলাম। তা কী করে ম্যানেজার তিনজন মারা গেলেন ?

ময়না-তদন্তে জানা গেছে তাঁদের গলা টিপে মারা হয়েছে এবং গলার পিছন দিকে মারাত্মক রকমের চারটি করে ছিদ্র দেখতে পাওয়া গেছে। তাছাড়া অন্য কোন দাগ বা কোন ক্ষত পর্যন্ত নেই।

শরীরের অন্য কোন জায়গায়ও না ?

না, তাও নেই।

আশ্চর্য!

তা আশ্চর্যই বটে। সত্যিই আশ্চর্য সেই চারটি কালো ছিদ্র। এবারকার নতুন ম্যানেজার হচ্ছেন আমারই কলেজ ফ্রেণ্ড শঙ্কর সেন। সেও তোমার মতই গোঁয়ার-গোবিন্দ ও একজন পাকা অ্যাথলেট্। সে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে আমায় সেখানে যেতে লিখেছে।

দেখ্, কিরীটী, সুব্রত বললে, একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।

যথা!

এবারকার রহস্যের কিনারার ভারটা আমার ওপরে ছেড়ে দে। এতদিন তোমার সাকরেদি করলাম, দেখি পারি কিংবা হারি-হরি।

বেশ তো। আমার সঙ্গেই চল্ না।

না। তা হবে না। পুরোপুরি আমার হাতেই সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে তুই মাথা দিতে পারবি না।

পুরাতন কলেজ ফ্রেণ্ড! যদি অসন্তুষ্ট হয় ?

কেন ? অসন্তুষ্ট হবেন কেন ? আমি হালে পানি না পাই তবে না-হয় তুই অবতীর্ণ হবি।

কিন্তু তখন যদি সময় আর না থাকে, বিশেষ করে একজনের জীবনমরণ যেখানে নির্ভর করছে।

সব বুঝি কিরীটী। তার নিয়তি যদি ঐ কলিয়ারীতেই থাকে তবে কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তুই আমি তো কোন্ কথা, স্বয়ং ভগবানও পারবে না।

তা বটে। তা বেশ, তুই তাহলে কাল রওনা হয়ে যা। শঙ্করকে একটা চিঠি ড্রপ করে দেব সমস্ত ব্যাপার খুলে লিখে।

হ্যাঁ। তাই দে। ভয় নেই কিরীটী, সুব্রত রায়কে তুই এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস, বুদ্ধির খেলায় না পারি দেহের সবটুকু শক্তি দিয়েও তাকে প্রাণপণে আগলাবই।

দেহের শক্তিতে সেও কম যায় না সুব্রত। একটু গোলমাল ঠেকলেই কিন্তু তুই আমায় খবর দিস ভাই। অবিশ্যি চিঠি থেকে যতটুকু ধরতে পেরেছি তাতে ব্যাপারটা যে খুব জটিল তা মনে হয় না। এক কাজ করিস তুই, বরং প্রত্যেক দিন কতদূর এগুলি বিশদভাবে আমায় চিঠি লিখে জানাস, কেমন?

বেশ, সেই কথাই রইল।

॥ তিন ॥

মানুষ না ভূত

কোল্‌ফিল্ডটা প্রায় উনিশ-কুড়ি বিঘে জমি নিয়ে।

ধু-ধু প্রান্তর। তার মাঝে একপাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে কুলিবস্তি বসানো হয়েছে। টেমপোরারী সব টালি ও টিনের সেড্ তুলে ছোট ছোট খুপরী তোলা হয়েছে। কোন-কোনটার ভিতর থেকে আলোর কম্পিত শিখার মৃদু আভাস পাওয়া যায়। অল্প দূরে পাকা গাঁথনী ও উপরে টালির সেড্ দিয়ে ম্যানেজারের ঘর তোলা হয়েছে এবং প্রায় একই ধরনের আর দুটি কুঠি ঠিকাদার ও সরকারের জন্য করা হয়েছে। ম্যানেজারের কোয়ার্টার এতদিন তালাবন্ধই ছিল। বিমলবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দেয়।

কোয়ার্টারের মধ্যে সর্বসমেত তিনখানি ঘর, একখানি রান্নাঘর ও বাথরুম।

মাঝখানে ছোট একটি উঠোন। দক্ষিণের দিকে বড় ঘরটায় একটা কুলি একটা ছাপর খাটের ওপরে শঙ্করের শয্যা খুলে বিছিয়ে দিল।

আচ্ছা আপনি তা হলে হাতমুখ ধুয়ে নিন স্যার। ঠাকুরকে দিয়ে আপনার জন্য

লুচি ভাজিয়ে রেখে দিয়েছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। বংশী এখানে রইল।

বিমলবাবু নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

শঙ্কর শয্যার ওপরে গা ঢেলে দিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।

কিন্তু কুয়াশার আবছায়ায় কিছু বোঝবার জো নেই।

একটু বাদে বিমলবাবুর ঠাকুর লুচি ও গরম দুধ দিয়ে গেল। দু-চারটে লুচি খেয়ে দুধটুকু এক ঢোকে শেষ করে শঙ্কর ভাল করে পালকের লেপটা গায়ে চাপিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন বিমলবাবুর ডাকে ঘুম ভেঙে শঙ্কর দরজা খুলে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের অরুণ রাগ তখন ঝিলিক হানছে।

সারাটা দিন কাজকর্ম দেখেশুনে নিতেই চলে গেল।

বিকেলের দিকে সুব্রত এসে পৌঁছল।

কিরীটী তার হাতে একটা চিঠি দিয়েছিল।

সুব্রতর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শঙ্কর বেশ খুশীই হল।

তারও দিন দুই পরের কথা।

এ দুটো দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে আবশ্যকীয় কয়েকটা কাগজপত্র শঙ্কর টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বসে দেখছে।

সুব্রত বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

শঙ্কর উৎকর্ণ হয়ে উঠল, কে?

আমি স্যার। চন্দন সিং।

ভিতরে এস চন্দন।

চন্দন সিং অল্প বয়সের পাঞ্জাবী যুবক।

এই কলিয়ারীতে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজে বহাল হয়েছে।

কি খবর চন্দন সিং?

আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

কই না! কে বললে? কতকটা আশ্চর্য হয়েই শঙ্কর প্রশ্ন করলে।

বিমলবাবু অর্থাৎ সরকার মশাই বললেন।

বিমলবাবু বললেন! তারপর সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। বস ঐ চেয়ারটায়। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

চন্দন সিং একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল।

এখানকার চাকরি তোমার কেমন লাগছে চন্দন?

পেটের ধান্ধায় চাকরি করতে এসেছি স্যার, আমাদের পেট ভরলেই হল স্যার।

না, তা ঠিক বলছি না। এই যে পর পর দুজন ম্যানেজার এমনিভাবে নিহত হলেন—

সহসা চন্দন সিংয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়তে শঙ্কর চমকে উঠল। চন্দনের সমগ্র মুখখানি ব্যেপে যেন একটা ভয়াবহ আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। কিন্তু চন্দন সিং সেটা সামলে নিল।

শঙ্কর বলতে লাগল, তোমার কী মনে হয় সে সম্পর্কে?

চন্দন সিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন কী একটা কিছু বেচারী প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চায়।

তুমি কিছু বলবে চন্দন?

সোৎসুকভাবে শঙ্কর চন্দন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা যদি বলি, অসন্তুষ্ট হবেন না তো স্যার?

না, না—বল কি কথা।

আপনি চলে যান স্যার। এ চাকরি করবেন না।

কেন? হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন?

না স্যার, চলে যান আপনি। এখানে কারও ভাল হতে পারে না।

ব্যাপার কি চন্দন? এ বিষয়ে তুমি কি কিছু জান? টের পেয়েছ কিছু?

ভূত!…আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ভূত!

হ্যাঁ। অত বড় দেহ কোন মানুষের হতে পারে না।

আমাকে সব কথা খুলে বল চন্দন সিং।

আপনার আগের ম্যানেজার সুশান্তবাবু মারা যাবার দিন দুই আগে বেড়াতে বেড়াতে পশ্চিমের মাঠের দিকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিকে অস্পষ্ট আঁধার, হঠাৎ মনে হল পাশ দিয়ে যেন ঝড়ের মত কী একটা সন্‌সন্‌ করে হেঁটে চলে গেল। চেয়ে দেখি লম্বায় প্রায় হাত পাঁচ-ছয় হবে। আগাগোড়া সর্বাঙ্গ একটা বাদামী রংয়ের আলখাল্লায় ঢাকা।

সেই অস্বাভাবিক লম্বা মূর্তিটা কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একটা পৈশাচিক অট্টহাসি শুনতে পেলাম। উঃ! সে হাসি মানুষের হতে পারে না।

তারপর ?

তার পরের পরদিনই সুশান্তবাবুও মারা যান। শুধু আমিই নয়, সুশান্তবাবুও মরবার আগের দিন সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি নিজেও দেখেছিলেন।

কি রকম ?

রাত্রি প্রায় বারটার সময়—সে রাতে কুয়াশার মাঝে পরিষ্কার না হলেও অল্প অল্প চাঁদের আলো ছিল—রাত্রে বাথরুমে যাবার জন্য উঠেছিলেন, হঠাৎ ঘরের পিছনে একটা খুকখুক কাশির শব্দ পেয়ে কৌতূহলবশে জানলা খুলতেই দেখলেন, সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি মাঠের মাঝখান দিয়ে ঝড়ের মত হেঁটে যাচ্ছে।

সে মূর্তি আমি আজ স্বচক্ষে দেখলাম শঙ্করবাবু। দুজনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে বক্তা সুব্রত। সে এর মধ্যে কখন একসময়ে ফিরে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

॥ চার ॥

আঁধারে বাঘের ডাক

কী দেখেছেন ?

ভূত! চন্দনবাবুর ভূত! সুব্রত একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে। তারপর চন্দন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বুঝি আমাদের শঙ্করবাবুর অ্যাসিস্টেন্ট ?

চন্দন সিং সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় হেলাল।

এখানকার ঠিকাদার কে চন্দনবাবু ?

ছট্টুলাল।

তার সঙ্গে একটিবার আলাপ করতে চাই। কাল একটিবার দয়া করে যদি পাঠিয়ে দেন তাকে সন্ধ্যার দিকে।

দেব, নিশ্চয়ই দেব।

আচ্ছা চন্দনবাবু, আপনাকে কটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন না ?

সে কি কথা! নিশ্চয়ই না। বলুন কি কথা ?

আমি শঙ্করবাবুর বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছি, জানেন তো ?

জানি।

কিন্তু এখানে পৌঁছে ওঁর আগেকার ম্যানেজারের সম্পর্কে যে কথা শুনলাম, তাতে বেশ ভয়ই হয়েছে আমার।

নিশ্চয়ই, এ তো স্বাভাবিক। আমি ওঁকে বলছিলাম এখানকার কাজে ইস্তফা দিতে। আমার মনে হয় ওঁর পক্ষে এ জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয়।

আমারও তাই মত। সুব্রত চিন্তিতভাবে বললে।

কি বলছেন সুব্রতবাবু?

হ্যাঁ—ঠিকই বলছি—

কিন্তু স্রেফ একটা গাঁজাখুরি কথার ওপরে ভিত্তি করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমার মন কিন্তু মোটেই সায় দেয় না। বরং শেষ পর্যন্ত দেখে তবে এ জায়গা থেকে নড়ব—তাই আমার ইচ্ছে সুব্রতবাবু। শঙ্কর বললে।

বড় রকমের একটা বিপদ-আপদ যদি ঘটে এর মধ্যে শঙ্করবাবু?···অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার, কখন কি হয় বলা তো যায় না!

যে বিপদ এখনও আসেনি, ভবিষ্যতে আসতে পারে, তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে থাকব এই বা কোন্ দেশী যুক্তি আপনাদের? শঙ্কর বললে।

যুক্তি হয়ত নেই শঙ্করবাবু, কিন্তু অ-যুক্তিটাই বা কোথায় পাচ্ছেন এর মধ্যে! সুব্রত বলে।

কিন্তু, চন্দন সিং বলে, শুনুন, শুধু যে ঐ ভীষণ মূর্তি দেখেছি তাই নয় স্যার, মাঝে মাঝে গভীর রাতে কী অদ্ভুত শব্দ, কান্নার আওয়াজ মাঠের দিক থেকে শোনা যায়! এ ফিল্ডটা অভিশাপে ভরা।···কেউ বাঁচতে পারে না। বাঁচা অসম্ভব। গত তিনবার ম্যানেজার বাবুদের ওপর দিয়ে গেছে—কে বলতে পারে এর পরের বার অন্য সকলের ওপর দিয়ে যাবে না!

সে রাত্রে বহুক্ষণ তিনজনে নানা কথাবার্তা হল।

চন্দন সিং যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, রাত্রি তখন সাড়ে দশটা হবে।

শঙ্কর একই ঘরে দু'পাশে দুটো খাট পেতে নিজের ও সুব্রতর শোবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

শঙ্করের ঘুমটা চিরদিনই একটু বেশী। শয্যায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নাক ডাকতে শুরু করে দেয়।

আজও সে শয্যায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

সুব্রত বেশ করে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে মাথার কাছে একটা টুলের ওপরে টেবিল-ল্যাম্পটা বসিয়ে তার আলোয় কিরীটীকে চিঠি লিখতে বসল।

কিরীটী,

কাল তোকে এসে পৌঁছানোর সংবাদ দিয়েছি। আজ এখানকার আশপাশ অনেকটা ঘুরে এলাম। ধু-ধু মাঠ, যেদিকে তাকাও জনহীন নিস্তব্ধতা, যেন চারিদিকে প্রকৃতির কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে।

বহুদূরে কালো কালো পাহাড়ের ইশারা, প্রকৃতির বুক ছুঁয়ে যেন মাটির ঠাণ্ডা পরশ নিচ্ছে। বর্তমানে যেখানে এদের কোল্‌ফিল্ড বসেছে তারই মাইল খানেক দূরে বহুকাল আগে একসময় একটা কোল্‌ফিল্ড ছিল। আকস্মিকভাবে এক রাত্রে সে খনিটা নাকি ধ্বসে মাটির বুকে বসে যায়। এখনও মাঝে মাঝে বড় বড় গর্তমত আছে। রাতের অন্ধকারে সেই গর্তর মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বের হয়।

অভিশপ্ত খনির বুকে দুর্জয় আক্রোশ এখনও যেন লেলিহান অগ্নিশিখায় আত্মপ্রকাশ করে। আজ সন্ধ্যার দিকে বেড়িয়ে ফিরছি ; অন্ধকার চারিদিকে বেশ ঘনিয়ে এসেছে, সহসা পিছনে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে চমকে পিছনপানে ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য ! কেউ যে এত লম্বা হতে পারে ইতিপূর্বে আমার ধারণা ছিল না।

লম্বায় প্রায় ছ হাত হবে। যেমন উঁচু লম্বা, তেমনি মনে হয় যেন বলিষ্ঠ গঠন। আগাগোড়া একটা ধূসর কাপড় মুড়ি দিয়ে হনহন করে যেন একটা ঝোড়ো হাওয়ার মত আমার পাশ দিয়ে হেঁটে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঠের অপর প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

আমি নির্বাক হয়ে সেই অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত বাঘের ডাক কানে এসে বাজল।

এত কাছাকাছি মনে হল—যেন আশেপাশে কোথায় বাঘটা ওৎ পেতে শিকারের আশায় বসে আছে।

তুই হয়ত বলবি আমার শোনবার ভুল, কিন্তু পর পর তিনবার স্পষ্ট বাঘের ডাক আমি শুনেছি।

তাছাড়া তুই তো জানিস সাহস আমার নেহাত কম নয়, কিন্তু সেই সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তরের মাঝে গুরুগম্ভীর সেই শার্দুলের ডাকে আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন অকস্মাৎ সিরসির করে উঠল। দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম বাসায় ফেরবার জন্য।

চিঠিটা এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে, এমন সময় রাতের নিস্তব্ধ আঁধারের বুকখানা ছিন্ন-ভিন্ন করে এক ক্ষুধিত শার্দুলের ডাক জেগে উঠল।

একবার, দুবার, তিনবার।

সুব্রত চমকে শয্যা থেকে লাফিয়ে নীচে নামল।

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ধাক্কা লেগে টেবিল-ল্যাম্পটা মাটিতে ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আলোর চিমনিটা ভাঙার ঝনঝন শব্দে ততক্ষণে শঙ্করের ঘুমটাও ভেঙে গেছে।

ত্রস্তে শয্যার ওপরে বসে চকিত স্বরে প্রশ্ন করলে, কে?

শঙ্করবাবু, আমি সুব্রত।

সুব্রতবাবু!

হ্যাঁ। ধাক্কা লেগে আলোটা ছিটকে পড়ে ভেঙে নিভে গেল।

বাইরে একটা চাপা অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ কানে এসে বাজে।

অনেকগুলো লোকের মিলিত এলোমেলো কণ্ঠস্বর রাতের নিস্তব্ধতায় যেন একটা শব্দের ঘূর্ণাবর্ত তুলেছে।

বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না, সুব্রতবাবু?

হ্যাঁ।

কিসের গোলমাল?

বুঝতে পারছি না, তবে যতদূর মনে হয় গোলমালটা কুলিবস্তির দিক থেকে আসছে, সুব্রত বললে। চলুন, একবার খবর নেওয়া যাক।

বেশ, চলুন।

দুজনে দুটো লং কোট গায়ে চাপিয়ে মাথায় উলের নাইট-ক্যাপ পরে দুটো টর্চ হাতে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হল।

গোলমালটা ক্রমে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘরের দরজা খুলে সুব্রত বেরুতে যাবে, এমন সময় আকাশ-পাতাল-ফাটানো একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন রাত্রির আঁধারকে যেন ফালি ফালি করে জেগে উঠল আবার অকস্মাৎ।

এবং এবারেও একবার, দুবার, তিনবার।

সুব্রতর সমস্ত শরীর লোহার মত শক্ত ও কঠিন, মনের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সজাগ হয়ে উঠেছে।

শঙ্কর ঘরের মাঝখানে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সহসা একটা তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে একেবারে অসাড় ও পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা কারও মুখে কোন কথাই নেই। কিন্তু সহসা সুব্রত যেন ভিতর থেকে প্রবল একটা ধাক্কা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠে এক ঝটকায় ঘরের খিল খুলে ফেলে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় টর্চটা জেলে লাফিয়ে পড়ল।

আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা বোধ হয় ঘটতে কুড়ি সেকেণ্ডও লাগেনি।

সুব্রতকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে প্রথমটা শঙ্কর বেশ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই সেও সুব্রতকে অনুসরণ করলে।

বাইরের অন্ধকার বেশ ঘন ও জমাট। সুব্রতর হাতের টর্চের তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চারিদিকে ঘুরে এল; কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

বাঘ তো দূরের কথা, একটা পাখী পর্যন্ত নেই!

ততক্ষণে শঙ্করও সুব্রতর পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বাঘের ডাক তো স্পষ্ট শোনা গেছে।

তবে?

বুঝতে পারছি না, সত্যি সত্যিই এ কি তবে ভৌতিক ব্যাপার!

বলতে বলতে শঙ্কর আবার হাতের টর্চের বোতামটা টেপে। মাঠের মাঝখানে কুলি-বস্তি ও কলিয়ারীতে যাবার পথে কতকগুলি কাটজুঁই ও বাবলাগাছ পড়ে। সেইদিকে শঙ্করের হাতের অনুসন্ধানী বৈদ্যুতিক বাতির রশ্মি পড়তেই দুজনে চমকে উঠল, কে? কে ওখানে?

একটা কালো মূর্তি। তার গায়ে সাদা সাদা ডোরা কাটা।

চকিতে সুব্রত কোমরবন্ধ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা টেনে বের করলে এবং চাপা গলায় বললে, ওই দেখুন বাঘ! সরে যান, গুলি করি।

শেষের কথাগুলো উত্তেজনায় যেন বেশ তীক্ষ্ণ সজোরে সুব্রতর কণ্ঠ ফুটে বের হয়ে এল।

স্যার আমি। গুলি করবেন না স্যার। ইয়োর মোস্ট ফেইথফুল অ্যাণ্ড ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।

একটা চাপা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল।

কে?

আমি বিমল দে। কলিয়ারীর সরকার।

বিমলবাবু! শঙ্করের বিস্মিত কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল।

দুজনে এগিয়ে গেল।

শঙ্কর বিমলবাবুর গায়ের ওপরে টর্চের আলো ফেলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এত রাত্রে এখানে এই শীতে মাঠের মধ্যে কি করছিলেন?

আগাগোড়া একটা সাদা ডোরা-কাটা ভারী কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে বিমলবাবু সামনে দাঁড়িয়ে···

আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম স্যার।

আমার কাছে যাচ্ছিলেন! শঙ্কর প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ। কুলি-ধাওড়ায় একটা লোক খুন হয়েছে।

খুন হয়েছে!…সুব্রত চমকে উঠল।

হ্যাঁ বাবু, খুন হয়েছে।

গোলমালটা তখন বেশ সুস্পষ্টভাবে কানে এসে বাজছে।

চলুন, দেখে আসা যাক।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বললে।

আগে শঙ্কর, মাঝখানে বিমলবাবু ও সর্বশেষে সুব্রত টর্চের আলো ফেলে কুলিবস্তির দিকে এগিয়ে চলল।

মাথার উপরে তারায় ভরা রহস্যময়ী অন্ধকার রাতের আকাশ কী যেন এক ভৌতিক বিভীষিকার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

আজ রাতে কুয়াশার লেশমাত্র নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ পাঁচ ॥

আবার ভয়ঙ্কর চারটি ছিদ্র

সকলেই নির্বাক। কারও মুখে কোন কথা নেই। শুধু রাতের স্তব্ধ মৌনতার বুকে জেগে উঠেছে কতকগুলো ভয়ার্ত লোকের একটানা গোলমালের এলোমেলো একটা ক্রম-বর্ধমান শব্দের রেশ।

সহসা সুব্রত কথা বললে, আপনার কোয়ার্টারটা কোথায় বিমলবাবু?

কেন, এখানেই তো থাকি।

এখানেই মানে? কোথায়? মানে লোকেশানটা চাচ্ছি!

কুলীদের ধাওড়ার লাগোয়া। আমি আর রেজিং-বাবু একই ঘরে থাকি।

আপনাদের রেজিং-বাবুর নাম কি?

রামলোচন পোদ্দার।

তিনি কোথায়?

তিনি ধাওড়ার দিকে গেছেন।

গোলমাল শোনবার আগে ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি?

না। রামলোচনবাবু ঘুমোচ্ছিলেন ;—আমি জেগে বসে হিসাবপত্র দেখছিলাম।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণ তারা কোল্‌ফিল্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অদূরে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে চানকের উপরের চাকাটা দেখা যাচ্ছে।

চারিদিকে একটা থমথমে ভাব এবং সেই থমথমে প্রকৃতির বুকে একটা অস্পষ্ট গোলমালের স্বর কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হয়।

ধাওড়ায় তখন সাঁওতাল পুরুষ ও কামিন সকলেই প্রায় এক জায়গায় ভিড় করে মৃদু গুঞ্জনে জটলা পাকাচ্ছে। শঙ্করকে দেখে সকলে ভিড় ছেড়ে সরে দাঁড়াতে লাগল।

একটা ঘরের দরজার সামনে সকলে এসে দাঁড়াল।

একটা বলিষ্ঠ চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সাঁওতাল যুবক চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

সামনেই একটা কেরোসিনের ল্যাম্প দপ্ দপ্ করে জ্বলছে প্রচুর ধূম উদ্‌গিরণ করে।

প্রদীপের লাল আলোর মলিন আভা মৃত সাঁওতাল যুবকের মুখের উপরে প্রতিফলিত হয়ে মৃতের মুখখানাকে যেন আরও বীভৎস, আরও ভয়ংকর করে তুলেছে।

মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুলগুলো এলোমেলো। গোল গোল বড় বড় চোখের মণি দুটো যেন চক্ষুকোটর থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিভটা খানিকটা বের হয়ে এসেছে মুখ-বিবর থেকে। সমগ্র মুখখানিব্যাপী একটা ভয়াবহ বিভীষিকা ফুটে উঠেছে।

সুব্রত মৃতের মুখের ওপরে শক্তিশালী টর্চের উজ্জ্বল আলো ফেলল।

অত্যুজ্জ্বল আলোয় মৃত ব্যক্তির গলার দিকে নজর পড়তেই সুব্রত চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি প্রখর করে দেখতে লাগল।

গলার দু'পাশে আঙুলের দাগ যেন চেপে বসে গেছে।

নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখলে, কোথাও আর শ্বাসপ্রশ্বাসের লেশমাত্র নেই।

অনেকক্ষণ মারা গেছে। হিমকঠিন অসাড়।

টর্চের আলোয় মৃতদেহটাকে সুব্রত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মৃতদেহটিকে উপুড় করে দিতেই ও লক্ষ্য করল রক্তে কালো কালো চারটি ছিদ্র ঘাড়ের দিকে যেন কি এক বিভীষিকায় ফুটে উঠেছে। মনে হয় যেন কোন তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়ে পাশাপাশি পর পর চারটি ছিদ্র করা হয়েছে।

শঙ্কর প্রশ্ন করলে, কী দেখছেন সুব্রতবাবু? উঠে আসুন!

সুব্রত টর্চটা নিভিয়ে দিল, হ্যাঁ, চলুন। কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু!

সকলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ চাঁদের একটুকরো জেগে উঠেছে যেন বাঁকানো

ছোরা একখানি। সহসা কে এক নারী আলুলায়িতা কুন্তলা, পাগলিনীর মতই শঙ্কর-বাবুর পায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, বাবু রে হামার কি হল রে—

সকলে চমকে উঠল।

একজন বৃদ্ধগোছের সাঁওতাল এগিয়ে এল, ওঠ্ সোহাগী। কী করবি বল্—

কে এই মেয়েটি বিমলবাবু? শঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন।

ঝণ্টুর ইস্ত্রি বাবু। সোহাগী।

কে ঝণ্টু?

যে লোকটা মারা গেছে।

তুই এখন যা সোহাগী।...তোর একটা ব্যবস্থা করে দিব রে। শঙ্কর বলে। সান্ত্বনা দেয়।

ঝণ্টুকে ছেড়ে আমি থাকতে লারব বাবু গো। ঝণ্টুকে তুই আমায় ফিরায়ে দে বাবু।

কেঁদে আর কি করবি বল্! যা ঘরে যা।

না, না। ঘরকে আমি যাব না রে। ঘর আমার আঁধার হয়ে গেল। ঝণ্টু আমার নাই রে। ওরে ঝণ্টু রে।

চুপ কর্। সোহাগী, চুপ কর্।

সহসা বিমলবাবু প্রচণ্ড বেগে ধমক দিয়ে উঠলেন, এই মাগী, থাম্। ভূতে তোর স্বামীকে খুন করেছে, তার ম্যানেজার বাবু কি করবে! যা ওঠ্ ওঠ্। যত সব নচ্ছার বদমায়েস এসে জুটেছে। যা, ভাগ। যা। অন্ধকার রাতে আনমনে পথ চলতে চলতে সহসা একটা তীব্র আলোর ঝাপটা মুখে এসে পড়লে পথিক যেমন ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সোহাগীও তেমনি সহসা যেন তার সকল শোক ভুলে মুহূর্তের জন্য মৌন বাক-হারা হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পায়ে পায়ে পিছন হেঁটে সরে যেতে লাগল।

চলুন ম্যানেজার বাবু। ওদিকে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। পুলিসে খবর দিতে হবে, লাশ ময়নাতদন্তে যাবে। যত সব হাঙ্গামা। পোষাবে না বাপু এখানে আর আমার চাকরি করা। ভূতের আড্ডা। কে জানে কবে হয়ত আবার আমারই ওপরে চড়াও হবে। বাপ মা ছেলেপিলে ছেড়ে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে প্রাণটা শেষে কি খোয়াব?

চলুন শঙ্করবাবু। কোয়ার্টারে ফেরা যাক। সুব্রত বলে।

সকলে কুলী-ধাওড়া ছেড়ে কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল। সকলেই নীরবে পথ অতিবাহিত করে চলেছে, কারও মুখে কোন কথা নেই।

পথ চলতে চলতে একসময় বিমলবাবু বলল, বলছিলাম না, এই কোলফিল্ডটা একটা পরিপূর্ণ অভিশাপ! এখানে কারও মঙ্গল নেই। কিন্তু এবারে দেখছি আপনি স্যার বেঁচে গেলেন। এর আগের বারের আক্রোশগুলো ম্যানেজারবাবুদের ওপর দিয়েই গেছে এবং আগেকার ঘটনা অনুযায়ী বিপদটা আপনার ঘাড়েই আসা উচিত ছিল। তা যাক, ভালই হল একদিক দিয়ে।

তার মানে? সহসা সুব্রত প্রশ্ন করে বসল।

বিমলবাবু যেন সুব্রতর প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মানে—মানে আর কি! ওই কুলীগুলোর জীবনের আর কী দাম আছে বলুন? ওদের দু-দশটা মরলে কী এসে গেল!

সহসা স্তব্ধ রাতের মৌনতাকে ছিন্নভিন্ন করে সোহাগীর করুণ কান্নার আকুল রেশ কানে এসে বাজল সবার। ঝণ্টু রে—তু ফিরে আয় রে। ওরে আমার ঝণ্টু রে—

সুব্রতর পায়ের গতিটুকু যেন সহসা লোহার মত ভারী হয়ে অনড় হয়ে গেল। বিমলবাবুর দিকে ফিরে শ্লেষমাখা স্বরে সে বলল, তা যা বলেছেন বিমলবাবু! দুনিয়ার আবর্জনা ওই গরীবগুলো। যাদের মরণ ছাড়া আর গতি নেই, এ সংসারে তারা মরবে বৈকি।

নিশ্চয়ই। আপনিই বলুন না, ওই জংলীগুলোর প্রাণের দাম কিই-বা আছে! বিমল বলে ওঠে।

॥ ছয় ॥

খাদে রহস্যময় মৃত্যু

বাকি রাতটুকু সুব্রতর চোখে আর ঘুম এল না। সে আবার অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা নিয়ে বসল।

কিরীটী, চিঠিটা তোর শেষ করেই রেখেছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা তোকে না লিখে পারলাম না। কুলী-ধাওড়ায় ঝণ্টু নামে এক সাঁওতাল যুবক রাত্রে খুন হয়েছে। বিমলবাবু প্রমাণ করতে চান ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভৌতিক। অর্থাৎ ভূতের কাণ্ড। তবে মৃতের গলার পিছনদিকে আগের মতই চারটি ভয়ঙ্কর কালো ছিদ্র আছে দেখলাম। আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন খুবই সহজ। জলের মতই সহজ।…তোর চিঠির প্রত্যুত্তরের আশায় রইলাম। চিঠি পেলেই

ভাবছি শ্রীমানকে পুলিসের হাতে তুলে দেব। কেননা ওই ধরনের শয়তান খুনীদের এমন সহজভাবে দশজনের সঙ্গে চলে-ফিরে বেড়াতে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? আমার, যতদূর মনে হয় আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ব্যাপারটার একটা সহজ মীমাংসা করে দিতে পারব। তোর উপস্থিতির বোধ হয় আর প্রয়োজনই হবে না। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা রইল। তোর সুব্রত।

চিঠিটা শেষ করে সুব্রত চেয়ার থেকে উঠে একটা আড়ামোড়া ভাঙল।

রাতের আকাশের বিদায়ী আঁধার দিগ্বলয়ের প্রান্তকে তখন ফিকে করে তুলছে।

সুব্রত বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

শীতের হাওয়া ঝিরঝির করে সুব্রতর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহমনকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

ঘুমোননি বুঝি সুব্রতবাবু!

শঙ্করের গলার স্বর শুনে সুব্রত ফিরে দাঁড়াল।

এই যে আপনিও উঠে পড়েছেন দেখছি! ঘুমোতে পারলেন না বুঝি?

না, ঘুম এল না। কিন্তু গত রাত্রের ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় সুব্রত বাবু?

দেখুন শঙ্করবাবু, ব্যাপারটা যে খুব কঠিন বা জটিল তা কিছু নয়, তবে এটা ঠিক যে এর আগে যে-সব খুন এখানে হয়েছে তার সমস্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে চট করে উপনীত হতে পারছি না। যতদূর মনে হয় এর পিছনে একটা দল আছে, অর্থাৎ একদল শয়তান এই ভয়ঙ্কর খুনখারাপি করে বেড়াচ্ছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, তাই। একজন লোকের ক্ষমতা নেই এত tactfully এতগুলো লোকের মধ্যে থেকে এমন পরিষ্কারভাবে খুন করে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে।

হাত-মুখ ধুয়ে চা পান করতে করতে শঙ্কর আর সুব্রত গত রাত্রের ঘটনারই আলোচনা করছিল, এমন সময় একটা কুলী ছুটতে ছুটতে এসে হাজির, বাবু গো, সর্বনাশ হয়েছে!

কি হয়েছে?

তের নম্বর 'কাঁথি'তে পিলার ধ্বসে গিয়ে কাল রাত্রে দশজন সাঁওতাল কুলী মারা গেছে।

শঙ্কর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

সর্বনাশ! এক রাত্রে দশ-দশটা লোকের একসঙ্গে মৃত্যু! কিন্তু রাত্রে তো এ মাইনে কাজ চালাবার কথা নয়! তবে? তবে কেমন করে এ দুর্ঘটনা ঘটল?

'রেজিংবাবু' কোথায় রে টুইলা? শঙ্কর কুলীটাকে প্রশ্ন করল।

রেজিং-বাবু তো ওধারপানেই আসতেছে দেখলুম বাবু।···দেখা গেল সামনের অপ্রশস্ত কাঁচা কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তাটা ধরে একপ্রকার দৌড়তে দৌড়তে রামলোচন পোদ্দার আসছে। রামলোচনবাবু এসে শঙ্করের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মোটাসোটা চর্বিবহুল নাদুসনুদুস চেহারাখানি, পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট ও খাকি হাফ শার্ট। ঠোঁটের ওপরে বেশ একজোড়া পাকানো গোঁফ। মাথায় সুবিস্তীর্ণ টাক চক্‌চক্ করে। বয়েস বোধ করি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

এ কি শুনছি রামলোচনবাবু?

সর্বনাশ হয়ে গেছে, ঠিকই শুনেছেন স্যার—একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই খনি বুঝি আর চালানো গেল না।

সব খুলে বলুন!

কাল রাত্রে ১৩নং কাঁথিতে পিলার ধ্বসে গিয়ে দশজন কুলী চাপা পড়ে মারা গেছে।

কাল রাত্রে মানে? অর্থাৎ আপনি বলতে চান রাত্রিতে কাল কয়লাখনিতে কাজ হচ্ছিল?

আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না! তার মানে? এই তো বললেন কাল রাত্রে ১৩নং কাঁথিতে দশজন মারা গেছে!

আজ্ঞে তা তো গেছেই—

খনিতে কয়লা কাটার কাজ না থাকলে কেন তারা সেখানে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই খনির মধ্যে লুকোচুরি খেলতে নয়! এ খনির নিয়ম কি? পাঁচটার মধ্যে খনির সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় তো? রাত্রে কোন কাজ হয় না?

আজ্ঞে।

তবে তারা রাত্রে খনির মধ্যে কি করে গেল? 'চানক' সন্ধ্যা পাঁচটার পর খাদে আর লোক নামায় না তো?

না, তা নামায় না। এবং রাত্রি সাতটা পর্যন্ত চানক খোলা থাকে খাদের লোক শুধু ওঠাবার জন্য।

এমনও তো হতে পারে শঙ্করবাবু, সেই দশটি লোক গত রাত্রে খাদ থেকে মোটে ওঠেইনি, খাদেই ছিল? হঠাৎ সুব্রত বলে।

Impossible! খনির কুলীদের একটা লিস্ট আছে নামের। খাদে যারা নামে ও কাজশেষে খাদ থেকে উঠে আসে, নামের Registry-র সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয় তাদের নাম। এতে ভুলচুক হওয়া সম্ভব নয় সুব্রতবাবু।

কিন্তু আগে সব কিছুর খোঁজ নেওয়া দরকার শঙ্করবাবু। চলুন দেখা যাক খোঁজ নিয়ে আসলে ব্যাপারটা কি।

বেশ চলুন।

তখনি দুজন রামলোচন ও টুইলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে সুব্রত শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করল, নামের রেজিষ্ট্রি খাতা কার কাছে থাকে শঙ্করবাবু?

সরকারবাবু—আমাদের বিমলবাবুর কাছে থাকে।

তিনি তো নাম মিলিয়ে নেন?

হ্যাঁ।

তবে আগে চলুন বিমলবাবুর খোঁজটা নেওয়া যাক, তিনি হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।

চলুন।

শীতের সকাল। পথের দু'পাশের কচি দূর্বাদলগুলির গায়ে রাতের শিশির বিন্দুগুলি সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই খনির সীমানা পড়ে। ট্রাম লাইনের পাশে একটা শূন্য কয়লা গাড়ির চারদিকে একদল সাঁওতাল জটলা পাকাচ্ছে, সকলেরই মুখে একটা ভয়চকিত ভাব।

শঙ্করকে আসতে দেখে দলের মধ্যে একটা মৃদু গুনগুন ধ্বনি জেগে উঠল।

কুলীদের সর্দার রতন মাঝি এগিয়ে এল।

কি খবর মাঝি? কিছু বলবি?

আমরা আর ইখানে কাম করতে লারব বাবু।

কেন রে?

ই খনিতে ভূত আছে বাবু।

ভূত! ওসব বাজে কথা, তাছাড়া কাজ ছেড়ে দিলে খাবি কি?

কিন্তুক তুরাই বল্ কেনে বাবু, প্রাণটি হাতে লিয়ে এমনি করে কেম্‌নে কাজ করি?

চন্দন সিং ও বিমলবাবু এসে হাজির হলেন।

এই যে বিমলবাবু, কাল রেজিষ্ট্রি খাতা আপনি মিলিয়ে ছিলেন তো? শঙ্কর প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সকলে খাদ থেকে উঠে এসেছিল working hoursয়ের পরে—মানে, যারা কাল দিনের বেলায় কয়লা কাটতে খাদে নেমেছিল তারা সকলে আবার খাদ থেকে ফিরে এসেছিল তো?

তা এসেছিল বৈ কি।

তবে এই রকম দুর্ঘটনা ঘটল কি করে? সব শুনেছেন নিশ্চয়ই। চানক যে চালায় সে লোকটা কোথায়?

কে, আবদুল?

হাঁ।

সে চানকের মেসিনের কাজেই আছে।

তাকে একবার ডেকে আনুন।

বিমলবাবু আবদুলকে ডাকতে চলে গেলেন।

রতন মাঝি আবার এগিয়ে এল, বাবু, আমরা কুলিকামিনরা আজ চলে যাব রে।

তোদের কোন ভয় নেই। দুটো দিন সবুর কর্, আমি সব ঠিক করে দেব। ভূত-টুত ওসব যে একদম বাজে কথা এ আমি ধরে দেব। যা তোরা যে যার কাজে যা।

কিন্তু দেখা গেল শঙ্করের আশ্বাসবাক্যেও কেউ কাজে যাবার কোন গরজই দেখাচ্ছে না।

তু কি বলছিস বাবু, আমি বোঙার নামে 'কিরা' কেটে বলতে পারি এ খনিতে ভূত আছে।

এমন সময় বিমলবাবু অবদুল মিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন।

আবদুলকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, গত সন্ধ্যায় সে যথারীতি আটটার মধ্যেই চানক বন্ধ করে চলে গিয়েছিল এবং সে যতদূর জানে খাদে আর কেউ তখন ছিল না।

চানকের এঞ্জিনে চাবি দেওয়া থাকে না মিস্ত্রী?

জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

হাঁ সাব্।

চাবি কার কাছে থাকে?

আজ্ঞে আমার কাছেই তো।

আচ্ছা, আজ সকালে চানকের এঞ্জিনের কাছে গিয়ে এঞ্জিনে চাবি দেওয়াই দেখতে পেয়েছিলে তো?

হাঁ, সাব্।

চলুন শঙ্করবাবু, খাদের যে কাঁথিতে পিলার ধ্বসে গেছে সে জায়গাটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

বেশ, চলুন। আসুন বিমলবাবু, চল চন্দন সিং।

তখন সকলে মিলে খাদের দিকে রওনা হল।

॥ সাত ॥

নেকড়ার পুঁটলি

এক, দো, তিন !!!

কয়লা খাদের মুখে অনসেটার ঘণ্টা বাজালে, এক, দো, তিন—

ঠং ঠং ঠং।···ঘণ্টার অদ্ভুত আওয়াজ, এক দো তিন বলবার সঙ্গে সঙ্গে গম্ গম্ ঝন্ ঝন্ করে চানকের গহ্বরের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হল।

পাতালপুরীর অন্ধ-গহ্বর থেকে যেন মরণের ডাক এল—আয়! আয়! আয়!

এ যেন এক অশরীরী শব্দমুখর হাতছানি।

রেজিং-বাবু রামলোচন পোদ্দার চানকের মুখে আগে এসে দাঁড়াল।

তিন ঘণ্টার মানে মানুষ এবারে খাদে চানকের সাহায্যে নামবে তারই সংকেত।

চানকের রেলিং ঘেরা খাঁচার মত দাঁড়াবার জায়গায় শঙ্কর, রেজিং-বাবু সুব্রত, রতন মাঝি ও আরও দু'জন সর্দার গ্যাসল্যাম্প নিয়ে প্রবেশ করল।

অন্ধকার গহ্বর-পথে ঘড়ঘড় শব্দে চানক নামতে শুরু করল।

বাইরের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী যেন সহসা সামনে থেকে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল।

উপরের সুন্দর পৃথিবী যেন খাদের এই বীভৎস অন্ধকারের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে দূরে সরে গেছে।

সকলে এসে খাদের মধ্যে নামল।

কঠিন স্তব্ধ অন্ধকার। কালো কয়লার দেওয়ালে দেওয়ালে যেন মিশে এক হয়ে গেছে।

মৌন আঁধারের মধ্যে শীতটা যেন আরও জমাট বেঁধে উঠেছে। সর্দার তিনজন গ্যাসল্যাম্প হাতে এগিয়ে চলল পথপ্রদর্শক হয়ে, অন্য সকলে চলল পিছু পিছু। সম্মুখে ও আশেপাশে কালো কয়লার দেওয়ালে সামান্য যেটুকু আলো গ্যাস-ল্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তা ছাড়া চারিদিকে কঠিন মৌন অন্ধকার যেন কী এক ভৌতিক

বিভীষিকায় হাঁ করে গিলতে আসছে।

সকলের পায়ের শব্দ অন্ধকারের বুকে শুধু যেন জীবনের একমাত্র সাড়া তুলেছে। এবং মাঝে মাঝে দু-একটা কথার টুকরো তার কাটা কাটা শব্দ।

সহসা রতন মাঝি এক জায়গায় এসে দাঁড়াল।

১৩নং কাঁথিতে যাবার মেন গ্যালারী এইটাই না হে মাঝি? প্রশ্ন করলেন বিমলবাবু।

আজ্ঞে বাবু।

চালটা এখানে একটু খারাপ আছে না?

আজ্ঞে।

এখানে একটু সাবধানে আসবেন ম্যানেজারবাবু। এ পাশের লোকেশন্‌টার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখেছেন স্যার? শঙ্কর নীরবে পথ চলতে লাগল। বিমলবাবুর কথার কোন জবাব দিল না।

পথের মধ্যে জল জমে আছে। সেই জল আশেপাশে দেওয়ালের গা বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। জলের মধ্য দিয়ে হাঁটার দরুন জলের সপসপ শব্দ হতে লাগল।

আরও খানিকটা এগিয়ে মাঝি একটা সরু সুড়ঙ্গ-পথের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই গ্যাস-ল্যাম্পের ম্রিয়মাণ আলোয় এক অপ্রশস্ত গুহাপথ যেন হাঁ করে মৃত্যুক্ষুধায় ওৎ পেতে আছে।

এই তেরো নম্বর কাঁথি সার। রতন মাঝি বললে।

হাতের গ্যাসল্যাম্পটা আরও একটু উঁচু করে সুড়ঙ্গ-পথের দিকে মাঝি পা বাড়াল, যাইয়ে সাব।

সুড়ঙ্গ-পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। প্রকাণ্ড একটা কয়লার চাংড়া ধ্বসে পড়ে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং সেই চাংড়ার তলা থেকে একটা সাঁওতাল যুবকের দেহের অর্ধেকটা বের হয়ে আছে। বুক পিঠ এক হয়ে গেছে। কান ও মুখের ভিতর দিয়ে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এসে কালো কয়লা ঢালা পথের ওপরে কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। পাশেই একটা লোহার গাঁইতি পড়ে আছে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

শুধু একসময় শঙ্করের বুকখানা কাঁপিয়ে একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

প্রথমেই কথা বললেন বিমলবাবু, Rightly served! কথাটা যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতই সকলের অন্তরে গিয়ে বিঁধল।

বেটারা নিশ্চয়ই চুরি করে রাত্রে কয়লা তুলতে এসেছিল! কথাটা বললেন রেজিং বাবু রামলোচন পোদ্দার।

কিন্তু কোন্ পথে কেমন করে ওরা এল বলুন তো? প্রশ্ন করলে সুব্রত, চানকে তো চাবি দেওয়াই ছিল।

ভূতুড়ে মশাই। সব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা। বললে তো আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না মশাই। ভূতের কখনো চাবির দরকার হয়? এখন দেখুন। চানকে চাবি দেওয়া রইল, অথচ এরা দিব্যি খাদের মধ্যেই এসে ঢুকল এবং মারা গেল। বিমল-বাবু বললেন।

হুঁ, চলুন এবারে ফেরা যাক। আর এখানে থেকে কী হবে? চল মাঝি, শঙ্কর বললে।

সকলে আবার ফিরে চলল। সুব্রত সকলের পিছনে চিন্তাকুল মনে অগ্রসর হল। সহসা অন্ধকারে পায়ে কী ঠেকতে তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে দেখতেই কী যেন অন্ধকারে পথের ওপরে হাতে ঠেকল। সুব্রত নিঃশব্দে সেটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল।

বস্তুটা কাপড়ের পুঁটলি।

সুব্রত পুঁটলিটা জামার পকেটে ভরে নিল।

সকলে এসে আবার চানকের মুখে উপস্থিত হল।

'অনসেটার' আবার ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে চানকের সাহায্যে খাদের উপরে তুলে নিল।

সেদিনকার মত খাদের কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ দিয়ে শঙ্কর বাংলোয় ফিরে এল।

এক রাতের মধ্যে এতগুলো পর পর মৃত্যু শঙ্করকে যেন দিশেহারা করে দিয়েছে।

কী এখন সে করবে?

কোন্ পথে কাজ শুরু করবে? বাংলোয় ফিরে খনির কর্তা সুধাময় চৌধুরীর কাছে একটা জরুরী তার করে দিল।

॥ আট ॥

পুঁটলি-রহস্য

সুব্রত এসে বাংলোয় নিজের ঘরে ঢুকল।

নানা এলোমেলো চিন্তায় সেও যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা নিছক

একটা অ্যাকসিডেণ্ট, না অন্য কিছু! কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য লোক গেল কী করে খাদের মধ্যে?

নাঃ, ব্যাপারটাকে যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক ততটা নয়।

চাকরকে এক কাপ গরম চা দিতে বলে শঙ্কর ইজিচেয়ারটার ওপরে গা-টা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগল।

চিন্তা করতে করতে কখন একসময় জাগরণ-ক্লান্ত দু'চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলুনি নেমেছে তা ও টেরই পায়নি। ভৃত্যের ডাকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল।

বাবুজি, চা!

ভৃত্যের হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিয়ে সামনের একটা টিপয়ের ওপরে সুব্রত নামিয়ে রাখল।

ভৃত্য ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

খোলা জানালাপথে রৌদ্রঝলকিত শীতের সুন্দর প্রভাত। দূরে কালো পাহাড়ের অস্পষ্ট ইশারা। ওদিকে ট্রাম লাইনে পর পর কখানা খালি টবগাড়ি—কয়েকটা সাঁওতাল যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। চা পান শেষ করে সুব্রত উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা এঁটে জামার পকেট থেকে খনির মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া ন্যাকড়ার ছোট পুঁটলিটা বের করল।

একটা আধময়লা রুমালের ছোট পুঁটলি।

কম্পিত হস্তে সুব্রত পুঁটলিটা খুলে ফেলল।

পুঁটলিটা খুলতেই তার মধ্যকার কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ল। একটা মাঝারি গোছের 'ডিনামাইট', একটা পলতে একটা টর্চ!

আশ্চর্য, এগুলো খনির মধ্যে কেমন করে গেল?

ডিনামাইট কেন? সুব্রত ভাবতে লাগল। ডিনামাইট সাধারণতঃ খাদের মধ্যে বড় বড় কয়লার চাংড়া ধসাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সঙ্গে পলতেও একটা দেখা যাচ্ছে। এই ডিনামাইটের সঙ্গে পলতের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বড় বড় কয়লার চাংড়া ধসানোর সুবিধা হয়।

টর্চ! এটা বোধ হয় অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য। তবে কি কেউ গোপনে রাত্রে এই সব সরঞ্জাম নিয়ে খাদে গিয়েছিল কয়লার চাংড়া ধসাতে? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু ধসাতেই যদি কেউ গিয়ে থাকবে, তবে এগুলো সেখানে ফেলে এল কেন? তবে কি ধসায়নি? না ধসিয়ে চলে এসেছিল? কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আরও ডিনা-মাইট আরও পলতে ছিল, একটায় যদি না হাসিল হয় তবে এটার দরকার হতে পারে

এই ভেবে বেশী ডিনামাইইট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল! তারপর হয়ত একটাতেই কাজ হয়ে যেতে এটার আর দরকার হয়নি, তাড়াতাড়িতে এটা ফেলেই চলে এসেছে। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে লোকটা খনির মধ্যে ঢুকল? ঢোকবার তো মাত্র একটিই পথ! চানকের সাহায্যে? চানকের চাবি কার কাছে থাকে? আবদুল মিস্ত্রি বললে তার কাছেই থাকে। চাবিটা এমন কোন মূল্যবান চাবি নয়; টাকাকড়ির সিন্দুকের চাবি নয়, বা কোন প্রাইভেট ঘরের চাবি নয়, সামান্য চানকের চাবি। চাবিটা রাত্রে চুরি করা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এবং কাজ শেষ হয়ে যাবার পর যথাস্থানে চাবিটা আবার রেখে আসাও দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভূত নয়—মানুষেরই কাজ। কিন্তু এর সঙ্গে লোকগুলো মারা যাবার কী সম্পর্ক আছে? তবে কি—। সহসা চিন্তার সূত্র ধরে একটা কথা সুব্রতর মনের কোঠায় এসে উঁকি দিতেই, সুব্রতর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু রুমালটা! রুমালটা কার? সুব্রত রুমালখানি সোজা দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে লাগল।

রুমালখানি আকারে ছোটই। হাতে সেলাই করা সাধারণ লংক্লথের টুকরো দিয়ে তৈরী রুমাল। রুমালের একধারে ছোট অক্ষরে লাল সুতোয় লেখা ইংরাজী অক্ষর S. C.

এক কোণে ধোপার চিহ্ন রয়েছে।...'ঞ্চ'

সুব্রতর মাথার মধ্যে চিন্তাজাল জট পাকাতে লাগল। কার রুমাল! কার রুমাল! S. C. নামের initial যার তার পুরো নাম কি হতে পারে? 'শশাঙ্ক', 'শঙ্কর', 'শশধর', 'শরদিন্দু', 'শরৎ', 'শশি' 'শচীন', 'শৈলেশ' কিংবা 'সনৎ', 'সুকুমার', 'সমীর', 'সুধাময়'! কে, কে? কিন্তু এমনও তো হতে পারে, অন্য কারও রুমাল চুরি করে আনা হয়েছিল! তবে?

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যোগসূত্র এলোমেলো হয়ে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক—আসতেই হবে। সে আসবে! আসবে!

অবশ্যম্ভাবী একটা আশু ঘটনার সম্ভাবনায় সুব্রতর সর্বশরীর সহসা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দেয় দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে।

বাইরে গোলমাল শোনা গেল।

পুলিসের লোক এসে গেছে অদূরবর্তী কাতরাসগড় স্টেশন থেকে।

চঞ্চলপদে পুঁটলিটা আবার পূর্বের মত বেঁধে সুব্রত সেটা নিজের সুটকেসের মধ্যে ভরে রেখে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল।

দারোগাবাবু সকলের জবানবন্দি নিয়ে, ধাওড়ায় লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চালান দিয়ে খাদের লাশগুলো উদ্ধারের একটা আশু ব্যবস্থা করবার জন্য শঙ্করবাবুকে আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

সুব্রত যাবার সময় তার পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুকে অনুরোধ জানাল, এখানে ইতিপূর্বে যেসব ম্যানেজারবাবু খুন হয়েছেন তাঁদের ময়না তদন্তের রিপোর্টগুলি সংক্ষেপে মোটামুটি যদি জানান তবে তার বড্ড উপকার হয়। দারোগাবাবু সুব্রতর পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন, নিশ্চয়ই, এ-কথা বলতে! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে কত যে সুখী হলাম! কালই আপনাকে রিপোর্ট একটা মোটামুটি সংগ্রহ করে লিখে পাঠাব।

সুব্রত বললে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। পুলিসের লোক হয়েও যে আপনি এতখানি উদার, সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। কিরীটী যদি এখানে আসে তবে নিশ্চয়ই আপনার কাছে সংবাদ পাঠাব। এসে আলাপ করবেন। আচ্ছা নমস্কার।

॥ নয় ॥

আঁধার রাতের পাগল

সুব্রত শঙ্করবাবুর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে অলক্ষ্যে চানকের ওপরে দুজন সাঁওতালকে সর্বক্ষণ পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করল।

বিকেলের দিকে সুধাময়বাবুর সেক্রেটারী কলকাতা থেকে তার করে জবাব দিলেন : কর্তা বর্তমানে কলকাতায় নেই। তিনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। কর্তা কলকাতায় ফিরে এলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে। তবে কর্তার হুকুম আছে, কোন কারণেই যেন, যত গুরুতরই হোক খনির কাজ না বন্ধ রাখা হয়।

রাতে শঙ্কর সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, কী করা যায় বলুন, সুব্রতবাবু? কাল থেকে তা হলে আবার খনির কাজ শুরু করে দিই?

হ্যাঁ, দিন। দু-চারদিনের মধ্যে আমার তো মনে হয় আর খুনটুন হবে না।

শঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, আপনি গুনতে পারেন নাকি সুব্রতবাবু?

না, গুনতে-ফুনতে জানি না মশাই। তবে চারদিককার হাবভাব দেখে যা মনে হচ্ছে তাই বলছি মাত্র। বলতে পারেন স্রেফ অনুমান।

www.boiRboi.blogspot.com

যাহোক, শঙ্কর খনির কাজ আবার পরদিন থেকে শুরু করাই ঠিক করলে এবং বিমলবাবুকে ডেকে যাতে আগামীকাল ঠিক সময় থেকেই নিত্যকার মত খনির কাজ শুরু হয় সেই আদেশ দিয়ে দিল।

বিমলবাবু কাঁচুমাচু ভাবে বললে, আবার ঐ ভূতপ্রেতগুলোকে চটাবেন স্যার! আমি আপনার most obedient servent, যা order দেবেন—with life তাই করব। তবে আমার মতে এ খনির কাজ চিরদিনের মত একেবারে বন্ধ করে দেওয়াই কিন্তু ভাল ছিল স্যার। ভূতপ্রেতের ব্যাপার! কখন কি ঘটে যায়!

শঙ্কর হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ভূতেরও 'ওঝা' আছে বিমলবাবু। অতএব মা ভৈষী। এখন যান সব ব্যবস্থা করুন গে, যাতে কাল থেকে আবার কাজ শুরু হতে পারে।

কিন্তু স্যার—

যান যান, রাত হয়েছে। সারারাত কাল ঘুমুতে পারিনি।

বেশ। তবে তাই হবে। আমার আর কি বলুন? আমি আপনাদের most obedient and humble servent বই তো নয়!

বিমলবাবু চলে গেলেন।

বাইরে শীতের সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। সুব্রত কোমরে রিভলবারটা গুঁজে গায়ে একটা কালো রংয়ের ফারের ওভারকোট চাপিয়ে পকেটে একটা টর্চ নিয়ে বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়াল।

পায়ে-চলা লাল সুরকির রাস্তাটা কয়লা-গুঁড়োয় কালচে হয়ে ধাওড়ার দিক বরাবর চলে গেছে।

সুব্রত এগিয়ে চলে, পথের দু'পাশে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় শাল ও মহুয়ার গাছগুলো প্রেতমূর্তির মত নিঝুম হয়ে যেন শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। পাতায় পাতায় জোনাকির আলো, জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে। গাছের পাতা দুলিয়ে দূর প্রান্তর থেকে শীতের হিমের হাওয়া হিল্ হিল্ করে বয়ে যায়।

সর্বাঙ্গ সিরসির করে ওঠে।

কোথায় একটা কুকুর শীতের রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে।

সুব্রত এগিয়ে চলে।

অদূরে পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার সামনে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা একটা কয়লার অগ্নিকুণ্ড জেলে চারিদিকে গোলাকার হয়ে ঘিরে বসে কী সব শলা-পরামর্শ করছে। আগুনের লাল আভা সাঁওতাল পুরুষগুলোর খোদাই করা কালো পাথরের মত দেহের ওপরে প্রতিফলিত হয়ে দানবীয় বিভীষিকায় যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

তারও ওদিকে একটা বহু পুরাতন নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ শীতের ধূম্রাচ্ছন্ন অন্ধকারে কেমন ভৌতিক ছায়ার মতই অস্পষ্ট মনে হয়।

চারিদিকে বোয়ান গাছের জঙ্গল, তারই পাশ দিয়ে শীর্ণকায় একটি পাহাড়ী ক্ষুদ্র নদী, তার শুষ্কপ্রায় শুভ্র বালুরাশির উপর দিয়ে একটুখানি নির্মল জলপ্রবাহ শীতের অন্ধকার রাতে এঁকেবেঁকে আপন খেয়াল-খুশিতে অদূরবর্তী পলাশবনের ভিতর দিয়ে ঝিরঝির করে কোথায় বয়ে চলেছে কে জানে!

পলাশবনের উত্তর দিকে ছয় ও সাত নম্বর কুলি-ধাওড়া। সেখান থেকে মাদল ও বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়।

সহসা অদূরবর্তী মহুয়া গাছগুলির তলায় ঝরাপাতার ওপরে একটা যেন সজাগ সতর্ক পায়ে চলার খস্-স্ শব্দ পেয়ে সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বুকের ভিতরকার হৃৎপিণ্ডটা যেন সহসা প্রবল এক ধাক্কা খেয়ে থমকে থেমে গেল।

পকেটে হাত দিয়ে সুব্রত টর্চটা টেনে বের করল।

যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল ফস্ করে সেই দিকে আলোটা ধরেই বোতাম টিপে দিল।

অন্ধকারের বুকে টর্চের উজ্জ্বল আলোর রক্তিম আভা মুহূর্তে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে অট্টহাসি হেসে ওঠে।

কিন্তু ও কে? অন্ধকারে পলাশ গাছগুলোর তলায় বসে অন্ধকারে কী যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে খুঁজছে!

আশ্চর্য!

এই অন্ধকারে, পলাশবনের মধ্যে অমন করে লোকটা কি খুঁজছে?

সুব্রত এগিয়ে গেল।

লোকটা বোধ করি পাগল হবে।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো বিস্রস্ত জট-পাকানো চুল। মুখ ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে গেছে এবং মুখে বিশ্রী দাড়ি। গায়ে একটা বহু পুরাতন ওভারকোট; শতছিন্ন ও শত জায়গায় তালি দেওয়া। পিঠে একটা নেকড়ার ঝুলি, পরনেও একটা মলিন লংস।

সুব্রত টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে লোকটার দিকে এগিয়ে যায়।

এই, তুই কে রে? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু লোকটা কোন জবাবই দেয় না সুব্রতর কথায়, শুক্‌নো ঝরে-পড়া শালপাতাগুলো একটা ছোট লাঠির সাহায্যে সরাতে সরাতে কী যেন আপন মনে খুঁজে বেড়ায়।

এই, তুই কে ?

সুব্রত টর্চের আলোটা লোকটার মুখের উপর ফেলে। সহসা লোকটা চোখ দুটো বুজিয়ে চক্‌চকে দু'পাটি দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে শুরু করল।

লোকটা কেবল হাসে।

হাসি যেন আর থামতেই চায় না। হাসছে তো হাসছেই। সুব্রতও সেই হাসি-ভরা মুখটার ওপরে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে নিতান্ত বোকার মতই চুপ করে।

সুব্রত আলোটা নিভিয়ে দিল।

সহসা লোকটা ভাঙা গলায় বলে ওঠে, তু কি চাস বটে রে বাবু!

সুব্রত বোঝে লোকটা সাঁওতাল, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

তোর নাম কি ? কোথায় থাকিস ?

আমার নাম রাজা বটে!…থাকি উই—যেথা মারাংবরু র'ইছে।

এখানে এই অন্ধকারে কি করছিস ?

তাতে তুর দরকারডা কী ? যা ভাগ্!

সুব্রত দেখলে সরে পড়াই ভাল। পাগল। বলা তো যায় না! সুব্রত সেখান থেকে চলে এল।

পলাশবন ছাড়ালেই ৬নং কুলির ধাওড়া।

রতন মাঝি সেখানেই থাকে।

পলাশ ও শালবনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কুলি-ধাওড়ার সামনে প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের লাল রক্ত আভাস।

মাদলের শব্দ কানে এসে বাজে, ধিতাং! ধিতাং!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিতে সাঁওতালী সুর।

সারাদিন খাদে ছুটি গেছে, সব আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে।

ধাওড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা কালো কুকুর ঘেউ-উ-উ করে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সাঁওতাল যুবক এগিয়ে এল, কে বটে রে ? আঁধারে ঠাওর করতে লারছি। রা করিস না কেনে ?

রতন মাঝি আছে ? সুব্রত কথা বলে।

আরে, বাবু! ও পিনটু, বাবুকে বসবার দে। বসেন আইজ্ঞা। রতন মাঝি সুব্রতর সামনে এগিয়ে আসে।

আধো আলো আধো আঁধারে মাঝির পেশল কালো দেহটা একটা যেন প্রেতের মতই মনে হয়।

কিছু সংবাদ আছে মাঝি ?

না বাবু। সারাটি দিনমানই রইলাম বটে।

সুব্রত আরও কিছুক্ষণ রতন মাঝির সঙ্গে দু-চারটে আবশ্যকীয় কথা বলে ফিরল।

॥ দশ ॥

অদৃশ্য আততায়ী

সেই আগেকার পথ ধরেই সুব্রত আবার ফিরে চলেছে। আকাশে কাস্তের মত সরু এক ফালি চাঁদ জেগেছে; তারই ক্ষীণ জ্যোৎস্না শীতার্ত ধরণীর ওপরে যেন স্বপ্নের মতই একটা আলোর ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। পলাশ ও মহুয়াবনে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো চাঁদের আলোর আলপনা। বনপথে যেন আলোর আলপনা ঢাকাই বুটি বুনে দিয়েছে। মাদল ও বাঁশির শব্দ তখনও শোনা যায়।

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবেই ধীরে ধীরে পথ চলছিল, সহসা সোঁ করে কানের পাশে একটা তীব্র শব্দ জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই স্তব্ধ আলোছায়া-ঘেরা বনতল প্রকম্পিত করে বন্দুকের আওয়াজ জেগে উঠল: গুড়ুম! এবং সঙ্গে সঙ্গে কার যেন আর্ত চিৎকার কানে এল। সুব্রত থমকে হতচকিত হয়ে যেন থেমে গেল।

প্রথমটা সে এতখানি বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে ব্যাপারটা যেন ভাল করে কোন কিছু বুঝে উঠতেই পারে না। পরক্ষণেই নিজেকে নিজে সামলে নিয়ে, কোমরবন্ধে লোডেড রিভলবারটা ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে যেদিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। কিছু দেখা যায় না বটে তবে শুকনো পাতার ওপরে একটা ঝটাপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সুব্রত রিভলবারটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে টর্চটা জ্বালল এবং টর্চের আলো ফেলে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল, শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে।

অল্প খুঁজতেই সুব্রত দেখলে একটা পলাশ গাছের তলায় কে একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় ছট্‌ফট করছে।

সুব্রত লোকটার গায়ে আলো ফেললে।

লোকটা একজন সাঁওতাল যুবক।

লোকটার ডানদিকের পাঁজরে গুলি লেগেছে।

তাজা লাল টক্‌টকে রক্তে বনতলের মাটির অনেকটা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

লোকটার পাশেই একটা সাঁওতালী ধনুক ও কতকগুলো তীর পড়ে আছে।

সুব্রত লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু সাঁওতালটাকে চিনতে পারল না।

লোকটা ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দু-একবার ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে হতভাগ্য শেষ নিশ্বাস নিল।

সুব্রত নেড়েচেড়ে দেখল, শেষ হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস সুব্রতর বুকখানাকে কাঁপিয়ে বের হয়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়াল। টর্চের আলো ফেলে ফেলে আশেপাশের বন ও ঝোপঝাড় দেখলে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

হতভাগা সাঁওতালটা বন্দুকের গুলি খেয়ে মরেছে এবং স্বকর্ণে সে বন্দুকের গুলির আওয়াজও শুনতে পেয়েছে।

কিন্তু কে মারলে? কেনই বা মারলে?

নানাবিধ প্রশ্ন সুব্রতর মাথার মধ্যে জট পাকাতে লাগল। কিন্তু এটা ঠিক, যেই মেরে থাক সে সশস্ত্র।

অন্ধকার বনপথে সুব্রতর কাছে লোডেড রিভলভার থাকলেও সে একা। তার উপর এখানকার পথঘাট তার তেমন ভাল চেনা নয়। অলক্ষ্যে বিপদ আসতে কতক্ষণ? আর বিপদ যদি আচমকা অন্ধকারের আশপাশ থেকে এসেই পড়ে তবে তাকে ঠেকানোও যাবে না। অথচ এত বড় একটা দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এমনি করে বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সমীচীন নয়। অতএব এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

সুব্রত সজাগ হয়ে উঠল।

টর্চের আলো জ্বেলে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলল।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কেবলই একজনের পর একজন খুনই হচ্ছে! কারা এমনি করে নৃশংসভাবে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে?

কিসের প্রয়োজনেই বা এমনি ভয়ঙ্কর খেলা? কিন্তু পথ চলতে একটু আগে যে সোঁ করে শব্দটাকে সে কানের পাশে শুনেছিল সেটাই বা কিসের শব্দ?

কিসের শব্দ হতে পারে?

নানারকম ভাবতে ভাবতে সুব্রত অন্ধকার শালবনের পথ ধরে যেন বেশ একটু দ্রুত পদেই অগ্রসর হতে থাকে।

রাত্রি কটা বেজেছে কে জানে!

আসবার সময় তাড়াতাড়িতে হাতঘড়িটা পর্যন্ত আনতে মনে নেই।

খানিকটা দ্রুত হেঁটে শালবন পেরিয়ে সুব্রত পাহাড়ী নদীটার ধারে এসে দাঁড়াল।

মাথার উপরে আকাশের বুকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় যেন একটা সূক্ষ্ম রূপালী পর্দা থিরথির করে কাঁপছে। কোথাও কুয়াশার লেশমাত্র নেই। দূরে সাঁওতাল ধাওড়া থেকে একটানা একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

শীতের পাহাড়ী নদী, একেবারে জল নেই বললেই হয়। অনেকটা পর্যন্ত শুধু বালি আর বালি। নদীটা হেঁটেই সুব্রত পার হয়ে গেল।

সামনেই একটা প্রান্তর।

প্রান্তর অতিক্রম করে সুব্রত চলতে লাগল।

আনমনে চিন্তা করতে করতে কতটা পথ সুব্রত এগিয়ে এসেছে তা টের পায়নি, সহসা অদূরে আবছা চাঁদের আলোয় প্রান্তরের মাঝখানে দৃষ্টি পড়তেই সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

এখানে আসবার পরের দিন সন্ধ্যার দিকে প্রান্তরের মাঝে বেড়াতে বেড়াতে যে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা দেখেছিল অবিকল সেই মূর্তিটাই যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে জনহীন মৃদু চন্দ্রালোকে প্রান্তরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

সুব্রত ক্ষণেক দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপরই কোমরের লেদার কেস থেকে অটো-মেটিক রিভলভারটা বের করে অদূরের সেই চলমান মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের ট্রিগার টিপল।

নির্জন প্রান্তরের অন্ধকারে একঝলক আগুনের শিখা উদ্‌গিরণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে একটা আওয়াজ ওঠে—গুড়ুম্।

সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরকে ভয়চকিত করে ক্ষুধিত শার্দুলের ভয়ঙ্কর ডাক শোনা গেল। পর পর তিনবার।

চমকে উঠতেই সুব্রত চকিতের জন্য চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে ফেলেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন চোখের পাতা খুলল, দেখল দ্রুত হাওয়ার মতই সেই মূর্তি ক্রমে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মূর্তিটিকে যে জায়গায় দেখা গিয়েছিল সেই দিক লক্ষ্য করে সুব্রত রিভলভারটা হাতে নিয়ে দৌড়ল।

আন্দাজমত জায়গায় এসে পৌঁছে সুব্রত টর্চটা জ্বেলে চারদিকের মাটি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল।

সহসা ও লক্ষ্য করলে, প্রান্তরের শুকনো মাটির ওপরে তাজা রক্তের কয়েকটা ফোঁটা

ইতস্ততঃ দেখা যাচ্ছে।

রক্ত! তাজা রক্তের ফোঁটা!

তাহলে সত্যিই ভূত নয়, দৈত্য দানব বা পিশাচ নয়! সামান্য রক্তমাংসের দেহ-ধারী মানুষ! কিন্তু জখম হয়নি। সামান্য আঘাত লেগেছে মাত্র। কিন্তু পালাবে কোথায়?

এই যে মাটির ওপরে রক্তের ফোঁটা ফেলে গেল এইটাই তার নিশানা দেবে। যেখানে যতদূর পালাক না কেন হাওয়ায় উবে যেতে পারবে না।

একদিন না একদিন ধরা দিতেই হবে। কেননা আঘাত যত সামান্য হোক না কেন, আহত হয়েছে এ অবধারিত এবং সেইজন্যই বেশী দূর পালানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু শার্দূলের ডাক!

ব্যাপারটা কী?

অবিকল শার্দূলের ডাক!

সহসা সোঁ-সাৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ সুব্রতর কানের পাশে দিয়ে যেন বিদ্যুতের মত চকিতে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত চমকে উঠে এক লাফে সরে দাঁড়াল। এবং সরে দাঁড়াতে গিয়েই পাশে অদূরে মাটির দিকে নজর পড়ল। একটা ছোট তীরের ফলা অর্ধেক মাটির বুকে প্রোথিত হয়ে থিরথির করে কাঁপছে।

সুব্রত নীচু হয়ে হাত দিয়ে তীরটা ধরে এক টান দিয়ে মাটির বুক থেকে তুলে নিল।

তীরের তীক্ষ্ণ চেপ্টা অগ্রভাগে মাটি জড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে সুব্রত বুঝতে পারলে, একটু আগে শালবনের মধ্যে অতর্কিতে যে শব্দ শুনেছিল সেও একটা তীর ছোটারই শব্দ এবং সেই তীরটাও তাকে মারবার জন্যই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

শত্রুপক্ষ তাহলে সুব্রতর ওপরে বিশেষ নজর রেখেছে এবং তাকে মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তীরটা হাতে নিয়ে সুব্রত সটান বাংলোর দিকে পা চালিয়ে দিল।

সুব্রত এসে বাংলোয় যখন প্রবেশ করল, শঙ্কর তখন ঘরে টেবিলের ওপরে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন দেখছে।

শঙ্করবাবু! সুব্রত ঘরের মধ্যে পা দিয়ে ডাকল।

কে? ও, সুব্রতবাবু! এত রাত করে কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম ঐ নদীর দিকটায়।

সামনেই একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে সুব্রত পা দুটো টান করতে করতে বললে।

এতক্ষণ এই অন্ধকারে সেখানেই ছিলেন?

হ্যাঁ।

কথাটা বলে সুব্রত হাতের তীরটা টেবিল ল্যাম্পের অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে উঁচু করে তুলে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুব্রতর হাতে তীরটা দেখে শঙ্কর সবিস্ময়ে বললে, ওটা আবার কী? কোথায় পেলেন?

সুব্রত তীরটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে করতেই মৃদু স্বরে জবাব দিল, মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে।

মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে তীর পেলেন! তার মানে?

শঙ্কর বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করল।

মানে আবার কী? কেন, মাঠের মধ্যে একটা তীর কুড়িয়ে পেতে নেই নাকি?

শঙ্কর এবারে হেসে ফেললে, তা তো আমি বলছি না, আসল ব্যাপারটা কী তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার কী মনে হয় জানেন? সুব্রত বললে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ।

কী?

এই তীরের ফলায় নিশ্চয়ই কোন তীব্র বিষ মাখানো আছে এবং সে বিষ সাধারণ কোন সুস্থ মানুষের শরীরের রক্তে প্রবেশ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু অবধারিত।

কি বলছেন সুব্রতবাবু?

শঙ্কর জিজ্ঞাসু সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

মনে হওয়ার কারণ আছে শঙ্করবাবু। সুব্রত গম্ভীর স্বরে বললে।

বুঝতে পারছি না ঠিক আপনার কথা সুব্রতবাবু—

কোন এক হতভাগ্যের উদ্দেশে এই বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে তার জীবনের ওপরে attempt করা হয়েছিল।

সর্বনাশ! বলেন কী?

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে, অর্থাৎ বিস্তারিত ভাবে আপনাকে সব কিছু বলবার আগে এক কাপ চা—দীর্ঘ পথ হেঁটে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

O! Surely! এখুনি। বলতে বলতে শঙ্কর সামনের টেবিলের ওপরে রক্ষিত কলিং বেল টিপল।

ভৃত্য এসে খোলা দরজার ওপরে দাঁড়াল।—সাহেব আমাকে ডাকছেন?

এই, শীগগির সুব্রতবাবুকে এক কাপ গরম চা এনে দে।

আনছি সাহেব। ভৃত্য চলে গেল।

ভৃত্যকে চায়ের আদেশ দিয়ে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে শঙ্কর দেখলে, চেয়ারের ওপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সুব্রত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে।

॥ এগার ॥

ময়না তদন্তের রিপোর্ট

টেবিলের ওপর সুব্রতর আনীত তীরটা পড়েছিল। শঙ্কর সেটা টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

তীরটা ছুঁড়ে কোন এক হতভাগ্যের lifeএর ওপর নাকি attempt করা হয়েছিল! কে attempt করল? কার lifeএর পরেই বা attempt করল? কেনই বা attempt করল? আশ্চর্য!

সহসা একসময় সুব্রত চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে শঙ্করের হাতে তীরটা দেখতে পেয়ে চমকে বলে উঠল, আরে সর্বনাশ! করছেন কী? তারপর কি একটা বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন! রাখুন, রাখুন, তীরটা রেখে দিন। কে জানে কী ভয়ঙ্কর বিষ তীরের ফলায় মাখানো আছে!

শঙ্কর একপ্রকার থতমত খেয়ে তীরটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল।

এমন সময় ভৃত্য গরম চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে কাপটা টেবিলের ওপরে সুব্রতর সামনে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। সুব্রত ধূমায়িত চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিল।

আঃ! একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সুব্রত শঙ্করের মুখের দিকে তাকাল, ওই যে তীরটা দেখছেন শঙ্করবাবু, একটু আগে কোন এক অদৃশ্য আততায়ী ওটা ছুঁড়ে আমাকে ভবপারাবারে পাঠাতে চেয়েছিল।

বলেন কি? শঙ্কর চমকে উঠল।

আর বলি কি! খুব বরাত এযাত্রা বেঁচে যাওয়া গেছে। শুধু একবার নয়, দুবার তীর ছুঁড়ে আমার জীবনসংশয় ঘটানোর সাধুপ্রচেষ্টা করেছিল।

তারপর?

আতঙ্কে শঙ্করের সর্বশরীর তখন রোমাঞ্চিত।

তারপর আর কী! দুটোর একটা attempt-ও successful হয়নি—প্রমাণ এখনও শ্রীমান সুব্রত রায় আপনার চোখের সামনেই স্ব-শরীরে বর্তমান।

তা যেন হল—কিন্তু এ যে ব্যাপার ভয়ানক দাঁড়াচ্ছে ক্রমে সুব্রতবাবু। শেষকালে কি এলোপাথাড়ি হাতের সামনে যাকে পাবে তাকেই মারবে!

মারতে পারুক ছাই না পারুক সাধু প্রচেষ্টার অভাব যে হবে না, এ-কথা কিন্তু হলফ করে বলতে পারি মিঃ সেন। সুব্রত বললে।

কিন্তু এভাবে একদল ভয়ঙ্কর অদৃশ্য খুনেদের সঙ্গে কারবার করাও তো বিপজ্জনক। মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেও না হয় এদের শক্তি পরীক্ষা করা যেত, কিন্তু এ যে গরিলা যুদ্ধের মত।

মেঘনাদ যিনি তিনি হয়তো সামনাসামনি দাঁড়িয়েই কল টিপছেন; আর কতকগুলো পুতুলকে কোমরে দড়ি বেঁধে যখন যেমন যেদিকে নাচাচ্ছেন তেমনি নাচছে; সুব্রত বলে।

কিন্তু মেঘনাদটি কে? শঙ্কর সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

আরে মশাই সেটাই যদি জানা যাবে তবে এত হাঙ্গামাই বা আমাদের পোহাতে হবে কেন? সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দিল।

তারপর সহসা হাসি থামিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে সুব্রত বললে, আজ আবার একটি হতভাগ্য প্রাণ নিতে এসে প্রাণ দিয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ। বেচারা আমাকে মারতে এসে নিজে প্রাণ দিয়েছে; সুব্রত বললে।

বলেন কী! তা কেমন করে জানলেন?

হতভাগ্যের মৃতদেহ এখনও শালবনের মধ্যে পড়ে আছে।

পুলিসে একটা খবর দেওয়া তো তবে দরকার। শঙ্কর বললে।

তা দরকার বইকি। পুলিস জাতটা বড় সুবিধের নয়। আগে থেকে সংবাদ একটা দিয়ে রাখাই আমার মতে ভাল; কেননা 'নয়'কে 'হয়' ও 'হয়'কে 'নয়' করতে তাদের জোড়া আর কেউ নেই।

কিন্তু এত রাত্রে কাকে থানায় পাঠানো যায় বলুন তো? Bus তো সেই রাত দেড়টায়! ধারে-কাছে তো থানা নেই; সেই একদম কাতরাসগড়, নয় তেঁতুলিয়া হল্টে। তাছাড়া ব্যাপার ক্রমে যা দাঁড়াচ্ছে, কোন চেষ্টাকেই যেন আর বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু থানায় লোক পাঠাতে আর হল না; ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে থানার দারোগাবাবুর কাছ থেকে একজন লোক এসেছে; সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমার সঙ্গে? সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দেখলে, একজন চৌকিদার অপেক্ষা করছে।

তুমি? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

আজ্ঞে, দারোগাবাবু আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েছেন।

একটা মোটা মুখবন্ধ On His Majesty's Service খাম লোকটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে ধরল।

সুব্রত খামটা হাতে করে ঘরে ঢুকতেই শঙ্কর বললে, কী ব্যাপার সুব্রতবাবু?

দারোগাবাবু একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। ভাল কথা, দেখুন তো লোকটা চলে গেল নাকি?

কেন?

তাড়াতাড়ি চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই ঝুমন! শঙ্কর ডাকল।

বাবু! ঝুমন দরজার ওপরে এসে দাঁড়াল।

চৌকিদারটা কি চলে গেছে?

আজ্ঞে না। চুটিয়া খাচ্ছে।

তাকে একটু দাঁড়াতে বল্।

ঝুমন চলে গেল।

ব্যাপার কী? শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

এই লোকটার হাতেই দারোগাবাবুকে শালবনের খুন সম্পর্কে একটা খবর দিয়ে দিন না। তাহলে আর লোক পাঠাতে হয় না।

ঠিক বলেছেন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি একটা চিঠির কাগজে সংক্ষেপে শালবনের খুন সম্পর্কে যতটা সুব্রতর কাছে শুনেছিল লিখে চৌকিদারের হাতে দিয়ে দিল দারোগাবাবুকে গিয়ে দেবার জন্য।

চৌকিদার চলে গেল।

সুব্রত খামটা খুলে দেখলে গোটা তিন-চার পুলিস মর্গের রিপোর্ট ও তার সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট।

সুব্রতবাবু, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাঠালাম। কাজ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারেন ফেরত দিলে সুখী হব। আর দয়া করে কিরীটীবাবু এলে একটা সংবাদ দেবেন। কতদূর এগুলো? নমস্কার।

কিসের চিঠি সুব্রতবাবু? শঙ্কর প্রশ্ন করল।

এখানে ইতিপূর্বে যেসব ম্যানেজার মারা গেছেন তাঁদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট।

ঠাকুর এসে বললে, খাবার প্রস্তুত।

দুজনে উঠে পড়ল।

খাওয়াদাওয়ার পর সুব্রত মাথার ধারে একটা টুলের ওপরে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কম্বলে গা ঢেকে শুয়ে পড়ল।

তারপর আলোর সামনে রিপোর্টগুলো খুলে এক এক করে পড়তে লাগল।

মৃত্যুর কারণ প্রত্যেকেরই এক ; প্রত্যেকেরই শরীরে তীব্র বিষের ক্রিয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই গলার পিছনদিকে যে ক্ষত পাওয়া গেছে, সেখানকার 'টিস্থ' পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেখানকার টিস্থতেও সেই বিষ ছিল। সিভিল সার্জনের মতে সেই ক্ষতই বিষ প্রবেশের পথ।...তাহলে বোঝা যাচ্ছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে যে, নিছক গলা টিপেই খুনগুলো করা হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে Chemical Examinerদের কোন report নেই। তাহলে জানা যেত কী ধরনের বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, বিষ অত্যন্ত তীব্র শ্রেণীর।

কিন্তু প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির গলার পিছন দিকে যে চারটি করে কালো কালো ছিদ্র বা ক্ষত পাওয়া গেছে, সেগুলোর তাৎপর্য কী? কী ভাবে সেগুলো হল? কেনই বা হল? সুব্রত চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

॥ বারো ॥

আরও বিস্ময়

একসময় সুব্রতর মনে হল, এমনও তো হতে পারে কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে পর পর খুন করা হচ্ছে! কিন্তু তা হলেই বা সে উদ্দেশ্যটা কী?

সুব্রত চিঠির কাগজের প্যাডটা টেনে নিয়ে কিরীটীকে চিঠি লিখতে বসল।

কিরীটী

গত কালকের সমস্ত সংবাদ দিয়ে তোকে একখানা চিঠি দিয়েছি।

ভেবেছিলাম আজ আর বুঝি তোকে চিঠি দেওয়ার মত কোন প্রয়োজনই থাকবে না; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কতকগুলো ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া আমার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ আবার অতর্কিতভাবে এক হতভাগ্য সাঁওতাল কুলি আমাকে খুন করতে এসে নিজে অদৃশ্য এক আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছে।

এই শত্রুর দেশে কে আমার এমন বন্ধু আছেন বুঝলাম না, যিনি অলক্ষ্যে থেকে এভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন।

এ ব্যাপারটার যে explanation আমি আমার মনে মনে খাড়া করেছি, আসলে হয়ত মোটেই তা নাও হতে পারে; হয়ত এটা আগাগোড়াই সবটা আমার উর্বর মস্তিষ্কের নিছক একটা অনুমান মাত্র। কিংবা হয়ত এমনও হতে পারে তাদেরই দলের কেউ তার উপরে হিংসা পোষণ করে বা অন্য কোন গূঢ় কারণবশতঃ তাকে খুন করে গেছে অলক্ষ্যে থেকে। তবে ময়নাতদন্তের একটা রিপোর্ট আজ কিছুক্ষণ আগে দারোগাবাবু দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাতে দেখলাম, হতভাগ্য ম্যানেজারদের মৃত্যুর কারণ 'বিষ'।...

মাইনের মধ্যেকার ব্যাপারটা এখনও জানা যায়নি। তবে রিপোর্ট দেখে মনে হয় দশজনই খুন হয়েছে।

বুঝতে পারি না এরকম নৃশংসভাবে একটার পর একটা খুন করে কী লাভ থাকতে পারে খুনীর! আর ম্যানেজারগুলো তো তৃতীয় পক্ষ। তাদের নিজস্ব কী এমন interest খনি সম্পর্কে থাকতে পারে যাতে করে তাদের এভাবে খুন হওয়ার ব্যাপারটাকে explain করা যেতে পারে।

তবে কি আসল ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা 'হুমকি' বা 'চাল'?

যা হোক এখন পর্যন্ত তোর বন্ধুটি নির্বিঘ্নে সুস্থ ও বহাল তবিয়তে খোসমেজাজেই আছেন। খবর কী? রাজুর খবর কী? মা কেমন আছেন?

তোদের সুব্রত

পরদিন সকালে সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙল, চারিদিকে একটা ঘন কুয়াশার যবনিকা ঝুলছে।

শঙ্কর খানিক আগেই শয্যা থেকে উঠে মাইনের দিকে চলে গেছে; কেননা আজ থেকে আবার মাইনের কাজ শুরু হবার কথা।

ঝুমন চায়ের জল চাপিয়ে দু-দুবার সুব্রতর ঘরের কাছে এসে ফিরে গেছে, সুব্রতকে নিদ্রিত দেখে।

শয়নঘর থেকে বের হয়ে সুব্রত ডাকল, ঝুমন!

সাব্—ঝুমন সামনে এসে দাঁড়াল।

কি রে, তোর চা ready তো?

ঝুমন হাসতে হাসতে জবাব দিল, জি সাব্।

ম্যানেজারবাবু কোথায় ?

খাদে গেছেন হুজুর।

চা খেয়ে গেছে ?

আজ্ঞে না। বলে গেছেন আপনি ঘুমিয়ে উঠলে তিনি এর মধ্যে ফিরে আসবেন, তারপর একসঙ্গে দুজনে চা খাবেন।

বেশ। তবে তুই চায়ের সব যোগাড় কর্। আমি ততক্ষণ চট্‌পট্ হাত পা ধুয়ে নিই, কি বলিস ?

জি সাব্—

ঝুমন নিজের কাজে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সুব্রত বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে গরম ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে চায়ের টেবিলের কাছে এসে দেখে শঙ্কর এর মধ্যে কখন মাইন থেকে ফিরে চায়ের টেবিলের সামনে এসে বসে আছে।

তাহলে শঙ্করবাবু ? মাইনের কাজ শুরু করে দিয়ে এলেন ?

অ্যাঁ! কে ? ও সুব্রতবাবু! কী বলছিলেন ?

মাইনের কাজ শুরু হবার আজ সকাল থেকে order ছিল না ? কাজ শুরু হল ?

হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু একটা বিচিত্র আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটেছে। মনে হচ্ছে এটা যেন ভেল্কীবাজির খনি।

ব্যাপার কী ? সুব্রতর দৃষ্টিটা প্রখর হয়ে উঠল।

ঝুমন গরম চা, রুটি, মাখন, ডিমসেদ্ধ ও কেক সাজিয়ে দিয়ে গেল সামনের টেবিলের ওপরে।

একটা সেদ্ধ ডিমের অর্ধেকটা কাঁটা দিয়ে ভেঙে নিয়ে সেটা গালে পুরে চিবোতে চিবোতে শঙ্কর বলল, তাছাড়া আর কি বলব বলুন ? ১৩নং কাঁথিতে মরল দশজন। কয়লার চাংড়া সরিয়ে মৃতদেহ পাওয়া গেল মোটে একটা !

তার মানে ? সুব্রত বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ মশাই, এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন ? ১৩নং কাঁথিতে মৃতদেহ মাত্র একটিই পাওয়া গেছে।

তবে যে শুনছিলাম দশজন মারা গেছে ? সুব্রত রুদ্ধনিশ্বাসে বললে।

তাই তো শোনা গিয়েছিল এবং লিস্টমত দশজনকে পাওয়াও যায়নি—কিন্তু কয়লা সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করবার পর দেখা যাচ্ছে মাত্র একটিই।

বলেন কি ! ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছিল তো ? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

আমি নিজে পর্যন্ত দেখে এসেছি। মানুষ তো দূরের কথা. একগাছি চুলও দেখতে পেলাম না।

আশ্চর্য!

তারপর, আবার সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, ১৩নং কাঁথিতে কাজ চলছে নাকি?

না। ১৩নং কাঁথিতে কাজ একদম বন্ধ করে রেখে এসেছি।

বেশ করেছেন। চলুন, চা খেয়ে আমি একবার সেই ১৩নং কাঁথিটা ঘুরে দেখে আসব।

বেশ তো, চলুন। উদাসভাবে শঙ্কর জবাব দিল।

চা পান শেষ করে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দুজনে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল।... এমন সময় দেখা গেল বিমলবাবুর সঙ্গে অদূরে দারোগাবাবু আসছেন।

দারোগাবাবুই আগে হাত তুলে নমস্কার জানালেন, নমস্কার সুব্রতবাবু। নমস্কার মিঃ সেন।

ওরা দুজনেই প্রতিনমস্কার জানাল।

দারোগাবাবুই প্রশ্ন করলেন, কোথায় মশাই আপনাদের শালবনে খুন হয়েছে?

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খবরটা পেলেন কি করে? সুব্রত শুধায়।

এদিকে আসছিলাম—পথেই চিঠিটা পেলাম। কিন্তু—

কি?

এতক্ষণ প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমি বিমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তন্নতন্ন করে শালবন নদীর ধার পর্যন্ত খুঁজে এলাম, কিন্তু কোথাও তো মশাই লাশের টিকিটিরও দর্শন পেলাম না। অন্ধকারে ভুল দেখেননি তো?

সুব্রত চমকে উঠল, আপনি বলছেন কী স্যার? আমার চোখের সামনে ব্যাটা ছট্‌ফট করে মরল, আর আমি ভুল দেখলাম!

তবে বোধ হয় ব্যাটা মরে ভূত হয়ে হাওয়ায়. মিলিয়ে গেছে সুব্রতবাবু। হাসতে হাসতে দারোগাবাবু বললেন।

দেখুন দারোগাবাবু, নেশা-ভাঙের অভ্যাস আমার জীবনে নেই তাছাড়া চোখের দৃষ্টি এখনও আমার খুবই প্রখর ও সজাগ।

কিন্তু লাশটা তাহলে কোথায়ই বা যাবে বলুন? কথাটা বললেন বিমলবাবু।

কোথায় যাবে তা কী করে বলব! পাওয়া যখন যাচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই কেউ রাতারাতি লাশ সরিয়ে নিয়ে গেছে!

কিন্তু ওই শালবনে অত রাত্রে যে একটা লোক খুন হয়েছে, সে-কথা লোকে জানলেই বা কেমন করে যে সরিয়ে নেবে রাতারাতি? দারোগাবাবু বললেন।

এবার সুব্রত আর না হেসে থাকতে পারলে না। হাসতে হাসতে বললে, তা যা বলেছেন। তবে যে খুনী সে তো জানতই লোকটা মারা গেছে, বিশেষ করে বন্দুকের গুলি খেয়ে যে বাঁচা চলে না এবং সে গুলি যখন পাঁজরা ভেদ করে গেছে।

তবে কি আপনি বলতে চান সুব্রতবাবু, খুনীই লাশ সরিয়েছে?

বলতে আমি কিছুই চাই না। লাশ কেউ সরিয়েছে বা সরায়নি এ সম্পর্কে কোন তর্কবিতর্ক করবারই আমার ইচ্ছে নেই। আপনারা যে সিদ্ধান্তে ইচ্ছা উপস্থিত হতে পারেন এবং যেমন খুশি further proceed করতে পারেন। তবে এটা ঠিকই জানবেন কাল একজন কুলি শালবনে বন্দুকের গুলিতে খুন হয়েছিল।

আপনার কথাই যদি ধরে নেওয়া যায়, অর্থাৎ খুনীই লাশ সরিয়ে থাকে, তবে কোথায় সরালে? দারোগাবাবু সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

কেমন করে বলব বলুন! আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর লাশ সরায়নি!

তাও তো ঠিক, তাও তো ঠিক। দারোগাবাবু মাথা দোলাতে লাগলেন পরম বিজ্ঞের মত।

॥ তের ॥

মৃতদেহ

দারোগাবাবুরও যেন অতঃপর কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, চলুন না সুব্রতবাবু আমার সঙ্গে একটিবার সেই শালবনে; কোথায় আপনি মৃতদেহ দেখে এসেছিলেন, exact locationটা দেখাবেন।

নিশ্চয়ই, চলুন।

সকলে নদী পার হয়ে শালবনের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রভাতের সোনালী রোদ শালবনের গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ইতস্তত উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রভাতের ঝিরঝিরে হাওয়া শালবনের গাছে সবুজ কচি পাতাগুলিকে মৃদু মৃদু শিহরণ দিয়ে বয়ে যায়।

সকলে এসে শালবনের মধ্যে প্রবেশ করল।

কোথায় দেখেছিলেন কাল রাত্রে সেই মৃতদেহ সুব্রতবাবু? দারোগাবাবু প্রশ্ন করলেন।

ওই শালবনের দক্ষিণ দিকে।

গতরাত্রের সেই জায়গায় সকলে সুব্রতর নির্দেশমত এসে দাঁড়াল।

আশেপাশে কয়েকটা বড় বড় শালগাছ ছোট একটা জায়গাকে যেন আরও ছায়াচ্ছন্ন ও নির্জনতর করে ঘিরে রেখেছে।

এই সেই জায়গা দারোগাবাবু, সুব্রত বললে।

সেই জায়গার মাটিতে তখনও রক্তের দাগ জমাট বেঁধে শুকিয়ে আছে দেখা গেল।

সুব্রত সেই জমাটবাঁধা রক্তের দাগগুলোর দিকে অঙ্গুলি তুলে বলল, এই দেখুন দারোগা সাহেব, আমি যে গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিনি বা আমার চোখের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেনি তার প্রমাণ। এই মাটির বুকে এখনও রক্তের দাগ রয়েছে।

সকলে তখন এক এক করে রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখল এবং সুব্রতর কথা যে মিথ্যা নয় এরপর সেটাই সকলে মেনে নিতে বাধ্য হল।

তাই তো স্যার, এ যে তাজ্জব ব্যাপার! দারোগাবাবু বলতে লাগলেন, কিন্তু মৃতদেহটা তবে কোথায় গেল?

সুব্রত তখন চারিদিকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে কী যেন দেখছিল, দারোগাবাবুর কথার কোন জবাবই দিল না।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে সহসা একসময় সুব্রতর চোখের দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সহসা সে চিৎকার করে বলে উঠল, ইউরেকা! ইউরেকা! সম্ভবতঃ আপনাদের লাশ পাওয়া গেছে দারোগা সাহেব। কিন্তু একটা শাবলের যে দরকার।

সুব্রতর উৎফুল্ল চিৎকারে সকলেই সুব্রতর দিকে ফিরে তাকাল।

ব্যাপার কী সুব্রতবাবু? শঙ্কর বললে।

লাশ পাওয়া গেছে শঙ্করবাবু। সুব্রত হাসতে হাসতে বললে।

লাশ পাওয়া গেছে? আপনার মাথা খারাপ হল নাকি সুব্রতবাবু? দারোগাবাবু বললেন।

দয়া করে একটা শাবল আনিয়ে দিন। আমি এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি।

তখনি বিমলবাবুকে খনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল একটা শাবল নিয়ে আসবার জন্য।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমলবাবু ছোট একটা মাটি-খোঁড়া শাবল নিয়ে ফিরে এলেন।

এই নিন স্যার শাবল।

সুব্রত বিমলবাবুর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে একটা বড় শালগাছের গোড়া থেকে একটা ছোট শালগাছের চারা এক টান দিয়ে অনায়াসেই শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে মাটি খুঁড়তে লাগল। বেশী মাটি খুঁড়তে হল না, খানিকটা মাটি উঠে আসবার পরই একটা মানুষের হাত দেখা গেল।

এই দেখুন দারোগা সাহেব, আমার কথা ঠিক কিনা! এই দেখুন লাশ। সুব্রতর সমগ্র শরীর ও কণ্ঠস্বর প্রবল একটা উত্তেজনায় যেন কাঁপছে।

তারপর অল্প আয়াসেই মাটি থেকে মৃতদেহ খুঁড়ে বের করা হল। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, সুব্রত যা বলেছিল ঠিক তাই। মৃতদেহের পাঁজরায় গুলির ক্ষতও রয়েছে।

দারোগাবাবু এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি, যেন বোকা বনে গেছেন। এমন ব্যাপার যে একটা ঘটতে পারে এ যেন ইতিপূর্বে তাঁর ধারণার অতীত ছিল। তিনি একজন দারোগা। এক-আধ বছর নয়, প্রায় দীর্ঘ এগার বছর এই লাইনে চুল পাকাচ্ছেন অথচ এই সামান্য সম্ভাবনাটা তাঁর মাথায় খেলেনি! খেলল কিনা সামান্য একজন শখের গোয়েন্দার সহচরের মাথায়!

দারোগাবাবু একটু গম্ভীরই হয়ে গেলেন।

এবার বিশ্বাস হয়েছে তো স্যার আমার কথায় পুরোপুরি? সুব্রত দারোগাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল।

এখনও আর না বিশ্বাস করে কেউ পারে নাকি সুব্রতবাবু? বললে শঙ্কর। কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে আমি পারছি না সুব্রতবাবু!

বুদ্ধির কিছু নয়—common sense শঙ্করবাবু; বুদ্ধি যদি বলেন সে আমার বন্ধু ও শিক্ষাগুরু কিরীটী রায়ের আছে, সুব্রত বললে। শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় যেন রুদ্ধ হয়ে এল।

কিন্তু কেমন করে বুঝলেন বলুন তো সুব্রতবাবু যে লাশ এখানে লুকনো আছে?

বললাম তো common sense! এই গাছটা লক্ষ্য করে দেখুন। গাছের পাতাগুলো যেন নেতিয়ে গেছে। এটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাকিটা আমার অনুমান —চারদিকে চেয়ে দেখুন, চারাগাছ আরও দেখতে পাবেন, কিন্তু কোন গাছেরই পাতা এমন নেতানো নয়। প্রথমেই আমার মনে হল, ঐ গাছের পাতাগুলো অমন নেতিয়ে গেছে কেন? তখনি গাছটার পাশে ভাল করে চাইতেই মাটির দিকে নজর পড়ল। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায় পাশের মাটিগুলো যেন কেমন আলগা। মনে হয় কে যেন চারপাশের মাটি খুঁড়ে আবার ঠিক করে রেখেছে। যেই এ কাজ করে

থাকুক না কেন, লোকটার যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বলতেই হবে। মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ পুঁতে এই গাছটি অন্য জায়গা থেকে উপড়ে এনে এখানে পুঁতে দিয়ে গেছে যাতে করে কারও নজরে না পড়ে এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু গাছটি অন্য জায়গা থেকে উপড়ে আনার ফলে এক রাত্রেই নেতিয়ে উঠেছে। আরও ভেবে দেখুন এক রাত্রের মধ্যে যেখানে গাড়ি মোটর বা ট্রেনের তেমন কোন ভাল বন্দোবস্ত নেই সেখানে একটা লাশকে সরিয়ে ফেলা কত কষ্টসাধ্য! তাছাড়া একটা মৃতদেহ অন্য জায়গায় সরানোও বিপদসঙ্কুল ব্যাপার। একে তো সকলের নজর এড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার ওপর ধরা পড়বার খুবই সম্ভাবনা। অথচ মৃতদেহটা এভাবে ফেলে রাখাও চলে না—তাই সরানোই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ এবং আশেপাশে কোথাও পুঁতে ফেলতে পারলে সব দিকই রক্ষা হয় এবং ব্যাপারটাও সহজ সাধ্যকর হয়ে যায়।

যা হোক, সকলে তখন লাশের একটা বন্দোবস্ত করে বাংলোর দিকে ফিরল। কারও মুখেই কোন কথা নেই। সকলে নির্বাকভাবে পথ অতিক্রম করছে।

সকলে এসে বাংলোয় প্রবেশ করল।

বিমলবাবু বাংলো পর্যন্ত আসেননি, খনির দিকে চলে গেছেন মাঝপথ থেকে বিদায় নিয়ে।

বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার পাতা ছিল। তিনজনে তিনটে চেয়ার টেনে বসল। দারোগাবাবুই প্রথমে কথা বললেন, সুব্রতবাবু, ময়নাতদন্তের রিপোর্টগুলো পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ, কাল রাত্রেই পড়ে ফেলেছি।

কি বুঝলেন?

সামান্যই। তার থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে না। আচ্ছা দারোগা সাহেব, এই caseগুলোর chemical examinationএর reportগুলো আপনার কাছে আছে নাকি?

না। তবে যদি বলেন তো চেষ্টা করে আনিয়ে দিতে পারি কোয়ার্টার থেকে; দরকার আছে নাকি?

হ্যাঁ, পেলে ভাল হত। একটা কাজ করতে পারবেন দারোগা সাহেব?

বলুন।

একটু অপেক্ষা করুন। সুব্রত ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং পরক্ষণেই কাগজে মোড়া গত রাত্রের সেই তীরটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

ব্যাপার কী? ওটা কি আপনার হাতে? দারোগাবাবু সুব্রতর হাতের কাগজে

মোড়া তীরটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

কাগজের মোড়কটা খুলতে খুলতে সুব্রত বললে, এটা একটা তীর। এর ফলায় আমার মনে হয় কোন মারাত্মক রকমের বিষ মাখানো আছে ; দয়া করে এটা ধানবাদের কোন কেমিস্টের কাছ থেকে একটু এগ্‌জামিন করে কী বিষ আছে জেনে আমায় জানাতে পারেন ?

চেষ্টা করতে পারি, তবে কতদূর সফল হব বলতে পারি না। তার চেয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই না কেন! এক হপ্তার মধ্যেই Chemical Examiner-এর report পেয়ে যাবেন।

দেখুন যদি ধানবাদে সুবিধা না হয়, তবে কলকাতায়ই পাঠাবেন।

তখনকার মত চা ও জলখাবার খেয়ে দারোগাবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শঙ্কর খাদের দিকে রওনা হল। সুব্রত চেয়ারটার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘটনাটা চিন্তা করতে লাগল।

॥ চোদ্দ ॥

রাত্রি যখন গভীর হয়

প্রতি রাতের মত আজও রাত্রির অন্ধকার ধূসর কুয়াশার ঘোমটা টেনে পায়ে পায়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত ধরণীর বুকে নেমে এল। পাখীর দল কুলায় গেল ফিরে। সারাদিন খনিতে খেটে ক্লান্ত সাঁওতাল কুলিকামিনরা যে যার ধাওড়ায় ফিরে এসেছে। সুব্রত চুপটি করে বারান্দায় একটা বেতের ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কাল হয়ত কিরীটীর চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু আজকের রাতটা ?

এ কি নির্বিঘ্নে কাটবে ?

রাতের অন্ধকারে কি আজ আর বিভীষিকাময় মৃত্যুর কঠিন হিমপরশ কোন হতভাগ্যের ওপরে নেমে আসবে না ?

দূর থেকে সাঁওতালী বাঁশি ও মাদলের সুর ভেসে আসে।

জীবনের কোন মূল্যই ওদের কাছে নেই। প্রকৃতির স্নেহের দুলাল ওরা। মাটির ঘরে অযত্নে বর্ধিত, মাটি-মাখা সহজ ও সরল শিশুর দল। প্রাণপ্রাচুর্যে জীবনের পাত্র ওদের কানায় কানায় পূর্ণ।

শঙ্কর এখনও খাদ থেকে ফেরেনি।

ঝুমন গরম চা, কেক ও ফল প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

সুব্রত একটুকরো কেক মুখে পুরে চায়ের কাপটা তুলে নিল। বাইরে আজ ঠাণ্ডাটা যেন একটু চেপেই এসেছে।

মাঝে মাঝে খোলা প্রান্তর থেকে আসন্ন রাতের স্তব্ধতা যেন বহন করে আনে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা।

একসময় চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে সুব্রত পাশের টিপয়ে সেটা নামিয়ে রেখে দিল।

কত রকম চিন্তাই একটার পর একটা মাথার মধ্যে এল মাকড়সার জালের মত।

এবং সেই জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি বেয়ে বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি দাগের মত কী যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কী ওগুলো ?

ভূতের মত একাকী চুপ করে এই বারান্দায় ঠাণ্ডায় বসে বসে কী ভাবছেন ?

চোখ তুলে তাকায় সুব্রত।

কে ? শঙ্করবাবু ? সুব্রত ধীরকণ্ঠে বলে।

কী এত ভাবছিলেন বলুন তো ? এখানে এসে আপনার এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তবুও টের পাননি ?

হাসতে হাসতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে।

এবেলা খাদের অবস্থা কেমন ? Peacefully work চলছে তো ?

কতকটা, যদি কিছু দুর্ঘটনা না আচমকা এসে পড়ে।

হঠাৎ এ কথা কেন শঙ্করবাবু ?

বলা তো যায় না। শঙ্কর মৃদুকণ্ঠে বলে, বিমলবাবুর ভাষায় বলতে গেলে এই ভৌতিক ফিল্ড-এ যখন-তখনই যে কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপারই তো ঘটা সম্ভব সুব্রতবাবু! তাছাড়া নতুন ম্যানেজারবাবু এখনও ভূতের হাতে আক্রান্ত হননি যখন!

সুব্রত কোন কথা বলে না।

তারপর আপনার কাজ কতদূর এগুলো সুব্রতবাবু ? How far you have proceeded ?

অনেকটা।

বলেন কী ? শঙ্করের কণ্ঠস্বর উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ। কিন্তু এখনও আমাদের দারোগা বাবু এসে পৌঁছলেন না!

দারোগা বাবুর এখন আসবার কথা আছে নাকি ?

শঙ্কর উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করে।

তাঁকে সন্ধ্যার পরই যে বাসটা থামে, তাতে দুজন কনেস্টবল নিয়ে আসতে বলে দিয়েছিলাম।

কনেস্টবল নিয়ে আসতে বলেছিলেন! কেন? হঠাৎ কনেস্টবল নিয়ে আসবেন কেন? কাউকে গ্রেপ্তার করবেন নাকি?

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু চারদিককার অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। আবার শঙ্কর প্রশ্ন করে, আমি যে অন্ধকারেই থাকছি সুব্রতবাবু। Please খুলে বলুন। কাকে গ্রেপ্তার করবেন?

খুনীকে। এ রহস্যের হোতাকে।

পেরেছেন বুঝতে তাহলে সত্যিই? পেরেছেন জানতে হত্যাকারী কে?

একরাশ উৎকণ্ঠা শঙ্করের গলার স্বরে ফুটে বেরুল।

হ্যাঁ। সুব্রত জবাব দেয়।

কে সুব্রতবাবু?

আপনিই বলুন কে? সুব্রত স্মিতভাবে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

আগে বলুন, এই খনির areaর মধ্যে সেই লোকটি আছে কিনা? তারপর বলছি।

শঙ্কর সুব্রতর মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

যদি বলি আছে! সুব্রত মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

তাহলে বলব, আমিও একজনকে সন্দেহ করেছি সুব্রতবাবু।

কে? বিমলবাবু—এই খনির সরকার?

হ্যাঁ। কিন্তু আশ্চর্য, how could you guess! আপনারা দেখছি সর্বজ্ঞ। Am I right সুব্রতবাবু?

অধীরভাবে শঙ্কর সুব্রতকে প্রশ্ন করে।

you are right শঙ্করবাবু। ধীরভাবে সুব্রত জবাব দেয়।

আজ তাহলে বিমলবাবুকে গ্রেপ্তার করছেন বলুন? শঙ্করবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন।

এমন সময় দারোগাবাবু দুজন কনেস্টবল সমভিব্যাহারে এসে হাজির হলেন। বাংলোর বারান্দায় উঠতে উঠতে দারোগাবাবু বললেন, আমরা এসে গেছি সুব্রতবাবু।

Many thanks, আসুন, আসুন। Everything O. K.! একটু চাপা গলায় বলে ওঠে।

Yes, everything O. K.—দারোগাবাবু জবাব দিলেন।

আপনারা তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা চট্ করে খাওয়াদাওয়া সেরে ready হয়ে নিচ্ছি। উঠুন শঙ্করবাবু, রাত হয়ে গেছে, চলুন খেতে যাওয়া যাক।

চলুন।

সুব্রত ও শঙ্কর দুজনে উঠে পড়ল।

রাত্রি গভীর হয়েছে।

সুব্রত, শঙ্কর, দারোগাবাবু তিনজনে নিঃশব্দে কালো কয়লার গুঁড়ো কাঁকরঢালা অপ্রশস্ত রাস্তাটা, যেটা বরাবর অফিসারদের কোয়ার্টারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে প্রেতের মত এগিয়ে চলে। সকলেরই পায়ে রবার সু। কাঁকর কয়লা বিছানো রাস্তা দিয়ে চললেও কোন শব্দ পাওয়া যায় না।

সকলে এসে বরাবর বিমলবাবুর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াল।

এর মধ্যেই চারিদিকে কুয়াশা জমেছে।

আশেপাশের সব কিছু আবছা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিমলবাবুর কোয়ার্টারটা কুয়াশার ওড়না জড়িয়ে যেন আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগে সুব্রত ও তার পিছনে দারোগাবাবু ও শঙ্কর পা টিপে টিপে বিড়ালের মত সন্তর্পণে বারান্দা অতিক্রম করে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ওকি! সুব্রত সবিস্ময়ে দেখল, দরজার দু'পাশের দুটো ভেজানো কবাটের ফাঁক দিয়ে ঈষৎ ম্রিয়মাণ একটা আলোকরশ্মি যেন অতি সন্তর্পণে বাইরে উঁকি দিচ্ছে ভয়ে ভয়ে।

সুব্রত একবার চেষ্টা করলে দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা দেখবার। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

আঙুলের চাপ দিতেই ভেজানো দরজা আরও ফাঁক হয়ে গেল।

ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

প্রচুর ধূম উদ্‌গিরণ করে হ্যারিকেনের চিমনিটা কালো হয়ে ওঠায় আলো অত্যন্ত মলিন বলে মনে হয়।

প্রথমটায় সেই মলিন আলোয় সুব্রত কিছুই দেখতে পেল না; কিন্তু পরক্ষণেই ভাল করে দৃষ্টিপাত করতেই সুব্রত ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠল।

ওকি! সেই শালবনে দেখা পাগলটা না?

কে একজন উপুড় হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পাগলটা সেই ভূপতিত দেহের ওপরে ঝুঁকে অত্যন্ত নীচু হয়ে কী যেন করছে।

ডান হাতে পিস্তলটা বাগিয়ে, বাঁ হাতে টর্চটা ধরে বোতাম টেপবার সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত আচমকা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

টর্চের তীব্র আলোর ঝাপটা মুখের ওপরে পড়তেই পাগলটা চমকে লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু ওকি! পাগলটার হাতে একটা উদ্যত পিস্তল!

সুব্রত থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কে তুই? বল্ শীগগির, কে তুই?

সহসা একটা উচ্চরোলের হাসির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে সমগ্র ঘরখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

পাগলটা হাসছে।

সকলেই স্তম্ভিত, বাক্যহারা।

হঠাৎ পাগলটা হাসি থামিয়ে স্বাভাবিক গলায় ডাকল, সুব্রত!

সুব্রত চমকে উঠল।

কে?

ভয় নেই, আমি কিরীটী।

অ্যাঁ! কিরীটী, তুই! একি বিস্ময়!

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও বলে উঠল, কিরীটী, তুই!

হ্যাঁ। কেন, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি শ্রীহীন কিরীটী রায়!

কিন্তু ব্যাপার কী? মাটিতে পড়ে লোকটা কে?

সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

বিমলবাবুর মৃতদেহ।

কার? কার মৃতদেহ? অস্ফুট কণ্ঠে সুব্রত চিৎকার করে উঠল।

কলিয়ারীর সরকার বিমলবাবু। যাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য তোমাদের আজকের রাত্রের এই দুঃসাহসিক অভিযান বন্ধু! চল বন্ধু, এবার বাসায় চল। দারোগাবাবু, আপনার সঙ্গে যে কনেস্টবল দুটি এনেছেন, তাদের এই মৃতদেহের জিম্মায় আজকের রাতের মত রেখে চলুন শঙ্করের বাংলোয় ফেরা যাক। চল্ সুব্রত, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী! গাম ইলাস্টিক দিয়ে একমুখ দাড়ি করে চুলকে চুলকে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হল!

কিন্তু—সুব্রত আমতা আমতা করে বললে।

এর মধ্যে আবার কিন্তু কী হে ছোকরা! চল্, চল্। রাত কত হল তার খবর রেখেছিস? বাড়িতে চল্, ধীরেসুস্থে বলব।

তাহলে বিমলবাবু···

সুব্রতর কথা শেষ হল না, কিরীটী বলে উঠল, আজ্ঞে না। You are mistaken, বিমলবাবু খুনী নন।

তবে?

তবে আবার কি ? অন্য লোক খুনী ।

কে খুনী ?

কাল সকালে বলব । এখন চল্ বাংলোয় ফেরা যাক ।

কিন্তু আমার যে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কিরীটী ! সুব্রত বললে ।

অর্থাৎ তুমি একটি হস্তীমূর্খ । শোন্, কানে কানে একটা কথা বলি !

সুব্রতর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে কিরীটী কি যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলতেই সুব্রত লাফিয়ে উঠল, অ্যাঁ, বলিস কি—আশ্চর্য, আশ্চর্য !

কিন্তু তার একটি ডান ও একটি বাঁ হাত ছিল যন্ত্র স্বরূপ । কিরীটী বললে, এই হতভাগ্য বিমলবাবু হচ্ছে বাঁ হাত ।

সে রাত্রে বাংলোয় ফিরে গরম জল করিয়ে কিরীটী ছদ্মবেশ ছেড়ে স্থির হতে হতে প্রায় রাত্রি আড়াইটে বেজে গেল ।

॥ পনের ॥

রহস্যের মীমাংসা

ঝুমনকে ডেকে শঙ্কর কিছু লুচি ও তরকারী করবার জন্য আদেশ দিতেই কিরীটী বাধা দিলে, আরে ক্ষেপেছিস শঙ্কর, এই রাত্রে মিথ্যে কেন ও বেচারীকে কষ্ট দিবি ! তার চাইতে বল্ এক কাপ গরম গরম চা বানিয়ে দিক । আর তার সঙ্গে ঘরে যদি কেক বিসকিট্ কিছু থাকে তবে তাই দু-চারটে দে, তাতেই হয়ে যাবে ।

ঘরে কেক ছিল । ঝুমন একটা প্লেটে করে কয়েকটা plum cake ও এক কাপ চা এনে কিরীটীর সামনে টিপয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, দিই না সাহেব কয়েকটা লুচি ভেজে, কতক্ষণ বা লাগবে !

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, ওরে না না । তুই শুতে যা । এতেই আমার হবে, কাল যদি এখানে থাকি তো বেশ করে পেট ভরে খাওয়াস ।

ঝুমন চলে গেল ।

কিরীটী জামার পকেট থেকে চুরোট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে মৃদু টান দিতে লাগল ।...

কিছুক্ষণ ধূমপান করবার পর প্রায়-ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা তুলে নিতে নিতে বললে, Cold tea with a Burma cigar, is a joy for ever

www.boiRboi.blogspot.com

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল কিরীটীর নিজস্ব কবিতা শুনে।

কিন্তু আমার শরীর যে ঘুমে ভেঙে আসছে শঙ্কর, শীঘ্র কোথায় শুতে দিবি বল্? কিরীটী শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

শঙ্কর নিজের ঘরেরই এক পাশে একটা ক্যাম্প খাটে কিরীটীর শোয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

কিরীটী শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে লেপটা টেনে নিল।

পরের দিন সকালে শঙ্কর ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

এমন সময় একজন সাঁওতাল কুলি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

বাবু, হুজুর মালিক এসেছেন গো—

মালিক? কখন এলেন তিনি?

কাল রাতে বাবু।

কে কাল রাতে এসেছেন শঙ্কর?

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি খোলা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে কিরীটী।

খনির মালিক সুধাময়বাবু কাল রাত্রে এসেছেন।

যা, তাড়াতাড়ি মনিবের সঙ্গে একবার মোলাকাত করে আয়।

হ্যাঁ, যাই।

হাত মুখ ধুয়ে শঙ্কর তখুনি মনিবের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

খনির অল্প দূরে মাঠের মধ্যে একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

খনির দুজন অংশীদার হনুমানপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা আর সুধাময় চৌধুরী। অংশীদারের মধ্যে কেউ কখনো এলে ঐ বাংলো বাড়িতেই ওঠেন। অন্য সময় বাংলো তালা-চাবি দেওয়াই থাকে।

শঙ্কর যখন এসে বাংলো বাড়িতে প্রবেশ করল, সুধাময়বাবু তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসে ধূমায়িত চায়ের সঙ্গে গরম গরম লুচির সদ্ব্যবহার করছেন।

ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ পাঠাতেই শঙ্করের ভিতরে ডাক এল। বহুমূল্য আসবাবপত্রে সাজানো কক্ষখানি গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়।

একটা বেতের চেয়ারে বসে সুধাময়বাবু প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন।

শঙ্কর ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার স্যার।

নমস্কার। বসুন। আপনিই এখানকার নতুন ম্যানেজার শঙ্কর সেন?

আজ্ঞে।

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ, বেশ।

শঙ্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

ওরে কে আছিস, ম্যানেজারবাবুকে চা দিয়ে যা।

সুধাময়বাবু হাঁক দিলেন।

না, না। ব্যস্ত হবেন না। এইমাত্র বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরুচ্ছি।

তাতে আর কী। Add a cup more, কোন harm নেই।

শঙ্কর সুধাময়বাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। মাথার মাঝখানে সিঁথি। চোখা নাক। চোখ দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বেশ লালচে। শিকারী বিড়ালের মত সদাচঞ্চল, অস্থির ও সজাগ। গায়ের রং আব্‌লুশ কাঠের মত কালো। ভদ্র বেশ না হলে সাঁওতালদেরই একজন ধরা যেতে পারে অনায়াসেই। গায়ে বাদামী রংয়ের দামী সার্জের গরম স্যুট।

ভৃত্য চা দিয়ে গেল। শঙ্কর চায়ের কাপটা টেনে নিল।

তারপর মিঃ সেন, আপনাদের কাজকর্ম চলছে কেমন?

মন্দ না। তবে পর পর এমনভাবে খুন হওয়ায় এখানকার কুলিকামিনদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া কাল রাত্রে আমাদের সরকার মশাই বিমলবাবু অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

কে নিহত হয়েছে?

বিমলবাবু।

The villain! Rightly served. I hated him most amongst my employees; but I am also determined to give up my shares. I am really fed-up with all this. ঝুনঝুনওয়ালাও আজই বিকেলের দিকে এসে পৌঁছচ্ছেন। শুনলাম তিনিও বেচে দেবেন তাঁর share।

মনিবকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম দেখে, শঙ্করের বাংলোয় ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো বেজে গেল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধরিত্রীর বুকে যেন রহস্যের যবনিকার মত নেমে এসেছে।

শঙ্করের ডাকবাংলোয় সকলে একত্রিত হয়েছে। খনির দুই অংশীদার সুধাময় চৌধুরী ও হনুমানপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা, সুব্রত, কিরীটী, দারোগাবাবু ছদ্মবেশে ও শঙ্কর নিজে। কিরীটী বলেছে আজ অপরাধী কে সকলের সামনে প্রকাশ করে বলবে এবং হাতে হাতে দারোগাবাবুর জিম্মায় দিয়ে দেবে। সুধাময়বাবু ও ঝুনঝুনওয়ালা দুজনেই

বলেছেন অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারলে দুজনেই পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা কিরীটীকে পুরস্কার দেবেন।

কিরীটী বলতে লাগল : Before I mention the name let me have my reward first of all with the promise that if I fail I will return the same।

সুধাময়বাবু ও ঝুনঝুনওয়ালা দুজনেই হাসতে হাসতে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকার দুখানা চেক লিখে দিলেন, এই নিন।

তাহলে আপনারা সকলে শুনুন।

এই খনি অভিশপ্তও নয়, ভূতের আস্তানাও নয় ; প্রচুর লাভের খনি। এবং আজ পর্যন্ত এই খনিতে যতগুলো খুন হয়েছে তার জন্য সর্বাংশে দায়ী খনির অন্যতম অংশীদার স্বয়ং সুধাময় চৌধুরী।...

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় এতটা কেউ চমকে উঠত না।

প্রবল ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে সুধাময়বাবু প্রচণ্ড হাসির তুফান তুলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এক হাত প্যাণ্টের পকেটে। সহসা পিস্তলের গর্জন শোনা গেল।

গুড়ুম!

উঃ! একটা বেদনার্ত চিৎকার করে সুধাময়বাবু একপাশে টলে পড়লেন এক হাত দিয়ে ডানদিকের পাঁজরা চেপে ধরে, অন্য হাত থেকে একটা রিভলবার ছিট্‌কে পড়ল।

শয়তান! কুকুর! তোকে কুকুরের মতই গুলি করতে বাধ্য হলাম—দারোগা সাহেব গর্জন করে উঠল, নাহলে তুই-ই হয়ত এখনি আমায় গুলি করতিস। জীবনে হয়ত আজ এই প্রথম সত্যিকারের গুলি করতে বাধ্য হলাম, কিন্তু তার জন্য আমার এতটুকুও অনুশোচনা হচ্ছে না। যে নৃশংস এতগুলো খুন পর পর করতে পারে—তার একমাত্র শাস্তিই পাগলা কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরা!

উঃ কিরীটীবাবু, আপনার কথাই ঠিক। অতি লোভ সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমার মৃত্যুর কারণ হল। হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি—আমিই সব খুন করেছি। উঃ!

ধীরে ধীরে হতভাগ্য সুধাময় চৌধুরীর প্রাণবায়ু বাতাসে মিশে গেল।

সহসা যেন নাটকের যবনিকাপাত ঘটল।

ঘরের সব কটি প্রাণীই স্তব্ধ।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

কিরীটী এতক্ষণে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল, এবারে আমি আমার বক্তব্য সব সংক্ষেপে শেষ করব। কেননা আজকের রাত্রের bus-ই আমায় ধরতে হবে। একটা কথা সর্বাগ্রে আপনাদের কাছে খুলে না বললে আমার এই ব্যাপারে explanationটা সহজ-বোধ্য হবে না। বর্তমানে এই যে এখানকার কলিয়ারীটা দেখছেন, পঞ্চাশ বছর আগে এই কলিয়ারীর পাশের ঐ একটা কলিয়ারী হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ ধসে যায় এরূপ কিংবদন্তী আছে। তারপর থেকেই এখানকার আশেপাশের লোকেরা এ জায়গাটা সম্পর্কে নানাপ্রকার মনগড়া বিভীষিকার কথা তুলে এটাকে অভিশপ্ত করে তোলে। এমনি করে দীর্ঘ চল্লিশটা বছর কেটে যায়।

কেউ এর পাশে ঘেঁষে না।

এমন সময় কলিয়ারী শুরু করবার ইচ্ছায় মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা ও সুধাময় চৌধুরী এদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই অভিশপ্ত ফিল্ডটার সন্ধান পান এবং অচিরে এটার লিজ্ নেন নব্বই বছরের জন্য খুব সামান্য টাকায়।

কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে আরও বছর চারেক কেটে যায়।

তারপর কাজ শুরু হল।

কাজ বেশ এগুচ্ছে এবং ফিল্ড থেকে প্রচুর কয়লা উঠছে।

এই সময় শয়তান সুধাময়ের মনে কু-মতলব জাগল। তিনি মনে মনে বদ্ধপরিকর হলেন ঝুনঝুনওয়ালাকে ফাঁকি দিতে। কিন্তু কেমন করে ঝুনঝুনওয়ালাকে সরানো যায় সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন খনির কাজ পরিদর্শন করতে এসে সামান্য অজুহাতে খনির সরকার বিকাশ-বাবু ও ম্যানেজারের অ্যাসিস্টেন্ট সত্যকিংকরবাবুকে বরখাস্ত করে নিজের লোক বিমলবাবু ও চন্দনসিংকে নিযুক্ত করে গেলেন।

চন্দনসিং ও বিমলবাবু ছিল সুধাময়বাবুর ডান ও বাঁ হাত, অপকর্মের প্রধান সঙ্গী বা সহায়ক। বিমলবাবু ও চন্দনসিং সুধাময়বাবুকে সকল সংবাদ সরবরাহ করত ও খনিটা ভৌতিক এই কিংবদন্তীকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য প্রোপাগাণ্ডা চালাত দিবারাত্র নানা ভাবে।

সুধাময়বাবুর রং ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নিজে বহুকাল সাঁওতাল পরগণায় ঘুরে ঘুরে সাঁওতালদের সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তাও পুরোপুরিভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, এবং যাতে করে তিনি অনায়াসেই সাঁওতাল কুলিদের মধ্যে তাদেরই একজন সেজে দিব্যি খোসমেজাজে একের পর এক খুন করে চলেছিলেন। অথচ কেউ কোনদিন সন্দেহ করবার অবকাশ পায়নি।

সুব্রতকে পাঠিয়ে দিয়েই আমি গোপনে পরের দিন সকালেই পাগলের ছদ্মবেশে এখানে চলে আসি এবং চারিদিকে নজর রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করি।

আমার কেন যেন মনে হয়, যে খুন করেছে এইভাবে পর পর ম্যানেজারদের, সে এখানেই সর্বদা উপস্থিত থাকে। কিন্তু কী ভাবে সে এখানে থাকতে পারে? কর্মচারীদের মধ্যে একজন হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাতে চট্ করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে কেমন করে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে? অথচ এ কথা যখন অবধারিত, এখানে সর্বদা উপস্থিত না থাকলে চারিদিক দেখেশুনে তার পক্ষে খুন করা সম্ভব হয় না, তখন নিশ্চয়ই কুলীদের মধ্যেই তাদের একজন হয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শুরু করে দিই।

এবং এখানে আসবার দিন রাত্রে যখন কুলিদের মধ্যে একজন খুন হল, সে-সময় আমি কুলিদের ধাওড়ার মধ্যেই কুলি সেজে উপস্থিত ছিলাম; কুলিটাকে খুন করে সুধাময় কুলির ছদ্মবেশে যখন পালায় তখন আমি অন্ধকারে অনুসরণ করে তার ঘরটা দেখে আসি।

বিমলবাবু ও চন্দনসিংয়ের সাহায্যে নজন কুলিকে রাতারাতি ধানবাদে কাজের অছিলায় হাঁটাপথে রেল লাইন ধরে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে বিদায় করে। মাত্র একজন কুলি নিয়ে বিমলবাবুর সাহায্যে রামলোচনের জামার পকেট থেকে চাবি চুরি ক'রে, খনির মধ্যে নেমে ডিনামাইট্ দিয়ে পিলার ধসিয়ে ১৩নং কাঁথি ভাঙা হয় তাও আমার নজর এড়ায় না। সুব্রত, তুমি রুমালে বাঁধা পলতে ও ডিনামাইট্ পেয়েছ!

পরের দিন সকলে জানল দশজন লোক মারা গেছে। যদিও মারা গেল একজন মাত্র। এটা শুধু কুলিদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করবার জন্য সাজিয়ে করা হয়েছিল।

ম্যানেজারদের মারা হয় চারিদিকে সকলের মনে একটা ভয়াবহ আতঙ্ক জাগাবার জন্য, যাতে করে খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিজে শেয়ার ছেড়ে দেবার ভান দেখিয়ে ঝুনঝুনওয়ালাকে দিয়ে তার শেয়ারও বিক্রি করিয়ে বেনামীতে সমগ্র খনিটা কিনে নিলেই কাজ হাসিল হয়ে যায়।

সব কিছু প্রায় হয়ে এল, সুধাময় ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে যখন সব ঠিক করে ফেললে, তখন তার অপকর্মের সহায়ক বিমলবাবু ও চন্দনসিংকে সরাবার মতলব করল।

গতকাল বিমলকে মারলেও চন্দনসিং নাগালের বাইরে পালিয়ে গেল। কেননা প্রভুর মনোগত ইচ্ছাটা সে আগেই টের পেয়েছিল। Metallic nails পরে তাতে

বিষ মাখিয়ে হাতের আঙুলে পরে, তার সাহায্যে গলা টিপে সুধাময় কাজ হাসিল করত। Strangle করবার সময় সেই metallic nails গলার মাংসে বসে গিয়ে বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটাত। এখন কথা হচ্ছে, শার্দূলের ডাক যেটা শোনা যেত সেটা আর কিছুই নয় সুধাময় নিজেই মুখ দিয়ে বাঘের হুবহু অনুকরণ করতে পারত। তোমরা হয়ত শুনে থাকবে এক-একজন অবিকল পশুপক্ষীর ডাক মুখ দিয়ে অনুকরণ করতে পারে। এটা একটা মানুষকে ভয় দেখাবার ফন্দি। তাছাড়া খুব উঁচু হিলওয়ালা একপ্রকার কাঠের জুতো পরে গায়ে একটা ধূসরবর্ণের ওড়না চাপিয়ে সুধাময় মাঠের মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে চলত। একে সে একটু বেশিরকম লম্বা ছিল, তার ওপরে ওই কাঠের জুতো পরাতে তাকে বেশ অস্বাভাবিক রকম বলে মনে হত। কাঠের জুতো ব্যবহার করবার মধ্যে আর একটা মতলব তার ছিল; পায়ের ছাপ পড়ত না। সুব্রতকে মারবার জন্য একটা সাঁওতাল কুলিকে সুধাময়বাবুই engage করেছিলেন; কুলিটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ল, কিন্তু unsuccessful হল। কিন্তু সুব্রতকে তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুধাময়ও লোকটাকে গুলি করে মারে। আমি সেই সময় ওদের পেছনে follow করতে করতে উপস্থিত ছিলাম বলে সব ব্যাপারই নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। এই হল এখানকার খনির মৃত্যুরহস্য।

কিরীটী চুপ করল।

আমাদের গল্পও এইখানেই শেষ হল।

অলোকলতা

www.boiRboi.blogspot.com

॥ এক ॥

আমন্ত্রণটা জানাল এবার মণিকাই।

পৃথক পৃথক ভাবে মণিকা পত্র দিল তার প্রিয় তিন বন্ধু অতুল, রণেন ও সুকান্তকে।

এবারে পূজার ছুটিতে এস বেনারস, কাশী। কাশীতে দিদিমার বাড়িতে ছুটিটা এবারে কাটানো যাবে।

আপত্তি আর কি থাকতে পারে! প্রত্যেকবারই পূজায় ছুটির কয়েকটা দিন চারজনে মিলে কোথাও না কোথাও গিয়ে হৈ হৈ করে কাটিয়ে আসে।

গতবারে গিয়েছিল ওরা লক্ষ্ণৌ, তার আগেরবার শিলং। এবারে না হয় কাশীই হোক।

জায়গাটা তো আর বড় কথা নয়। সকলে মিলে কয়েকটা দিনের জন্য এক জায়গায় একত্রে মিলিত হয়ে হৈ হৈ করে আনন্দ করা। তা সে লক্ষ্ণৌই হোক, শিলংই হোক বা কাশীই হোক—এমন কি পাতাল বলে সত্যি যদি কিছু থাকত সেখানে যেতেও আপত্তি ছিল না। অবিশ্যি কাশীতে মণিকার দিদিমার ওখানে ছুটি কাটানো যে এই প্রথম তা নয়।

বছর তিনেক আগে একবার পূজাবকাশটা ওরা কাশীতে মণিকাদের ওখানেই কাটিয়েছিল এবং সেবারে বেশ কিছুদিনই কাশীতে ওরা থেকেছিল।

তার কারণও অবশ্য একটা ঘটেছিল।

ছুটির মাঝামাঝি হঠাৎ মণিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে সামান্য অল্প অল্প জ্বর—কিন্তু তিন-চারদিনেও সেই অল্প অল্প জ্বর যখন গেল না এবং ক্রমে জ্বরের সঙ্গে দু-একটা করে উপসর্গ দেখা দিতে লাগল তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত রোগটা গিয়ে টাইফয়েডে দাঁড়ায় এবং পুরো এক মাস লাগে মণিকাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে।

কাজেই দশ-পনের দিনের জায়গায় মাসখানেকের কিছু উপরেই সকলকে থাকতে হয়েছিল কাশীতে সেবারে।

এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে যে সকলেরই কাশীতে মণিকাদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল না, তাও নয়।

মণিকার দিদিমা ছিলেন কাশীতে।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাশীবাসিনী।

মণিকারও ত্রিসংসারে ঐ এক বুড়ী দিদিমা ছাড়া আপনার জন বলতে কেউ ছিল না।

মণিকা এম. এ. পাস করে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কলকাতাতেই থাকে। অথচ বুড়ী দিদিমাকে সর্বদা কাশীতে দেখাশোনা করবারও একজন কারও দরকার। বুড়ী দিদিমার জন্য মণিকার সর্বদাই একটা দুশ্চিন্তা।

কাশীতে অবিশ্যি সেরকম স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না, কিন্তু দিদিমার খুঁতখুঁতে মন, কাউকেই তেমন পছন্দ হয় না।

এমন সময় দেশের গ্রাম থেকে নিরাশ্রয়া সুবালা গ্রামের একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তীর্থপর্যটন করতে করতে কাশীতে এসে উঠল মণিকাদেরই বাড়িতে।

সুবালা ব্রাহ্মণের মেয়ে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়।

সুবালা অভাগিনী। ছোটবেলায় মা বাপকে হারায়। মামা মামীর কাছেই মানুষ। গ্রামের স্কুলে লেখাপড়াও কিছু শিখেছিল এবং মামা মামীর চেষ্টাতেই এক-প্রকার নিখরচায়ই এক মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে বিবাহও হয়েছিল সুবালার। মেধাবী ছাত্রটি সুবালার রূপে মুগ্ধ হয়েই স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিল সুবালাকে।

শুধু রূপসী বললেই সুবালা সম্পর্কে যেন সবটুকু বলা হয় না।

আগুনের মত রূপ ছিল সুবালার।

প্রখর সে রূপের জৌলুসে পুরুষ তো ছার, মেয়েদের চোখই ঝলসে যেত।

কিন্তু বিনা পণে বিবাহের বাজারে রূপের জৌলুসে বিকিয়ে গেলেও সুবালার স্বামীভাগ্য ছিল না। তাই বিবাহের পর ছ'মাস না যেতেই সুবালা হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর মুছে মামা মামীর কাছে ফিরে এল।

এবং দুর্ভাগ্য যখন আসে একা আসে না—মামার গৃহে ফিরে আসবার মাসখানেকের মধ্যেই মামা গেলেন মারা।

সংসারে চক্ষুশূল হয়ে উঠল সুবালা শীঘ্রই সকলের।

দুঃখের অপমানের অন্ন তিক্ত হতে তিক্ততর হয়ে উঠতে লাগল সুবালার মুখে দিন যত যায়।

মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায় রাত্রি ও দিনের মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল।

এমনি করে অনেকগুলো বছর কেটে গেল বৈধব্যের।

তারপর একদিন গ্রামের একদল প্রবীণা তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এসে কাশীতে মণিকার দিদিমার ওখানে উঠল সুবালা।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সুবালা অতি সহজেই মণিকার দিদিমার স্নেহকে জয় করে নিল।

ফলে যাবার সময় সকলে ফিরে গেল, কিন্তু সুবালা থেকে গেল মণিকার দিদিমার ওখানেই।

সেও আজ বছর পাঁচেকের কথা।

সুবালাকে পেয়ে মণিকার দিদিমাও নিশ্চিন্ত হলেন এবং মণিকাও দিদিমা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হল।

রান্না ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ সুবালা তো করেই, অবসর সময় ভাগবত রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদিও পড়ে শোনায় মণিকার বুড়ী দিদিমাকে।

সুবালার অল্প বয়স ও আগুনের মত রূপ দেখে প্রথমটায় মণিকার বুড়ী দিদিমা মনে মনে একটু ইতস্তত করেছিলেন সুবালাকে গৃহে স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা।

কিন্তু দেখা গেল বয়স অল্প ও আগুনের মত রূপ থাকলেও সুবালার চরিত্রে একটা সংযত আভিজাত্য আছে ও সেই সঙ্গে আছে একটা অদ্ভুত নিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ। ছ্যাবলা নয়, অত্যন্ত সংযমী। ধীর-স্থির।

নিশ্চিন্ত হলেন মণিকার বুড়ী দিদিমা।

সুবালার চরিত্রে আর একটি গুণ ছিল, আলসেমিকে সে কখনও এতটুকু প্রশ্রয় দিত না। সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সময়টা সুবালা বই পড়ে অথবা উলের বা সেলাইয়ের কাজ করে কাটাত।

পাড়ার গৃহস্থদের উলের ও সেলাইয়ের কাজ করে সুবালা দু'পয়সা বেশ উপার্জনও করত।

কাশীতে মণিকার দিদিমার বাড়িটা জঙ্গমবাড়ির একটা গলির মধ্যে।

সেকেলে ধরনের তিনতলা পুরাতন বাড়ি।

বাড়িটা বছর পনের-ষোল আগে চাকরিতে অবস্থানকালেই মণিকার দাদু কাশীশ্বর চৌধুরী কিনেছিলেন একটা মৌকায় মাত্র পাঁচ হাজারে।

সংসারে তাঁর আপনার বলতে ছিল স্ত্রী সারদা ও একমাত্র নাতনী মণিকা।

মণিকা কাশীশ্বর চৌধুরীর একমাত্র সন্তান কন্যা রেণুকারও একমাত্র সন্তান। বহু অর্থব্যয় করে মনোমত পাত্রে কন্যা রেণুর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু মণিকার যখন মাত্র চার বৎসর বয়স তখন একটা রেল অ্যাকসিডেন্টে জামাই ও মেয়ে একসঙ্গে মারা গেল। সেই হতে মণিকা দাদু ও দিদিমার স্নেহযত্নেই মানুষ।

কাশীশ্বরের ইচ্ছা ছিল সরকারের চাকরি হতে অবসর নেওয়ার পর জীবনের বাকী কটা দিন দেবাদিদেবের লীলাভূমি কাশীধামেই নিঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু মানুষ

ভাবে এক হয় আর। পেনশন নেওয়ার মাত্র যখন মাস চার-পাঁচ বাকী হঠাৎ এমন সময় অকস্মাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে কর্মস্থল হতে ফিরে করোনারী থ্রম্বোসিসে এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন কাশীশ্বর।

প্রথম ও একটিমাত্র আক্রমণেই সব শেষ হয়ে গেল।

মণিকা সেবারে আই. এ. পরীক্ষার জন্য কলকাতার হস্টেলে থেকে প্রস্তুত হচ্ছে।

মণিকার দাদু তখন মৌরাটে কার্যস্থলেই ছিলেন। সেখানেই ঘটল দুর্ঘটনা।

তার পেয়ে কলকাতা হতে মৌরাটে মণিকা ছুটে গেল।

এবং মৌরাট থেকে সোজা এসে দিদিমাকে নিয়ে উঠল কাশীর বাড়িতে।

বাড়িটা খালিই, তালা দেওয়া ছিল। ভাড়া দেওয়া হয়নি কখনও।

কটা দিন কাশীতে থেকে সাধ্যমত সব গোছগাছ করে দিয়ে মণিকা আসন্নবর্তী পরীক্ষার জন্য আবার ফিরে গেল কলকাতায়।

বুড়ী দিদিমার একমাত্র বন্ধন মণিকা ম্যাট্রিক পাস দেওয়ার পর হতেই কলকাতায় হস্টেলে সেই যে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে—সেই যেন পাকাপোক্তভাবে তার দিদিমার আশ্রয়-নীড় হতে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। ক্রমে হস্টেল-জীবনেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একটি নিজের একান্তভাবে একেবারে নিজের ঘর বাঁধবার স্বপ্ন যে বয়েসে মেয়েদের মনে এসে বাসা বাঁধে ঠিক সেই বয়েসেই হস্টেলের স্নেহবন্ধনহীন ভাসা-ভাসা জীবনের মধ্যে পড়ে কেমন যেন দায়িত্বহীন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে সে। হস্টেলে থেকেই একটার পর একটা পরীক্ষা পাস করে দিল্লীর এক কলেজে চাকরি নিয়ে আবার সেই হস্টেল-জীবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাড়ির সঙ্গে ও দিদিমার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এখন মাসান্তে এক-আধখানা চিঠিতে এসে পর্যবসিত হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটিটা যদিও এসে কাশীতে দিদিমার কাছে কাটিয়ে যায়, পুজোর ছুটিতে তাও আসে না। তিন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে ছুটিটা কাটায়।

দিদিমার সঙ্গে মণিকার সম্পর্কটি কিন্তু বড় মধুর। মেয়ে-বন্ধু মণিকার একজনও নেই। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা উঠলে বলে, মেয়েদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব হয় নাকি! মনের পরিধি বা ব্যাপ্তি ওদের মধ্যে কোথায়? ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই তো ওরা মশগুল থাকে।

মণিকার বন্ধু অতুল, রণেন ও সুকান্ত দিদিমার পরিচিত।

মধ্যে মধ্যে দিদিমা ঠাট্টা করেছেন নাতনীকে, 'আচ্ছা মণি, এইভাবে বাউণ্ডুলের মত চাকরি নিয়ে হস্টেলে না থেকে তোর ঐ তিন বন্ধুর মধ্যে যাকে হোক একজনকে বিয়ে করেই না হয় সংসার পাত্ না!

এইবার তুমি ঠিক বলছে দিদিমা। একজনকে বিয়ে করি আর দুজন মুখ গোমড়া করে বসে থাকুক। জবাবে বলেছে মণি।

দিদিমাও হাসতে হাসতে বলেছেন, তাহলে না হয় কলির দ্রৌপদী হয়ে ওদের তিন-জনকেই একসঙ্গে বিয়ে কর্ ভাই।

ভুলে যাচ্ছ কেন দিদিমা, এটা কলি যুগই। এ যুগে দ্রৌপদীদের সতী বলে কেউ ভোরবেলায় স্মরণ করে না—স্বৈরিণী বলে কলঙ্ক রটায়। তাছাড়া বিয়ে করা মানেই তো দুজনকে হারানো, এতদিনের বন্ধু ওরা আমার, ওদের একজনকেও হারাতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত দেখিস ভাই, ওই তিনের বন্ধুত্বই একদিন না তোর পক্ষে বিষ হয়ে ওঠে! কথায় বলে মেয়ে-পুরুষ!

এত বছরেও যখন বিষ হয়নি—বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে অমৃত হয়ে থাকবে।

হলেই ভাল। দিদিমা আর প্রসঙ্গটাকে টানতে চাননি। ওই তিন বন্ধুকে নিয়ে দিদিমার কথা ছেড়ে দিলেও, মণিকাকে কম নিন্দা ও গ্লানি সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু কোন নিন্দাকেই যেন মণিকা গায়ে মাখতে চায়নি।

অনেকদিন বাদে পূজাবকাশের কয়েকটা দিন আনন্দে হৈচৈ করে কাটাবে বলে মণিকার ওখানে এল সকলে কাশীতে। কিন্তু পূজাবকাশের আনন্দঘন দিনগুলোর মধ্যে আকস্মিকভাবে এমনি করে যে ভয়াবহ মৃত্যুর নিষ্ঠুর কালো ছায়া নেমে আসবে এ কেউ কি ওরা স্বপ্নেও ভেবেছিল! আগের রাত্রে যখন একত্রে সকলে মিলে বসে প্রায় সাড়ে এগারটা পর্যন্ত হৈ হৈ করে তাস খেলেছে, তখনও তারা বুঝতে কি পেরেছিল রাত্রি প্রভাত হবে দলের একজনের জীবনাবসানের ভিতর দিয়ে! বুঝতে কি পেরেছিল ওরা কেউ চারজনের মধ্যে একজনও যে তাদেরই একজনের পশ্চাতে মৃত্যু এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে! অমোঘ অনিবার্য। অতুল, রণেন, সুকান্ত ও মণিকা। চারজনের মধ্যে যে কেবল দীর্ঘদিনের আলাপ-পরিচয় তাই নয়—নিবিড় ঘনিষ্ঠতাও ছিল। চারজনই অবিবাহিত। অতুল সাইকোলজির প্রফেসার, রণেন ডাক্তার, সুকান্ত ইঞ্জিনীয়ার, আর মণিকা প্রফেসার। অতুল, সুকান্ত ও রণেনের মণিকা সম্পর্কে সঠিক মনোভাবটা বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও এবং তিনজনের মধ্যে একজনও কথায়বার্তায় বা আভাসে-ইঙ্গিতে ঘুণাক্ষরে কখনও কিছু না প্রকাশ করলেও এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হত না যে, মণিকা সম্পর্কে একটা দুর্বলতা তিন বন্ধুরই আছে। তিন বন্ধুর মধ্যে সর্বপ্রকার আলোচনাই হত, কেবল দুটি বিষয় নিয়ে কখনও আলোচনা হত না—পরস্পরের বিবাহ ও মণিকা সম্পর্কে। ওই জায়গাটিতে ছিল যেন ওরা অতি সতর্ক। কোনক্রমে কখনও

কোন আলোচনার মধ্যে অতর্কিতেও যদি ঐ দুটি ব্যাপার এসেও যেত, প্রত্যেকেই অতি সতর্কতায় এড়িয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

এদের তিনজনের মধ্যে অতুল ধনী পিতার পুত্র। নিজেও মেধাবী ছাত্র হিসাবে অল্প বয়েসেই ভাল চাকরিও পেয়েছে। রণেন কিছুদিন হল বিলাতী ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা নিয়ে এসে একজন তরুণ চিকিৎসক হিসাবে ক্রমে চিকিৎসা-জগতে নাম করতে শুরু করেছে। রণেনের আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও মোটামুটি। ছাত্র হিসাবে সেও বরাবর মেধাবী ও বৃত্তি পেয়ে এসেছে। দুজনের চেহারার মধ্যে কারোরই এমন বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় ছিল না। তবে স্বভাবে দুজনেই নম্র বিনয়ী ধীর ও সহিষ্ণু। তৃতীয় বন্ধু সুকান্ত গরীবের ছেলে, বাপ গরীব স্কুলমাস্টার। বাপের ক্ষমতা ছিল না ছেলেকে খরচপত্র করে উচ্চশিক্ষায় মনোমত উচ্চশিক্ষিত করে তোলেন। কিন্তু সুকান্তর ভাগ্যক্রমে তার এক সহায় জুটেছিল নিঃসন্তান এক ধনবতী মাসী। মাসী তার মায়েরও বড়। সুকান্তরা চার ভাই ও পাঁচ বোন। ভাইবোনদের মধ্যে সুকান্ত তৃতীয়। সুকান্তকে একপ্রকার দত্তক পুত্রের মতই বরাবর তার মাসী নিজের কাছে রেখে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। সুকান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে একটি বিলাতী ইলেকট্রিক্যাল ফার্মের বড় চাকুরে; মেসোরই সুপারিশে ভাল চাকুরিতে ঢুকেছে বছর দেড়েক হল প্রায়। সুকান্ত তিন বন্ধুর মধ্যে সব চাইতে সুশ্রী। দীর্ঘ পেশল চেহারা, গোরাদের মত টকটকে গায়ের রং। আরও একটি তার গুণ আছে, সে একজন সুকণ্ঠ এবং সুগায়কও। আর মণিকা? মণিকার গায়ের রং কালো হলেও সমগ্র দেহ এমন একটি লাবণ্যে ঢল-ঢল, বিশেষ করে মুখখানি, তার বুঝি তুলনা হয় না। রোগাটে চেহারায় এমন একটি সৌন্দর্যময়ী সজীবতা আছে যে মনে হয় জীবনপাত্রখানি তার বুঝি সুধারসে উছলে উঠছে। সৌন্দর্যময়ী, মাধুর্যময়ী ও লাবণ্যময়ী।

রণেন, সুকান্ত ও অতুল এদের কলেজে আই. এস-সি ক্লাসেই পরিচয়। পূজার ছুটিতে ও গ্রীষ্মের ছুটিতেই বরাবর তিন বন্ধুতে মিলে কোন-না-কোন জায়গায় গিয়ে কিছু হৈচৈ করে আসত। অমনি এক পূজার ছুটিতেই পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রসৈকতেই ওদের পরিচয় হয় প্রথম মণিকার সঙ্গে। মণিকা তখন বি. এ. পড়ছে। মণিকারও অভ্যাস ছিল পূজার ছুটিতে কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যাওয়া। দেশভ্রমণের একটা অদ্ভুত নেশা বরাবরই ছিল তার সেই ছোটবেলা হতেই। পুরীর সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে এসে চারজনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটা ছিল একটা নিত্যকার ব্যাপার এবং প্রতি রবিবারের ছুটিটা বটানিক্সে বা ডায়মণ্ডহারবারে অথবা নৌকো করে গঙ্গায় কিংবা দক্ষিণেশ্বরে,—কোথাও-না-কোথাও

সারাটা দিন হৈচৈ করে কাটতই ওদের চারজনের। একটি মেয়ে ও তিনটি পুরুষের মধ্যে এই হৃদ্যতা বেশ যেন বিচিত্র। এমনি করে ক্রমে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। শিক্ষা-সমাপনান্তে এক-একজন যে-যার কর্মপথে এগিয়ে গেল, ছাড়াছাড়ি হল চারজনের মধ্যে। অতুল গেল হুগলী কলেজে প্রথমে, সেখান হতে কুচবিহারে; রণেন পাটনায় প্র্যাকটিস করতে লাগল, সুকান্ত রইল কেবল কলকাতায়। মণিকা চাকরি নিয়ে গেল দিল্লীতে। কিন্তু পূজা-অবকাশে ঠিক চারজনে কোথাও-না-কোথাও একত্রে এসে মিলিত হত। সমস্ত ছুটিটা হৈচৈ করে কাটিয়ে তারপর আবার এক বৎসরের জন্য যে-যার কর্মস্থানে যেত ফিরে। কেবল সুকান্ত বেশীদিন থাকতে পারত না। দিন-দশেক পরে সে কলকাতায় ফিরে যেত। এইভাবেই তাদের পরস্পরের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় দীর্ঘ আট বৎসর কেটে গিয়েছে। এবারে মণিকার আমন্ত্রণে সকলে পূজার ছুটিতে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। এবং দুর্ঘটনাটা ঘটল সাতদিন পরে। ঠিক কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তিনেক পরে—রাত্রে।

॥ দুই ॥

অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনা।

দিদিমার বাড়ির ঘরগুলো স্বল্পপরিসর বলেই মণিকা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিল শয়নের। একটা ঘরে দিদিমার সঙ্গে মণি নিজের শয়নের ব্যবস্থা করেছিল। বাকী তিনটি ঘরে তিনজনের শোয়ার ব্যবস্থা। দোতলায় ইংরাজী 'E' প্যাটার্নের পরিকল্পনায় চারিখানি ঘর। প্রথম ঘরটিতে অতুল, দ্বিতীয় ঘরে রণেন, তৃতীয় ঘরে মণি, তার দিদিমা ও সুবালাদি এবং শেষ ঘরে সুকান্ত। রাত সাড়ে এগারটার পর তাস খেলা শেষ হলে যে-যার ঘরে শুতে যায়। পরের দিন প্রত্যুষে মণি অন্যান্য দিনের মত প্রভাতী চা তৈরী করে প্রথমে ঘুম ভাঙিয়ে সুকান্তকে চা দেয়, তারপর ডেকে তোলে রণেনকে এবং চা দেয়। সর্বশেষে অতুলের ঘরের ভেজানো দ্বার ঠেলে ডাকতে গিয়ে দেখে অন্যান্য দিনের মত তার দরজায় ভিতর হতে খিল তোলা নেই, খোলাই আছে। একটু যেন আশ্চর্যই হয় মণিকা, অতুলের চিরদিনের অভ্যাস—সে কখনও শয়ন-ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ না করে শোয় না। এখানে আসবার পরও গত সাতদিন সকালে অন্ততঃ চার-পাঁচবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডেকে তবে মণিকে দরজা খোলাতে হয়েছে। দরজা প্রথম ধাক্কাতেই খুলে যেতে বেশ একটু বিস্মিত হয়েই চায়ের কাপ হাতে মণি

অতুলের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

অতুল চেয়ারের ওপর বসে আছে। চায়ের কাপটি হাতে এগুতে এগুতে ঠাট্টা করেই মণি বলে, কি ব্যাপার বল তো অতুলানন্দ স্বামী!

সকলের নামের সঙ্গেই তিন বন্ধুকে একটা 'নন্দ' যোগ করে স্বামী বলে ডাকে মণি। ওরা তিন বন্ধুই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, আমরা ত্রয়ী ঘোরতর সংসারী। স্বামীজী মোটেই নই!

মণিকা ঠাট্টা করে বলেছিল, উঁহু, এ ঠিক তা নয়। এ অনেকটা দুধের সাধ ঘোলে মেটানো আর কি।

একত্রে যুগপৎ সকলেই প্রশ্ন করে, তার মানে, তার মানে?

উঁহু। Thus far and no further! কতকগুলো এমন ব্যাপার আছে সংসারে যার রহস্যটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেলেই সকল মাধুর্য তার নষ্ট হয়ে যায়।

এই ব্যাপারের পরেই কিন্তু একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। যদিচ তিন বন্ধু জানে আজ পর্যন্ত একজন ব্যতীত বাকী দুজন সে ঘটনা সম্পর্কে একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু মণিকা জানে তিন বন্ধুর প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা করে তাকে একই অনুরোধ জানিয়েছে এবং প্রত্যেককেই মণিকা একই জবাব দিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে নিবৃত্ত করেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে মণিকার বন্ধুদের ঐ ধরনের সম্বোধনের কিছুদিন পরেই একদিন অতুল বলে, মণি, তুমি নিশ্চয়ই জান আমাদের চারজনের বন্ধুত্বের মধ্যে কোথাও এতটুকু গলদ নেই। তোমার সেদিনকার রহস্যজনক উক্তি বুঝতে পারিনি মনে কোরো না।

মণি কৌতুক হাস্যের সঙ্গে অতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, বুঝতে পেরেছ! কি বল তো অতুলানন্দ স্বামী?

সত্যি, ঠাট্টা নয়! Be serious মণি!

I am serious—go on! মণি গম্ভীর হবার ভান করে।

তুমি যদি আমাদের তিনজনের মধ্যে কাউকে বিয়ে কর, জেনো, বাকী দুজন আমরা এতটুকুও দুঃখিত হব না।

সত্যি বলছ?

ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলছি, সত্যি।

নাস্তিকের মন নিয়ে আর ভগবানকে টানাটানি কোরো না অতুলানন্দ স্বামী।

বিশ্বাস কর আমি যা বলছি—

করলাম, কিন্তু আমার নিজস্ব একটা মতামতও তো থাকতে পারে এ ব্যাপারে!

নিশ্চয়ই।

তাহলে শোন, বিধাতা এ জীবনে বোধ হয় আমার ঘর বাঁধার ব্যাপারে বিষম একটা কৌতুক করে বসে আছেন!

মানে?

মানে তোমাদের তিনজনের মধ্যে এমন বিশেষ বিশেষ কতকগুলো গুণ আছে, একমাত্র যাদের সমন্বয়েই আমি বিবাহে স্বীকৃত। অতএব বুঝতেই পারছ তা যখন এ জীবনে হবার নয় তখন—

তাহলে আর কি হবে?

তাই তো ভেবেছি এ জীবনের তপস্যা পরজন্মে মনোমত পতিলাভ।

পরে রণেন ও সুকান্তও ঠিক অনুরূপ অনুরোধই জানিয়েছিল মণিকাকে এবং মণিকাও পূর্ববৎ জবাবই দিয়েছিল তাদেরও।

কিন্তু মণিকার সম্বোধনেও অতুল কোন সাড়া দেয় না। আরও একটু এগিয়ে এসে মণিকা বলে, কি গো অতুলানন্দ স্বামী, চেয়ারে বসে বসে ঘুমোচ্ছ নাকি?

এবারেও সাড়া না পেয়ে ভাল করে তাকায় মণিকা অতুলের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে ও, হাত হতে চা-ভর্তি কাপটা মাটিতে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে গুঁড়িয়ে যায়। অত্যন্ত ধীরস্থির মণিকা চিরদিন—সাধারণতঃ মেয়েরা যে স্নায়বিক হয় আদপেই সে ধরনের সে নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে শিথিল হাত হতে চায়ের কাপটা পড়ে মাটিতে চূর্ণ হয়ে যাবার ঠিক পূর্বে ক্ষণেকের জন্য সম্মুখেই উপবিষ্ট নিশ্চল অতুলের মুখের দিকে তাকিয়েই যেন একটা ভয়ের অনুভূতি তাকে বিকল করে দিয়েছিল। অস্ফুট একটা আর্ত শব্দ কোনমতে চাপতে চাপতে ছুটে ঘর হ'তে বের হয়ে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকে, রণেন, সুকান্ত—শিগগিরী!

সুকান্ত সবে তখন চায়ের কাপটি শেষ করে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল শয্যার পাশেই মেঝেতে হাত বাড়িয়ে, এবং শয্যা হতে তখনও সে গাত্রোত্থান করেনি। আর রণেন চায়ের কাপ অর্ধেক নিঃশেষ করেছে। মণিকার চাপা আর্ত ডাকটা উভয়েরই কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই প্রায় একসঙ্গে দু ঘর হতে বের হয়ে আসে সামনের বারান্দায়। মণিকার সর্বশরীর তখনও উত্তেজনায় কাঁপছে। একবার মাত্র ওদের ডেকেই যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মুখখানা তার ভয়ে ও উত্তেজনায় কেমন হয়ে গিয়েছে। একটা বিবশ অসহায় নিষ্ক্রিয়তা।

দুজনেই ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি? কি হয়েছে মণি?

অতুল—কোনক্রমে মণিকা কেবল নামটাই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়।

অতুল! কি হয়েছে অতুলের? সুকান্ত প্রশ্ন করে, কিন্তু রণেন ততক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে অতুলের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

কি? কি হয়েছে অতুলের? সুকান্ত আবার প্রশ্ন করে।

কিন্তু মণিকার কণ্ঠে কোন জবাব আসে না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুকান্তর মুখের দিকে, অগত্যা সুকান্তও ঘরের মধ্যে যায়। মণিকা তাকে অনুসরণ করে আচ্ছন্নভাবে যন্ত্রচালিতের মত।

নির্বাক স্থির জড়পদার্থের মত দাঁড়িয়ে আছে রণেন চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট অতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

অতুল!

অতুলের গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সমস্ত মুখখানার ওপরে একটা কালো ছায়া পড়েছে। চোখ দুটি খোলা এবং আতঙ্কে বিস্ফারিত। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ—অসহায় শিথিল—চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে। হাঁটু দুটো একটু ভাঁজ করা। বারেক মাত্র তাকিয়েই কারও বুঝতে কষ্ট হয় না যে অতুল মৃত। ডাক্তার রণেনের পক্ষে তো নয়ই, সুকান্তরও বুঝতে দেরি হয় না অতুল মৃত।

গত রাত্রে আহারাদির পর সাড়ে নটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত চারজনে একত্রে সুকান্তর ঘরে বসে তাস খেলেছে। এবং তাস খেলতে খেলতে প্রত্যহ যেমন হৈ-হুল্লোড় হাসি-তামাশা হয় তেমনিই হয়েছে। বরং গত রাত্রে যেন একটু বেশীই কৌতুকপ্রিয় দেখা গিয়েছিল অতুলকে। এমনিতেই কারণে অকারণে অতুল একটু বেশী হাসে, গত রাত্রে তার সে হাসির মাত্রা যেন অন্যান্য দিনের চাইতে একটু বেশীই বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অতুল।

কোন রোগ ছিল না তার দেহে। সুকান্ত ও রণেন তবু মধ্যে মধ্যে অসুখে বা পেটের গোলমালে ভুগেছে, কিন্তু গত সাত-আট বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও অতুলকে অসুস্থ হতে দেখা যায়নি। সে সবার চাইতে বেশী পরিশ্রমী—চঞ্চলও সে সকলের চাইতে বেশী তিনজনের মধ্যে। সেই নীরোগ সুস্থ অতুল! হঠাৎ তার এমন কি হল যে হঠাৎ চেয়ারে বসে বসেই তার প্রাণ বের হয়ে গেল! প্রথমটায় প্রায় মিনিট দশেক তিনজনের মধ্যে কারও মুখেই কোন কথা সরে না। তিনজনেই যেন বোবা নিশ্চল। অতুলের মৃত্যু শুধু অভাবনীয় নয়, যেন চিন্তারও অতীত।

অনেকক্ষণ মৃত অতুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ওরা তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। সকলের বোবা দৃষ্টিতে যেন একটি মাত্র প্রশ্ন: এ কি হল?

শরৎ-প্রভাতের সোনালী আলো মুক্ত বাতায়নপথে ঘরের মধ্যে এসে যেন সেই

প্রশ্নই করছে, কি হল ?

জানলার পাল্লার উপরে একটা চড়ুই পাখি লাফালাফি করে কিচিরমিচির শব্দ করছে। দিদিমা এখনো গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফেরেননি। দাই জান্‌কীয়ার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, সুবালাদির সঙ্গে নিত্যকার ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা নিয়ে খিটিমিটি চলেছে নীচে। দিদিমার দক্ষিণ হস্ত ঐ সুবালাদি। আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর গাঁ হতে এসে দিদিমার আশ্রয়েই থাকেন। একবেলা রান্না সুবালাদিই করেন। মণিকা ঘরে এলেও বেশীক্ষণ কিন্তু দৃশ্যটা সহ্য করতে পারে না। ঘরের বাতাসে যেন এতটুকু অক্সিজেনও নেই, কেমন যেন শ্বাসরোধ করছে।

মণিকা বারান্দায় বের হয়ে এল। রেলিংয়ের সামনে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে বেশ খানিকটা আকাশ দেখা যায়। শরতের আকাশ। পেঁজা তুলোর মত কয়েক টুকরো মেঘ নীল আকাশের বুকে ইতস্তত সঞ্চরণশীল। প্রাণের সংবাদ নিয়ে সকালে সূর্যের আলো দিগন্ত প্লাবিত করে দিচ্ছে। এই শুচিস্নিগ্ধ প্রভাতের প্রশান্তিতে কেন মৃত্যু এল! অতুল! অতুল! গত সাতদিনের খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ছে। গতকালও এমন সময় অতুলের ঘরে বসেই চা পান করছিল ও।

অতুল বলছিল চা পান করতে করতে, এ যাত্রায় তার বেশীদিন থাকা হবে না, দু-চারদিনের মধ্যেই এবারে তাকে বম্বে রওনা হতে হবে। সেখানে কিসের একটা কনফারেন্স আছে। পরশুদিন সকলে মিলে সারনাথ গিয়েছিল। রণেন ও সুকান্ত ভিতরে ছিল, মণিকা আর অতুল বাইরে বেড়াচ্ছিল। সূর্যের শেষ আলোটুকু নিঃশেষ হতে চলেছে তখন পৃথিবীর বুক হতে।

চারদিকে আবছা আলোর একটা ম্লান বিধুর বিষণ্ণতা।

অতুল হঠাৎ বললে, একটা কথা এবারে আমি তোমাকে বলব স্থির করেছি মণি।

কৌতুকস্মিত কণ্ঠে মণিকা জবাব দিয়েছিল, বলবেই যখন স্থির করেছ অতুলানন্দ স্বামী, বলেই ফেল চট্‌পট। মনের মধ্যে আর পুষে রেখো না। বেশীক্ষণ পুষে রাখলে জমাট বেঁধে যাবার আবার ভয় আছে।

না, না—ঠাট্টা নয়—

ঠাট্টা যে নয় সে তো বুঝতেই পারছি। তবে আর বিলম্ব কেন ? বলেই ফেল। হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল মণিকা।

আমি বিবাহ করব স্থির করেছি—কথাটা যেন কোনমতে উগরে দেয় অতুল।

সুসংবাদ। কবে ? কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় মণিকা অতুলের মুখের দিকে।

যবে কনে বলবে প্রস্তুত—সেই দিনই।

কেন, কনে কি এখনও প্রস্তুত নয়? আবার সেই কৌতুক জেগে ওঠে কণ্ঠে মণিকার।

বুঝতে পারছি না।

বল কি! তবে কি রকম বিয়ের ঠিক করলে? হাসতে শুরু করে মণিকা, কনের মনের সংবাদই এখনো মিলল না, অথচ স্থির করে ফেললে বিয়ে করছ!

তাই তো কনেকে শুধাচ্ছি—

বুঝেও যেন না বোঝার ভান করে মণিকা বলে, মানে?

সেই জবাবই তো চাই তোমার কাছে মণি—

ক্ষণকাল মণিকা চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমার জবাব তো তুমি পেয়েছ অনেক দিন আগেই অতুল। আমি তোমাদের তিনজনকেই ভালবাসি। এবং সেই ভালবাসার মধ্যে আমি বিচ্ছেদ বা দুঃখ আনতে চাই না।

এ ধরনের platonic ভালবাসার কোন অর্থই হয় না। আর জান, এ ভালবাসায় আমি তৃপ্তও নই। আমি চাই আমার ভালবাসাকে পরিপূর্ণভাবে একান্তভাবে আমারই করে পেতে। জীবনের সর্ব ব্যাপারে ভাগ দিতে ও ভাগীদার হতে আমি রাজী আছি, কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারে নয়।

কিন্তু এতদিন তো তুমি তাতেই তৃপ্ত ছিলে, অতুলানন্দ!

না। সে তোমার ভুল।

ভুল?

হ্যাঁ। একেবারেই ভুল।

এর পর নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, তারপর বলে, আমাকে তুমি ক্ষমা কর অতুল।

না, না। না আজ আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে মণি।

মণিকা নির্বাক।

কি, চুপ করে রইলে যে?

কি বলব বল। সবই তো তোমরা জান। আমাকে পাওয়ার চিন্তা তুমি ভুলে যাও।

তা আর সম্ভব নয় মণি। গত তিন বৎসর যুদ্ধ করে নিজের সঙ্গে আমি আজ ক্ষত-বিক্ষত। এই আমার শেষ সংকল্প। আমি তোমায় চাই। অতুল হাত বাড়িয়ে আবেগের সঙ্গে মণিকার একখানা হাত অন্ধকারেই চেপে ধরে, মণি!

হাত ছাড় অতুল। অধীর হয়ো না। এত বড় বন্ধুত্বকে ক্ষুণ্ণ হতে দিয়ো না।

হঠাৎ এমন সময় শুকনো পাতার উপর কার যেন দ্রুত পলায়মান পদশব্দ শোনা গেল। দুজনেই চকিত হয়ে প্রশ্ন করে, কে? কে?

ইতিমধ্যে দুজনের একজনেরও খেয়াল হয়নি কখন একসময় সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গিয়েছে।

খেয়াল হতেই মণিকা বলে ওঠে, উঃ, দেরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রণেন আর সুকান্তর এখনও পাত্তা নেই কেন? ওরা আবার কোথায় গেল?

অল্প দূরেই এমন সময় সুকান্তর গলা শোনা যায়, অতুল, মণি, তোমরা কোথায়? বাড়ি ফিরবে না? টাঙ্গাওলা যে তাগাদা দিচ্ছে।

একটু এগুতেই সুকান্ত ও রণেনের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।

ও সম্পর্কে দুজনের মধ্যে গত দু'দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর কোন আলোচনাই হয়নি।

মণিকার দু'চোখের কোল জলে ভরে ওঠে। নীচে দিদিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কৃষ্ণের শতনাম করতে করতে গঙ্গাস্নান সেরে এই বোধ হয় তিনি ফিরলেন।

॥ তিন ॥

রণেন আর সুকান্ত পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। পরস্পরের দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি যেন একই প্রশ্ন চোখের তারায় ফুটে উঠলেও মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না। সুকান্তই প্রথমে কথা বললে দুজনের মধ্যকার বিশ্রী স্তব্ধতাটা ভেঙে, ভাবতেই পারছি না আমি রুণু—সত্যি সত্যিই অতুল আমাদের মারা গিয়েছে!

কিন্তু কি করে মরল তাই ভাবছি।

সেটা পরের কথা। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য বল?

মৃত্যুটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদের এখুনি নিকটবর্তী থানায় একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। মৃদু কণ্ঠে রণেন বলে।

থানায়! মানে পুলিসে! কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে সুকান্ত যেন কেমন নিজেই চমকে ওঠে। কণ্ঠস্বরে একটা সুস্পষ্ট ভীতির আভাস পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, থানায় সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে একজন বাইরের ডাক্তারকে ডাকলে হত না? রণেন যেন নিজেকেই

নিজে প্রশ্ন করার ছলে কথাটা বলে।

ডাক্তার! ডাক্তার এসে এখন কি করবে? তাছাড়া তুমিই যখন উপস্থিত আছ! সুকান্ত জবাবে বলে।

বাইরের একজন ডাক্তারেরও প্রয়োজন বইকি। একটা death certificate-ও তো চাই সৎকার করতে হলে মৃতদেহ!

কেন, তুমি?

না, আমার পক্ষে death certificate দেওয়া ভাল হবে না।

তবে?

ডাঃ মজুমদারকেই না হয় তাহলে ডাকা যাক।

বেশ। তাই হোক।

ডাঃ বিলাসবিহারী মজুমদার পাড়াতেই থাকেন। তাঁকেই ডেকে আনতে গেল রণেন।

এদিকে মণিকার বুড়ী দিদিমার কাছে কিন্তু আর চাপা রইল না দুঃসংবাদটা। সুকান্তই জানাল। বুড়ী অতুলকে মৃত দেখে একেবারে কেঁদে ফেললেন। দীর্ঘদিনের পরিচিত এই ছেলে তিনটি বুড়ীর। এবং এই দীর্ঘদিনের পরিচয়ে একটা স্নেহের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল এদের সঙ্গে। বুড়ী দিদিমা অতুল, রণেন ও সুকান্তকে নিজের জনের মতই দেখতেন।

সুবালাদিও সব শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একটু পরেই ডাঃ মজুমদার এলেন। ডাক্তার এ বাড়িতে বিশেষ পরিচিত। হাসিখুশি ও রসিক মানুষ। রণেন ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে আসল সত্যিকারের সংবাদটি দেয়নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উচ্চকণ্ঠে ডাক্তার দিদিমাকে ডাকতে লাগলেন, সক্কালবেলাতেই আবার চৌধুরী গিন্নীর বাড়িতে কার অসুখ হল? কোথায় চৌধুরী গিন্নী?

দোতলার বারান্দায় মণিকা দাঁড়িয়ে ছিল, তার সঙ্গেই ডাঃ মজুমদারের প্রথমে চোখাচোখি হল, এই যে মণি মা! কার অসুখ হল আবার বাড়িতে? রণেনবাবু জরুরী তলব দিয়ে একেবারে টেনে নিয়ে এলেন!

মণিকার কণ্ঠে সাড়া নেই এবং মণিকার ভীতিবিহ্বল ফ্যাকাসে মুখখানার দিকে হঠাৎ তাকিয়েই ডাক্তারের মনে কেমন যেন খটকা লাগে। দাঁড়িয়ে যান ডাঃ মজুমদার এবং ব্যগ্র উৎকণ্ঠার সঙ্গেই এবারে প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার মণি মা? এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে যে?

ডাঃ মজুমদার মণিকাকে 'মণি মা' বলে ডাকতেন এবং মণিকা ডাক্তারকে 'ডাক্তার জ্যাঠা' বলে ডাকত।

ঐ ঘরে যান ডাক্তার জ্যাঠা। নিম্ন কণ্ঠে কোনমতে কথাগুলো বলে মণিকা।

কি হয়েছে?

ঐ ঘরে—

বিস্মিত হতভম্ব ডাঃ মজুমদার অগত্যা নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেও প্রথমটায় তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। তারপর অতুলের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাক্যস্ফূর্তি হয় না। He is dead! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন কথাটা ডাক্তার মজুমদার। সকলের মুখের দিকেই অতঃপর একবার তাঁর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

রণেন, সুকান্ত, মণিকা, দিদিমা ও সুবালাদি সকলেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই। এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। মৃতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে মণি মা! থানায় শিউশরণকে একটা সংবাদ দাও। আমি তো death certificate দিতে পারব না। বলতে বলতে রণেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমার ডিসপেন-সারিতে গিয়ে কম্পাউণ্ডার হরিকে বলুন সে যেন এখুনি সাইকেলে করে থানায় গিয়ে আমার নাম করে শিউশরণকে একটা খবর দিয়ে আসে—এখুনি এই বাড়ির ঠিকানায় আসতে বলেছি আমি। যান—আর দেরি করবেন না। তাই তো! তাই তো!

ডাক্তার নীরবে মাথা দোলাতে লাগলেন আপন মনেই।

॥ চার ॥

এবারেও পূজার অবকাশটা কাটাতে কিরীটী ও সুব্রত শিউশরণের ওখানে এসে দিন পাঁচেক হল উঠেছে।

সকালবেলা কাজে বের হবার আগে শিউশরণ পোশাক পরে টেবিলে বসে কিরীটী ও সুব্রতর সঙ্গে চা পান করতে করতে খোসগল্প করছিল। এমন সময় রণেনকে নিয়ে একটা সাইকেল রিকশায় চেপে ডাঃ মজুমদারের কম্পাউণ্ডার এসে হাজির।

হরি কম্পাউণ্ডার একাই আসতে চেয়েছিল সাইকেল নিয়ে, কিন্তু রণেন একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে দুজনেই এসেছে থানায়। থানায় না দেখা পেয়ে এসেছে নিকটবর্তী শিউ-শরণের বাসায়। ভৃত্যের মুখে ডাঃ মজুমদারের কম্পাউণ্ডারের নাম শুনে শিউশরণ তাদের ঘরেই আহ্বান জানায়। ভৃত্যের পশ্চাতে হরি কম্পাউণ্ডার ও রণেন এসে ঘরে প্রবেশ

করে। রণেনই নিজের পরিচয় ও বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করে।

শিউশরণ হাসতে হাসতে কৌতুক করে কিরীটীকে বলে, এই নাও কিরীটী, তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যাসংবাদ! চল, যাবে নাকি একবার অকুস্থানে?

কিরীটী একটা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে, না হে। তুমিই যাও।

উহুঁ। একা তীর্থদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয় না। তোমাকেও সঙ্গী চাই। ওঠ। চল।

যাও না হে! কিরীটী এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

না। তোমাকেও যেতে হবে। চাই কি তুমি সঙ্গে থাকলে হয়ত অকুস্থানেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। বখেড়া মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। চল।

অগত্যা কিরীটীকে উঠতেই হল।

ছ'জন একটা সাইকেল রিকশায় যাওয়া চলে না তাই আর ছুটিকে ডাকতে হল। একটায় উঠে বসে রণেন ও কিরীটী, অন্যটায় শিউশরণ ও সুব্রত, হরি কম্পাউণ্ডার ও একজন কনস্টেবল আর একটাতে।

ইতিমধ্যেই কাশী শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। পূজায় এবারে লোকসমাগমও অনেক হয়েছে শহরে। রাস্তায় ও দোকানে দোকানে নানাবয়েসী স্ত্রী-পুরুষের ভিড়—তাদেরই মধ্যে নিত্য গঙ্গাস্নান-যাত্রীদেরও আনাগোনা চলেছে। খোদাইচৌকির থানা থেকে গোধূলিয়ার দূরত্ব খুব বেশী নয়। হেঁটে গেলে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের বেশী লাগে না। কিরীটী তাই প্রথমটায় বলেছিল পথটুকু হেঁটেই যাবে কিন্তু শিউশরণ রাজী হয়নি।

চলন্ত রিকশায় রণেনের পাশে বসে কিরীটী নানা প্রশ্ন করছিল। কিরীটীর সজাগ তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় ছুটি ওদের কথাবার্তার প্রতি নিয়োজিত থাকলেও, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে একটা চুরুট টানতে টানতে রাস্তার দুধারে চলন্ত জনতার প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

আপনি বলছিলেন রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত আপনারা চারজনে তাস খেলেছেন, তারপর শুতে যান যে যার ঘরে!

হ্যাঁ।

শুতে যাবার পর আপনি কোনরূপ চিৎকার বা অস্বাভাবিক কোন শব্দ শোনেননি?

না। সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ গঙ্গায় দাঁড় টেনেছিলাম। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে মণিকার ডাকে।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি করেন রণেনবাবু?

আমি ডাক্তার। পাটনায় প্র্যাকৃটিস করি।

আপনিই কি ডক্টর আর চৌধুরী—পাটনার হার্ট-ডিজিজ স্পেশালিস্ট?

হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় রণেন।

আপনি নিজে যখন একজন ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন তখন ডাঃ মজুমদারকে আবার ডাকা হল যে? কিরীটী রণেনের মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করে।

কারণ মৃতদেহ দেখেই বুঝেছিলাম, আমাদের বন্ধু অতুলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তাছাড়া আর একটা কথাও আমার ঐ সঙ্গে মনে হয়েছে। যেভাবে বাড়ির মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাতে করে স্বভাবতই সকলের ধারণা হবে বাড়ির মধ্যেই কেউ আমরা তাকে হত্যা করেছি; তাই তো আমি নিজে ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আর একজন বাইরের ডাক্তারকে ডাকা ও থানায় সংবাদ দেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত বলে আমার মনে হয়েছে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের। আমাদেরই মধ্যে একজনের এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল কেন? আর এর জন্য আমরাই কেউ দায়ী কিনা এটাও আমাদের জানা প্রয়োজন, নয় কি?

নিশ্চয়ই। সত্যিই আপনার সৎ সাহসের আমি প্রশংসা করছি ডাঃ চৌধুরী।

সৎ সাহসের কথাটা বাদ দিলেও অতুলের মৃত্যুটা যে কত বড় মর্মান্তিক আঘাত আমাদের পক্ষে, বাইরের লোক আপনারা বুঝতে ঠিক পারবেন না কিরীটীবাবু। এবং শুধু মর্মান্তিক নয়, অত্যন্ত লজ্জারও ব্যাপার। অতুলের মৃত্যু-রহস্যের একটা মীমাংসা বিশেষভাবেই প্রয়োজন আমাদের বিবেকের দিক থেকেও। যতক্ষণ না এই ব্যাপারের মীমাংসায় আমরা পৌঁছুতে পারব ততক্ষণ আমরা পরস্পর আমাদের পরস্পরের কাছেই থাকব guilty—দোষী।

কথাগুলো বলতে বলতে ডাঃ রণেন চৌধুরী শেষের দিকে নির্বাক কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আপনার নাম আমার বিশেষ পরিচিত মিঃ রায়। আজকে আমাদের এত বড় বিপদের দিনে আপনাকে এ সময়ে এখানে পাওয়ায় সত্যি বলতে কি কতখানি যে নিশ্চিন্ত হয়েছি বলতে পারব না। আপনি বোধ হয় ভগবান-প্রেরিত। আমাদের আজকের লজ্জা ও অপমান থেকে আপনি অন্ততঃ যদি আমাদের মুক্তি দিতে পারেন—

কিরীটী নিরুত্তর থাকে।

কিরীটী তখন মনে মনে ভাবছে।

দীর্ঘদিনের চার বন্ধু। তিনজন পুরুষ একজন নারী। না জানলেও সাধারণ মানব-চরিত্রের দিক দিয়ে এটা খুবই স্বাভাবিক পরস্পরের বন্ধুত্ব ছাড়াও তিন বন্ধুর মধ্যবর্তিনী ওই নারী বান্ধবীকে কেন্দ্র করে ঐ তিনটি পুরুষের মনে এই দীর্ঘদিনে নিশ্চয় কিছু না কিছু দুর্বলতা ছিল। আর শুধু দুর্বলতাই বা কেন, হিংসা বা একটা বিদ্বেষ গড়ে

ওঠাও তেমন কিছু বিচিত্র বা আশ্চর্য নয়।

হঠাৎ কিরীটী রণেনকেই প্রশ্ন করে, ডাঃ চৌধুরী, আচ্ছা একটা কথা, আপনারা চারজনের মধ্যে কে কে বিবাহিত?

কেউ নয়। আমরা তিন বন্ধু ও মণিকা কেউই বিবাহ করিনি।

কেউ বিবাহ করেননি?

না।

কেউ বিবাহিত নয়! দীর্ঘ নয় বৎসরের বন্ধুত্ব! তিনটি কৃতবিদ্য কুমার ও একটি কুমারী। তিন পুরুষের মধ্যবর্তিনী এক নারী। তারই মধ্যে এসেছে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

কিরীটীর মনে হয় জীবনে ইতিপূর্বে এমন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন সে খুবই কম হয়েছে। স্নেহ ভালবাসা রাগ দ্বেষ হিংসা ও ঘৃণা—মানব-মনের গোপন অবগহনে যে সব স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো আনাগোনা করে এক্ষেত্রে কোন্‌টির প্রভাব পড়েছে কে জানে! আর কেমনই বা সেই মধ্যবর্তিনী নারী!

কিরীটীর চিন্তাপ্রবাহে ছেদ পড়ে। সাইকেল রিকশা গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এগুবে না—বাকি সামান্য পথটুকু পদব্রজেই যেতে হবে।

প্রথমে রণেন, তার পশ্চাতে শিউশরণ ও সর্বশেষে কিরীটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে। ডাঃ মজুমদার পাশের ঘরেই শিউশরণের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনিও এগিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিরীটী কক্ষমধ্যে পা দিয়ে প্রথমেই তার চিরাচরিত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মাঝারি আকারের ঘরটি। দক্ষিণ দিকটা চাপা। পূবে দুটি জানলা। জানলা দুটিই খোলা। যে চেয়ারটার ওপরে মৃতদেহ রয়েছে তারই হাত-দেড়েক ব্যবধানে একটি ক্যামবিসের খাটিয়ার ওপরে নিভাঁজ একটি শয্যা বিছানো। শয্যাটি ব্যবহৃত, শয্যাটিতে কেউ রাত্রে শয়ন না করলেও একটা ব্যাপার কিরীটীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, শয্যার মাঝামাঝি একটা জায়গায় শয্যার চাদরটা যেন একটু কুঁচকে আছে। বোধ হয় কেউ ঐ জায়গাটায় বসেছিল। এবং তাতে করেই বোঝা যায় শয্যায় কেউ না শয়ন করলেও কেউ শয্যায় বসেছিল। শিউশরণ মৃতদেহের সামনে এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোধ হয় মৃতদেহ পরীক্ষা করছিল। এবারে সেই দিকে তাকাল কিরীটী। যে চেয়ারটার ওপরে মৃতদেহ উপবিষ্টাবস্থায় রয়েছে সে চেয়ারটা সাধারণ কাঠের নয়, স্টীলের ফ্রেমে লোহার চাদরে তৈরী। এবং চেয়ারের পাশেই ডান দিকে একখানা বই—বাংলা বই, মেঝেতে পড়ে আছে। এবারে মাথার উপরে তাকাল

কিরীটী। শেডে ঢাকা ইলেকট্রিক আলো। আলোটি নেভানো।

কিরীটী রণেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ডাঃ চৌধুরী, প্রথমে যিনি আজ সকালে এই ঘরে ঢুকে মৃতদেহ আবিষ্কার করেন তিনি কি ঐ আলোটা নেভানো দেখেছিলেন, না আলোটা জ্বলছিল ?

ঘরের আলোটা নেভানো রয়েছে। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে যেন প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায়। সকলেই একে একে জবাব দেয়—আলো নেভানোই ছিল।

এবারে কিরীটী মণিকাকেই প্রশ্ন করে, আপনি তো প্রথম সকালে এ ঘরে ঢোকেন চা নিয়ে, তখন কি আলোটা নেভানো ছিল, না জ্বলছিল ?

লক্ষ্য করিনি তো !

আচ্ছা সাধারণতঃ উনি, মানে অতুলবাবু, কি ঘরের দরজা বন্ধ করেই শুতেন ?

বন্ধ করে শুত দরজা এবং প্রত্যেক দিনই সকালে ওকে ডেকে ওঠাতে হত। তাই তো আজকে ঘরের দরজা খোলা পেয়ে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। জবাবে মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো মণিকা বলে।

কিরীটী মনে মনে ভাবে, শোবার ঘরের দরজা শয়নের পূর্বে যার চিরদিন বন্ধ করে শোয়াই অভ্যাস—কেন আজ তার ঘরের দরজা খোলা ছিল ? কেন ?

বোঝা যায় মৃত ব্যক্তি বিছানায় শোয়নি গত রাত্রে, আগের রাত্রের সেই হাফ শার্টটা পরা, চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থাতেই মারা গিয়েছে, চেয়ারের পাশেই মেঝেতে একটা বই—সব কিছু মিলে স্বাক্ষর দিচ্ছে শয়নের পূর্বে সে বই পড়ছিল বা পড়বার চেষ্টা করেছিল এবং গত রাত্রে সেক্ষেত্রে আলোটা ঘরের জ্বলবে না কেন ? কে নেভাল আলো ? কেনই বা নেভাল ? কেন ?

আচ্ছা মণিকা দেবী ! কিরীটীর ডাকে মণিকা আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

রাত্রে কি আপনাদের বাড়ির দোতলার সিঁড়ির মুখের যে দরজাটা দেখলাম সেটা বন্ধ থাকে না ?

না, খোলাই থাকে। জবাবে বলে মণিকা।

বাড়িতে বর্তমানে আপনারা কজন আছেন ?

দিদিমা, সুবলাদি, ঝি জানকীয়া আর আমরা চারজন। কয়েকদিনের জন্য একটা ঠিকে চাকর রাখা হয়েছে, তা সে রাত্রে নটা-দশটার পর বাড়ি চলে যায়। রাত্রে এখানে শোয় না।

গত রাত্রে দোতলায় আপনারা কে কে ছিলেন ? আবার প্রশ্ন কিরীটীর।

এই ঘরে অতুল, পাশের ঘরে রণেন, তার পরের ঘরে আমি সুবলাদি ও দিদিমা, তার পাশের ঘরে সুকান্ত।

কোন্ ঘরে বসে গত রাত্রে আপনারা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত তাস খেলেছেন ?

সুকান্তর ঘরে।

কেউ আপনারা মনে করে বলতে পারেন, গতকাল সমস্ত দিন ও শুতে যাবার আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখন কখন এবং কতবার অতুলবাবু বা আপনারা এঘরে এসেছেন ?

প্রথমেই ডাঃ রণেন চৌধুরী বললে, সিটিতে আমার এক সহপাঠী ডাক্তার আছেন, কাল সকালে চা-জলখাবার খেয়েই আমি ক্যামেরাটা লোড করে নিয়ে বের হয়ে যাই। বেলা চারটে পর্যন্ত সেই বন্ধুর ওখানেই ছিলাম। খাওয়াদাওয়া সেখানেই করি। এখানে ফিরে আসি বেলা পাঁচটা নাগাদ। অতুল তখন বাড়িতে ছিল না। আমি ফিরে আসবার আরও আধ ঘণ্টা পরে অতুল ফেরে। প্রায় ছটা নাগাদ আমরা গঙ্গায় নৌকো বাইবার জন্য যাই। রাত আটটায় ফিরে আমার ঘরেই সকলে বসে আড্ডা দিই। রাত নটায় খাওয়াদাওয়া সেরে তাস খেলতে বসি। সাড়ে এগারোটায় তাস খেলা ভাঙলে সোজা নিজের ঘরে শুতে যাই। ক্লান্ত ছিলাম, শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছি। গতকাল দিনে বা রাত্রে একবারের জন্যও এ ঘরে আমি আসিনি। আর দেখিওনি অতুল কতক্ষণ এ ঘরে ছিল বা কবার এসেছিল।

কথাগুলো যেন জবানবন্দির মতই একটানা গুছিয়ে বলে গেল ডাঃ রণেন চৌধুরী।

অতুলবাবু বাড়ি ছিলেন না আপনি একটু আগে বললেন আপনি যখন বাড়ি ফেরেন! অতুলবাবু কখন বের হয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন বা কতক্ষণের জন্য বাইরে ছিলেন জানেন কিছু ডাক্তার চৌধুরী ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, আমি বলতে পারি না।

মণিকা দেবী, আপনি ?

বেলা দুটো পর্যন্ত সে বসে চিঠি লিখেছিল ঘরে বসে জানি। ঠিক দুটো বাজতে চিঠিগুলো ডাকে ফেলতেই বাইরে গিয়েছিল। মণিকা জবাবে বলে।

ডাকঘর কতদূর এখান থেকে ? দুটোর সময় বের হয়ে সাড়ে পাঁচটায় ফিরলেন চিঠি পোস্ট করে !

বলতে পারি না। অন্য কোথাও হয়ত যেতে পারে।

একটা কথা মণিকা দেবী, ঠিক দুটোর সময়ই যে অতুলবাবু বাইরে গিয়েছিলেন ঠিক আপনার মনে আছে ?

হ্যাঁ। তার কারণ অতুল চলে যাবার পরেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী অতুলের ঘরের আলোটা

ঠিক করতে আসে—বংশী এসে যখন মিস্ত্রী এসেছে বললে তার আগে আমার একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। ঘর থেকে বেরুতে যাব এমন সময় ঘরের ওয়াল-ক্লকটায় ঢং ঢং করে দুটো বাজল। তাইতেই সময়টা আমার মনে আছে।

মণিকার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিরীটী। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন হঠাৎ অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ হয়ে মণিকার কথা শুনছিল। চোখেমুখে একটা অদ্ভুত ব্যাকুল সুতীব্র উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গতকাল ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এসেছিল এই ঘরের আলো ঠিক করতে?

হ্যাঁ।

কেন?

ঘরের আলোটা পরশু রাত্রে হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। গতকাল সকালে উঠেই অতুল বলেছিল মাঝরাত্রে উঠে আলো জ্বালাতে গিয়ে আলো জ্বলেনি, সুইচেও নাকি শক দিচ্ছিল। মণিকা জবাবে বলে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কজনই কৌতূহলের সঙ্গে কিরীটীর প্রশ্ন ও প্রশ্ন করার পর জবাব শুনছিল।

অন্য কেউ না বুঝলেও সুব্রত ও শিউশরণ কিরীটীর পর পর প্রশ্নগুলো শুনে বুঝতে পেরেছিল বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই কিরীটী সকলকে প্রশ্ন করছে। ঘরের মধ্যেই প্রাপ্ত কোন-না-কোন একটা সূত্র কিরীটীকে সজাগ করে তুলেছে।

কিরীটী কিন্তু আর প্রশ্ন করে না কাউকে। হঠাৎ যেমন প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল, হঠাৎই আবার তেমনি চুপ করে যায়। ঘরের মধ্যে সকলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোন শব্দ নেই। মিনিট দু-তিন নিস্তব্ধ কেটে যায়।

আবার কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে। এবারে ডাঃ মজুমদারকে।

মৃতদেহ দেখে মৃত্যুর কারণ আপনার কি মনে হচ্ছে ডাঃ মজুমদার?

খুব সম্ভব কোন একটা শকে মারা গিয়েছেন।

ইলেকট্রিক শক বলে আপনার মনে হয় কি?

হতে পারে। মৃদু কণ্ঠে ডাঃ মজুমদার বলেন।

তাহলে মৃতদেহ চেয়ারে কেন? কিরীটী যেন নিম্ন কণ্ঠে নিজেকেই নিজে প্রশ্নটা করে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে এক-সময় আপন মনেই নিঃশব্দে কয়েকবার মাথাটা দোলায় এবং পূর্ববৎ অনুচ্চ কণ্ঠেই বলে, তা হতে পারে! তা হতে পারে!

সকলেই যুগপৎ কিছুটা বিস্ময় ও বোকার মতই যেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে

তার মৃদুচ্চারিত স্বগতোক্তিগুলো বোঝবার ব্যর্থ প্রয়াস পায়।

কিন্তু কিরীটী সময়ক্ষেপ করে না। অতঃপর মৃতের জামার পকেটগুলো খোঁজ করতে গিয়ে একটা পোস্টকার্ড পেল। কার্ডটা লিখেছে অতুলেরই এক বন্ধু দেরাদুন হতে। সে লিখেছে দুন এক্সপ্রেসে সে কলকাতায় যাচ্ছে। পথে কাশী স্টেশনে যেন অতুল তার সঙ্গে দেখা করে, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দুন এক্সপ্রেস বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছবে। চিঠিটা কিরীটী পকেটে রেখে দিল। তারপর শিউশরণের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে বলে, শিউশরণ, এবারে তুমি তোমার কাজ কর ভাই। তবে আগে একটা চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দাও।

কিরীটীর নির্দেশমতই একটি বড় চাদর এনে মৃতদেহটা ঢেকে দেওয়া হল।

এবং সকলে অতঃপর কিরীটীরই ইচ্ছামত সুকান্তর ঘরে গিয়ে বসল।

॥ পাঁচ ॥

জবানবন্দি নেবার জন্য প্রস্তুত হয় শিউশরণ। যার জবানবন্দি নেওয়া হবে তাকে ছাড়া অন্য সকলকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলা হয়।

প্রথমেই ডাক পড়ল ডাঃ রণেন চৌধুরীর।

ডাঃ রণেন চৌধুরী। বলিষ্ঠ গঠন। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। হত্যার অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা নিকটে ছিল; পাশেরই ঘরে। দুই ঘরের মধ্যবর্তী একটি দরজা ছিল। দরজাটায় অতুলের ঘর হতে শিকল তোলা ছিল। ডাঃ রণেন নিহত অতুলের বিশেষ বন্ধু। দীর্ঘদিনের পরিচয়। অবিবাহিত, অবস্থাপন্ন, বৃত্তি চিকিৎসক।

শিউশরণ তার প্রশ্ন শুরু করে, আপনি সকালে কটা আন্দাজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যান?

সকাল নটায়। জবাব দেয় ডাঃ চৌধুরী।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর খেলা শেষ হতেই ঘরে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন? কিন্তু ঘুমোবার আগে পর্যন্ত পাশের ঘরে কোন শব্দ শুনেছিলেন?

শুনেছিলাম কি যেন একটা কবিতা মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করছে অতুল।

মাঝরাতে একবারও আপনার ঘুম ভাঙেনি?

না।

মণিকা দেবীর ডাকে এ ঘরে আজ সকালে ঢোকবার আগে পর্যন্ত ওর মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানতেন না ?

না।

ডাঃ চৌধুরী একটা কথা, আপনি জানতেন নিশ্চয়ই পরশু রাত্রে এই ঘরের আলোটা খারাপ হয়ে গিয়েছে ? প্রশ্ন করে কিরীটী।

জানতাম।

আচ্ছা আলোটা ঠিক করবার জন্য কে এবং কখন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দিয়েছিল জানেন কিছু ?

বলতে পারি না। বোধ হয় মণিই দিয়ে থাকবে।

অতুলবাবু গতকাল বিকেলে স্টেশনে যাবেন জানতেন ?

কই, না তো!

হুঁ। আচ্ছা একটা কথা, কিছু মনে করবেন না—মণিকা দেবীকে আপনি ভালবাসেন নিশ্চয়ই ?

বাসি।

কখনও মণিকা দেবীকে নিয়ে আপনাদের তিন বন্ধুর মধ্যে মণিকা দেবীর অনুপস্থিতিতে কোন আলোচনা হত না ?

কিরীটীর আচমকা প্রশ্নে হঠাৎ যেন ডাক্তার একটু বিহ্বল হয়েই পড়ে, কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে থাকে। পরে মৃদুচ্চারিত কণ্ঠে বলে, হয়েছে দু-একবার কিন্তু সেও উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নয়।

প্রশ্নটা যদিও একান্তভাবেই ব্যক্তিগত তবুও জিজ্ঞাসা করছি ডক্টর চৌধুরী, আপনাদের তিন বন্ধুর মধ্যে মণিকা দেবীর প্রতি কারও বেশী দুর্বলতা ছিল বলে কি আপনার মনে হয় ?

থাকতে পারে কারও তবে আমি জানি না। আমার অন্ততঃ ছিল না।

না জানলেও আপনি বলতে ইচ্ছুক নন! কোন্‌টা সত্য ডক্টর চৌধুরী ?

কিরীটী স্মিতভাবে প্রশ্ন করে।

যা মনে করেন। নিরাসক্ত উদাস মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় ডাঃ চৌধুরী।

আচ্ছা এখানে আসবার পরে মণিকা দেবী সম্পর্কে আপনাদের তিন বন্ধুর মধ্যে কি কোন আলোচনা বা বচসা হয়েছিল recently ?

না।

আপনার বন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন ?

বাইরের আর কাকে করব বলুন। করতে হলে সন্দেহও আমাদের তিনজনকেই করতে হচ্ছে। হয় আমি, নয় সুকান্ত, নয়ত মণি।

হতে পারে। হয়ত আপনাদের তিনজনের মধ্যেই একজন আপনাদের বন্ধুকে হত্যা করেছেন। গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত কিরীটীর কথাগুলো যেন অকস্মাৎ বজ্রসম ধ্বনিত হল।

সোজা সরল স্পষ্ট অভিযোগ।

রণেন যতই বলুক কিরীটীর শেষের কথার কঠিন ইঙ্গিতে যেন সে বিমূঢ় নির্বাক হয়ে যায়।

আপনি, মানে—বলতে চান আমাদের—

হ্যাঁ। আপনাদের তিনজনের মধ্যেই একজন।

কিন্তু—

এর মধ্যে আমার কোন সংশয় বা কোন কিন্তুই নেই ডক্টর চৌধুরী। প্রথমতঃ সম্ভাবনার দিক দিয়ে যদি আপনাদের বন্ধুর হত্যার ব্যাপারটাকে বিচার করেন তাহলে আপনাদের তিনজনের পক্ষেই সেটা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ মোটিভ যদি বা বলেন, উদ্দেশ্য আপনাদের তিনজনের যতটা ছিল আর কারোরই সেটা থাকা সম্ভব নয়।

বন্ধু হয়ে বন্ধুকে হত্যা করব! এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়?

সে আলোচনা পরের জন্য আপাততঃ তোলা রইল, এইটুকু বর্তমানে শুধু বলতে পারি, মোটিভ একটা ছিল যার জন্য বন্ধু হয়েই বন্ধুকে পথের কাঁটা হিসাবে সরানো হয়েছে।

তাহলে ধরেই নিচ্ছেন আপনি এটা একটা দুর্ঘটনা নয়—হত্যা? এবং—

হ্যাঁ, নিষ্ঠুর হত্যা! কঠিন ঋজু কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

এবার ডাক পড়ল সুকান্ত হালদারের।

অতীব সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা। কেবল নারী কেন, যে কোন পুরুষের চোখেও আকর্ষণীয়। ধনী মেসো-মাসীর আশ্রয়ে পালিত, উচ্চশিক্ষিত। ইন্‌জিনিয়ার বৃত্তি, ভাল চাকরিতে নিযুক্ত। অবিবাহিত। রণেন, অতুল ও মণিকার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা।

ঘটনার দিন রাত্রে তারই ঘরে তাস খেলা হয়, তারপর রাত সাড়ে এগারোটায় খেলা ভাঙার পর অন্য সকলে যে যার ঘরে শুতে গেলে নিজেও শয্যায় আশ্রয় নেয়। রাত্রে ঘুম ভাঙেনি বা কোনরূপ শব্দও শোনেনি। মণিকার ডাকে বাইরে এসে আজ সকালে অতুলের ঘরে ঢুকে জানতে পারে যে অতুল মৃত।

কালকের আপনার movements সম্পর্কে আমাকে in details একটা idea দিতে পারেন মিঃ হালদার? প্রশ্ন করে এবারে কিরীটী।

কাল সকাল থেকেই শরীরটা ভাল না থাকায় সারাটা দিনই প্রায় ছটা পর্যন্ত ঘরে খিল এঁটে শুয়েছিলাম। সারাদিন কিছু খাইওনি। সন্ধ্যায় অতুলের ডাকাডাকিতেই বাইরে বের হই। রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত গঙ্গায় নৌকোয় ঘুরে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তাস খেলে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙিয়েছে মণিকা সকালে চা নিয়ে এসে।

অতুলবাবু যে কাল বিকেলের দিকে স্টেশনে যাবেন তা আপনি জানতেন?

না।

সন্ধ্যায় ফিরে আসবার পর রাত্রে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত অতুলবাবু কি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন?

যেতে পারে তবে আমি দেখিনি।

বিয়ে না করবার কি কোন কারণ আছে আপনার এত বয়স পর্যন্ত?

মনের মত সঙ্গী না পেলে বিয়ে করে কি হবে?

মণিকা দেবীকে আপনারা সকলেই ভালবাসেন?

প্রশ্নটা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত নয় কি মিঃ রায়? রূঢ় কণ্ঠে যেন জবাব দেয় সুকান্ত।

নিশ্চয়ই। প্রশ্নটা করতে বাধ্য হয়েছি এইজন্য যে নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণেই আপনাদের বন্ধু অতুল বোস নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন মানে? আপনি কি মনে করেন—

কথাটা সুকান্তর শেষ হল না, কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, হ্যাঁ—তাকে হত্যাই করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আপনারই কোন এক বন্ধু, আপনাদের অতি নিকট বন্ধু অতুল বোসকে হত্যা করেছেন।

আপনি পাগল মিঃ রায়! আপনি জানেন না আমাদের সম্পর্ক একদিনের নয়। দীর্ঘ ন বৎসরের ঘনিষ্ঠতা আমাদের। তাছাড়া একটা কথা নিশ্চয়ই আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, এখানে আপনাকে ডেকে এনেছেন কে? দারোগা সাহেব—শিউশরণের দিকে ফিরে তাকিয়ে সম্বোধন করে সুকান্ত, আপনার করণীয় আপনি করতে পারেন, third person-এর interference আমরা সহ্য করব না।

জবাব দিল এবারে শিউশরণ, মিঃ রায়ের কথার জবাব দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে মিঃ হালদার, তবে জানবেন যাই আপনি বলুন সেটা আপনার against-এ বা for-এ evidence হিসাবেই আমরা নেব। আর উনি তৃতীয় ব্যক্তি নন। আমারই লোক। এই হত্যার তদন্তের ব্যাপারে উনি সরকারের পক্ষ হতেই কাজ করছেন।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই মিঃ হালদার। উনি যা প্রশ্ন করছেন তার জবাব দেবেন কিনা আমি জানতে চাই।

মিনিট দুই স্তব্ধ হয়ে থেকে সুকান্ত মৃদু কণ্ঠে বলে, বেশ, কি জানতে চান বলুন?

আপনি তো একজন ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার, তাই তো? আবার কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

বাড়িতে ছোটখাটো ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কিছু হলে আপনি দেখেশুনে দেন না কখনও?

সে রকম কাজ হলে দিই তবে ছোটখাটো ব্যাপারে আমার মিস্ত্রীরাই কাজ করবার যা করে।

এ ঘরের ইলেকট্রিক আলোটা পরশু রাত্রে খারাপ হয়েছিল আপনি জানতেন?

না, আজ সকালেই প্রথমে মণির মুখে একটু আগে শুনলাম।

মিস্ত্রী কাল কাজ করতে এসেছিল দুপুরে তাও জানতেন না?

না। বললাম তো একটু আগে আপনাকে—শরীর খারাপ ছিল বলে সারাদিন ঘর থেকে বের হইনি।

এখানে আসবার পর খুব ইদানীং আপনাদের তিন বন্ধুর মধ্যে মণিকা দেবী সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা বা বচসা কিছু হয়েছিল কি?

কি mean করছেন আপনি?

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ হালদার, কি আমি বলতে চাইছি—

আপনার ও প্রশ্নের জবাব দেবার মত আমার কিছু নেই।

মণিকা দেবীকে ডাকা হল। এবারে তার জবানবন্দি।

সুন্দরী শিক্ষিতা, দিল্লীতে অধ্যাপিকার কাজ করে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমস্ত মুখের ওপরে যেন একটা নিরতিশয় বেদনার ছায়া ফেলেছে। দীর্ঘ ন বৎসরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব মণিকার অতুল, রণেন ও সুকান্তর সঙ্গে। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যেন ও ভারী মুষড়ে পড়েছে।

বসুন মণিকা দেবী। কিরীটীই বলে।

আমিই এবারে ওদের পুজোর ছুটিটা এখানে কাশীতে কাটাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম মিঃ রায়। আবেগে কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখের কোল দুটি ছলছল করে, এমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে যদি স্বপ্নেও জানতাম, সত্যি। ভাবতেও পারছি

না! অতুল, অতুল নেই আর—

অন্যদিকে মুখটা ফেরায় মণিকা বোধ করি উদগত অশ্রুকে সকলের দৃষ্টি হতে আড়াল করবার জন্যই।

আপনার লজ্জা ও দুঃখ আমি বুঝতে পারছি মিস্ গাঙ্গুলী, কিন্তু কি করবেন বলুন? বোধ হয় সান্ত্বনা দেবারই চেষ্টা করে কিরীটী, আকস্মিক দুর্ঘটনার ওপরে তো আমাদের কারোরই কোন হাত নেই, দৈব।

কিরীটী কিছুক্ষণ সময় দেয় মণিকাকে কিছুটা সামলে নেবার জন্য।

কিরীটী আবার শুরু করে, এই নিষ্ঠুর হত্যার—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না। চমকে অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে তাকায় চকিতে মণিকা প্রশ্নকারী কিরীটীর মুখের দিকে। অর্ধস্ফুট বিস্মিত কণ্ঠে শুধায়, হত্যা?

হ্যাঁ মণিকা দেবী। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি অতুলবাবুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। নিষ্ঠুর হত্যা!

না! না! আর্ত চাপা কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় মণিকা, You don't really mean it!

সত্যিই হত্যা মণিকা দেবী! অতুলবাবুকে হত্যা করাই হয়েছে!

অতুল—

হ্যাঁ। এবং হত্যা বলেই এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হওয়া একান্তই প্রয়োজন নয় কি?

মণিকা চুপ। মণিকার মনের অবগহনে তখন যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের আলোড়ন চলেছে। অতুল নিহত। কিন্তু কেন? কেন সে নিহত হল? নিরীহ অতুল! কে তাকে হত্যা করলে? এ কি ভয়াবহ নিষ্ঠুর কথা!

মিস্ গাঙ্গুলী!

অ্যাঁ! চমকে তাকাল মণিকা কিরীটীর ডাকে তার মুখের দিকে।

এ ঘরের ইলেকট্রিক আলোটা যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল সে সংবাদ আপনি কখন মিস্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন?

আমি! আমি সংবাদ পাঠিয়েছিলাম! কই না তো! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় মণিকা কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনি সংবাদ দেননি?

না! চিরদিন অত্যন্ত ভোলা মন আমার। বরং কাল দুপুরে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আসবার পর, অতুল যে তার ঘরের আলোটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল হঠাৎ সে

কথাটা মনে পড়ায় বিশেষ লজ্জিতই হয়েছিলাম।

আপনি তাহলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দেননি ?

না।

যে মিস্ত্রী আলো সারাতে এসেছিল সে কি আপনাদের পূর্বপরিচিত।

না।

হুঁ। লোকটার বয়স কত হবে বলে আপনার মনে হয় ?

একটু বেশী বলেই মনে হয়েছিল। জাতিতে বোধ হয় বেহারী।

আপনার সঙ্গে লোকটার কি কথা হয় ?

তার সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি বলতে গেলে। বংশী লোকটাকে নিয়ে এসেছিল—আমি শুধু ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এসেছিলাম।

লোকটা যখন ঘরে কাজ করে আপনি তখন ঘরে ছিলেন না ?

না। কতক্ষণ যে কাজ করেছে এবং কখন যে কাজ করে চলে গিয়েছে তাও জানি না।

আশ্চর্য ! লোকটা কাজ করে পয়সা নিয়ে যায়নি ?

হ্যাঁ, সুবালাদিই নাকি দিদিমার কাছ থেকে চেয়ে তিন টাকা দিয়ে দিয়েছিল।

হুঁ। কিরীটী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। অতঃপর বলে, আচ্ছা অতুলবাবু যে ছুটোর সময় চিঠি ফেলতে বাইরে বের হয়েছিলেন বলে আপনার ধারণা, তখন যে তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন তা জানেন ?

স্টেশনে ! কই না তো ! স্টেশনে সে যাবে কেন ?

গিয়েছিলেন তিনি। আচ্ছা কোন চিঠি গতকাল তাঁর নামে এসেছিল জানেন ?

হ্যাঁ। একটা চিঠি এসেছিল বটে।

কার চিঠি সেটা জানেন ?

না। বংশী এনে আমার হাতে দেয়, আমি চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দিই।

বাড়িতে ফিরে তিনি ঘরে যাননি ?

যতদূর মনে পড়ছে, না। সে যখন ফিরে আসে, আমরা, মানে আমি ও রণেন বাইরের বারান্দায় বসে চা ও ডালমুট ভাজা খাচ্ছিলাম। অতুল ডালমুট বড় ভালবাসত। How nice ডালমুট, বলতে বলতে সে বারান্দাতেই একটা মোড়ায় বসে চা ও ডালমুট খেতে শুরু করে। তার পরই বোধ হয় পৌনে ছটা বা ছটা নাগাদ আমরা গঙ্গায় নৌকোয় ঘুরতে বের হই। যতদূর মনে পড়ছে সে ঐ সময়টা বাইরেই বারান্দায় ছিল, ঘরে যায়নি।

রাত্রে বাসায় ফিরে ?

বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ আমরা সকলে তিনতলার ছাদে গল্প করে নীচে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে সুকান্তর ঘরে গিয়ে তাস খেলি।

সুকান্তর ঘরে বসেই কি বরাবর তাস খেলতেন আপনারা রাত্রে ?

তার কোন ঠিক নেই, প্রতিরাত্রেই গত সাতদিন ধরে তাস খেলেছি আমরা—কখনও বারান্দায়, কখনও রণেনের ঘরে। তবে গতকাল রাত্রে সুকান্তই তার ঘরে বসে খেলতে বললে, তাই—

হুঁ। রাত সাড়ে এগারোটায় খেলা শেষ হবার পর অতুলবাবুকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন ?

দেখেছি। এবং তাকে দরজা বন্ধ করতেও শুনেছি। তাই তো আজ সকালে তার ঘরের দরজা খোলা দেখে আমি আশ্চর্যই হয়েছিলাম !

এমনও তো হতে পারে কোন এক সময়ে হয়ত রাত্রে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন ? কথাটা বলে শিউশরণ।

তা হতে পারে। কিরীটী বলে।

রাত্রে একবার অতুল উঠতই। তবে উঠলেও শোয়ার আগে আবার সে দরজা বন্ধ করেই দিত বরাবর। কখনও তার দরজা দিতে ভুল হত না বললে মণিকা।

মিস্ গাঙ্গুলী, আপনি বলেছিলেন গত রাত্রে খেলা শেষ হবার পর অতুলবাবু আপনার সামনেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর দরজা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আপনি শুতে যান ?

হ্যাঁ। আমার আগেই অতুল শুতে যায়।

রণেনবাবু ?

রণেন আমাদের আগেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

আচ্ছা মিস্ গাঙ্গুলী, রাত্রে শোবার পর কোনপ্রকার শব্দ বা অস্বাভাবিক কোন কিছু শুনতে পেয়েছিলেন ?

না।

বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েননি নিশ্চয় ?

না। ঘুম আসছিল না বলে অনেক রাত পর্যন্ত, তা প্রায় গোটা দুই হবে, জেগে বই পড়েছি।

ওই সময়ের মধ্যেও কোন শব্দ বা কিছু ?

সেরকম কিছু না তবে বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়েছি। ভাবছিলাম হয়ত কেউ

বাথরুমে যাচ্ছে রাত্রে।

ঘরে আপনার দিদিমা ও সুবালাদি ছিলেন বলছিলেন না? আপনি যখন ঘরে শুতে যান তখন কি তাঁরা ঘুমিয়েই ছিলেন, না জেগে ছিলেন?

দুজনেই ঘুমিয়ে ছিল।

সকালে আপনার ঘুম ভাঙে ক'টায়?

ভোর ছটায়। দিদিমা উঠে যাবার কিছু পরেই।

এবার একটু ইতস্ততঃ করে কিরীটী বলে, মণিকা দেবী, অতুলবাবুর এই ধরনের আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যুতে আপনি যে অত্যন্ত শক্ড্ হয়েছেন বুঝতে পারছি। এবং এও নিশ্চয়ই আপনার মত একজন শিক্ষিতা মহিলা বুঝতে পারছেন—আমাদের পক্ষে এ রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে হলে কতকগুলো delicate প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রত্যেকেই বিশেষ করে আপনি যদি আমাদের সর্বতোভাবে না সাহায্য করেন, তাহলে—

বলুন কি জানতে চান?

কিছু মনে করবেন না। আপনাদের চারজনের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। কথায় বলে দশ পা একত্রে গেলেই নাকি বন্ধুত্ব হয়, তা এক্ষেত্রে আপনারা চারজন নিশ্চয়ই একে অন্যের খুব নিকটতম সংসর্গেই এসেছিলেন। এবং আপনাদের চারজনের মধ্যে একা আপনিই নারী। পুরুষ ও নারীর এই বয়সের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সাধারণতঃ যে সম্পর্কের সম্ভাবনাটা দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক—বুঝতে পারছেন আশা করি, কি আমি বলতে চাই মিস্ গাঙ্গুলী?

তিনজনই আমার অত্যন্ত প্রিয়। মৃদুকণ্ঠে মণিকা জবাব দেয়।

তাহলেও হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না মণিকা দেবী।

না। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধ হয় কারও প্রতি কোন আকর্ষণের তারতম্য ছিল না আমার।

মনকে আপনার খুব ভাল করে প্রশ্ন করে দেখুন। এত সহজে জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না।

ঠিকই বলছি। মণিকার স্বর দৃঢ়।

আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউ কোনদিন আপনার কাছে কোন—excuse me for my language—মানে propose করেননি?

এবার একটু থেমে ইতস্ততঃ করে মণিকা জবাব দেয়, করেছিল। তিনজনই।

পরে সংক্ষেপে সংকোচের সঙ্গে মণিকা ঘটনাটা বিবৃত করে।

এ ছাড়া আর কোন ঘটনা ? অনুগ্রহ করে লজ্জা বা দ্বিধা না করে খুলে বলুন।

মণিকা দিন দুই আগেকার সারনাথের ঘটনাটাও বিবৃত করে।

আর কোন দিনের কোন ঘটনা ?

সুকান্ত—কথাটা বলতে গিয়েও ইতস্ততঃ করে যেন মণিকা।

বলুন। থামবেন না, বলুন। উদ্‌গ্রীব-ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি জানায় কিরীটী মণিকাকে।

গত বছর পূজোর ছুটিতে আমরা দার্জিলিং যাই। সেখানে এক রাত্রে সুকান্ত আমার ঘরে এসে ঢোকে—হঠাৎ—

তারপর ?

মণিকার দার্জিলিং-বিবৃতি।

দার্জিলিংয়ের সে রাত্রের স্মৃতি। রাত্রে হোটেলের ঘরে ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপ-চাপ বসে মণিকা। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। পূজো সেবারে ছিল অক্টোবরের শেষে। শীতও সেবারে দার্জিলিংয়ে বেশ কড়া পড়েছিল। অতুলের এক প্রফেসার বন্ধুর বাড়ি কার্ট রোডে, তারাও সস্ত্রীক দার্জিলিং এসেছে, নিমন্ত্রণ করেছিল ওদের চারজনকেই কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হওয়ায় মণিকা যেতে পারেনি। সুকান্ত, অতুল ও রণেন গিয়েছে নিমন্ত্রণে।

রাত বোধ করি বারোটা হবে। হঠাৎ দরজার গায়ে মৃদু নক্ পড়ল।

কে ?

আমি। দরজাটা খোল মণি।

মণিকা উঠে দরজাটা খুলে দিল, এ কি! সুকান্ত তুমি একা! ওরা কই ?

ওরা তাসের আড্ডায় বসেছে। হয়ত আজ রাত্রে ফিরবেই না। মিঃ ও মিসেস চামেরিয়ার তাসের প্রচণ্ড নেশা। তুমি একা, তাই চলে এলাম।

বেশ করেছ, বস। মণিকা চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

গায়ের গ্রেট্ কোটটা খুলে খাটের বাজুর ওপরে রেখে দিল সুকান্ত। পাশেই একটা চেয়ার খালি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সুকান্ত বসছে না।

দেওয়ালের গায় অগ্নির রক্তাভ শিখাগুলো যেন আনন্দে নৃত্য করছে। বাইরে আজ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সমস্ত দার্জিলিং শহরটা শীতে যেন কুঁকড়ে রয়েছে।

বসো সু। আবার মৃদু আহ্বান জানায় মণিকা।

তথাপি সুকান্ত কিন্তু বসল না।

চেয়ারে উপবিষ্ট মণিকার পাশে এসে দাঁড়াল, মণি ?

বসো। মণিকা আবার জানায় সুকান্তকে।

মণিকার কাঁধের ওপরে ডান হাতটা রাখল সুকান্ত।

কাঁধের ওপরে সুকান্তর হাতের স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকাল মণিকা।

চোখের মণি দুটোতে যেন এক অস্বাভাবিক দীপ্তি।

চাপা কণ্ঠে সুকান্ত ডাকে, মণি ?

সুকান্তর স্বরের অস্বাভাবিকতা অকস্মাৎ মণিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে তাকে সচকিত করে তুলল। তখনও তাকিয়ে মণিকা সুকান্তর মুখের দিকে।

সম্মুখের ফায়ার-প্লেসের অগ্নির রক্তাভ আলোর আভায় সুকান্তর গৌর মুখখানা যেন রাঙা টক্‌টক্ করছে।

কি হয়েছে সু ? শরীর অসুস্থ বোধ করছ না তো ? উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে মণিকা উঠে দাঁড়ায়।

না। বসো।

কই দেখি কপালটা ? আরও একটু এগিয়ে এসে মণি হাতটা দিয়ে সুকান্তর কপাল স্পর্শ করতে উদ্যত হতেই মুহূর্তে দু বাহু দিয়ে সুকান্ত মণিকাকে নিজের বুকের ওপরে টেনে নিয়ে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, মণি ! মণি !

এবং পরক্ষণেই সুকান্তর উত্তপ্ত ওষ্ঠ মণিকার কপাল ও কপোলে মুহুর্মুহুঃ চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দেয়।

মণিকা ঘটনার আকস্মিকতায় এমন বিহ্বল হয়ে যায় যে বাধা দেবারও প্রথমটায় অবকাশ পায় না।

থরথর করে গভীর উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে সুকান্তর। দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় যেন একটা তরল অগ্নির জ্বালা। রোমকূপে-কূপে একটা উত্তপ্ত কামনার প্রদাহ। ভুয়ো বালির বাঁধ কামনার বন্যাস্রোতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সে আগুনের তাপে মণিকার শরীর যেন ঝল্‌সে যায়।

সুকান্ত—

না ! না ! না ! কোন বাধাই মানব না ! কোন যুক্তি কোন নিষেধ শুনব না ! তুমি—তুমি আমার ! আমার !

জোর করে ছাড়াতে চেষ্টা করে নিজেকে মণিকা সুকান্তর কঠিন বাহুবন্ধন হতে, কিন্তু সুকান্ত আরও নিবিড় করে তার দুটি বাহুর বেষ্টনী, না ! মণি, না !

সুকান্ত ! প্রায় একটা ধাক্কা দিয়েই নিজেকে এবারে মুক্ত করে নেয় মণিকা।

শোন মণি, এ নিষ্ঠুর খেলার অবসান হোক। সুকান্ত তখনও কাঁপছে উত্তেজনার

আধিক্যে, আজ জানতে চাই তুমি আমার হবে কিনা ?

আমি কারও নই। তোমাদের কারোরই হতে পারি না।

কারোরই হতে পার না! এত অহঙ্কার তোমার! তুমি কি ভেবেছে এমনি করে দিনের পর দিন আমাদের তিনজনকে তুমি বাঁদর-নাচ নাচিয়ে বেড়াবে! হিংস্র কামনামত্ত আদিম পশুপুরুষ সভ্যতার খোলস ফেলে নখর বিস্তার করেছে।

কি বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি। তুমি জান তিনজনই আমরা তোমায় চাই। আমরা তিনজনই তোমাকে কামনা করি, তাই কি তুমি এইভাবে খেলছ আমাদের নিয়ে ?

খেলছি তোমাদের নিয়ে ?

হ্যাঁ। খেলছ। কিন্তু এ চলবে না। এতদিন ওদের আমি সুযোগ দিয়েছি। তারা avail যখন করেনি—আমি আর অপেক্ষা করব না। হয় তুমি আমার হবে, না হয় আমাদের সামনে থেকে তোমায় চিরদিনের মত সরে যেতে হবে।

অতুল, রণেন তোমার বন্ধু—মণিকার স্বর যেন ভেঙে পড়তে চায়।

বন্ধু! হ্যাঁ, বন্ধু বলেই তো এতদিন চুপ করে ছিলাম। আজ যদি তারা আমার পথে দাঁড়ায় জেনো তাদের হত্যা করতেও আমি পশ্চাৎপদ হব না। কতকগুলো ক্লীব জড় পদার্থ! কণ্ঠস্বরে ঘৃণা ও আক্রোশ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

সুকান্ত! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

পাগল! না হলেও পাগল হতে বেশী দেরি হবে না আর তোমাদের এই আদর্শের ন্যাকামি নিয়ে আর কিছুদিন থাকলে। বন্ধুত্ব! মনে মনে অহোরাত্র কামনার হিংসায় জর্জরিত হয়ে বাইরে বন্ধুত্বের ভান করব আমরা আর তুমি কেবল মিষ্টি হাসি ও দুটো চোখের ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের শান্ত রাখবার চেষ্টা করবে! নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ তোমার ঐ যৌবনের রঙের ঝাপ্‌টা এই তিনটে বোকার চোখে দিয়ে—

সুকান্তর কথাটা শেষ হল না। মণিকার ডান হাতটা চকিতে একটা চপেটাঘাত হানল সুকান্তর গালে।

থমকে থেমে গেল সুকান্ত।

Get out! এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও!

প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে একটা জলের ঝাপ্‌টা দিলে যেমন সহসা সেটা নিস্তেজ হয়ে যায়, সুকান্তরও মণিকার একটিমাত্র চপেটাঘাতের চকিত বিহ্বলতায় তার ক্ষণপূর্বের সমস্ত প্রদাহ ও কামনার জ্বালা দপ্‌ করেই নিভে যায়।

নিঃশব্দে সুকান্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং শুধু ঘর থেকেই নয়, ঘণ্টাখানেক বাদে নিজের ঘর হতে সুটকেসটা নিয়ে একেবারে হোটেল ছেড়েই চলে গেল।

বাকি রাতটুকু পথে পথে কাটিয়ে পরের দিনই সে দার্জিলিং ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে গেল।

পরের দিন সকালে রণেন ও অতুল ফিরে এল। সুকান্তর খোঁজ করতে মণিকা বললে, সে তো কই ফেরেনি রাত্রে।

দুই বন্ধু আশ্চর্য হয়ে তখুনি খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু সারাটা শহরেও তার দেখা মিলল না। সকলে তখন ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় গিয়ে পুলিসে সংবাদ দেয়।

চতুর্থ দিনে অতুল সুকান্তর একটা টেলিগ্রাম পায়, 'আমি হঠাৎ কলকাতায় চলে এসেছি। ভালই আছি।'

বুঝতে ঠিক পারে না অতুল আর রণেন, সুকান্তর ঐ ধরনের বিচিত্র ব্যাপারটা। তবে ওরা জানত সুকান্ত বরাবরই একটু বেশীমাত্রায় খেয়ালী, কারণে অকারণে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পরে বন্ধুদের সঙ্গে সুকান্তর যখন দেখা হল, বলেছিল হাসতে হাসতে, হঠাৎ কি খেয়াল হল চলে এলাম। হঠাৎ যেন মধ্যরাত্রে সেদিন হোটেলে ফেরবার পথে মনে হল ফগে ভর্তি দার্জিলিং শহরটা বিশ্রী। যত শীঘ্র সম্ভব শহরটা পরিবর্জন করাই ভাল। অতএব কালবিলম্ব আর না করে কাউকে কিছু না বলে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে রাত্রে বের হয়ে পড়লাম।

* * *

কিন্তু দিল্লীতে ফিরে মণিকা কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি পেল সুকান্তর।

মণি,

জানি না সে রাত্রের আমার পশুবৎ আচরণকে তুমি এ জীবনে ক্ষমা করতে পারবে কিনা। তবু জেনো সে রাত্রের যে সুকান্তকে তুমি দেখেছিলে তার সন্ধান আর তুমি কোন দিনও পাবে না। এবং আমার সেদিনকার আচরণের জন্য দায়ী তোমার প্রতি আমার তিল তিল করে গড়ে ওঠা সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই। আমার সে আকাঙ্ক্ষাকে তুমি ঘৃণা করো না। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেই থাকে চিরন্তন আদিম একটা বৃত্তি যাকে এ যুগের লোকেরা বলবে কু আর থাকে আজকের দিনে তথাকথিত সভ্যতার আচরণে ক্লিষ্ট ভীরু একটা বৃত্তি যাকে তোমরা সগৌরবে বলে থাক সু। কিন্তু জান এই কু বা সু কোনটাই মিথ্যা নয় বরং প্রথমটাই আমার মতে নির্ভেজাল সত্য পরিচয়, যুগে যুগে মানুষের আজও যা নিঃশেষ করে ফেলতে পারিনি আমরা সভ্যতা ও তথাকথিত শিক্ষার

কষ্টিপাথরে ঘষেও। সে যা চায় তা প্রাণ খুলে অতি বড় দুঃসাহসের সঙ্গেই চায়। চাইতে গিয়ে সরমে পিছিয়ে আসে না। কিন্তু যাক সে কথা। কারণ এ যুগে 'কু'কেও কেউ ক্ষমার চক্ষে দেখবে না। সত্য ও নির্ভীক হলেও তার মনুষ্যসমাজে মর্যাদা নেই। মনে মনে যাই আমি স্বীকার করি না কেন আমিও বোধ হয় সু-এরই বশ। সেই বৃত্তিতেই ক্ষমা চাইছি। আশা করি সে রাত্রের স্মৃতিকে তুমি মনে মনে পোষণ করে রাখবে না অন্তর্জ্বালায় ও ঘৃণায়।

ইতি

অনুতপ্ত সুকান্ত

চিঠিটা পেয়ে সেদিন মণি তোমার মনে কি ভাব হয়েছিল ভোলনি নিশ্চয়ই! কারণ মুখে তুমি যতই বড়াই করো না কেন সুকান্তর সে রাত্রের অকুণ্ঠ সতেজ পুরুষ-আহ্বান তোমারও দেহে কামনার তীব্র দাহন জ্বেলেছিল। তুমি কাগজ-কলম নিয়ে লিখতেও গিয়েছিলে ঃ

সু—আমার সুকান্ত,

ভুল আমারই। স্বীকার করতে আজ আর আমার কোন লজ্জা নেই। আমার এ নারীমন আমার অজ্ঞাতে যে একটিমাত্র বিশেষ পুরুষের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল তাকে তুমিই সবল বাহুতে নাড়া দিয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও জাগিয়ে তুলেছিলে। সে রাত্রের আমার প্রত্যাখ্যানকে অস্বীকার করে জোর করে যদি তুমি আমায় অধিকার করতে, সাধ্য ছিল না আমার তোমাকে না ধরা দিই। কেন নিলে না জোর করে, কেন?

কিন্তু না! না—এসব কি লিখছে মণিকা! তাড়াতাড়ি চিঠির কাগজ ছিঁড়ে ফেলে কুটিকুটি করে সেটা উড়িয়ে দেয়। তারপর লেখে ঃ

সুকান্ত,

ভুল দোষ ত্রুটি নিয়েই মানুষ। যা হয়ে গেছে তার জন্য মনে কিছু করো না। আমরা পরস্পরের বন্ধু। এর মধ্যে কাউকে কারও ক্ষমার প্রশ্ন আসতেই পারে না। সে সব কথা আমি ভুলে গিয়েছি। ভালবাসা নিও—

তোমাদের মণি।

সংক্ষেপে মণিকা কিরীটীকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে দার্জিলিংয়ের সে রাত্রের সুকান্ত-কাহিনী বলে যায়। কিন্তু আসল কথাটি চাতুর্যের সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে গোপন করে গেলেও মণিকার গলার স্বরে এবং বিবৃতির সময় তার চোখমুখের ভাবে কিরীটীর তীক্ষ্ণ সজাগ অনুভূতির অগোচর কিছুই থাকে না।

এতক্ষণে যেন অন্ধকারে ক্ষীণ একটা আলোকের রশ্মি দেখতে পায় কিরীটী। বুঝতে

পারে এখন সুস্পষ্ট ভাবেই যেটা এখানে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে ক্ষীণ কুয়াশার মতই অস্পষ্ট ছিল, তার চিরাচরিত অনুমানের ভিত্তির ওপরে রণেন চৌধুরীর মুখে অতুলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেটা একেবারে মিথ্যা নয় এবং এই মৃত্যু-রহস্যের মূলে হয়ত তার অনেকখানিই ছড়িয়ে আছে।

ডাক পড়ল মণিকা দেবীর পর প্রথমে দিদিমার।

দিদিমা পেটের গোলমালের জন্য কয়েক বৎসর ধরে আফিম খান। তিনি অতুলের মৃত্যুর ব্যাপারে বিশেষ কোন আলোকসম্পাতই করতে পারলেন না। তাছাড়া দিদিমা কানেও একটু খাটো। তাঁকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, এরকমটি যে হবে তা আমি জানতাম দারোগাবাবু। তিনটে পুরুষ আর ও একা মেয়ে।

কিরীটী সচকিত হয়ে ওঠে, কেন দিদিমা? আপনি কি ওদের মধ্যে তেমন কিছু কখনও দেখেছেন?

তেমন পাত্রীই আমার নাতনী নয়। মেয়ে আমার খুব ভাল। আর ওরা তিনজনও বড় ভাল কিন্তু কথায় বলে বয়েসের মেয়ে-পুরুষ! ঘি আর আগুন! যত সাবধানেই রাখ অনর্থ ঘটতে কতক্ষণ!

কিরীটী বোঝে দিদিমাকে আর বেশী ঘাঁটিয়ে লাভ হবে না।

কিরীটীর ইঙ্গিতে শিউশরণ দিদিমাকে বিদায় দেয়।

॥ ছয় ॥

সর্বশেষে ডাক পড়ল সুবালাদির। সুবালা।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়েই কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

কিরীটীরই ভাষায়—

স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম যেন প্রথমটায়। একটা জ্বলন্ত আগুনের রক্তাভ শিখা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল হঠাৎ।

এত রূপ মানুষের দেহে কখনও সম্ভব কি!

শুভ্র পরিধেয় শ্বেতবস্ত্রে সে রূপ যেন আরও স্পষ্ট আরও প্রখর হয়ে উঠেছিল।

বিস্ময় ও আকস্মিকতায় কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে আবার ভাল করে ভদ্রমহিলার

মুখের দিকে তাকালাম। এবং তখুনি আমার মনে হল সে রূপ বা দেহশ্রীর মধ্যে এতটুকু স্নিগ্ধতা নেই। জলন্ত উগ্র উষ্ণ। তৃষ্ণা মেটে না, চোখ যেন ঝলসে যায়।

আরও একটা জিনিস যেটা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তার ছোট কপাল, বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল ও ঈষৎ চাপা নাসিকার মধ্যে যেন একটা উগ্র দাম্ভিকতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

দৃঢ়বদ্ধ চাপা ওষ্ঠ ও সরু চিবুক নিদারুণ একটা অবজ্ঞায় যেন কুটিল কঠিন।

এমন কি তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটির মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা তাচ্ছিল্যের ও অবজ্ঞার ভাব।

কপাল পর্যন্ত স্বল্প ঘোমটা টানা।

তার ফাঁকে ফাঁকে কুঞ্চিত কেশদাম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বয়স ত্রিশের বেশী নয়।

কিরীটীই প্রথম কথা বললে, আপনিই সুবালা দেবী?

হ্যাঁ। নিম্নকণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ করলে সুবালা।

বসুন—

কিরীটীর বলা সত্ত্বেও উপবেশন না করে সুবালা নিঃশব্দে বারেকের জন্য ঘরের মধ্যে উপস্থিত কিরীটী, শিউশরণ ও সুব্রত সকলের মুখের প্রতি দৃষ্টিটা যুগপৎ বুলিয়ে নিয়ে কিরীটীকেই প্রশ্নটা করল, আমাকে আপনারা ডেকেছেন কেন?

অতুলবাবুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, শুনেছেন বোধ হয়? কথাটা বললে কিরীটী।

শুনেছি। তেমনি নিম্ন শান্ত কণ্ঠের জবাব।

গত রাত্রে আপনি মণিকা দেবীর সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

কাল রাত কটা আন্দাজ আপনি ঘুমোতে যান মনে আছে কি আপনার?

ও ঘরে আমি রাত দশটায় সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলেই যাই। বিছানায় যাই রাত এগারোটা আন্দাজ।

সারদা দেবী—মানে মণিকা দেবীর দিদিমা তো ওই একই ঘরে ছিলেন?

হ্যাঁ।

সারদা দেবীর আফিমের অভ্যাস আছে শুনলাম—

হ্যাঁ।

সারদা দেবী সাধারণতঃ রাত্রে ঘুমোন কেমন?

সাধারণতঃ ভাল ঘুম হয় না তাঁর। নেশায় একটা ঝিমানো ভাব থাকে।

কানেও তো একটু কম শোনেন উনি শুনলাম।

সে এমন বিশেষ কিছু নয়।

রাত সাড়ে এগারোটার পর মণিকা দেবী ঘরে ঢুকে আলো জ্বালান। তার আগে পর্যন্ত মানে রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনি কি করছিলেন?

একটু আগেই তো আপনাকে বললাম রাত এগারোটায় আমি শুতে যাই।

হ্যাঁ। কিন্তু ঘরে গিয়েছেন আপনি রাত দশটায়। দশটা থেকে এগারোটা এই এক ঘণ্টা আপনি কি করছিলেন?

একটা বই পড়ছিলাম।

তারপর?

তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি।

শুয়েই নিশ্চয়ই ঘুমোননি?

না। তবে বোধ হয় মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুম এসে গিয়েছিল।

মণিকা দেবী রাত সাড়ে এগারোটায় যখন ঘরে ঢোকেন, জানেন আপনি?

ঠিক কখন সে ঘরে প্রবেশ করেছে জানি না। তবে মাঝরাত্রে একবার ঘুম ভেঙে যেতে দেখেছিলাম ঘরে আলো জ্বলছে—মণি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

আবার আপনি ঘুমিয়ে পড়েন?

হ্যাঁ।

কখন ঘুম ভাঙল?

ভোর পাঁচটায়।

অত ভোরেই কি সাধারণতঃ আপনি বিছানা ত্যাগ করেন?

হ্যাঁ। ভোর-ভোরই আমি ঘরের কাজকর্ম সেরে রাখি।

আজও তাই করেছেন?

হ্যাঁ। ঘুম ভাঙতেই নীচে চলে যাই কাজকর্ম সারতে।

মণিকা দেবী তখন কি করছিলেন?

ঘুমোচ্ছিল।

সারদা দেবী?

তিনি তার কিছুক্ষণ বাদেই উঠে গঙ্গাস্নানে যান।

অতুলবাবু যে মারা গিয়েছেন আপনি জানলেন কখন?

দিদিমণি গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে আসবার পর তাঁকে যখন মণি বলে সেই সময়—

তার আগে টের পাননি?

সুবালা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, তার আগে টের পাননি ?

য়্যাঁ! সুবালা যেন চমকে ওঠে, কি বলছেন ?

বলছিলাম তার আগে কিছু টের পাননি ?

না।

কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে, তারপর প্রশ্ন করে, কাল রাত্রে কোন রকম শব্দ শুনেছেন সুবালা দেবী ?

শব্দ! কই না তো!

এ-বাড়িতে আপনি কতদিন আছেন ?

বছর পাঁচেক হবে।

অতুলবাবু, রণেনবাবু ও সুকান্তবাবু এদের তো আপনি ভাল করেই চেনেন ?

হ্যাঁ। ওঁরা মধ্যে মধ্যে এখানে এসে থাকেন।

দেখুন সুবালা দেবী, যে ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ঘটনার সঙ্গে পাকেচক্রে যাঁরা জড়িত হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র আপনিই সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ। তাই কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। এবং আপনার কাছ হতে চাই তার নিরপেক্ষ জবাব।

আমি কিছুই জানি না।

আমার প্রশ্ন না শুনেই বলছেন কি করে যে জানেন না ?

বুঝতেই পারছেন এদের আশ্রয়েই আমি আছি। ত্রিসংসারে আমার আপনার কেউ নেই।

কিন্তু এটা নিশ্চয়ই চান হত্যাকারী ধরা পড়ুক ?

হত্যাকারী! মানে ?

মানে অত্যন্ত সহজ। অতুলবাবুকে কেউ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।

হত্যা!

হ্যাঁ।

এই ধরনের কিছু যে হবে এ আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম।

কেন বলুন তো ?

এই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক!

তাছাড়া কি। নেহাত এদের আমি আশ্রিত নচেৎ একটি মেয়েকে নিয়ে তিনটি অবিবাহিত পুরুষ—ক্ষমা করবেন। বলতে বলতে হঠাৎ সুবালা থেমে গেল।

থামলেন কেন? বলুন কি বলছিলেন?

লেখাপড়া জানা সব শিক্ষিত এরা। এদের হাবভাবই আলাদা—আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অশিক্ষিত গেঁয়ো মেয়েমানুষ।

সুবালার প্রতিটি কথার উচ্চারণে তীক্ষ্ণ একটা চাপা শ্লেষ অত্যন্ত বিশ্রীভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেটা কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়ায় না।

কিরীটী তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিতে ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড়টা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সুবালা দেবী, এদের চারজনকেই মানে আমি মৃত অতুলবাবুর কথাও বলছি—কি রকম মনে হয়?

তা সকলেই ভদ্র মার্জিত শিক্ষিত—

এদের পরস্পরের সম্পর্কটা?

প্রত্যেকের সঙ্গেই তো প্রত্যেকের গলায় গলায় ভাব দেখেছি। তবে কার মনে কি আছে কেমন করে বলি বলুন?

তা বটে। আচ্ছা মণিকা দেবী, তাঁর তিনটি বন্ধুকেই সমান চোখে দেখতেন বলে আপনার মনে হয়?

মনে কিছু অন্যরকম আছে কিনা বলতে পারি না। তবে বাইরে কারও প্রতি মণির কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

গত দু-একদিনের মধ্যে এদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা বলতে পারেন?

না।

এদের তিন বন্ধুর মধ্যে সব চাইতে কাকে বেশী ভাল বলে আপনার মনে হত সুবালা দেবী?

অতুলবাবুকেই।

অতঃপর ক্ষণকাল আপন মনে কিরীটী কি যেন ভাবে। তারপর সুবালার দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন সুবালা দেবী।

সুবালা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করতে শুরু করে।

সুব্রত ও শিউশরণ কেউ কোন কথা বলে না।

মণিকা দেবীকে আর একবার ডাক তো শিউশরণ!

হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে পড়ায় কিরীটী শিউশরণকে কথাটা বললে।

শিউশরণ কিরীটীর নির্দেশমতই মণিকাকে ডাকতে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই শিউশরণের সঙ্গে সঙ্গে মণিকা এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন মণিকা দেবী! আপনাকে আবার কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত। কিরীটী বললে।

মণিকা কিরীটীর কথায় কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই থাকে।

আচ্ছা মণিকা দেবী, এইবারের ছুটির মত আর কখনও আগে আপনারা সকলে এই বাড়িতে কি কখনও একত্রে এসে কাটিয়েছেন?

কিরীটীর প্রশ্নে মণিকা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কতদিন আগে?

তিন বছর আগে।

কতদিন সেবারে আপনারা এখানে ছিলেন?

এক মাস প্রায় হবে।

অনেকদিন সেবারে ছিলেন তো?

হ্যাঁ। আমার সেবারে টাইফয়েড্ হয়, তাই বাধ্য হয়েই—বাকী কথাটা আর শেষ করে না মণিকা।

হুঁ। আচ্ছা তিনজনেই মানে তিন বন্ধুই আপনার সেবা করতেন সমান ভাবে, না? প্রশ্ন করে আবার কিরীটী।

তা করত। তবে বেশীর ভাগ সময় অতুল ও সুবালাদিই আমার ঘরে থাকত।

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে যদি অবিশ্যি কিছু না করেন?

বলুন।

বলছিলাম আপনার সুবালাদিকে কি রকম মনে হয়? প্রশ্নটা করে কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ যেন চমকে মণিকা কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

এ-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? হিন্দুঘরের ব্রতচারিণী বিধবা সুবালাদি—

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির একটা বঙ্কিম রেখা জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়।

আপনি নারী হয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অন্য এক নারী সম্পর্কে আমার প্রশ্নটা ঠিক—

না, সে রকম কিছু থাকলে অন্ততঃ আমার দিদিমার নজর এড়াত না মিঃ রায়। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় মণিকা কিন্তু তথাপি কিরীটীর মনের সংশয়টা যেন যায় না। অদৃশ্য একটা কাঁটার মতই একটা সংশয় যেন কিরীটীকে বিঁধতে থাকে।

আচ্ছা। আপনি যেতে পারেন।

মণিকা চলে গেল।

মণিকা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর কিরীটী নিঃশব্দে আপন মনেই কিছুক্ষণ ধূমপান করে। তারপর অর্ধদগ্ধ চুরোটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে শিউশরণের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, শিউ, চল আর একবার অতুলবাবুর ঘরটা দেখে আসা যাক।

চল। কিরীটী যখন পাকেচক্রে একবার এই ব্যাপারে এসে মাথা দিয়েছে, মীমাংসায় একটা পৌঁছনো যাবেই। তাই কিরীটীর উপরেই সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল শিউশরণ।

সকলে পুনর্বার যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

চাদরে আবৃত মৃতদেহটা তেমনি রয়েছে চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট।

কিরীটী তার অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দিকে তাকাতে লাগল আর একবার।

ঘরের পূর্ব কোণে একটা জলচৌকির উপরে একটা মাঝারি আকারের চামড়ার সুটকেস। এগিয়ে গিয়ে কিরীটী সুটকেসটার সামনে দাঁড়াল।

সুটকেশের উপরে অতুলের নাম ও পদবীর আদ্যক্ষর ইংরাজীতে লেখা।

নীচু হয়ে কিরীটী সুটকেশটা খোলবার চেষ্টা করতেই ডালা খুলে গেল। বোঝা গেল সুটকেশে চাবি দেওয়া ছিল না। তালাটা খোলাই ছিল। ডালাটা সুটকেশের তুলল কিরীটী। কতকগুলো জামাকাপড়, খানকতক ইংরাজী বই।

একটা একটা করে কিরীটী বইগুলো তুলে দেখতে লাগল।

একান্ত শিথিল ভাবেই কিরীটী সুটকেশ হতে ইংরাজী বইগুলো একটা একটা করে তুলে দেখতে শুরু করে।

বইগুলো বিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত নামকরা সব সাইকোলজি ও সেকসোলজি সংক্রান্ত।

বইগুলো অন্যমনস্ক ভাবে উলটে দেখতে দেখতে আচমকা কিরীটীর মনের চিন্তা-আবর্তে এসে উদিত হয় একটা কথা এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী সুটকেসের পাশে হাতের বইগুলো নামিয়ে রেখে পুনর্বার এগিয়ে যায় চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট ও চাদরে আবৃত মৃতদেহের সন্নিকটে এবং নীচু হয়ে চেয়ারের পায়ার কাছেই ভূপতিত বইটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গিয়ে সহসা চেয়ারের পায়ার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

শিউশরণ :তখন তার নোটবুকে ক্ষণপূর্বে শোনা জবানবন্দির কতকগুলো পয়েন্টস্ টুকে নিতে ব্যস্ত। কিরীটীর প্রতি তার নজরটা ছিল না।

যে চেয়ারটার উপরে মৃতদেহ উপবিষ্ট ছিল তারই একটা পায়ার সঙ্গে ও দেখতে পেল

জড়ানো সরু একটা তামার পাত।

চেয়ারটা যদিও তৈরী স্টীলের এবং রঙটা তার অনেকটা তামাটে, সেই কারণেই সেই তামাটে বর্ণের সরু স্টীলের পায়ার সঙ্গে জড়ানো সরু একটা তামার পাত চট্ করে সহজে কারও দৃষ্টিতে না পড়বারই কথা। সেই কারণেও বটে এবং প্রথম দিকে মৃতদেহ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে কিরীটীর মন বেশী নিবিষ্ট ছিল বলেই ব্যাপারটা ওর নজর এড়িয়ে গিয়েছে প্রথম দিকে।

কৌতূহলভরে কিরীটী হাত দিয়ে চেয়ারের পায়া থেকে সরু তামার পাতটা খুলে নেবার চেষ্টা করল। এবং খুব বেশী শক্ত করে জড়ানো না থাকায় অল্প আয়াসেই সেটা খুলে নিল।

তামার পাতটা হাতে নিয়ে কিরীটী পরীক্ষা করে।

তার মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলো বিশেষ ভাবেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুরাতন একটা তামার পাত!

বুঝতে কষ্ট হয় না চেয়ারের পায়াটার দিকে তাকিয়ে যে, পায়ার সঙ্গে তামার পাতটা বরাবর জড়ানো ছিল না।

শিউশরণের নজর পড়ে কিরীটীর দিকে।

কি দেখছ অমন করে, রায়?

একটা সরু তামার পাত।

তামার পাত! বিস্মিত শিউশরণ পালটা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। বলতে বলতে কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক আবার তাকায়।

চোখের শ্যেন অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা একসময় ঘুরতে ঘুরতে দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে যেখানে আলোর সুইচটা তার উপরে গিয়ে নিবদ্ধ হল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কিরীটী সুইচটার সামনে দেওয়ালের কাছে।

সাধারণ প্লাস্টিকের সুইচ।

সুইচের উপরের অংশটা কোন একসময় ভেঙে গিয়েছিল বোধ হয়। খানিকটা অংশ নেই। অথচ আশ্চর্য! জানা গিয়েছে পরশু এ ঘরের আলোটা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল! মিস্ত্রীও এসেছিল। তবু ভাঙা সুইচটা বদলানো হয়নি বোঝাই যাচ্ছে।

অন্যমনস্ক ভাবেই কিরীটী সুইচটা টিপল কিন্তু দেখা গেল ঘরের বাল্‌ব্‌টা জ্বলছে না।

আবার এগিয়ে গেল কিরীটী ঝুলন্ত বাল্‌ব্‌টার কাছে। এবং তাকিয়ে রইল ঝুলন্ত বাল্‌ব্‌টার দিকে।

শিউশরণ অবাক হয়ে কিরীটীকে প্রশ্ন করে, কি হল?

সুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ঐ চৌকিটা এনে ঐ বাল্‌ব্‌টা খোল তো শিউশরণ।

কেন হে! হঠাৎ বাল্‌ব্‌টার কি আবার প্রয়োজন হল?

খোল না বাল্‌ব্‌টা। যা বলি কর—

শিউশরণ আর কথা বাড়ায় না। কিরীটীর নির্দেশমত চৌকিটা এনে তার উপরে দাঁড়িয়ে বাল্‌ব্‌টা খুলে কিরীটীর হাতে দিল।

বাল্‌ব্‌টা হাতে করে একবার ঘুরিয়ে দেখেই গম্ভীর কণ্ঠে আত্মগত ভাবেই যেন কিরীটী মৃদুভাবে বলে, হু। ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

কি বললে?

কিছু না।

বলতে বলতে কিরীটী আবার এগিয়ে যায় দেওয়ালের গায়ে সুইচটার সামনে।

সুইচটা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া শুরু করে।

এবারে হঠাৎ একটা সরু তারের অংশ সুইচের তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে, কিরীটীর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় তার মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোতে কম্পন তুলে। চোখের তারা দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। ও নিম্নকণ্ঠে বলে, So this is that!

কি হল হে?

পেয়েছি—

কি পেলে?

তামার পাত ও ফিউজড্ বাল্‌বের রহস্য।

হেঁয়ালি গাঁথছ কেন বল তো?

হেঁয়ালি নয় শিউশরণ, সাধারণ সাংকেতিক নিয়ম।

তারপরই হঠাৎ আবার কি মনে পড়ায় কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এগিয়ে গিয়ে ক্ষণপূর্বে রাখা মাটি হতে বইটা হাতে তুলে নিল।

বইটা কিন্তু সাইকোলজি বা সেকসোলজি সংক্রান্ত নয়। শরৎচন্দ্রের একখানা বহুখ্যাত উপন্যাস। চরিত্রহীন।

বইটা হাতে করে অন্যমনস্ক ভাবে বইয়ের পাতাগুলো ওলটাতে লাগল কিরীটী।

অনেক হাত ঘুরেছে। অনেক হাতের ছাপ বইটার সর্বত্র।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ বইয়ের একটা পাতার মার্জিনে লাল কালিতে বাংলায়

লেখা একটা টিপ্পনী নজরে পড়তেই কিরীটীর চোখের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। মন হয়ে ওঠে সচেতন।

সুন্দর মুক্তার মত ছোট ছোট হরফে গোল গোল লেখা।

কিরণময়ী, দুঃখ করো না। উপীন্দ্র নপুংসক।

ক্ষণকাল স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে লাইনটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিরীটী। তারপর আবার একসময় বইটার বাকি পাতাগুলো বেশ একটু মনোযোগ সহকারেই উলটে চলে। কিন্তু আর কোথায়ও কোন টিপ্পনী ওর চোখে পড়ে না।

কি ভেবে কিরীটী চরিত্রহীন বইখানা হাতে নিয়েই পুনরায় সুটকেসটার কাছে এগিয়ে এল। এক এক করে এবারে সুটকেস হতে কাপড়জামাগুলো বের করে পাশে নামিয়ে রাখতে লাগল।

শুধু কাপড়জামা ও বই-ই নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি অনেক কিছুই সুটকেস হতে বের হয়। এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে তলায় পাওয়া গেল বইয়ের আকারে একটা মরোক্কো লেদারে বাঁধানো সুদৃশ্য খাতা।

সাগ্রহে কিরীটী খাতাটা তুলে নিয়ে মলাটটা ওলটালো।

প্রথম পাতাতেই লেখা : ছিন্নপাতার দল।

তার নীচে লেখা : অতুল।

মনের মধ্যে একটা কৌতূহল উঁকি দেয়। কিরীটী খাতার পৃষ্ঠাগুলো উলটে চলে সাগ্রহে উত্তেজনায়। অতুলের ডায়েরী।

কোথাও তারিখ বড় একটা নেই। অসংলগ্ন স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো যেন এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে।

লেখা কখনও ইংরাজীতে, কখনও বাংলায়।

দু-একটা পৃষ্ঠা এদিক-ওদিক থেকে পড়ে কিরীটী।

তারপর একসময় ডায়েরীটা জামার পকেটে ভরে নেয়।

আরও কিছুক্ষণ পরে।

কিরীটীর নির্দেশক্রমেই শিউশরণ সকলকে ডেকে আপাততঃ তার বিনানুমতিতে যেন কাশী কেউ না ত্যাগ করে নির্দেশ দিয়ে ও মৃতদেহের উপরে পাহারার ব্যবস্থা করে সকলে বিদায় নিয়ে ঐ বাড়ি হতে বের হয়ে এল।

॥ সাত ॥

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে।

আহারাদির পর শিউশরণ একটা জরুরী তদন্তে বাইরে বের হয়েছে। সুব্রত একটা নভেল নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

কিরীটী একটা আরাম-কেদারার ওপরে একটা বর্মা চুরোট ধরিয়ে ঐদিন সকালে তদন্তের সময় মৃত অতুলের সুটকেসে প্রাপ্ত ডায়েরীটা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টে চলেছে।

এক জায়গায় লেখা ঃ

মাঝে মাঝে ভাবি মণি কি ধাতুতে গড়া! সত্যিই কি ওর মধ্যে কোন নারীমন আছে? না, দেহেই ও শুধু নারী! মনের দিক দিয়ে ও নপুংসক। এই দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে আমাদের তিন পুরুষ বন্ধুর কেউই কি ওর মনে কোন আঁচড়ই কাটতে পারিনি!

আবার এক পাতায় লেখা ঃ

বাবা মা এত করে বলছেন বিবাহের জন্য। কিন্তু কেমন করে তাঁদের বলব বিবাহ করলে আমি সুখী হতে পারব না। সমস্ত মন আমার আচ্ছন্ন করে রয়েছে সে। অথচ নিজের মনে নিজেই যখন বিশ্লেষণ করি অবাক হয়ে যাই। কি আছে ওর? রূপ তো নয়ই। ওর মত মেয়েরও বাংলাদেশে অভাব নেই। আচ্ছা ও কি কোন যাদু জানে! নচেৎ এমন করে আমাদের প্রত্যেককে ও আকর্ষণ করে কেন?

*　　　*　　　*

মাঝে মাঝে ভারি জানতে ইচ্ছে করে আমাদের সম্পর্কে ওর মনোভাব কি? যে যাই বলুক ও তো মেয়েমানুষই! নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কারও সম্পর্কে কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকা সম্ভব। সুকান্ত ও রণেনকে জিজ্ঞাসা করব খোলাখুলি! না না, ছিঃ! কি ভাববে ওরা? যদি হাসে! ব্যঙ্গ করে! না না, সে হবে মর্মান্তিক। কিন্তু এমন করে মনের সঙ্গেই বা কতকাল আর যুদ্ধ করা যায়? এর চাইতে স্পষ্টাস্পষ্টি একদিন সব কিছুর মীমাংসা করে নেওয়াই তো ভাল।

I don't believe Sukanta! বিশ্বাস করি না ওকে আমি। তলে তলে নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে সুকান্তর কোন বোঝাপড়া হয়েছে।

কিন্তু তাই যদি হয়, বন্ধু বলে ক্ষমা করব না সুকান্তকে।

একজন আমরা ওকে পাব বাকি দুজন পাবে না, না। এ হতে পারে না।

তার চাইতে এ অনেক ভাল।

বহুবল্লভাই ও থাক।

ও আমাদের দ্রৌপদী!

কিরীটী পাতার পর পাতা উল্টে চলে—সবই প্রায় একই ধরনের কথা। সেই একটি মেয়ের জন্য মনো-বিকলন। কখনও রাগ, কখনও অভিমান, কখনও হিংসা। লেখার প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

কিরীটী দু-এক লাইন করে পড়ে আর উল্টে যায়।

হঠাৎ মাঝামাঝি একটা পাতায় এসে ওর মন সচেতন হয়ে ওঠে যেন নতুন করে।

* * *

উঃ! চোখ যেন ঝলসে গেল আমার। আগুনের একটা হঠাৎ ঝাপ্‌টা যেন চোখের দৃষ্টি আমার কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিয়ে গেল। মূর্তিমতী অগ্নিশিখা যেন। আলোর একটা শিখা যেন ঊর্ধ্বে বঙ্কিম হয়ে উঠেছে।

কি নাম দিই ওর? অগ্নিশিখা! না বহ্নিশিখা?

আবার এক জায়গায়।

না। আমার মনের ভুল নয়। ওর চোখের দৃষ্টিতেই ও ধরা পড়েছে। দুপুর বেলায় সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম হঠাৎ চোখাচোখি হল একেবারে সামনাসামনি।

কি যেন ও নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিল। হঠাৎ এমন সময় উপরে মণির গলা শুনতে পেলাম। দুরদুর করে উঠল বুকের ভিতরটা।

ছিঃ ছিঃ—মণি যদি জানতে পারে লজ্জায় যে তার কাছে আর এ জীবনে মুখ দেখাতে পারব না। বলবে, এই তোমার ভালবাসা! এই চরিত্রের তুমি গর্ব কর!

মণির অসুখ। রাত্রে শিয়রে বসে আছি মণির মাথায় আইস্‌-ব্যাগটা ধরে। বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ একটা আগুনের মত তপ্ত স্পর্শে চমকে চোখ খুলে তাকালাম। আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরেছে।

চাপা গলায় বললে, বাইরে চল। কথা আছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই উঠে বাইরে এলাম। সাপের চোখের সম্মোহন দৃষ্টি যেন তার চোখে ছিল।

আমি আর পারছি না অতুলবাবু—

এসব কি বলছেন আপনি!

বলবই না এ জীবনে কোন দিনই ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এ কদিনে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছি—

ছিঃ ছিঃ! এ-কথা আপনারও যেমন বলা মহাপাপ, আমার শোনাও মহাপাপ!

পাপ!

হ্যাঁ। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছেন আপনার সত্য পরিচয়।

ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মতই মুহূর্তে সে গ্রীবা বেঁকিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, কি বললেন?

আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ নন, ঘরে যান।

দেখ অতুলবাবু, আর যে-ই চরিত্রের বড়াই করুক তোমরা কেউ অন্তত করো না। তোমাদের সম্পর্কের কথা পরস্পরের মধ্যে আর কেউ না বুঝুক আমার চোখে চাপা দিতে পারবে না।

এসব কি বলছেন আপনি? সকলকে নিজের মত ভাববেন না। রাগে তখন আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় অন্য দিকে আমি মুখ ফেরালাম।

সব চরিত্রবান যুধিষ্ঠিরের দল!

বলতে বলতে চলে গেল সে।

হতবাক দাঁড়িয়ে রইলাম আমি সেখানে।

তারপরই লেখা :

যাক। ও সুস্থ হয়ে উঠেছে।

উঃ! কি সাংঘাতিক ঐ বহ্নিশিখা! সাপের চেয়েও সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! এ কদিন সর্বদা আমার একটা ভয় ছিল হয়ত আমার নামে মণির কাছে ও অনেক কিছু বানিয়ে বলবে। কিন্তু বলেনি।

তারপর আবার এক জায়গায় লেখা :

দার্জিলিংয়ের ব্যাপারটা যে কি হল বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ সুকান্ত কাউকে না বলে-কয়ে রাতারাতি দার্জিলিং হতে উধাও হয়ে গেল কেন?

মণি যতই চুপ করে থাক আমার স্থির বিশ্বাস নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

আর যার দৃষ্টিকেই ওরা এড়িয়ে যাক না কেন ওদের দুজনের হাবভাব পরস্পরের প্রতি পরস্পরের, চোখে চোখে নীরব ইশারা স্পষ্ট আমার কাছে।

আমার কেন জানি মনে হয় আমাদের মধ্যে সুকান্তর ওপরেই মণির দুর্বলতা একটা আছে।

শেষ পর্যন্ত কি ভাগ্যলক্ষ্মী সুকান্তর গলায়ই করবে মাল্যদান!

তারপর শেষ পাতায়ঃ

আবার কাশী। আবার সেই তপ্ত অগ্নিশিখার সম্মুখীন হতে হবে।

না বলতেও তো পারব না।

মণির আমন্ত্রণ। যেতেই হবে।

* * *

না। ও নিষ্ঠুর।

হৃদয় বলে ওর কোন বস্তু নেই।

সত্যি কি তাই!

* * *

আশ্চর্য ব্যবহার বহ্নিশিখার! এবারে যেন মনে হচ্ছে ও একেবারে সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছে। অবশ্য নিজেও আমি মনের দিক দিয়ে কোন ক্ষীণতম আকর্ষণও অনুভব করছি না।

আচ্ছা এরই বা কারণ কি! ওর দিকে তাকালে আকর্ষণের বদলে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণাই বোধ করি।

ও রূপে মনের তৃষ্ণা তো মেটেই না, স্নিগ্ধও হয় না মন। বরং মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে।

আর মণি!

দিন-দিনই যেন আকর্ষণ বাড়ছে।

ওকে দেখার তৃষ্ণা বুঝি এ জীবনে মেটবার নয়।

কিন্তু হায় রে তৃষ্ণা! ও যে মরীচিকা মিথ্যা! মায়া!

॥ আট ॥

পরের দিন সকালেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

কোন তীব্র বৈদ্যুতিক কারেণ্টের আঘাতেই অতুলের মৃত্যু ঘটেছে। শিউশরণের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কিরীটী, সুব্রত ও শিউশরণের মধ্যে ঐ সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল সন্ধ্যার দিকে ঐ দিনই।

Electrocutionয়ে মৃত্যু! অভিনব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে হত্যা করবার জন্য।

কিরীটী বলছিল, অতুলবাবুর শরীরের মধ্যে হাই ভোল্টের কোন ইলেকট্রিক কারেণ্ট প্রবেশ করিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে সেটুকু বোঝা গেল। কিন্তু কথা হচ্ছে আলোর সুইচটা অন্ করেছিল কে? অতুলবাবু নিজেই, না হত্যাকারী?

শিউশরণ প্রশ্ন করে, কি তুমি বলতে চাও কিরীটী? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শিউশরণ কিরীটীর মুখের দিকে।

বলছি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেই অতুলবাবু আলোটা জেলে নিজের ঘরের মধ্যে যে মৃত্যু-ফাঁদ পাতা ছিল তাতে নিজেই অজ্ঞাতে পা দিয়েছিলেন, না অতুলবাবু সে রাত্রে তাসের আড্ডা হতে ফিরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বরাবর গিয়ে শয্যা নিয়েছিলেন তারপর কোন একসময় সেই ঘরে হত্যাকারী প্রবেশ করে।

তাহলে তোমার ধারণা হত্যাকারী অতুলবাবুর বিশেষ পরিচিতই ছিল? প্রশ্নটা করে শিউশরণ।

নিশ্চয়ই। সে রকমই যদি হয়ে থাকেও কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে শেষের ব্যাপারটাই যদি ঘটে থাকে তাহলে বুঝতে হবে একান্ত আকস্মিক ভাবেই মৃত্যু এসেছিল সে রাত্রে বিশেষ তাঁর একজন পরিচিত জনের হাত দিয়েই—

আর একটু খোলসা করে বল, রায়।

দেখ শিউশরণ, আমার অনুমান প্রথমোক্ত ভাবেই অতুলবাবুকে আকস্মিক ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাসের আড্ডা হতে ফিরে খুব সম্ভবতঃ অতুলবাবু আলো জেলে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যাবেন এমন সময় হয়ত হত্যাকারী ঘরে প্রবেশ করে। এবং খুব সম্ভবতঃ হয়ত হত্যাকারী গিয়ে অতুলবাবুর শয্যার ওপরে উপবেশন করে ও তাই দেখে অতুলবাবু চেয়ারে বসতে যান—এই পর্যন্ত কথাটা বলতে বলতেই হঠাৎ কিরীটী কি ভেবে যেন থেমে যায় এবং চাপা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই তাই!

বিস্মিত সুব্রত ও শিউশরণ দুজনেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি? কি নিশ্চয়ই কিরীটী?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কিন্তু—কিন্তু কেন! আর তাই যদি হয়ে থাকে মণিকা দেবীর জানা উচিত ছিল। মণিকা দেবীর নিশ্চয়ই জানা উচিত ছিল। কিরীটী স্বগতোক্তির মতই যেন আপন মনে কথাগুলো বলে চলে।

সুব্রত ও শিউশরণ কিরীটীর মৃদুচ্চারিত কথাগুলো শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে তখন পায়চারি শুরু করেছে।

কোন একটা বিশেষ চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে এবং সেই চিন্তার আবর্তেই কিরীটী সহসা ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অথচ এও সুব্রত জানে নিজে থেকে স্বেচ্ছায় যতক্ষণ না কিরীটী স্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে ততক্ষণ কোনমতেই কোন সাড়া তার কাছ হতে পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ আবার একসময় পায়চারি থামিয়ে কিরীটী শিউশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, চল শিউশরণ, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক।

বাইরে! কোথায় যাবে?

চলই না। আগে হতেই মেয়েলী কৌতূহল কেন? সুব্রত, চল। ওঠ।

অগত্যা উঠতেই হল ওদের দুজনকে।

রাস্তায় বের হয়ে কিরীটী গোধূলিয়ার দিকেই চলতে শুরু করে।

মন্থর অলস পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে কিরীটী আগে আগে আর ওরা দুজনে নির্বাক তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

কোথায় চলেছে কিরীটী!

চলতে চলতে ক্রমে ওরা জঙ্গমবাড়িতে মণিকা দেবীদের বাড়ির কাছাকাছিই এসে দাঁড়াল।

অপ্রশস্ত সরু গলিপথটায় আলোর ব্যবস্থা এত কম যে সমগ্র গলিপথটা একটা আলো-আঁধারিতে যেন কেমন থমথম করছে।

হঠাৎ কিরীটী শিউশরণকে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, মণিকাদের ঠিক উল্টো দিকে ঐ দোতলা বাড়িটায় কে থাকে শিউশরণ?

কেমন করে বলব না খোঁজ নিয়ে? শিউশরণ নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

তাহলে চল একবারটি না হয় খোঁজ নিয়েই দেখা যাক।

ব্যাপার কি ?

বুঝতে পারছ না ? 'উপরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ। ঐ বাড়ির দোতলা থেকে মণিকা দেবীদের বাড়ির দোতলার বিশেষ একটা ঘরের জানলাটা খোলা থাকলে এ-বাড়ির কোন কোন লোকের চোখে ঘটনাচক্রে বা দৈবাৎ যাই বল মণিকা দেবীদের বাড়ির ঐ ঘরের কোন কিছু হয়ত দৃষ্টিগোচরও হতে পারে। এবং মণিকা দেবীদের বাড়ির প্ল্যানটা একটু ভেবে দেখলেই মনে পড়বে ঐ যে বন্ধ জানলাটা দেখছ মণিকা দেবীদের বাড়ির ওটাই সেই ঘর—অকুস্থান, যেখানে অতুলবাবুকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব—

কিরীটীর কথায় দুজনে তাকিয়ে দেখতেই মনে হল, সত্যি তাই তো !

শেষোক্ত কথার জের টেনে কিরীটী তখন বলছে, অতএব চলই না একবার ঐ বাড়িটায় ঢুঁ মেরে দেখা যাক।

চল।

সকলে এগিয়ে গেল।

কিন্তু দরজার কড়া নাড়তে হল না। দরজার কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ বন্ধ দরজা খুলে গেল এবং খোলা দ্বারপথে একজন লংস ও হাফসার্ট পরিহিত পুরুষ একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বের হয়ে আসছেন দেখা গেল।

অ মশাই, শুনছেন ? কিরীটীই আহ্বান জানায়।

সাইকেল-হাতে ব্যক্তি থামলেন, আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন বুঝি ?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো ? কি চাই ? রুক্ষ ভারী কণ্ঠস্বর।

আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ! তাছাড়া এখন আমার সময় নেই। পূর্ববৎ রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

এবারে শিউশরণ এগিয়ে এসে হিন্দীতে বললে, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আমি খোদাইচৌকির থানা-অফিসার, থানা থেকেই আসছি।

থানা-অফিসার ! এবারে ভদ্রলোক তাকালেন।

হ্যাঁ। একটু ভেতরে চলুন, কয়েকটা কথা আছে।

সকলে এসে ভদ্রলোকের বাড়ির নীচের তলাকার একটা ঘরে প্রবেশ করল। ভদ্রলোক ঘরে সর্বাগ্রে প্রবেশ করেই সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

মাঝারি আকারের ঘর। নীচু ছাত।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন কোন বাহুল্য না থাকলেও একটা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ভাব আছে।

ঘরের মধ্যস্থলে একটা তক্তপোশ পাতা। তার উপরে একটা সতরঞ্চ বিছানো। এবং খান-দুই চেয়ার।

দেওয়ালে একটি বাংলা-ইংরাজী দেওয়ালপঞ্জী ভিন্ন অন্য কোন ছবি নেই।

বসুন—ভদ্রলোকই আহ্বান জানালেন।

তক্তপোশের ওপরেই সকলে উপবেশন করে।

ঘরের আলোয় ভদ্রলোকের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ গঠন। চওড়া কপাল। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। মধ্যখানে সিঁথি, ঠোঁটের উপরে একজোড়া ভারী গোঁফ।

আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

রণলাল চৌধুরী।

দেখুন মিঃ চৌধুরী, এই সময় হঠাৎ এসে আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বিরক্ত করছি বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত। অবশ্য বেশী সময় আপনার আমরা নষ্ট করব না। যেজন্যে এসেছি সেই কথাই বলি। আপনি শুনেছেন হয়ত আপনার বাড়ির সামনের বাড়িতেই পরশু এক ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন—

শুনেছি।

আচ্ছা আপনাদের এই বাড়িতে উপরে নীচে কখানা ঘর মিঃ চৌধুরী?

ওপরে দুখানা—নীচে দুখানা।

আপনাদের family member কজন?

Family member বলতে আমরা দুজন। আমি আর আমার বুড়ো বাবা।

বাড়ির কাজকর্ম করার লোক নেই?

ঠিকে রাঁধুনী ও ঝি আছে। আর আমার দোকানের একটা বাচ্চা চাকর রাত্রে—এখানে এই ঘরে থাকে।

ও। আপনার বুঝি দোকান আছে?

হ্যাঁ। চকে Electric goods-এর একটা দোকান আছে।

হুঁ। ওপরে আপনি কোন্ ঘরে থাকেন জানতে পারি কি?

রাস্তার ওপরের ঘরটাতেই থাকি।

আচ্ছা সাধারণতঃ কত রাতে আপনি শুতে যান?

রাত বারোটা-একটার আগে বড় একটা আমি ঘুমোই না।

অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন ?

হ্যাঁ। বইটই পড়ি আর কি।

পরশু রাত্রে ?

তা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত প্রায় জেগে বই পড়েছি।

আপনার ঘরের জানলা খোলা ছিল—I mean রাস্তার দিকের জানলাটা ?

হ্যাঁ। জানলা-দরজা আমার ঘরের সব সময় খোলাই থাকে।

মিঃ চৌধুরী, আপনি বলতে পারেন পরশু রাত্রে সাড়ে এগারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে সামনের বাড়ির দোতলার ঠিক আপনার ঘরের সামনের ঘর থেকে কোন কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন ?

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করছেন বলে যেন মনে হয়।

কিরীটীর চোখের দৃষ্টি কিন্তু রণলাল চৌধুরীর মুখের ওপরেই নিবদ্ধ থাকে।

মিঃ চৌধুরী, যদি কিছু দেখে থাকেন বা শুনে থাকেন তো বলুন। কারণ আপনি হয়ত নিশ্চয়ই শুনেছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—কিরীটি বলে।

তার মানে! কি আপনি বলতে চান ? মার্ডার ? সুস্পষ্ট একটা আতঙ্ক রণলাল চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়।

সত্যিই তাই।

হত্যা! খুন!

হ্যাঁ।

অতঃপর রণলাল চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতার পীড়ন যেন চলেছে।

তাহলে আমি যতটুকু জানি বলাই উচিত। সে রাত্রে দোকান থেকে ফিরতে আমার অন্যান্য দিনের চাইতে একটু রাতই হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালাতে যাব হঠাৎ একটা তীব্র নীল আলোর ঝাপটায় যেন চোখ দুটো আমার ঝলসে গেল। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। খেয়াল যখন হল আমার ঘরের খোলা জানলাপথে সামনের বাড়ির ঘরটা দেখলাম অন্ধকার। ব্যাপারটা যে কি ঘটল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শুধু একটা নীল আলোর ঝাপটা ? আর কিছু দেখেননি বা শোনেননি ?

না।

কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধতা।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে কিরীটীই, ঐ বাড়ির সঙ্গে আপনার জানাশোনা নেই ?

হ্যাঁ। মণিকা দেবীর দিদিমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমিও তাঁকে দিদিমা বলেই ডাকি। এবং উনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

ও! কতদিন এ বাড়িতে আপনারা আছেন ?

তা বছর দশেক তো হবেই।

সুবালা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই ?

কে ? ঐ রাঁধুনী মেয়েটা ? রণলালের কণ্ঠে একটা সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য।

হ্যাঁ।

না মশাই। মেয়ে তো নয় একেবারে পুরুষের বাবা! বিশ্রী ক্যাট্‌কেটে কথাবার্তা!

আচ্ছা রণলালবাবু, অবসর সময় আপনার কেমন করে কাটে ?

এই বইটই পড়ে, না হয় ক্লাবে তাস খেলে কাটাই।

তাহলে বই পড়া আপনার অভ্যাস আছে ?

অভ্যাস কি বলছেন! চার-চারটে লাইব্রেরীর মেম্বার আমি!

শরৎ চাটুয্যের বই আপনার কেমন লাগে ?

কেমন লাগে বলছেন ? শরৎবাবুর লেখার আমি একজন গোঁড়া ভক্ত।

চরিত্রহীন বইটা পড়েছেন ?

নিশ্চয়ই। বার চার-পাঁচ পড়েছি। সোৎসাহে জবাব দেয় রণলাল।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী সত্যি কাকে ভালবাসত বলে আপনার মনে হয় রণলালবাবু ? দিবাকরকে না উপীন্দ্রকে ?

কিরণময়ী ভালবাসত উপেন্দ্রকেই। দিবাকরের মত একটা গর্দভকে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসতে পারে নাকি ?

সুব্রত নির্বাক হয়েই রণলালের সঙ্গে কিরীটীর কথাবার্তা শুনছিল। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সুব্রত, হঠাৎ কিরীটী রণলালের মত একজন সদ্যপরিচিত লোকের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠল কেন! অথচ এও তো সে জানে এ ধরনের ঘরোয়া আলোচনা কখনও কিরীটী নিজের মনোমত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ছাড়া করে না। তার স্বভাববিরুদ্ধ।

আর শিউশরণ তো স্পষ্টই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। এই জন্যই কি হঠাৎ কিরীটী এ সময় বাড়ি হ'তে বের হয়ে এলো!

রণলাল চৌধুরীর সঙ্গেই যদি তার পরিচয় করবার প্রয়োজন ছিল তবে বললেই তো হ'ত তাকে। থানা থেকেই লোক পাঠিয়ে কিরীটী এই লোকটাকে ডেকে নিয়ে যেতে

পারত। সেজন্য এ সময়ে এতদূর ছুটে আসবার কি প্রয়োজন ছিল!

আচ্ছা আমরা তাহলে চলি রণলালবাবু। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারী আনন্দ হল। আর এভাবে হঠাৎ এসে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম বলে মনে কিছু করবেন না। কিরীটী বিনয়ে যেন বিগলিত হয়ে যায়।

না না—বরং আপনাদের সঙ্গেও তো আমার আলাপ হল। অবশ্য আপনারা না এলে আমিই হয়ত যেতাম। কিন্তু জানেন তো ঠিক সাহস পাইনি। হাজার হোক কেউ স্বেচ্ছায় কি পুলিসের সামনে যায়! বলে রণলাল নিজেই হেসে ওঠে।

রণলালের ওখান হতে বিদায় নিয়ে তিনজনে আবার খোদাইচৌকির দিকেই ফিরছিল।

হঠাৎ একসময় শিউশরণই প্রশ্ন করে, রণলালবাবু যে নীল আলোর কথা বললেন, ব্যাপারটা তোমার কি মনে হচ্ছে কিরীটী? Something electrical ব্যাপার নয়ত? তুমি তো বলছিলে এবং ময়নাতদন্তেও প্রকাশ অতুল বোসকে electrocution করে হত্যা করা হয়েছে!

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ। তাই কি?

একবার কাল সকালে মণিকা দেবীদের বাড়িতে গিয়ে অতুল বোস যে ঘরে থাকত সেই ঘরের ইলেকট্রিক কানেকশনটা দেখে এলে হত না?

শিউশরণের কথায় কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটা হাসির বঙ্কিম রেখা জেগে ওঠে।

অতুল বোসের মৃত্যু-তদন্তের ব্যাপারে যদিও সুব্রত প্রথম হতেই উপস্থিত এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার আলোচনাই সে শুনেছে, সে কিন্তু একটি কথাও বলেনি। এবারের হত্যা-তদন্তে সে যেন এক নীরব দ্রষ্টা ও শ্রোতা মাত্র। তবে মুখে কোনরূপ প্রশ্ন বা মন্তব্য না করলেও মনে মনে সে সমগ্র ব্যাপারটাই নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনায় বিচার বিশ্লেষণে একটা মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা শুরু হতেই করে আসছিল।

হঠাৎ একটা কথা সুব্রতর মনে পড়ে। পরশু সকালে মণিকা দেবীদের গৃহ হতে ফেরবার পথে কথাপ্রসঙ্গে কিরীটী বলেছিল: হাই ভোলটের কারেন্টে বেচারার মৃত্যু হয়েছে। প্রমাণের খানিকটা অংশ সরিয়ে ফেললেও হত্যাকারী আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি। কারণ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার কিছুটা মালমসলা তখনও ঐ ঘরে অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু কি সে প্রমাণ! এখন সহসা একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎ-চমকের মতই সুব্রতর মনে ভেসে ওঠে: অতুল বোসের মৃতদেহটা চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট ছিল। চেয়ারটি স্টীলের পাত ও রডে তৈরী। ইলেকট্রিক কারেন্টে মৃত্যু। তবে কি ঐ স্টীলের চেয়ারটাই!

কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। না শিউশরণ, তার আর প্রয়োজন নেই। বললাম তো হত্যাকারী তার হত্যার নিদর্শন স্বরূপ যে প্রমাণটুকু হয় ইচ্ছা করে অপসারণের প্রয়োজন মনে করেনি অথবা নিয়তিরই নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তাকে আকর্ষণ করেনি বলেই ফেলে রেখে গিয়েছে, সেইখানেই সে ধরা পড়ে গিয়েছে।

কি সে প্রমাণ? কথাটা শিউশরণ না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না।

একটা তামার পাতের রিং মত যেটা অতুল বোসের মৃতদেহ যে চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট ছিল তার পায়ার সঙ্গে লাগানো ছিল। মৃদু কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটী সহসা যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। কিন্তু যাক সে কথা। আমি ভাবছি হত্যাকারীর দুঃসাহসিক বুকের পাটার কথা। এত বড় দুঃসাহস হল কি করে! একপক্ষে অবিশ্যি ভালই হয়েছে, একটা জায়গায় এসে আমি হোঁচট খাচ্ছিলাম বার বার। ঠিক রাত কটায় অতুলকে হত্যা করা হয়েছে! এখন বুঝতে পারছি রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত পৌনে বারোটার মধ্যেই।

বলতে বলতে সহসা শিউশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, বুঝলে শিউশরণ, এ হত্যার পরিকল্পনা একদিনের বা হঠাৎ কোন এক বিশেষ মুহূর্তের আকস্মিক নয়। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে স্থিরীকৃত। কিন্তু তার পশ্চাতে আছে হয়ত কোন বিচিত্র অনুভূতির গোপন পীড়ন যেটা দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে হত্যাকারীর মনের অবগহনে তার হত্যার মতই একটা পাশবিক জিঘাংসা বা লিপ্সাকে জাগিয়ে তুলেছে। সঙ্কল্প হয়েই ছিল শুধু মাত্র সুযোগের ও স্থানের অপেক্ষা, সেই সুযোগ ও স্থান মিলে গেল এবারে পূজাবকাশের ছুটিতে কাশীতে। হত্যাকারীর মনের মধ্যে যে বিচিত্র সঙ্কল্পটা বিষের ধোঁয়ার মতই ধোঁয়াচ্ছিল, যেটা ছিল কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট, বিচিত্র অনুকূল পরিবেশে সেটা অকস্মাৎ হয়ত কোন কারণে নখদন্ত বিস্তার করে আত্মবিকাশ করেছে। এবং আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বোধ হয় হত্যা করবার জন্য যে পরিকল্পনাটুকু হত্যাকারী করেছে সেটা পূর্ব-পরিকল্পিত নয়, হঠাৎই হয়ত তার মনে সম্ভাবনাটুকু উদয় হওয়ায় কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে পরিকল্পনাটা। And it became successful! হতভাগ্য অতুল বোসের মৃত্যু ছিল ঐরূপ এক দুর্ঘটনাতেই, ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনা। কথাগুলো একটানা বলে কিছুক্ষণ কিরীটী স্তব্ধ থাকে। তারপর আবার মৃদু কণ্ঠে বলে, একটি ছোট্ট একস্‌পেরিমেণ্ট করব। এবং আশা করি তারপরই এ রহস্যের ওপরে যবনিকা তোলা যাবে।

দিন দুই পরে। অহল্যাবাঈ ঘাট, রাত্রি বোধ করি এগারোটা হবে। স্থানটি ঐ সময় একপ্রকার নির্জন বললেও হয়। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। শুক্লপক্ষের মেঘমুক্ত আকাশে একরাশ তারা ঝিকমিক করে জ্বলছে। গঙ্গার জলে পড়েছে সেই আকাশের তারার স্তিমিত আলোর ক্ষীণ দীপ্তি।

ঘাটের কাছে পর পর দুটি নৌকো বাঁধা। অস্পষ্ট আলোছায়ায় সেই নৌকোর সামনে একটি নারীমূর্তি উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পশ্চাতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দীর্ঘকায় কে একজন সিঁড়ি ভেঙে ঘাটের কাছে নেমে আসছে। একজন পুরুষ। পুরুষ নারীর পশ্চাতে এসে দাঁড়াল। অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় তাকেও ভাল করে চেনা যায় না। নারীমূর্তি ফিরে তাকাল, কে?

আমি।

ও, তুমি! এস, বস। নারী আহ্বান জানাল।

কিন্তু কি ব্যাপার বল তো! এভাবে এই জায়গায় চিঠি দিয়ে দেখা করবার জন্য ডেকে আনবার মানে কি? যা বলবার আমার ঘরে রাত্রে এসেও তো বলতে পারতে। পুরুষ বলে।

না। বলতে পারতাম না তার কারণ কারও না কারও নজরে পড়ে গেলে পরের দিন সকালে তুমি বা আমি কেউই কি আর মুখ দেখাতে পারতাম! আর যাই করি এত বড় নির্লজ্জ অন্ততঃ দিদিমার সামনে হতে পারতাম না!

কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না মণি, এভাবে এত রাত্রে এ জায়গায় কেন তুমি ডেকে এনেছ আমাকে!

কেন ডেকে এনেছি জান? অতুলের মৃত্যুর ব্যাপারটা একবার খোলাখুলি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

আশ্চর্য! সে আলোচনার জন্য এইভাবে এত রাত্রে চিঠি লিখে গঙ্গার ঘাটে ডেকে আনবার কোন প্রয়োজনই তো ছিল না মণি!

ছিল।

কেন?

কারণ লোক-নিন্দা ও লোকেদের কথা ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমাদের তিনজনের একজনও কি অস্বীকার করতে পারব যে, আমাদের তিনজনের মধ্যেই একজন অতুলের এই নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দায়ী?

সত্যিই কি তুমি তাই মনে কর মণি?

কিরীটীবাবু মনে করেন। গতকাল তাই তিনি আমাকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মিঃ কিরীটী রায় আর কি মনে করেন? নিশ্চয়ই আমাদের তিনজনের মধ্যে যে হত্যাকারী তাকেও তিনি তাঁর অপূর্ব বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে সনাক্ত করে ফেলেছেন! বলেই ফেল না। সে কথাটাই বা লুকোচ্ছ কেন? আমাদের তিনজনের মধ্যে কে? তুমি, আমি, না রণেন?

পুরুষ আর কেউ নয়, সুকান্ত। এবং নারী মণিকা।

সুস্পষ্ট ব্যঙ্গে সুকান্তর কণ্ঠস্বর এবারে আরও কঠিন মনে হয়, কিন্তু সেই কারণে এমনি করে এই রাত্রে গঙ্গার ঘাটে টেনে এনে এ নাটক সৃষ্টি না করলেও পারতে মণি। এবারে তোমাকে আমি সত্যই বলছি, এই তেলাপোকা আর কাঁচপোকার নাটক এখানেই আমি শেষ করতে চাই। আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান? একজন তো গেছেই, বাকি দুজনকেও শেষ করে অবশেষে নিজেকে হত্যা করে এই ন'বৎসরের নাটকের ওপর যবনিকা টেনে দিই। আসলে তুমি কি জান মণিকা! একটি harlot!

সুকান্ত!

চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই মণিকা। এখন দেখতে পাচ্ছি চিঠি দিয়ে আজ রাত্রে এখানে তুমি আমাকে ডেকে এনে একপক্ষে ভালই করেছ। আমাদের চারজনের এই নাটকের শেষ দৃশ্যটুকু তোমাকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারব। অপূর্ব এক ভালবাসার অভিনয় তুমি এই দীর্ঘ ন'বৎসর ধরে করছ। সত্যিই তুমি অনন্যা!

সুকান্ত! আর্ত করুণ কণ্ঠে যেন চিৎকার করে ওঠে মণিকা।

থাম। শোন, মনে পড়ে তোমার দার্জিলিংয়ের সে রাত্রের কথা! সে রাত্রের ঘটনার জন্য পরে আমি অনুতপ্ত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, হয়ত আমাদের তিনজনের মধ্যে আমাকে বাদ দিয়ে অতুল বা রণেনকে তুমি মনে মনে ভালবাস, কিন্তু তুমি অগ্রসর হতে পারছ না আমাদের তিনজনের বন্ধুত্বের কথা ভেবেই। পাছে আমাদের দুজনের মনে আঘাত লাগে একজনকে তুমি বরণ করলে। পরে বুঝেছিলাম ভুল আমারই। ভালবাসা তোমার চরিত্রে নেই। ভালবাসতে তুমি কাউকেই কোনদিন পারবে না। ভালবাসতে হলে যে মনের দরকার, যে কোমল অনুভূতির প্রয়োজন সেইখানেই ঝুলি তোমার শূন্য। সেইখানেই তোমার চরিত্রের পরম দৈন্য। যে নারীর মনে ভালবাসার অনুভূতি নেই অথচ রূপ ও যৌবন আছে, সে বিকৃত মনেরই সমগোত্রীয়। তাই তোমার সংসর্গে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে, অতুল নিহত হয়েছে। এবার হয়ত আমাদের পালা কিন্তু অতদূর আমি গড়াতে দেব না।

সুকান্তর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সভয়ে আবার চিৎকার করে ওঠে মণিকা ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে, সুকান্ত! সু—

হাঃ হাঃ করে বজ্র কণ্ঠে হেসে ওঠে সুকান্ত। হাসির শব্দটা একটা প্রতিধ্বনি তুলে নির্জন অহল্যাবাঈ ঘাট হতে নিশীথের গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, নির্জন এই অহল্যাবাঈ ঘাটে গঙ্গার উপকূলে কেউ নেই। তোমাকে গলা টিপে হত্যা করে অন্ধকারে ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। হাঃ হাঃ! আবার পাগলের মত অট্টহাসি হেসে ওঠে সুকান্ত। এগিয়ে গিয়ে সুকান্ত মণিকার ডান হাতের সুকুমার মণি-বন্ধটা চেপে ধরে লৌহ-কঠিন মুষ্টিতে।

সুকান্ত! সুকান্ত—আমি—মণিকা ব্যাকুল কণ্ঠে কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

কেউ শুনতে পাবে না। কেউ জানতে পারবে না—দু'হাতে মণিকার গলাটা টিপে ধরে সুকান্ত।

ঠিক এমনি সময় ঘাটের কাছে অন্ধকারে যে নৌকো দুটো বাঁধা ছিল তার একটার মধ্যে একটা ঝটাপটির শব্দ শোনা যায় এবং পরক্ষণেই কে একজন ব্যাঘ্রের মত ঘাটের ওপরে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে সুকান্তকে আক্রমণ করে।

সুকান্ত ছাড়। ছাড়—খুনী শয়তান—

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নৌকোর ভেতর থেকে কিরীটী, শিউশরণ ও সুব্রত ঘাটের সিঁড়ির উপর লাফিয়ে পড়ল। রণেনের আক্রমণ থেকে সুকান্তকে মুক্ত করে দেয় কিরীটী।

সুকান্ত ও রণেন দুজনেই তখন হাঁপাচ্ছে।

রণেন কিন্তু চেঁচিয়ে বলে, না না, ওকে ছাড়বেন না মিঃ রায়। সুকান্ত—সুকান্তই অতুলকে হত্যা করেছে।

আরও আধ ঘণ্টা পরে রণেন, সুকান্ত ও মণিকাকে নিয়ে কিরীটী ও শিউশরণ থানায় গিয়ে হাজির হল। থানারঅফিসঘরে সকলে প্রবেশ করে এবং কিরীটী সকলকে বসতে অনুরোধ করে।

আর কিছুক্ষণ পরে কিরীটী বলতে শুরু করে, আজ রাত্রে কিছুক্ষণ আগে অহল্যাবাঈ ঘাটে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং আপনাদের তিনজনের কাছেই সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। অতুলবাবুর মৃত্যুরহস্যের উদ্ঘাটনে পৌঁছবার জন্য আমি ছোট্ট একটা একস্‌পেরিমেণ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে একস্‌পেরিমেণ্টের সমাপ্তিটা যে এমন বিশ্রী তিক্ত ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়াবে সত্যি আমি তা ভাবিনি। আপনারা তিনজনেই বিশ্বাস করুন আজকের ক্ষণপূর্বে অহল্যাবাঈ ঘাটে যে একস্‌পেরিমেণ্টের পরিকল্পনা আমি করে মণিকা দেবীকে দিয়ে সুকান্তবাবুকে রাত্রে গঙ্গার ঘাটে দেখা করবার জন্য চিঠি দিইয়ে এবং নৌকো ভাড়া করে সেই নৌকার মধ্যে অন্ধকারে

রণেনবাবুকে নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলাম, সবটাই এই সৎ উদ্দেশ্যেই করেছিলাম যে আজকের এই ছোট্ট একস্‌পেরিমেন্টের ভেতর দিয়েই আমরা অতুলবাবুর হত্যারহস্যের একটা মীমাংসায় পৌঁছব এবং হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারব। যদিও হত্যাকারীকে আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলেও কিছুক্ষণ পূর্বে গঙ্গার ঘাটে আপনাদের তিনজনকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এখন বুঝতে পারছি অবশ্যম্ভাবীই হয়ে উঠেছিল। এবং ঐ অপ্রীতিকর ব্যাপারটা আজ রাত্রে গঙ্গার ঘাটে না ঘটলেও দু-একদিনের মধ্যেই যে ঘটত সে বিষয়ে এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

কিরীটীর কথাগুলো যেন রণেন, সুকান্ত ও মণিকার কর্ণকুহরে গলিত সীসের মতই প্রবেশ করল।

তিনজনেই ওরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নির্বাক। কিরীটী কিন্তু ওদের কারোর দিকেই তাকাচ্ছে না। ওদের যেন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগে ব্যস্ত।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া জমাট বেঁধে উঠেছে। সিগারটায় অগ্নিসংযোগ করে তাতে গোটা দুই টান দিয়ে হঠাৎ কিরীটিই নিজের রচিত শ্বাসরোধকারী ঘরের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতাটা ভেঙে দিল, অতুলবাবুর হত্যার পশ্চাতে আছে একটা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হিংসা। দিনের পর দিন দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তিনটি পুরুষের মনের অবগহনে একটি নারীকে কেন্দ্র করে চলেছিল এক হিংসার কুটিল ভয়ঙ্কর বিষমন্থন। শুনে আশ্চর্য হবেন না আপনারা কেউ, অতুলবাবু নিহত না হয়ে রণেনবাবু ও সুকান্তবাবু আপনাদের দুজনের একজনও নিহত হতে পারতেন। এবং অতুলবাবু নিহত না হয়ে আপনাদের মধ্যে একজন কেউ নিহত হলে, অতুলবাবু ও অন্য একজনকে হয়ত আজকের এই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত। আজকের এই পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, প্রত্যেকেই আপনারা তিন বন্ধু আপনাদের ঐ বান্ধবীর জন্য পরস্পরের প্রতি দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে নিরতিশয় ঘৃণা ও হিংসা পোষণ করেছেন। হয়ত বা মনে মনে কত সময় পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবার সঙ্কল্পও করেছেন। কিন্তু হত্যার সংকল্প করলেই কিছু হত্যা করা যায় না। তার জন্য চাই ক্ষণিক একটা বিকৃত উন্মাদনা, ভয়ঙ্কর একটা প্রতিজ্ঞা। এ তো হঠাৎ হত্যা করা নয়। এ যে স্থির মস্তিষ্কে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হত্যায় লিপ্ত হওয়া। ভাবুন তো একবার বাইরে বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে মনের মধ্যে সন্তর্পণে হত্যার জন্য ছুরি শানিয়েছেন! দিনের পর দিন মনের মধ্যে পরপস্পর পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড হিংসা ও ঘৃণা পোষণ করে বাইরে ভালবাসা ও প্রেমের চটকদার অভিনয় করেছেন। এবং আজ রাত্রে অহল্যাবাঈ ঘাটে

যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা দীর্ঘদিনের ঐ গোপনে মনের মধ্যে লালিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রচণ্ড হিংসা ও ঘৃণা ঐ মণিকা দেবীকে কেন্দ্র করে।

কিরীটী কথাগুলো বলে ক্ষণকালের জন্য চুপ করে থাকে।

হঠাৎ রণেনবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, উঃ, ঘরের মধ্যে কি বিশ্রী গরম! জানলা-গুলো একটু খুলে দিতে বলুন না। দম আটকে আসছে।

ঘরের তিনটে জানলার মধ্যে দুটো জানলার কবাটগুলো খোলাই ছিল, বাকি জানলার পাল্লা দুটোও এগিয়ে কিরীটী হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত তিনটে ঘোষণা করল। ইতি-মধ্যেই রাত্রিশেষের প্রহরগুলিতে শিশিরের একটা সিক্ততা দেখা দিয়েছে। একটা আর্দ্র ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব।

নিস্তব্ধ সকলে একে অন্য হতে অল্প অল্প ব্যবধানে বসে আছে ঘরের মধ্যে। তিনটি ফাঁসির আসামী যেন রাত পোহালে ফাঁসি হবে তারই অধীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় তিনটি প্রাণহীন পুতুল যেন।

কিরীটীর কঠিন নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, শুধু আপনারাই ঐ দোষে দোষী নন রণেনবাবু, সুকান্তবাবু। সর্বত্র চলেছে আজ ঐ হিংসার কুটিল আবর্ত। যুগ যুগ ধরে মানুষের শুভবুদ্ধির ও ভালবাসার দুশ্চর তপস্যা ব্যর্থ হয়েছে। হিংসা! হিংসা! হিংসা সর্বত্র! বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু যাক সে কথা। এবারে অতুলবাবুর হত্যার ব্যাপারে ফিরে আসি।

শিউশরণ এখানে বাধা দেয়, কিন্তু—

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, বুঝেছি তোমার খটকা কোথায় লাগছে শিউশরণ! ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আর কেউ নয় হত্যাকারীই স্বয়ং সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্য ঐ'বেশ নিয়েছিল।

তারপর একটু থেমে যেন দম নিয়ে তার অসমাপ্ত বক্তব্যে ফিরে আসে, আমার মনেও ঐখানেই খট্‌কা লেগেছিল। এবং সেই জন্যই আসলে ছোট একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের আয়োজন করেছিলাম আজ রাত্রে আমি গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাতে করে অতুলবাবুর নৃশংস হত্যারহস্যের জটিল অংশের দুইয়ের তিন অংশ পরিষ্কার হয়ে গেলেও বাকি ও শেষ অংশটুকু এখনও অস্পষ্টই আছে। এবং সেই জন্যই গঙ্গার ঘাট হতে সকলকে নিয়ে আমি এখানে এসে মিলিত হয়েছি। তারপর হঠাৎ শিউশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, বাইরে এইমাত্র পদশব্দ পেলাম। দেখ উনিও বোধ হয় এসে গেলেন। তাঁকেও এই ঘরে নিয়ে এস, যাও।

বিস্মিত নির্বাক সকলের সামনে দিয়েই শিউশরণ ঘর হতে বের হয়ে গেল এবং প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই সুবালা দেবীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

যুগপৎ ঘরের মধ্যে ঐ সময় উপস্থিত সকলেই নির্বাক বিস্ময়ে সুবালা দেবীর দিকে তাকাল নীরব দৃষ্টি তুলে। শিউশরণ তার চেয়ারটাই এগিয়ে দিল সুবালা দেবীর দিকে, বসুন।

কেবল মণিকার অর্ধোস্ফুট কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল একটিমাত্র শব্দ, সুবালাদি!

বসুন সুবালা দেবী। কিরীটী বললে।

নিঃশব্দে সুবালা দেবী শিউশরণের খালি চেয়ারটায় উপবেশন করে।

মণিকা দেবী, সুবালা দেবী, রণেনবাবু, সুকান্তবাবু, আপনারা সকলেই উপস্থিত এখানে সে রাত্রে যাঁরা ঘটনাস্থলের আশেপাশে ছিলেন। একটা কথা না বলে পারছি না, সকলেই আপনারা সেদিনকার আপনাদের প্রদত্ত জবানবন্দিতে কিছু কিছু গোপন করেছেন। একান্ত পৈশাচিক ভাবেই সে রাত্রে আপনাদেরই চারজনের মধ্যে একজন অতুলবাবুকে হত্যা করেছেন। এবং এও আমি জানি আপনাদের মধ্যে কে তাঁকে হত্যা করেছেন। তাই আবার আজ এখন শেষ অনুরোধ আপনাদের জানাচ্ছি, এখনও আপনারা যে যা গোপন করেছেন খুলে বলুন। অকাট্য প্রমাণ দিয়ে আমায় সাহায্য করুন হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেবার।

কিরীটীর শেষের কথাগুলো যেন ঝম্‌ঝম্ করে ঘরের মধ্যে একটা বজ্রের হুঙ্কার ছড়িয়ে গেল।

সকলেই স্তব্ধ। নির্বাক। কারও মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই।

সহসা সুকান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ঘরের খোলা দরজার দিকে পা বাড়ায়। কিরীটীর কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল, ঘর ছেড়ে যাবেন না সুকান্তবাবু! বসুন।

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে সুকান্ত চেঁচিয়ে ওঠে, No, No! This is simply inhuman torture! I can't stand it any more! I can't.

না। আপনার এখন যাওয়া হতে পারে না। এগিয়ে আসে এবারে শিউশরণ।

শিউশরণকে দু'হাতে পাগলের মতই ঠেলে ঘর হতে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায় সুকান্ত, Let me go! Let me go! যেতে দিন, আমাকে যেতে দিন!

এবারে এগিয়ে এল রণেন, না। দাঁড়াও সুকান্ত। যদি আমাদের তিনজনের মধ্যেই একজন সত্যিই অতুলের হত্যাকারী হই—let that be decided once for all!

খিঁচিয়ে ওঠে সুকান্ত, Decide করবে? কি decide করবে শুনি যে আমরাই একজন অতুলকে বন্ধু হয়ে হত্যা করেছি? ছিঃ ছিঃ! এর চেয়ে গলায় দড়ি দাও তোমরা।

এবারে মণিকা বলে, সুকান্ত, রণেন, তোমরা কি পাগল হলে ?

সহসা রণেন ঘুরে দাঁড়ায় মণিকার কথায় তার দিকে এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে, খেপবার আরও কি কিছু বাকি আছে মণিকা! তবু যদি সে রাত্রে তোমাকে আমি সকলে শুতে যাবার পর অতুলের ঘর থেকে আমার ও তার ঘরের মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বের হয়ে তোমার শোবার ঘরে যেতে না দেখতাম !

কি বলছো তুমি রণেন! বিস্ময়ে যেন চেঁচিয়ে ওঠে মণিকা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। অন্ধকার ঘর দেখে ভেবেছিলে তখনও বুঝি আমি ঘরে ঢুকিনি! তখনও বুঝি আমি বাথরুম থেকে ফিরিনি! কিন্তু সব—সব আমি দেখেছি। তুমি আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘরের এক মাঝের দরজা দিয়ে অতুলের ঘর থেকে বের হয়ে অন্য মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলে। দেখেছি, আমি সব দেখেছি।

রণেন! রণেন এসব তুমি কি বলছ? আমি তোমরা—তুমি ও অতুল ঘর ছেড়ে চলে আসবার পর প্রায় আধ ঘণ্টা সুকান্তর ঘরে দাঁড়িয়েই গল্প করেছি।

হ্যাঁ। She is right! সমর্থন করে সুকান্ত।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করা আর বৃথা সুকান্ত। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে রণেন।

না, মিথ্যে নয়। যা বলেছি তা সত্যি। মণিকা আবার বলে।

থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। ঘৃণাভরে মুখ ফেরায় রণেন।

এতক্ষণে কিরীটী কথা বলল, না রণেনবাবু, মণিকা দেবী, সুকান্তবাবু ও আপনি কেউই আপনারা মিথ্যে কথা বলেননি। কিন্তু এ কথাগুলো সেদিন জবানবন্দির সময় প্রত্যেকে আপনারা যদি গোপন না করতেন তবে এত কষ্ট করতে হত না আমাকে হত্যাকারীকে ধরতে। কথাটা বলে কিরীটী এবার শিউশরণের মুখের দিকে তাকাল এবং নিঃশব্দে চোখে চোখে কি যেন ইঙ্গিত জানাল এবং শিউশরণ নিঃশব্দে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

এবারে সুবালা দেবী, এঁরা সকলেই যেটুকু যে গোপন করেছিলেন বললেন। আপনিও যা গোপন রেখেছেন বলুন। কিরীটী কথাগুলো বললে সুবালা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি যা জানতাম সব বলেছি। শান্ত ধীর কণ্ঠস্বর।

না, বলেননি। আপনি এখনও বলেননি কেন আপনি সে রাত্রে অতুলবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

মিথ্যে কথা। তার ঘরে আদৌ আমি যাইনি সে রাত্রে।

কিন্তু সাক্ষী যে আছে সুবালা দেবী!

ঠিক এই সময় শিউশরণের সঙ্গে রণলাল চৌধুরী এসে সেই ঘরে প্রবেশ করল, এসবের মানে কি দারোগাবাবু! সেই সন্ধ্যা থেকে থানায় এনে আমাকে আটকে রেখেছেন? ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে রণলাল। তার কণ্ঠে রীতিমত বিরক্তি।

কি করি বলুন রণলালবাবু! সে রাত্রে যদি সত্যি কথাটা বলতেন তবে মিথ্যে কষ্ট দিতে হত না আপনাকে। জবাব দেয় কিরীটী।

তার মানে? এসব কি আপনি বলছেন?

ঠিকই বলছি। সুবালা দেবী স্বীকার যাচ্ছেন না যে সে রাত্রে সুবালা দেবী অতুলবাবুর ঘরে বসে অন্ধকারে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আপনি তো সব দেখেছেন। Eye witness! আপনিই বলুন না?

কিরীটীর কথায় রণলাল ও সুবালা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে তারা কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলে যেন পাথরে পরিণত হয়েছে। সকলেই নির্বাক। বিমূঢ়।

এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুবালা।

এখনও বুঝতে পারছেন না? আশ্চর্য! সুবালা দেবী, আপনি একজন পাকা অভিনেত্রী সন্দেহ নেই; কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার, ধর্মের কল বাতাসেই নড়েছে। এত করেও আপনি সব দিক বজায় রাখতে পারেননি।

কিরীটীবাবু? তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে মণিকা।

হ্যাঁ মণিকা দেবী, অতুলের হত্যাকারিণী উনিই। সুবালা দেবী। অবশ্য পরিকল্পনাটি ওঁর নয়, ওনার। রণলালবাবুর। এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকারই যুগ্ম প্রচেষ্টায় অতুলবাবু নিহত হয়েছেন।

বলেন কি! প্রশ্নটা সকলেই প্রায় একসঙ্গে করে।

মৃত্যু-ফাঁদ পেতেছিলেন রণলাল তাঁরই প্রেমিকা সুবালার অনুরোধে। তারপর সেই মৃত্যুফাঁদকে সক্রিয় করে তোলেন উনি শ্রীমতী সুবালা দেবী। কিরীটী জবাব দেয়।

হঠাৎ ঐ সময় পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে রণলাল সুবালার দিকে তাকিয়ে, হারামজাদী! তবে তুই সব বলেছিস? তোকে আমি খুন করব।

বলতে বলতে অতর্কিতে রণলাল ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবালার ওপরে এবং তার কণ্ঠ টিপে ধরে দু'হাতে। কিন্তু কিরীটী সতর্ক ছিল, নিমেষে সে এগিয়ে দুজনের মধ্যখানে এসে পড়ে এবং বলপ্রয়োগে রণলালকে ছাড়িয়ে দেয়। রণলালকে পুলিসের প্রহরায় অতঃপর একটা চেয়ারের ওপরে বসিয়ে কিরীটী বলে, বসুন রণলালবাবু। প্রেমের গতিটা বড়

কুটিল। চরিত্রহীনের দিবাকরকে বুঝেও যে কেন আপনি বুঝতে পারলেন না, সত্যিই লজ্জার কথা। কিরণময়ী দিবাকরকে ভালবাসেনি কোন দিনও, ভালবেসেছিল সে উপীনকেই অর্থাৎ অতুলবাবুকেই।

সুবালাদি! মণিকার কণ্ঠ হতে কথাটা আর্ত চিৎকারের মতই শোনাল।

হ্যাঁ মণিকা দেবী। বিধবা কিরণময়ীর উপেনকে সেই ভালবাসাই হল কাল। হতভাগিনী কিরণময়ী যেমন জানত না যে উপেনের সমস্ত মন জুড়ে ছিল পশু বৌঠান, তেমনি সুবালাও জানতেন না যে অতুলের সমস্ত মন জুড়ে ছিল মণিকা দেবী। তাছাড়া আরও একটা মারাত্মক ভুল সুবালা করেছিলেন, স্বৈরিণীর মত উপযাচিকা হয়ে নিজেকে এক শিক্ষিত মার্জিত অন্যের প্রেমে অন্ধ পুরুষের সামনে দাঁড় করিয়ে।

আবার রণলাল চেঁচিয়ে ওঠে, স্বৈরিণী! মনে মনে তবে তুই অতুলকেই চেয়েছিস! আমাকে নিয়ে কেবল খেলাই করেছিস! উঃ! কি বোকা আমি! কি বোকা!

হ্যাঁ। বড় মারাত্মক খেলা! মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

কিন্তু—তবে—তবে সুবালাদি অতুলকে খুন করলে কেন? আবার মণিকাই প্রশ্ন করে।

সেটা সুবালা দেবী বলতে পারবেন না হয়ত। কিন্তু আমি জানি। কিন্তু আজ আর নয়। রাত পোহাল। এবারে আপনারা বাড়ি যান সকলে।

সমস্ত দৃশ্যটার উপরে কিরীটী তখনকার মত একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে চাইল।

কিন্তু শেষটুকু না শুনে কেউ যেতে রাজী নয়।

কিরীটী তখন অদূরে পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল উপবিষ্ট সুবালার দিকে আর একবার তাকাল।

হতাশা অপমান ও দুর্নিবার লজ্জায় উপবিষ্ট সুবালার মাথাটা বুকের ওপরে ঝুলে পড়েছে।

নিষ্ফলা এক নারীর পক্ষে এ যে কত বড় মর্মঘাতী কিরীটী তা বুঝতে পারে। মৃদুকণ্ঠে তাই সে শিউশরণকে লক্ষ্য করে বললে, এদের দুজনকে তাহলে অন্য ঘরে রেখে এস শিউশরণ।

শিউশরণের নির্দেশে তখন রণলাল ও সুবালা স্থানান্তরিত হল।

তাহলে এবারে আপনাদের বলি সব কথা। কিরীটী বলতে শুরু করে: ব্যর্থ প্রেমের এক মর্মন্তুদ কাহিনী। হতভাগিনী সুবালা! I pity her! জ্বলন্ত আগুনের মত রূপ নিয়ে এসেও সে হল নিষ্ফলা। কিন্তু যৌবন তার সহজাত কামনার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিল তার দেহ ও মনে। সেই অতৃপ্ত কামনার আগুন বুকে নিয়ে সুবালা এসে

মণিকা দেবীর দিদিমার কাছে আশ্রয় নিল। দিন কেটে যাচ্ছিল একরকম করে, এমন সময় পাশের বাড়ির রণলাল চৌধুরী সুবালার সামনে এসে দাঁড়াল। সুবালার আগুনের মত রূপে রণলাল মুগ্ধ পতঙ্গের মতই পুড়ে ঝল্‌সে গেল কিন্তু অর্ধশিক্ষিত মিস্ত্রী রণলাল সুবালার মনকে পুরোপুরি আকর্ষণ করতে পারল না। বোধ হয় রুচির সংঘাত।

সুবালার মনের মধ্যে ছিল একটা পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ তাই সে তার অতৃপ্ত যৌন-কামনায় জ্বলতে থাকলেও রণলালকে গ্রহণ করতে পারলে না মন থেকে। কিন্তু একেবারে হাতছাড়াও করলে না সম্ভবতঃ রণলালকে। মুগ্ধ পতঙ্গকে আকর্ষণ করবার যে এক ধরনের তৃপ্তি—পুরুষকে আকর্ষণ করবার যে সহজাত নারীতৃপ্তি মনে মনে সেটাই সুবালা উপভোগ করতে লাগল রণলালকে দিয়ে। কিন্তু হতভাগ্য প্রেমমুগ্ধ রণলাল সুবালার মনের আসল সংবাদ না পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল, সুবালা তার করায়ত্ত।

এমনি যখন অবস্থা, মণিকা দেবীর আমন্ত্রণে অতুলবাবু, রণেনবাবু ও সুকান্তবাবু এলেন সেবারে কাশীতে। এবং বলাই বাহুল্য সুবালা সত্যি সত্যিই এবারে অতুলবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হল। এবং সে আকর্ষণ ক্রমে বর্ধিত হয়ে চলল মণিকা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও তার সেবার মধ্য দিয়ে অতুলবাবুর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে। সৌভাগ্য-ক্রমে এ সংবাদ আমার গোচরীভূত হয় তদন্তের দিন অতুলবাবুর সুটকেস হাতড়াতে গিয়ে তাঁর সুটকেসের মধ্যে তাঁর স্বহস্ত-লিখিত রোজনামচাখানি পেয়ে ও পড়ে। অতুল-বাবুও যে সুবালার রূপে প্রথম দিকে কিছুটা আকর্ষিত হননি তা নয়, কিন্তু তাঁর মণিকা দেবীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম শিক্ষা ও রুচি তাঁর মনের ওপরে কষাঘাত হেনে তাঁকে সজাগ করে দিল। তিনি সজাগ হয়ে সরে গেলেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে কিরীটীর কথা শুনছে। বোবা বিস্ময়ে সকলেই নির্বাক।

কিরীটী পকেট হতে সিগার-কেসটা বের করে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করলে। জ্বলন্ত সিগারটায় গোটাকয়েক টান দিয়ে আবার তার বক্তব্য শুরু করল।

যা বলছিলাম, অতুলবাবুও সাবধান হলেন কিন্তু সুবালা তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তার আর ফেরবার পথ ছিল না। এবং সোজাসুজি ভালবাসার বিকারে একদিন সুবালা অতুলবাবুর হাত চেপে ধরলে। অতুলবাবু জানালেন প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যানের লজ্জা ও অপমান নিয়ে সুবালা ফিরে এল আর সেই লজ্জা ও অপমানের ভিতর হতে জন্ম নিল এক ভয়ঙ্কর কুটিল প্রতিহিংসা, পদাহতা নারী সর্পিণীর মত ছোবল তুলল। এই প্রতিহিংসা-অনলে ইন্ধন যোগায় দুটি বস্তু—এক অতুলের প্রত্যাখ্যান আর দুই মণিকা দেবীর চাইতে ঢের বেশী রূপবতী হয়েও অতুলবাবুকে আকর্ষন না করতে পারায় মণিকা দেবীর কাছে তার পরাজয়।

প্রতিহিংসার ঐ আগুন তিন বৎসর ধরে সুবালা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। সেই সুযোগ এল এবারে যখন আবার আপনারা সকলে কাশীতে এলেন। এবং খুব সম্ভবতঃ হয়ত অতুলবাবুর প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জন্য সুবালা রণলালের শরণাপন্ন হয়। কারণ যেভাবে অতুলবাবুকে হত্যা করা হয়েছে সে পরিকল্পনা কোন নারীর মস্তিষ্ক-উদ্ভূত যে নয় এ ধারণা আমার প্রথম দিনই হয়েছিল। তাই প্রথম দিনই সন্দেহের তালিকা থেকে মণিকা দেবীকে আমি বাদ দিয়েছিলাম। যাহোক তারপর রণলালের আবির্ভাব ঘটল রঙ্গভূমে। এবং রণলালেরই পরামর্শমত অবশ্য সবই আমার অনুমান সুবালা কোন কিছুর সাহায্যে অতুলবাবুর ঘরের আলোটা নষ্ট করে মিস্ত্রীবেশী রণলালের প্রবেশের সুযোগ করে দেয় ওদের বাড়িতে। সুযোগমত মিস্ত্রীরূপী রণলাল রঙ্গভূমে প্রবেশ করে সবার অলক্ষ্যে মৃত্যু-ফাঁদ পেতে রেখে গেল।

পূর্বেই বলেছি অতুলবাবুকে হত্যা করা হয় বৈদ্যুতিক কারেণ্ট প্রয়োগে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রণলালের পক্ষে হাই ভোল্টের পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সহজই ছিল এবং সম্ভবতঃ পরিকল্পনাটি তার মাথায় আসে যত রাজ্যের ট্রাশ ইংরাজী পেনী সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনীর বাংলা অনুবাদ পড়ে পড়ে। কিন্তু যাক সে কথা। এবারে হত্যার ব্যাপারে ফিরে আসি।

অতুলবাবুর ঘরের বসবার লোহার চেয়ারটার পায়ার সঙ্গে ওঘরের আলোর সুইচ-বোর্ডের সঙ্গে একটা তামার পাত ও তারের সাহায্যে যোগাযোগ করে রাখা হয়েছিল এমন ভাবে যে, বেচারী অতুলবাবু ঘরে ঢুকে আলো জেলে ইলেকট্রিক কারেণ্টে তরঙ্গায়িত সেই চেয়ারটায় একটিবার গিয়ে বসলেই আর তাঁর পরিত্রাণ থাকবে না। Direct 220 Volt, A. C. current, অপূর্ব, নিষ্ঠুর, অব্যর্থ মৃত্যুফাঁদ। এইখানে হত্যাকারী একটু risk নিয়েছে। যদি অতুলবাবু চেয়ারে একেবারেই না সে রাত্রে বসতেন! সেই ভেবেই হত্যাকারী পূর্ব হতেই বোধ হয় অতুলবাবুর ঘরে ঢুকে অন্ধকারে তাঁর শয্যার উপরে নিঃশব্দে বসে ছিল অতুলবাবুর অপেক্ষায়।

অতুলবাবু ঘরে ঢুকে আলো জেলেই ঘরের মধ্যে হত্যাকারীকে দেখতে পেয়ে বোধ হয় চমকে যান। এবং খুব সম্ভবতঃ তখন হত্যাকারী সুবালা অতুলবাবুকে চেয়ারটায় উপবেশন করতে বলে। কোনরূপ সন্দেহ না করে অতুলবাবু হয়ত চেয়ারে গিয়ে বসেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাড়াতাড়ি তখন সুইচ অফ করে সুবালা রণলালের নির্দেশমত মৃত্যুফাঁদের সাজসরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে অর্থাৎ রণেনবাবুর ঘরের ভেতর দিয়ে পালায়।

মানসিক চাঞ্চল্যে এইখানে হত্যাকারী মারাত্মক তিনটি ভুল করে। এক নম্বর অতুলবাবু যে রাত্রে শয়নের পূর্বে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করেন সেই তথ্যটি পূর্ব

হতে জানা থাকায় এবং লোকের মনে সেই ধারণা জন্মাবার জন্য চেয়ারের পাশে একখানা বই ফেলে রেখে যায় যেটা হয়ত নিজেই সে রাত্রে সে পড়েছিল ও তার হাতে ছিল। ভুল করেছিল অতুলবাবুর স্যুটকেস থেকে সাধারণতঃ যে ধরণের বই তাঁর প্রিয় যেমন সাইকোলজি ও সেকসোলজির কোন একখানা বই সেখানে না রেখে তারই অর্থাৎ হত্যাকারীরই বহু-পঠিত প্রিয় চরিত্রহীন উপন্যাসখানা সেখানে ফেলে রেখে গিয়ে। দু নম্বর ভুল করে সে চেয়ারের পায়া থেকে তামার পাতের রিংটা না খুলে নিয়ে গিয়ে ও সুইচ-বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত তারের সবটুকু খুলে নিতে না পারায়, তাড়াতাড়ি টানাটানিতে বোধ হয় তারের একটা সুইচ-বোর্ডে লেগে ছিল ছিঁড়ে গিয়ে। তিন নম্বর ও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল করে সে মানসিক চাঞ্চল্যে সাধারণ দ্বারপথটা না ব্যবহার করে ঘরের মধ্যবর্তী দ্বার-পথটা যাবার সময় ব্যবহার করে। সে হয়ত কল্পনাও করেনি ঘরের মধ্যে ঐ সময় ঠিক অন্ধকারে রণেনবাবু এসে প্রবেশ করেছেন। সোজা পথে ঘর হতে বের হলে ঐ সময় বারান্দায় তাকে কেউ দেখলেও হয়ত অতটা সন্দেহ জাগত না।

এমন সময় রণেনবাবুই প্রশ্ন করেন, কিন্তু মিঃ রায়, আপনি জানলেন কি করে যে সুবালা দেবীই হত্যাকারী ?

কিরীটী জবাব দিল, দুটি কারণে। প্রথমতঃ অতুলবাবুর ডায়েরী পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত অতুলবাবুর চেয়ারের সামনে চরিত্রহীন উপন্যাসখানা পেয়ে। প্রথমটায় চরিত্রহীন উপন্যাসটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু অতুলবাবুর স্যুটকেস ঘাঁটতে গিয়ে তার মধ্যে কয়েকখানা সেকসোলজি ও সাইকোলজির বই দেখে চেয়ারের কাছে মাটির ওপরে পড়ে থাকা বইখানা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবারে গিয়ে বইখানা তুলে নিয়ে দেখি শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। পূর্বেই শুনেছিলাম অতুলবাবু সাইকোলজির প্রফেসর। সাইকোলজির প্রফেসর অতুলবাবু রাত জেগে চরিত্রহীন উপন্যাস পড়বেন কেমন যেন মনে খট্‌কা লাগল।

এই সময় হঠাৎ রণেনবাবু বলে ওঠেন, বাংলা উপন্যাস বা বই বড় একটা ও পড়তই না। বিশেষ করে নভেল বা উপন্যাস ছিল তার দু-চক্ষের বিষ।

আমারও সেই রকমই মন বলেছিল, যাহোক কৌতূহলভরেই বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পাতার মার্জিনে দেখলাম রিমার্ক পাস করা হয়েছে—কিরণময়ী, দুঃখ করো না। উপীন্দ্র নপুংসক। হাতের লেখা দেখে বুঝলাম কোন স্ত্রীলোকের রিমার্ক। এই ধরনের টিপ্পনী করা অভ্যাস বই পড়ে নারীদেরই সাধারণতঃ থাকে বা ঐ জাতীয় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পুরুষদের থাকে। তাছাড়া বইয়ের প্রথমেই টাইটেল পেজে ছোট্ট করে এক জায়গায় লেখা ছিল 'সুবালা'। বুঝলাম সেটা তারই বই। সমস্ত ব্যাপারটা যোগ করে ভাবতে গিয়ে মনে হল যেভাবেই হোক ঐ হত্যারহস্যের মধ্যে সুবালার অন্ততঃ কিছুটা

যোগাযোগ আছেই। কিন্তু সকলের জবানবন্দি থেকে কোন কিনারা হল না।

সন্দেহ পড়েছিল আমার রণেন ও সুবালার ওপরেই বেশী। অথচ এও বুঝেছিলাম একাকিনী সুবালার পক্ষে এ হত্যা ঘটানো সম্ভবপর নয়। সুবালা সুন্দরী যুবতী। পুরুষ মাত্রেই তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু কার সাহায্য নিল সুবালা! স্বভাবতঃই মনে হল সুবালা যদি কারও সাহায্য নিয়ে থাকে তো সে আশপাশেরই কোন যুবক হবে। তাই হানা দিলাম সর্বপ্রথমেই পাশের বাড়িতে। রণলালের সাক্ষাৎ মিলল এবং তার সঙ্গে কথায়বার্তায় বুঝলাম, সুবালার প্রতি রণলাল যে বিরাগ দেখাচ্ছে সেটা আসলে সত্য নয়। অভিনয় মাত্র। যাতে তাদের ওপরে কারও সন্দেহ না পড়ে। কিন্তু তা যেন হল, সুবালাই যদি হত্যা করে থাকে তার movements ধোঁয়াটে। জবানবন্দিতে পরিষ্কার হয়নি। তাই গঙ্গার ঘাটে আজ রাত্রের অভিনয়ের আয়োজন। কিন্তু তাতে একটা ব্যাপার প্রমাণিত হলেও সুবালার ব্যাপারটা হল না। কারণ মণিকা দেবীকে shield করবার জন্য রণেন ও সুকান্তবাবু তখনও সত্যি কথা সবটুকু বললেন না।

কিন্তু কি প্রমাণিত হল বলছিলেন? প্রশ্ন করে সুকান্ত।

প্রমাণিত হল এই যে সত্যিই আপনারা দুজনেই মণিকা দেবীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। এবং আপনাদের দুজনের একজনও অতুলবাবুর হত্যার সঙ্গে জড়িত নন।

তারপর বলুন? রণেন বলে।

তারপর আর কি! পূর্বাহ্নেই আমি শিউশরণের সাহায্যে সুবালা ও রণলালকে পৃথক পৃথক ভাবে থানায় ডাকিয়ে এনে দুটি পৃথক ঘরে আটকে রেখেছিলাম। তার পরের ব্যাপারটা তো সর্বসমক্ষেই ঘটল। নূতন করে বিবৃতির প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু শেষ কথা আমার আপনাদের বলছি—আপনি, রণেনবাবু ও সুকান্তবাবু, আপনাদের মধ্যে এবারে যত শীঘ্র সম্ভব একটা শেষ মীমাংসা করে নিন। কারণ আগুন নিয়ে এ বড় বিষম খেলা। দেখলেন তো চোখের সামনেই।

তিনজনেই মাথা নীচু করে।

কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বের হয় না।

কিরীটী শিউশরণের দিকে তাকিয়ে বললে, শিউশরণ, এঁরা আজ তোমার অতিথি। মিষ্টিমুখ না করাও অন্ততঃ এক কাপ করে চা—

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

শিউশরণ খুশিভাবে ঘর হতে প্রস্থান করলে বোধ হয় চায়ের যোগাড় দেখতেই।

॥ শেষ ॥

www.boiRboi.blogspot.com